মোহাম্মদ হাশিম কামালি

ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামে
মত প্রকাশের
স্বাধীনতা

মোহাম্মদ হাশিম কামালি

মালয়েশিয়ার মর্যাদাপূর্ণ
ইসমাইল আল ফারুকী
এ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক
এক্সিলেন্স প্রাপ্ত গ্রন্থ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মূল : মোহাম্মদ হাশিম কামালি
ভাষান্তর : মো: সাজ্জাদুল ইসলাম

ISBN
984-70103-0009-3

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৬
মহররম ১৪৩০
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাসা # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail: biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

মূল্য
২৫০.০০ টাকা US $ 20

মুদ্রণে
আহমদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৪৫/১ আরামবাগ, ফোন : ৭১৯২৬৪৪

Islame Mat Prokasher Swadhinota [Freedom of Expression in Islam] by Muhammad Hashim Kamali Translated by Md. Sajjadul Islam and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9,Uttara Model Town, Dhaka-1230, Phone : 8950227, 8924256, Fax : 8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org, Price : Tk. 250.00 US $ 20

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান দুনিয়ার একটি অন্যতম আলোচিত ও স্বীকৃত অধিকার। স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে যে কোন বিষয়ে নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি অপরকে জানানো। বিষয়টি যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ের হয়, তা হলে তা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং যদি সেটি রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তাহলেও সে ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ তার থাকা আবশ্যক। এই সাধারণ অধিকারটির প্রতি সকলেই কম বেশি উদার মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই যখন কেউ তার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যান অর্থাৎ স্বাধীন মত প্রকাশ করতে গিয়ে কেউ যখন কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে অনধিকার চর্চা করেন বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের পরিপন্থী কোন বিবৃতি দিয়ে বসেন অথবা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি বিভ্রান্তিমূলক এবং বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। এ ধরনের আচরণের ফলে ব্যক্তিগত সংঘাত শুরু হয়। কখনো বা তা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ ধরনের আচরণ মানুষ কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে, কখনও অজ্ঞতার কারণে করে থাকেন। যারা জেনে শুনে, অসৎ উদ্দেশ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন তারা অবশ্যই মানবীয় আইনে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে থাকেন। কিন্তু যারা অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে থাকেন, তাদের জন্য এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা' বইটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এতে ধর্মীয় দিক নির্দেশনার আলোকে মত প্রকাশের অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে গ্রহণযোগ্য পরিসর নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই বইয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, যদিও মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; তবুও একে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া ব্যক্তি ও সমাজের জন্য খুবই বিপদজ্জনক হতে পারে।

এই বই এর শুরুতেই স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এর পরিধি কি হওয়া উচিৎ তা বলে দেয়া হয়েছে। অত:পর মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির সাথে পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক মত প্রকাশের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এই বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা শর্তাধীন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করবেন। এক্ষেত্রে নৈতিক এবং আইনগত উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বইটির মাধ্যমে ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত দ্বিধা, সংশয় এবং বিভ্রান্তী দূর হবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, বইটিকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, এতে কয়েকটি মুসলিম দেশ যেমন মালয়েশিয়া, মিশর ও পাকিস্তানের প্রাসঙ্গিক আইনেরও পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে এটি আধুনিক আইনের ছাত্রদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া এই বইয়ে সমসাময়িক বিভিন্ন আলোচিত ইস্যুকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শরীয়াহ ও আধুনিক সমাজ বাস্ত-বতার মধ্যে অনাহুত সৃষ্ট ব্যবধানকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। মোট কথা বইটিতে ইসলামের সৌন্দর্য ও ব্যাপকতার দিক বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল দিক বিবেচনা করে এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বাধগম্য করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বিআইআইটি।

আশা করি বইটি একদিকে জ্ঞানপিপাসুদের জন্য একটি উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে, অপরদিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবেও গণ্য হবে ইন্‌শাল্লাহ।

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক, বিআইআইটি

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ স্বাধীনতা ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। মানব সমাজের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে স্বাধীনতার এ ধারণা । মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সত্যের উন্মোচন ও সমাজের কল্যাণসাধন। মানবজাতির জন্য সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এসেছে ইসলাম, যা কিয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন আদর্শ হিসেবে বিরাজমান থাকবে। মানবজীবন, সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের দিক নির্দেশনা রয়েছে কুরআন-সুন্নাহতে।

পশ্চিমা জগতে আধুনিক মানবাধিকারের ধারার উন্মেষের বহু পূর্বে ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। রাসূল সাঃ এর প্রদর্শিত এ স্বাধীনতা চর্চার অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় খোলাফায়ে রাশেদার যুগে।

একথা সত্য যে, মৌলিক মানবাধিকারের অন্যতম দিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় বর্তমান সাংবিধানিক আইনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; কুরআন-হাদিসে বিষয়টি তেমন গোছালোভাবে বর্ণিত হয়নি, তবে শরীয়ার বিভিন্ন স্থানে এর স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণপঞ্জি ছড়িয়ে রয়েছে। এ স্বাধীনতা ছাড়া ইসলামি আদর্শ পূর্ণ ভাবে অনুসরণ সম্ভব নয়। অথচ পশ্চিমা দুনিয়ায় এ ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত রয়েছে।

মুহম্মদ হাশিম কামালী Freedom of Expression in Islam বা ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন- *শরীয়ার বিভিন্ন সূত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিপুল পরিমাণ প্রমাণপঞ্জি থাকা সত্ত্বেও আধুনিক সাংবিধানিক আইনের ওপর লেখা সুবিদিত গ্রন্থে যেভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি বিবৃত হয়েছে, আলেমদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় একান্তভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা কেউ দেখতে পাবেন না।*

হাশিম কামালি আরও বলেছেন -‘*ইসলাম একটি আচরনিষ্ট ধর্ম এবং অধিকারের ধারণা বিশেষ করে মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি শরীয়ার আওতাবহির্ভূত-পশ্চিমা মনীষীদের এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জবাবে মূলত এ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।*’

লেখক তার গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রাথমিক আলোচনায় গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও এর পরিসর এবং অধিকার ও মৌলিক অধিকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ইসলামের সমর্থনসূচক প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরা হয়েছে। হিসবাহ বা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ

www.pathagar.com

কাজের নিষেধ, নসিহা বা আন্তরিক সদুপদেশ, শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শ, ইজতিহাদ বা স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রদান এবং আল মু'য়ারাদা বা গঠনমূলক সমালোচনা, হুররিয়াত আল দ্বীনিয়া বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতার মতো মূলনীতিসমূহে ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। নৈতিক সংযম শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে যে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ। এ বিধি নিষেধ, দু'ক্যাটাগরির- এক: নৈতিক, দুই: আইনগত। নৈতিক ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে কুৎসা রটনা, তিক্ত-কটু কথা বলা, অপরের দুর্বলতা প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ। এছাড়া মিথ্যা অপবাদ, মানহানিকর কথা, অপমান করা ও ধর্মাবমাননার মতো বিষয় আইনগত ক্যাটাগারির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আইনগত সংযম প্রদর্শনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্যে ক্ষতিকর কথা উচ্চারণ, মিথ্যা অপবাদ দান, অবমাননা করা, অভিশাপ প্রদান, কোন মুসলমানকে কাফের বলা, বিদ্রোহ ও ধর্মাবমাননা।

গ্রন্থটির শেষে প্রদত্ত ৫টি পরিশিষ্টে হক, হুকম ও আদল, মালয়েশিয়া, মিশর ও পাকিস্তানসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আইনের তুলনামূলক আলোচনা এবং সালমান রুশদীর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শেষে সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দার্থ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর মালয়েশিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ইসমাইল আল ফারুকী এ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স লাভ করে। *পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়-*

'ইংরেজী, আরবী বা উর্দু ভাষায় ইসলামী আইন সংক্রান্ত কোন গ্রন্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে এতো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়নি।'

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে তাদের মাতৃভাষায় পাঠের সুযোগ করে দিতে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তারা অনুগ্রহ করে আমার ওপর বইটি তরজামার দায়িত্ব দেয়। বইটি তরজমার ক্ষেত্রে বিআইআইটির উপ-নির্বাহীপরিচালক ভাই আব্দুল আজিজ, মুফতি আব্দুল মান্নান ও আরো অনেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সকলের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। বইটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তাদের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।

-মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
ঢাকা, ২০০৯

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটি রচনায় যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছে, আমি তাদের সকলের কাছে ঋণী ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি এ ব্যাপারে প্রথমে '*সোশ্যাল সায়েন্সেস এন্ড হিউম্যানিটিজ রিসার্চ কাউন্সিল অব কানাডা*'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যারা ১৯৮৩-৮৪ সালে আমাকে একটি বৃহত্তর গবেষণা প্রকল্পের জন্য উদারহস্তে মঞ্জুরী সহায়তা দিয়েছিল। বৃহত্তর এ প্রকল্পটির শিরোনাম ছিল '*ফানডামেন্টাল রাইটস অফ ইনডিভিজুয়াল ইন ইসলামিক ল*' (ইসলামি আইনে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার) এবং এ বইটি উক্ত প্রকল্পেরই অংশ বিশেষ। আমি এ বই রচনায় ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তের বড় অংশই ঐ প্রকল্পের প্রস্তুতি হিসেবে সংগ্রহ করেছিলাম। আমি আমার সাবেক সহকর্মী ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্ট্যাডিজ ইনস্টিটিউটের প্রফেসর চার্লস জে এডামস এর প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ এ গবেষণাকর্মে তার উৎসাহ, উপদেশ ও সহযোগিতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সহায়ক হয়েছে।

www.pathagar.com

আমি গবেষণাকর্মে লন্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ এর ল' ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। বিশেষভাবে আমার দুই সহকর্মী মি: আইয়ান এজ ও চিবলি মাল্লাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার গবেষণার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য দুটি *কলৌক্যুয়া'র* আয়োজন করেন। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া এর রিসার্চ কমিটি আমাকে এ গবেষণায় সহায়তার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করে, যার ফলে ১৯৯০ সালের গ্রীষ্মে আমি গবেষণা ছুটি নিয়ে লন্ডন ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির সংগৃহীত তথ্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে সক্ষম হই। এজন্য তাদেরকে জানাই আন্ত রিক ধন্যবাদ বিশেষ করে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া এর কুল্লিয়া অব ল' এর ডীন প্রফেসর আহমদ ইব্রাহীম সবসময়ই আমার এ গবেষণাকর্মে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন এবং তার উৎসাহদান ও গঠনমূলক পরামর্শ এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সুযোগে আমি কুল্লিয়া অব ল'জ বিভাগের পাবলিক লেকচার সিরিজ এর আয়োজক কমিটির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়াতে আয়োজিত একটি পাবলিক লেকচারের মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। সবশেষে আমি ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত 'ফ্রিডম অফ এসোসিয়েশন : দ্য ইসলামিক পারসপেক্টিভ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজক কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আইআইইউ মালয়েশিয়া-র লাইব্রেরির কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে বোন নূরাইনি ইসমাঈল এবং কুল্লিয়া অব ল' এর সেক্রেটারিয়াল স্টাফ সিতি রোহাইয়া জাকারিয়া ও নোরাসিয়াহ মোহাম্মদ সোলায়মানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা আমাকে নানাভাবে সবসময়ই সহায়তা করেছেন। তাঁরা আমার লেখা টাইপ করে দেন এবং পান্ডুলিপি প্রস্তুতিতেও সহায়তা করেন।

মোহাম্মদ হাশিম কামালি
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, ১৯৯৩

www.pathagar.com

সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকা

১৯৯৪ সালে সেপ্টেম্বরে কুয়ালালামপুরে প্রথমে বইটি প্রকাশিত হবার পর ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বইটির 'ইসমাঈল আল ফারুকী এ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স' লাভ ছিল একটি বড় ঘটনা। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর মালয়েশিয়া শাখা এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, যৌথভাবে এ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। এ্যাওয়ার্ড বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত এক্সটার্নাল এস্‌সেসর'স রিপোর্টে এ গ্রন্থকে একটি *'অগাধ শ্রমসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা'* বলে অভিহিত করে বলা হয় যে, *'এতে লেখকের আদ্যপান্ত অগাধ জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর দখল থাকার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।'* রিপোর্টটিতে আরও বলা হয় যে *'ইংরেজি, আরবি অথবা উর্দু ভাষায় ইসলামি আইন সংক্রান্ত কোন বইয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে এতো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়নি।'*

কুয়ালালামপুর সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর আমি ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি'র সম্পাদকবৃন্দ- বিশেষ করে ড. আবদাল রহমান আজ্জামের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করি। তিনি একজন মিশরীয় বিশেষজ্ঞকে বইটি পর্যালোচনা করে তাঁর অভিমত জানাতে অনুরোধ করেন। ড. আজ্জাম এক চিঠির মাধ্যমে তার সে অভিমতের সারসংক্ষেপ আমাকে অবহিত করেন। পর্যালোচক ও ড. আজ্জাম উভয়ের উন্নততর পরামর্শ থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। বইটিতে ব্যবহৃত আরবি পরিভাষাগুলো যাতে সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝতে সক্ষম হন, সেজন্য ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা দেয়ার প্রস্তাব করা হয় এতে, এছাড়া কতিপয় ভাষাগত সংশোধনীরও পরামর্শ প্রদান করা হয় যাতে 'বইটিতে একটি অবজেকটিভ লিগ্যাল হ্যান্ডবুক' স্টাইলের প্রতিফলন ঘটে এবং তা অনেকের জন্য একটি

www.pathagar.com

মানসম্মত তথ্যসূত্র (রেফারেন্স) ও অনুপ্রেরণার গ্রন্থে পরিণত হয়। পর্যালোচকরা বইটিকে 'এ ধরনের প্রথম অনন্য গ্রন্থ' বলেও বর্ণনা করেন।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে প্রস্তুতির জন্য আমি বইটির রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছি। এরমধ্যে রয়েছে কিছু কিছু অনুচ্ছেদের সংশোধনী, কিছু আরবি পরিভাষার ব্যাখ্যামূলক পাদটিকা সংযোজন এবং বইটির শেষ অধ্যায়ে একটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন। সংযুক্ত নতুন পরিচ্ছেদটিতে ধর্মের অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআনের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট ইবনে তাইমিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল শারিম আল মাসলুল* এর আলোচনা করা হয়েছে। সালমান রুশদির ব্যাপারে প্রথম সংস্করণে আলোচনা করা হয়েছিল, এখন তা বইটির সর্বশেষে টীকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা ও ভারসাম্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে এ পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথম ও বর্তমান উভয় সংস্করণে পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যবহৃত আরবি শব্দের ব্যাখ্যা করতে বইটির সর্বশেষে টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

বইটি ইসমাইল আল ফারুকী এ্যাওয়ার্ড এর জন্য মনোনীত হওয়ার ফলে অনেক বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া -এর রেক্টর ও ইসমাইল আল ফারুকী এ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, মালয়েশিয়া -এর পরিচালক ড. জামাল বারজিনজি আমাকে নানাভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আই আই ইউ এম এর একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স- এর ডেপুটি রেকটর প্রফেসর মোহাম্মদ কামাল হাসানের মূল্যবান মন্তব্যের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংশোধিত সংস্করণে আমি তাঁর এ মন্তব্যের বিষয়কে কাজে লাগিয়েছি। পরিশেষে আমি চমৎকার সম্পাদনা কর্ম সম্পাদন ও সহযোগিতার জন্য ইসলামিক টেক্সটস্ সোসাইটির সম্পাদকবৃন্দ, বিশেষ করে মিসেস ফারহানা মেয়েরর ও ড. রেজা শাহ কাজেমীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ হাশিম কামালি
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া
জুন, ১৯৯৫।

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম অধ্যায় : প্রাথমিক আলোচনা

১. সূচনা ১৩

২. সংজ্ঞা ও পরিসর ১৯

৩. অধিকার ও মৌলিক অধিকার ৩০

* টিকা ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমর্থনসূচক প্রমাণপঞ্জি

১. সূচনা বক্তব্য ৪২

২. হিসবাহ সম্পর্কে কুরআনের মূলনীতি ৪৩

৩. অন্তর নিংড়ানো উপদেশ *(নাসিহাহ্)* ৫০

৪. পারস্পরিক আলোচনা *(শুরা)* ৫৭

৫. ব্যক্তিগত যুক্তিপূর্ণ অভিমত *(ইজতিহাদ)* ৬২

৬. সমালোচনার স্বাধীনতা *(হুররিয়াত আল মু'য়ারাদা)* ৬৭

৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা *(হুররিয়াত আল-রা'ই)* ৭৯

৮. সংগঠন করার স্বাধীনতা ৯১

৯. ধর্মীয় স্বাধীনতা *(আল্ হুররিয়াত আল দীনিয়া)* ১০৬

* উপসংহার ১২৭

* টিকা ১২৯

তৃতীয় অধ্যায় : নৈতিক সংযম

১. সাধারণ বিষয়সমূহ ১৪৪

১. সূচনা বক্তব্য ১৪৪

২. কুৎসা রটনা, অপবাদ ও উপহাস ১৪৪

৩. অপরের দুর্বলতা প্রকাশ করা ১৫১

৪. সুপারিশকৃত নীরবতা ১৫৫

৫. ব্যক্তিগত অভিমতের *(রা'ই)* অপব্যবহার ১৫৮

www.pathagar.com

২. বিশেষ বিষয়সমূহ ১৭৭
১. আল্লাহর সত্ত্বা *(যাত আল্লাহ)* ১৭৮
২. স্বাধীন ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারন *(আলক্বাদা ওয়া'লক্বাদার)* ১৮১
৩. কটুবাক্য, কলহ, বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন *(মিরা, জাদাল ও খুসুমাহ)* ১৮২
৪. ভান করা *(তাকিয়্যাহ)* ১৮৭
* টিকা ১৯১

চতুর্থ অধ্যায় : বৈধ-সংযম

১. সূচনা বক্তব্য ২০১
২. জনসমক্ষে কষ্টদায়ক কথা উচ্চারণ ২০২
৩. মিথ্যা অপবাদ *(ক্বাদফ্)* ২০৬
৪. মানহানি *(ইফতিরা)* ২১০
৫. অবমাননা *(সাব, শাতম)* ২১৩
৬. অভিসম্পাত *(লা'ন)* ২১৮
৭. কোন মুসলমানকে অবিশ্বাসী বলা *(তাক্ফির আল মুসলিম)* ২২২
৮. বিদ্রোহ *(ফিৎনা)* ২২৭
৯. ধর্ম অবমাননা *(সাব আল্লাহ ওয়া সাব আল রাসুল)* ২৫৩
* টিকা ২৯৭

উপসংহার ৩১০

পরিশিষ্ট ১ ৩১৩
পরিশিষ্ট ২ ৩২৬
পরিশিষ্ট ৩ ৩৩০
পরিশিষ্ট ৪ ৩৩৯
পরিশিষ্ট ৫ ৩৪৯

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ৩৫৯
শব্দার্থ (Glossary) ৩৭৫

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায় : প্রাথমিক আলোচনা

১. সূচনা

এই বইয়ের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সংজ্ঞা, সুযোগ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের প্রকাশ ও মানব মর্যাদা রক্ষা করা। এ অংশে সেদিকটি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বীকৃতির বিষয়সমূহ অথবা অন্য কথায় শরীয়ার অধিকারের দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম একটি আচার-অনুষ্ঠান ও কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম এবং অধিকারের ধারণা বিশেষ করে মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি শরীয়ার আওতাবহির্ভূত, এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিতে এ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

বইটির অবশিষ্টাংশে দুটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হল, মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রমাণপঞ্জি এবং তার সীমাবদ্ধতা। ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চার ক্ষেত্রে নৈতিক অথবা আইনগত সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এ দুটি মূল বিষয়কে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক বলা যেতে পারে, আর সে কারণে আমি এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এটি সংযোজন করেছি যার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনবোধে ও ইচ্ছা করলে কতিপয় বিষয় পুনর্মূল্যায়ন এবং শরীয়ার সূত্রের বিভিন্ন বিষয় নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তার দিক তুলে ধরা। সাধারণত সমসাময়িক ঘটনাবলির আলোকে শরীয়ার বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইনি সমস্যার সঙ্গে শরীয়ার নির্দেশনার সম্পর্ক নির্মাণের আগ্রহ থেকে আমি এ সূত্রসমূহ ও তার পটভূমি পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেছি।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রমাণের অধ্যায়ে সর্বপ্রথম আল-কুরআন ও সুন্নাহর কতিপয় মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদবের শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে এ স্বাধীনতার অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি একথা বলেছি যে, শরীয়ার বিভিন্ন সূত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিপুল প্রমাণ-পঞ্জি থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক আইনের ওপর আধুনিক রচনা ও বর্তমানে সুবিদিত গ্রন্থে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় যেভাবে বিবৃত হয়েছে 'আলেমদের' পান্ডিত্যপূর্ণ লেখায় একান্তভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয় কেউ দেখতে পাবেন না এবং কেউ তা পাবার আশাও করতে পারেননা। বাক স্বাধীনতার বিষয় যেসব মূলনীতিতে সমর্থিত হয়েছে তা হল 'হিসবাহ' সৎ-কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, 'নাসিহা' বা আন্তরিক সদুপদেশ, 'শুরা'

www.pathagar.com

বা পারস্পরিক পরামর্শ এবং ইজতিহাদ বা স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রদান এবং হাক আল-মু'য়ারাদাহ বা গঠনমূলক সমালোচনা। এসব নীতিতে ইসলামে বাক স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আমি পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আমার এ অংশের আলোচনায় ব্যক্তিগত অভিমত (রা'ই) ও এর ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার উদ্ভব ঘটেছে শরীয়ার বিধিবিধান বিকাশের সাথে ব্যক্তিগত যুক্তিপূর্ণ অভিমতের ব্যবহার সমন্বিত করা হবে কি না এবং কিভাবে, সে প্রশ্ন থেকে। হ্যাঁসূচক সাক্ষ্যের অংশের আলোচনা সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতার বিষয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আমার এ অংশের আলোচনা অনেকটা গবেষণাধর্মী, কেননা এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন দৃষ্টান্ত আমি খুঁজে পাইনি। আমার চিন্তার প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রমাণপঞ্জি খুঁজে বের করা এবং তা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা। এছাড়া এ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট অনুসিদ্ধান্তের আলোকে বর্তমান তথ্য প্রমাণের ব্যাখ্যা প্রদান করা।

পরবর্তী অংশে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগত বিধির আওতায় এ স্বাধীনতার মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে, যা সাধারণত ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাসের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। শরীয়া বিবেকের স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছে কি-না আমি সে মৌলিক নীতির বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ স্বাধীনতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন অনুধাবনে কতিপয় বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে শরীয়ায় দৃঢ় সমর্থন রয়েছে বলে আমি উপসংহারে উপনীত হয়েছি। বিশেষজ্ঞরা নানা যুক্তি দেখিয়েছেন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই" (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)। আয়াতটি বাতিল হয়ে গেছে, এটি এক্ষেত্রে ঠিক নয় এবং আমি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রেক্ষাপট দেখতে পেয়েছি। এছাড়া আমি মুরতাদ হয়ে যাবার বিষয়, এর অর্থ ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় এর অবস্থানের কতিপয় সাক্ষ্য–প্রমাণও পর্যালোচনা করেছি।

আমার দুটি প্রধান বিষয়ের দ্বিতীয়টি হল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ। এ বইয়ের বড় অংশ জুড়ে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমি বিধিনিষেধের বিষয় দুটি প্রধান ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি। তা হল নৈতিক ও আইনগত। বাকস্বাধীনতা লংঘনের নৈতিক ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে কুৎসা রটনা, তিক্ত-কটু কথা বলা, অপরের দুর্বলতা প্রকাশ করা এবং

অনেক ধরনের মিথ্যা কথা কথন। মিথ্যা অপবাদ, মানহানিকর কথা, অপমান করা ও ধর্মের অবমাননার মত অপরাধের আইনগত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তাই স্পষ্টত বিচারযোগ্য বিষয় হওয়ায় এগুলোকে আইনগত নিষিদ্ধ ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ (ফিৎনা), বিভ্রান্তি ছড়ানো (বিদ'আত) ও অবিশ্বাস (কুফর)-এর মতো কতিপয় ধারণা বা বিষয়কে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। এসব বিষয়ের স্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি এবং এর বহুমুখী প্রয়োগ রয়েছে। প্রথম দিকের সাহিত্যে আমি এসব বিষয়ের প্রয়োগের অনেক বৈচিত্র্য দেখতে পেয়েছি এবং এসব ধারণাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা ও মূল্যায়ন করা বেশ কঠিন। এছাড়া এসব বিষয় ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মূলনীতি থেকে বেশ ভিন্ন হতে পারে। যেমন বিদ্রোহের (ফিৎনা) সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে খারেজিরা ইসলামের শিক্ষার মূল ধারা থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং কতিপয় ধারণা পেশ কওে, যা ছিল সুস্পষ্টভাবে বিতর্কিত এবং অন্যগুলো ছিল নিছক সন্দেহজনক। ফেরকার সাহিত্যে বিভ্রান্ত ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কুফরের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেক সময় শিথিলতা প্রদর্শন ও নিজস্ব মতের ব্যাপারে জোর জবরদস্তির পন্থা অবলম্বনকারী বিরোধী উপদলের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হয়। প্রধান প্রধান মাযহাবের আলেমগণ এ ধরনের বিচ্যুতি চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। ধর্মত্যাগ, অপবাদ ছড়ানো ও বিভ্রান্তির আলোকে আমি তাদের ধারণাকে পৃথক ও বিশেষভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এসব ধারণা প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয় এবং যুগপৎ ঘটে থাকে।

বিভিন্ন ধারণা অথবা বিষয়ে শরীয়ার সূত্রের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার করার চেষ্টা করেছি। নির্ধারিত বিষয়ে যেখানে নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহারের কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেখানে সৃষ্ট প্রশ্নমালা ও গুরুত্বের বিচারে সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির মাত্রা আমি নিজেই গ্রহণ করছি। আমার জানামতে ইংরেজি বা আরবি ভাষায় একান্তভাবেই ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে কোন গবেষণাগ্রন্থ নেই। তাই এ কাজটি অনেকটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক ছিল; কারণ তা রচনার ক্ষেত্রে আইন, ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য নৈতিক সীমারেখার মধ্যে থেকে সকল ইস্যুর সব ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হয়েছে-যাতে আমার আলোচনা যেন আদৌ কোন বিশেষ সীমারেখায় গণ্ডিবদ্ধ থাকার চিহ্ন না থাকে। আমি আগেই বলেছি, আমি

www.pathagar.com

বিষয়গুলোকে নৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য বিষয়ে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি, সুনির্দিষ্ট বা পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এ শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি, কারণ আরও অনেক বিষয় অবশিষ্ট থাকতে পাওে; যা একই সঙ্গে একাধিক শিরোনামে পেশ করা যেতে পারে। আমি আইন-বহির্ভূত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও এই গবেষণা গ্রন্থটি অনুসন্ধানমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রধানত আইন সংক্রান্ত এবং কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।

এ গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত পরিশিষ্ট-১ এ দ্বিতীয় অধ্যায়ের হক, এর সংজ্ঞা এবং ইসলামের দুটি সম্পর্কিত বিষয় হুকুম ও আদল এর সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।[১] পরিশিষ্ট ২, ৩ ও ৪-এ আমার প্রাপ্ত তথ্য এবং মালয়েশিয়া, মিশর ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের প্রচলিত আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছি। তবে এসব করার পিছনে আমার লক্ষ্য ছিল নিছক তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি প্রদান করা এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিক আইনের রূপরেখা তুলে ধরা। সমসাময়িক মুসলিম দেশসমূহের আইনে সামগ্রিকভাবে অবিশ্বাস, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মের প্রতি অবমাননা ও ধর্মত্যাগের মতো বিষয়ের সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। শরীয়া ও আধুনিক আইনের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ও এ আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্রোহ বা নৈরাজ্য (ফিৎনা) সৃষ্টির বিষয় শরীয়ার আইন শাস্ত্রে যেমন ধর্মীয় বিষয়; তেমনি রাজনৈতিক ইস্যুও। অন্যদিকে আধুনিক আইনে আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি রাজনৈতিক বিষয়। আমি কেন এ গ্রন্থে আধুনিক আইনের আলোকে কতিপয় বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, তার আংশিক ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া গেছে। পারিশিষ্ট-৫ এ সালমান রুশদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আমরা যেসব বিষয় উত্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আইনগত বিধি ও শরীয়ার নির্দেশনা কি রয়েছে-তা চিহ্নিত করা। এসব বিষয় এমনভাবে গ্রন্থিত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে আধুনিক আইনের ছাত্ররা তা ব্যবহার করতে পারে। উপাত্তসমূহ মূল্যায়নকালে আমি বর্তমানে মুসলমানদের জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগের আলোকে বিভিন্ন পরামর্শ পেশ করেছি এবং অন্তত কতিপয় ক্ষেত্রে এ নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান চালানো ও সমাধান পেশ করা প্রয়োজন। এছাড়া আমি যেসব ক্ষেত্রে সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়েছি, সে ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব অভিমতও তুলে ধরেছি। তবে আরও গবেষণার মাধ্যমে আরও বিকাশ সাধনের মতো অনেক ক্ষেত্র এখনও রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

শরিয়ত ও আধুনিক আইনের মধ্যে সঙ্গতিবিধান লক্ষ্যে কতিপয় বিষয়ে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হতে পারে এবং বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোর সংবিধান ও আইনে সামগ্রিকভাবে ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রায় এ সঙ্গতি বিধানের সে চেষ্টাই করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর কালের প্রথম দিকে এ মনোভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল; তবে বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত ব্যবহারিক আইনের পরিচয় ও উৎস সংহত ও জোরদার করা সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দশকগুলোতে প্রধানত রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ইসলামি পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে যাতে ইসলামি উত্তরাধিকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তুলে ধরার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ দাবি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। কারণ সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সম্ভাবনাময় বিকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোথায় ও কিভাবে-এ ঐতিহ্য প্রয়োগ করা হবে-তা স্থির করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সাংবিধানিক আইন প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অথবা সংবিধান অথবা অন্যান্য আইনে ইসলামি বিষয় সন্নিবেশ করার জোরদার দাবি জানানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এটি অর্জন করা সম্ভব হবে, সুনির্দিষ্ট কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সংস্কার করা প্রয়োজন এবং তা কোন্ পন্থায় করা হবে, সেসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।

এ গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাপারে ইসলামি সমাধান অনুসন্ধান করা। এসব ব্যাপারে শরীয়ার নির্দেশনা কি কেবল তা নিরূপণ করা নয়, উপরন্তু শরীয়া ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে সৃষ্ট ব্যাপক ব্যবধান দূর করা। দীর্ঘকাল ধরে অনুকরণের (তাকলিদ) ফলে এ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে, এর ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট দিকে যে সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নতুন যেসব প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে, তার সাথে অতীতের আইনশাস্ত্রের (মাযহাব) স্বাধীন যুক্তির (ইজতিহাদ) কোন সম্পর্ক নেই।[২]

তাই বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে হয় বর্তমান অবস্থার আরও উন্নয়ন সাধন করতে হবে; আর তা করা না গেলে বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করতে শরীয়ার সূত্রের বিষয়গুলো সরাসরি উপস্থাপন করতে হবে। এ দুটো পন্থাকে পারস্পরিকভাবে পরিপূর্ণ মনে করার প্রয়োজন নেই। এমনকি যেখানে নতুন সমাধান প্রয়োজন বলে মনে হবে সেখানেও বর্তমান অভিমত ও ইজতিহাদ অত্যন্ত সহায়ক হবে। এছাড়া বিকল্প ব্যাখ্যা সম্পর্কে জুরিদের ইতমধ্যে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে।

পরিভাষা সংক্রান্ত নোট

আরব লেখকগণ 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার' বিষয়ে অভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। তাদের অনেকে এই বিষয়কে হুররিয়াতি আল-রা'ই যার আক্ষরিক অর্থ 'মতামতের স্বাধীনতা' এবং হুররিয়াত আল কাউল বা 'বাক স্বাধীনতা' বলেছেন। কেউ কেউ আবার এর বিকল্প পরিভাষা যেমন, হুররিয়াত আল তাফকির আক্ষরিক অর্থে 'চিন্তার স্বাধীনতা' হুররিয়াত আল- তাবির অর্থে মত প্রকাশ বা ব্যাখ্যার স্বাধীনতা এবং হুররিয়াত আল বায়ান, 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' বুঝিয়েছেন। অর্থে সুবহি মাহমাসানি হুররিয়াত আল রা'ই ও হুররিয়াত আল রা'ই ওয়াল তানবির উভয় পরিভাষা ব্যবহার করেন যার অর্থ হলো 'মত ও বাক প্রকাশের স্বাধীনতা'। এরপর তিনি হুররিয়াত আল তাফকির বা আক্ষরিক অর্থে চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়ে এ দীর্ঘ পরিভাষা কেন ব্যবহার করেছেন তার ব্যাখ্যা করেছেন:

> *চিন্তা হচ্ছে অন্তরের একটি গোপন বিষয় এবং মানসিক কর্মকাণ্ড-যা কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কোনো চিন্তার বিষয় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তা আইনের এখতিয়ার বহির্ভূত থাকে। চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা রা'ই (অভিমত) বলে উল্লেখ করে থাকি। হুররিয়াত আল রা'ই ওয়ালতাবির পরিভাষার ব্যবহারকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এ কারণে যে যাতে এতে কোনো বিষয়ে চিন্তা, ধারণা বা মত প্রকাশ করা এবং জানানোর বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।*[৩]

আবদ আল-হামিদ আল-মুতাওয়াল্লিও হুররিয়াত আল-রা'ই এবং হুররিয়াত আল-রা'ই ওয়াল তা'বির-উভয় পরিভাষা ব্যবহার করেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ কামিল লাইলা হুররিয়াত আল-রা'ই এবং আবদ আল ওয়াহিদ ওয়াফি আল-হুররিয়াত আল-ফিকরিয়া বা 'চিন্তার স্বাধীনতা' পরিভাষা ব্যবহার করেন আব্দুল কাদের আওদা ও সায়ীদ আল সাবিক এর অপর সমার্থক শব্দ হুররিয়াত আল-তাফকির ব্যবহার করেন। অপরদিকে ফারুক আল-নাবহান ব্যবহার করেছেন হুররিয়াত আল-রা'ই আল তাফকির বা 'মতামত ও মৌলিক চিন্তার স্বাধীনতা' বুঝাতে। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মতামত ও চিন্তা প্রচারের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে তার হুররিয়াত আল-তা'বির পরিভাষার ব্যবহারে।[৫] এসব লেখকদের সকলেই ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পৃথক বিষয় হিসেবে দেখেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একে হুররিয়াত আল-তাদাইউন: 'ধর্মীয় স্বাধীনতা', হুররিয়াত আল-রা'ই: 'বিশ্বাসের স্বাধীনতা' ও হুররিয়াত আল-দিনিয়া: 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'কে পৃথক পৃথক শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন। যদিও সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্পূরক, এটি একটি সংযোজন এবং তাহল: বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার একটি যৌক্তিক পরিণতি, শরীয়া যাকে বৈধতা প্রদান করেছে ও সমুন্নত রেখেছে।'[৬]

আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মুসলিম বিশেষজ্ঞরা তাদের পান্ডিত্যপূর্ণ লেখায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হুররিয়াত আল-রা'ই কেন ব্যবহার করলেন; যার শাব্দিক অর্থ হল 'মতামতের স্বাধীনতা' অথচ এ বিষয় আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরিভাষা ছিল হুররিয়াত আল-কাউল। সম্ভবত এ কারণে এটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মতামত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া রা'ই শব্দের একটা নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। 'রা'ই' অর্থ সুচিন্তিত অভিমত যা প্রায়ই ব্যক্তিগত যুক্তির (ইজতিহাদ) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামের বিধিবিধান ও মূল নীতিমালার সাথেও বেশ সঙ্গতিপূর্ণ।

২. সংজ্ঞা ও পরিসর

ক. সংজ্ঞা

স্বাধীনতার একটি ব্যাপকভিত্তিক সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি এমনকি পরস্পরবিরোধী স্বার্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকায় আজ পর্যন্ত এর সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব হয়নি। লেখক ও ভাষ্যকাররা অবশ্য স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেয়ার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছেন। তৎসত্ত্বেও এক্ষেত্রে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও সংশয় বিরাজ করছে। কার জন্য স্বাধীনতা? কার কাছ থেকে এ স্বাধীনতা? এবং কী করার জন্য স্বাধীনতা? অধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হলো এ পার্থিব জগতের আকর্ষণ ও নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি লাভ করা। দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদরা মানুষ ও তার স্রষ্টা আল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা করেন, এ দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি কি নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারেন। তা না পারলে স্বাধীনতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়াবে? কোন অর্থ বোধিকতা থাকলে 'স্বাধীনতা' শব্দটি সঠিক প্রেক্ষাপট প্রকাশ করতে পারে?

আইনজীবী ও বিচারকদের কাছে স্বাধীনতা হচ্ছে আইনের সীমার মধ্যে ক্রিয়াশীল একটি বিষয়। আমি এখন আইনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার একটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে চাই। তবে মনে রাখবেন, এটি স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার কতিপয় দিকের সংজ্ঞা দেয়ার একটি চেষ্টা মাত্র, কোন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নয়।

www.pathagar.com

শুরুতেই একথা উল্লেখ করা দরকার যে, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সকল আইনগত ব্যবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে স্বাধীনতার মৌলিক ধারণা অভিন্ন। যে কোন ব্যক্তি পশ্চিমা আইন, চীনা আইন অথবা ইসলামি আইনে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইলে তাকে অবশ্যই 'অন্যের অধিকার লঙ্ঘন বা আইনের সীমা অতিক্রম ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে' তার তা করা বা বলার অথবা তা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতাকেই বুঝাতে হবে।[৮] যদিও আমি ইসলামি সূত্র থেকে স্বাধীনতার এ সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছি; কিন্তু এর মূল বক্তব্য সার্বজনীন। সব ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'অপরের বাধা ছাড়াই কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণ ও নিজের যা ইচ্ছা তা করতে পারে।'[৯] মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ হলো, 'কোন ধরনের বিধিনিষেধ ছাড়াই ব্যক্তি বা গ্রুপ অন্যদের কাছে তাদের মতামত বা আদর্শ প্রচার করবে, তবে এক্ষেত্রে তাদেরকে একথা বুঝতে হবে যে, তারা অন্যদেরকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য করবে না এবং ব্যক্তির মর্যাদার জন্য অত্যাবশ্যকীয় অধিকারও ভূলুণ্ঠিত করবে না।'[১০]

মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সব-ধরনের বইপুস্তক, ছবি, প্রতীক ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা। এর উদ্দেশ্য হতে পারে অন্যদেরকে অবহিত করা, উদ্বুদ্ধ ও সম্মত করা, সত্য প্রকাশ করা অথবা ব্যাখ্যাদান ও সন্দেহ-সংশয় দূর করা। আমি পাশ্চাত্য সূত্র থেকে উপরে আমার উদ্ধৃত শেষ দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছি। তাদের দেয়া এ ধারণায় সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা স্বাধীনতার ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পশ্চিমা ধারণার ব্যাপারে Montgomery-Watt-এর সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনার বিষয় উল্লেখ করতে পারি। এতে পাশ্চাত্যের ও মুসলিম ধারণার কতিপয় পার্থক্যের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হলেও উপসংহারে বলা হয়েছে, 'জগতের এ ধরনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। স্বাধীনতার ব্যাপারে পাশ্চাত্যে যে ধরনের কাজ করা হয়, এক্ষেত্রেই সেই একই ধরনের কাজ করা হয়।'[১১] তাই দেখা যাচ্ছে, ইসলামসহ সকল আইনগত ঐতিহ্যে স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে দৃশ্যত একটি অভিন্ন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। অবশ্য অন্যান্য আইনের সাথে শরীয়ার, বিশেষ করে এর আরোপিত সীমা ও লালিত মূল্যবোধ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করলে মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিধি ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে আমি শরীয়া বিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে চাইলে আমাকে একথা বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে আধুনিক আইনের মতো

www.pathagar.com

শরীয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতার কথা কেবলমাত্র নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর জোর দিবে বলে আশা করা হয়। যার অর্থ হতে পারে যেসব ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালার কথা বলা হয়নি। এক্ষেত্রে শরীয়া ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ বা সামাজিক অবস্থা ও ক্ষমতার রাজনীতির নির্দেশনা দান করার পরিবর্তে প্রকৃত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। তবে একটি ধর্মীয় আইন হিসেবে শরীয়া বিরোধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এ আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করবে। ধর্মের অবমাননা, ধর্মত্যাগ, ও কুফরি করার ব্যাপারে শরীয়ার বিধানের বিষয় উল্লেখ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হলো, ইসলামের আদর্শ ও বিশ্বাসকে সমর্থন করা। এমনকি এক্ষেত্রে পশ্চিমা আইনে আইন-বহির্ভূত ব্যক্তিগত বিষয় বলে বিবেচিত বিষয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপও করা হতে পারে। অন্যদিকে শরিয়ায় নাগরিকদেরকে সরকারের সমালোচনা করার অধিকার দেয়া হয়েছে, যাতে এর স্বাধীন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। দেশদ্রোহিতা ও সরকারের কর্তৃত্বের সমালোচনা করার মতো আধুনিক আইনের অতি নিয়ন্ত্রিত বিষয়ে শরীয়ার বিধিবিধানে নমনীয়তা ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত শরীয়ার বিধানের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নৈতিক উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়। লোকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চরিত্র গঠনে ইসলামের শিক্ষা ও সুপারিশমালার তুলনায় সাধারণ আইনের বিধান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

খ. উদ্দেশ্য

মৌলিকভাবে দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। বাকস্বাধীনতার অধিকারে প্রদত্ত এর লক্ষ্য হল: সত্য আবিষ্কার ও মানব মর্যাদা সমুন্নতকরণ। ঘটনাবলি ও মতামত প্রকাশ হলে তীব্র ক্ষোভ বা অসন্তোষ সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র বাকস্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে, যা স্বাভাবিকভাবে সত্যের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত করে। বাকস্বাধীনতার অধিকার হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশও। কোন ব্যক্তি যা বলতে, লিখতে, প্রকাশ বা প্রচার করতে চায়; তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হচ্ছে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিগত বিকাশের আকাঙ্খা সমর্পণ করা। ইসলাম এই দু'টি লক্ষ্যকে স্বীকৃতি ও বৈধতা প্রদান করেছে সম্ভবত এ কারণে যে, ইসলাম সত্য উদঘাটন ও তা সমর্থনের প্রতি অত্যন্ত জোর দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একে সত্য উন্মোচনের প্রতি ইসলামের অঙ্গীকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা

www.pathagar.com

উচিত। সত্য উদঘাটন ও মানব মর্যাদার মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে পূর্বের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে অগ্রাধিকার পাবে। পবিত্র কুরআনের আয়াতে এ অগ্রাধিকার ক্রমের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এতে ঘোষণা করা হয়েছে :

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّامَنْ ظُلِمَ .

"মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না,
কারোর ওপর যুল্‌ম করা হলে অন্য কথা। (আন-নিসা, ৪:১৪৮)।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ আয়াত বাকস্বাধীনতার ওপর বড় ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যখন তা অন্যায়, অশ্লীল ও অনৈতিক অথবা অপরের জন্য আঘাতস্বরূপ হয়। তবে অন্যায় বা যুল্‌মের শিকার লোকদের জন্য এ বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়েছে, যাতে তারা উচ্চঃস্বরে তাদের কথা বলতে পারে। তাদেরকে কোন বিধিনিষেধ ছাড়াই কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছে এ কারণে, তা যেন ন্যায়বিচার লাভ ও সত্য প্রকাশে সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সাক্ষী আদালতে অপর কোন ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করতে পারে অথবা এমন মন্তব্যও করতে পারে, যা ব্যক্তিমর্যাদার জন্য হানিকর; তবে তা ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে কাজে এলেই কেবল তা করা যাবে। অন্য কথায় এটা বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে বেদনাদায়ক বক্তব্য দেয়াকে সহনীয় করেছে। তাই ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রচেষ্টা এমনকি কঠোর ব্যক্তিগত মর্যাদা কঠোরভাবে লঙ্ঘনের বিনিময়ে হলেও অব্যাহত রাখা যাবে। কুরআনে ন্যায়বিচারের আদর্শ; ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, অভিন্ন ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ আলোচনার আপেক্ষিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্য অবহিত করা উচিত যে, বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যের অন্বেষণের চেয়ে ব্যক্তি মর্যাদা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ ও গৃহাঙ্গনের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে (৬৯:১২; ২:১৮৯)। সত্য উদঘাটনের ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তির গৃহাঙ্গনের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বিরক্তিকর কিছু করা যাবে না অথবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করতে গোয়েন্দাগিরি করার অনুমতি নেই, এমনকি তা করা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হলেও। একদিকে এসব মূল্যবোধের অগ্রাধিকারের বিষয় নির্ণয় করা; অন্যদিকে এসবের কোনটির বৈধতার যেনো হানি না ঘটে সেদিকে; লক্ষ্য রাখা। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সত্যের সন্ধান-উভয়ই আদর্শ মূল্যবোধ এবং উভয়ের নিজস্ব যথার্থতা মেনে চলতে হবে এবং কোনটির ক্ষতিসাধন ছাড়া তা সমুন্নত রাখতে হবে। তাদের মধ্যে ঘন ঘন সরাসরি বিরোধের বিষয় আশা করা যায় না

www.pathagar.com

কেননা এ মূল্যবোধের স্বাভাবিক সম্পর্কের ধরন হচ্ছে একে অপরের সমর্থন এবং একে অপরের কাজ বাস্তবায়নে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হিসেবে কাজ করা।

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে সত্যের (আল-হক) প্রতি মৌলিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। আল-হক হচ্ছে আল্লাহতা'আলার একটি সুন্দর নাম (আসমাউল হুসনা) এবং কুরআনের স্বীকৃত একটি মূলনীতি। কুরআনের একটি আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে :

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ .

'এটি আমাদের কিতাব যা তোমাদের কাছে সত্যকে (বি'ল-হক)
প্রকাশ করেছে।' (৪৫:২৯)।

আল-হকের আদর্শ বৈশিষ্ট্য এবং তা অনুসরণের অব্যাহত প্রচেষ্টার বিষয় পবিত্র কুরআনে জোরালো ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যাতে তাদেরকে 'সত্যিকারের ঈমানদার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হক প্রতিষ্ঠায় ও সত্যের বিধিবিধান পালনে তৎপর :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

'একজন অপরজনকে হক এর উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য্য ধারনে
উৎসাহ দিয়েছে' (১০৩ : ৩)।

আল হকের অনেক অর্থ করা যেতে পাওে; তা হলো: 'ন্যায়, 'আসল', 'সঠিক', 'আনুগত্য' 'সত্য' 'নি:সন্দেহ' (আল সুবূত ওয়াল উজুব) এবং 'কল্যাণ সাধন' ও জনকল্যাণ' (আল খায়ের ওয়াল মাসলাহা)।[১৩] ইসলামি আইন ও আল্লাহর অধিকারকে 'হাক্ক আল্লাহ' এবং জনগণের অধিকার, ব্যক্তিগত ও নাগরিক অধিকারকে 'হক্ক আল-আ-দামী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এতোসব সত্ত্বেও আল-হকের সবচেয়ে স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে 'সত্য কথা বলা'। এছাড়া কুরআন আল-হকের চূড়ান্ত অবস্থাকে সমর্থন করে বলেছে যে, সত্য এক সময় লাভ করার পর তার বাইরে আর কোনো কিছুই অর্জিত হতে পারে না।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ .

'তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া
কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে'(১০:৩২)।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা) এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের জীবনে আল-হকের

www.pathagar.com

ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট অর্থের সমর্থনে অনেক নযীর রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিসে এর দৃষ্টান্ত চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে। অন্যরা বিরাগভাজন হতে পারে অথবা কারোর অসন্তোষের কারণ সত্যের পথে কখনো বাধা হতে পারবে না: 'এমনকি অপ্রিয় হলেও সত্য বলবে।'

قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرّاً

সত্যের প্রতি সমর্থনের এ প্রবল দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে আরেকটি হাদিস। এ হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে : 'সত্য পথে সংগ্রামের সর্বোত্তম উপায়' সরূপ সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে কোন অত্যাচারি শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলা।'[১৫]

اَفْضَلُ الجِهادِ كلمتُ حَقِّ عند سلطان جائر .

উল্লিখিত হাদিস শাসক ও জনগণ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তারা উভয়ে সত্যের অনুসরণ ও উদঘাটনে প্রতিশ্রুতিশীল। প্রথম দু'খলিফা হযরত আবু বকর রা: [মৃত্যু, ১২ হিজরি/৬৩৪ খ্রী:] ও তার উত্তরসুরি 'উমর ইবন খাত্তাব রা: [মৃত্যু, ২৩ হি:/৬৪৩ খ্রী:] তাঁদের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে এ মনোভাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ও গুরুত্ব প্রদান করেন। যতদিন তাঁরা সঠিক পথে থাকবেন ততদিন তাদেরকে সহায়তা করার এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হলে তাঁদেরকে সংশোধন করার জন্য তারা উভয়ে জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান।

বিচারের ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে সত্য প্রমাণের আরেকটি অনুপম উদাহরণ রয়েছে। কেউ যদি একথা স্বীকার করেন যে, মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য দিক হচ্ছে ভুল-ত্রুটি; তাহলে এ ভুল প্রকাশ ও সংশোধনের পথ উন্মুক্ত রাখা উচিত। প্রস্তাব প্রদান, মতামত প্রকাশ, উপদেশ দান অথবা সমালোচনার মাধ্যমে তা সংশোধন করা যাবে এবং বাক স্বাধীনতার গ্যারান্টি ছাড়া এটি করা সম্ভব নয়। কুরআনের হিসবা নীতি বা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধে এ নসিহত নীতি বা সদুপদেশ দান এর মূলনীতি হচ্ছে ন্যায় ও সত্যের অনুসন্ধানে ইসলামের যে কয়েকটি পন্থা রয়েছে তার অন্যতম। আমি অন্যত্র পৃথকভাবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি মানব মর্যাদারও পরিপূরক। কোন ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তার মতামত ও বিচার বিবেচনায়। কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে তার মতামত প্রদান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করার অধিকার না দিলে তার কোন মর্যাদা থাকে না। পবিত্র কুরআনে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে ব্যাপকার্থে এ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা, . لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ادَمَ'আমরা আদম সন্তানকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছি (১৭:৭০)। স্পষ্টত এ আয়াতে মানবজাতিকে বিভক্তকারী সব ধরনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

এটি একটি সাধারণ ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এবং শরীয়ার কোথাও ব্যাপক অর্থবহ ও সার্বজনীন- এ বিবৃতির সমকক্ষ আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরেকটি আয়াতে এই বক্তব্যের আদর্শ বৈশিষ্ট্যের আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যাতে মহান আল্লাহতাআলা (আলইয্যাহ) ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাঃ এর পাশাপাশি ঈমানদারদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৬৩:৮)। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও ইয্যতের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। তাঁদের সম্মিলিত অভিমত ও বিচক্ষণতা (ইজমা) আল্লাহতাআলার ইচ্ছার কাছাকাছি এবং শরীয়া একটি উৎস হিসেবে স্বীকৃত। শরীয়া প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে যে যা বলতে চায়, তা বলার সুযোগ দিয়েছে; তবে তার সাথে ধর্মের কোন অবমাননা, গিবত (পরনিন্দা), মিথ্যা কলঙ্ক লেপন, অবমাননা অথবা মিথ্যার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এছাড়া দুর্বৃত্তায়ন, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, বৈরিতা অথবা বিদ্রোহের বিস্তার ঘটানোর কোন চেষ্টা থাকবে না তাতে। সমর্থনমূলক দৃষ্টিকোণের কারণে শরীয়া সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (হিসবাহ), আন্তরিক উপদেশ দান (নাসিহা), পারস্পরিক পরামর্শ (শুরা), ব্যক্তিগত যুক্তিপূর্ণ অভিমত (ইজতিহাদ) এবং দেশ পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের সমালোচনাসহ বিভিন্ন উপায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে।

সৎ ও উত্তম চরিত্র বা আদালাহ কোন মানুষের যে মর্যাদা দিয়েছে, তার মানদণ্ডেই আল্লাহ ও মানবজাতির কাছে তার স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি আদালতের সাক্ষী, বিচারক, রাষ্ট্রপ্রধান, উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি, অভিভাবক, কোন ব্যক্তি বা অপরের সম্পত্তির হেফাজতকারী- যাই হোক না কেন-বিচারের দৃষ্টিতে তাকে অবশ্যই আদালতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, শরিয়ত এমন একটি সমাজের চিন্তা করে যার কার্যক্রম পরিচালনা করবে সৎ মানুষেরা। হাদিসে একথাই বলা হয়েছে। মুসলমান সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবে-এটিই ধরে নিতে হবে, যতক্ষণ না

www.pathagar.com

তার ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়।'[১৬] তাই সৎ নাগরিকদের সম্মান ও সুখ্যাতির ওপর আক্রমণকে শরীয়া গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। পবিত্র কুরআনে গুটিকয়েক অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক শাস্তির (হুদুদ) বিধান রয়েছে তার একটি হল মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক রটনা (কাজফ)। এমনকি অপবাদের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (কাজফ) যথাযথভাবে বিচার ও শাস্তি প্রদান করা হলেও; তাকে কখনো আদালতে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে না, কারণ সে যে অপরাধ করেছে, তাতে এর শিকার ব্যক্তির সম্মানের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

গ. ভূমিকা ও তাৎপর্য

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রায়ই একটি ব্যারোমিটার হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে; যার মানদণ্ডে কোন সরকারের গণতান্ত্রিক গুণাবলী এবং নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিশ্রুতির পরিমাপ করা হয়। সম্ভবত একথা বলা সমভাবে সত্য যে, এ স্বাধীনতা রক্ষায় জনগণের প্রচেষ্টা এবং এর সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধে সে যে ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করে, তা তাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সূচক হিসেবে কাজ করে। সমাজের সদস্যদের পক্ষে সমাজ সহনশীলতার যে উৎসাহ প্রদান করে, তা প্রত্যেককে তারা যা বলতে চায় তা বলতে সক্ষম করে তোলে এবং অন্যরা তা গ্রহণে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়। এটি কোন সমাজের কেবল আইনগত সুকৌশল নয়;উপরন্তু তাতে একটি সমাজের সম্মিলিত চেতনার উদারতা ও অবাধ স্বাধীনতার বিষয়ও প্রতিফলিত হয়। কেবলমাত্র একটি নিরাপদ ও সহনশীল পরিবেশের মধ্যেই সমাজ ও এর নেতৃবৃন্দ সুচিন্তিত অভিমত ও গঠনমূলক সমালোচনা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও প্রশংসা করেন। সে সমাজে এ ধরনের অবদানকে ইতিবাচক বিবেচনা করে উৎসাহিত করা হয় ও কাজে লাগানো হয়।

যে সরকার জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়, সে সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছা, মতামত ও মনোভাব কি-তাও নিরূপণ করতে পারে না। বাকস্বাধীনতা কেবলমাত্র বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ্যে এনে মতপার্থক্য উস্কে দিতে পারে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে; তবে এসব বিষয়ে একটি অর্থবহ মতৈক্য পৌঁছানোর সুযোগ করে দিতেও, এটিই একমাত্র উপায় হতে পারে। এ দৃষ্টিতে ব্যাপকার্থে গঠনমূলক বাকস্বাধীনতা মূল্যবোধের যথাযথ সংশোধন এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তঃক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও বাধা প্রদানের লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। তবে সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতাসীনদের

www.pathagar.com

রোষানলে পড়া বা তাদের হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাড়াই সে যা বলতে চায় তা বলার নিশ্চয়তা দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এ উন্মুক্ততার প্রয়োজন আরও বেশি কেননা সংখ্যাগুরুরা বা ক্ষমতাসীন সরকার তার বিরোধিতা করতে পারে। যে সরকার কেবলমাত্র তার সমর্থকদের মতামত কী তাই জানতে চায় সেটি একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। অপরদিকে যে সরকার নিরপেক্ষতাকে উৎসাহিত করে ও আস্থা বৃদ্ধি করে সে সরকার সমাজের আশা-আকাঙ্খা পূরণের বাহনে পরিণত হতে পারে।

শাসক বা নেতৃবৃন্দ তাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে গেলে তাদের অন্যায়-অবিচার মোকাবেলা করা এবং অসদাচরণের বিষয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও বাক স্বাধীনতা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ অর্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতা জনগণকে তাদের সরকারের আচরণ পর্যবেক্ষণে সক্ষম করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সরকারের কাজের দোষত্রুটি ও অবহেলার বিষয় প্রকাশ পায়। এভাবে বাক স্বাধীনতা একটি সুবিদিত ও সচেতন সমাজ লালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এমন সমাজ নেতা বাছাই ও নির্বাচনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। তাই ইবন কাইয়িম আল-জাওজিয়াহ বলেছেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে (হুররিয়াত আলরা'ই) কল্যাণ সাধন (মাসলাহা), অথবা অন্যায় প্রতিরোধে (মাফসাদাহ) ব্যবহার করা যেতে পারে, বাকস্বাধীনতা চর্চার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে, অত:পর তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।[১৭]

'আওদা অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, বৈধ কাঠামোর মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চর্চা করা হলে তা অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে নাগরিকদের মধ্যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করে। এছাড়া এটি এমন এক মাধ্যম যা কল্যাণ সাধন এবং অন্যায়, বৈষম্য ও কুসংস্কার মোকাবিলায় শাসক ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা (তা'আউন) বৃদ্ধি করতে পারে।'[১৮]

মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বাভাবিক মূল্যবোধের সূচক ভালো নয় এবং ইসলামি সরকারের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। একথা সকলে স্বীকার করেন যে, খোলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বে প্রথম চার দশক ধরে ইসলামি সরকার পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শিক শিক্ষায় সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু এরপর মধ্যযুগের সরকার বলে ইতিহাসে স্বাভাবিকভাবে পরিচিত সরকারগুলো যেভাবে পরিচালিত হয়; ঠিক একইভাবে মুসলিম ভূ-খণ্ডের সরকারের কার্যক্রম পরিচালনায় রাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পায়।

www.pathagar.com

ফারুক আল নাবহান একথা স্বীকার করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, নিপীড়নকারী সরকারের হাতে অমুসলিমদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। এ লেখকই আবার বলেছেন, 'এ ধরনের পদক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক ছিলনা। ইসলামের বিধিবিধান ও মূলনীতির সাহায্যে তাকে কোন ভাবেই বৈধতা দেয়া সম্ভব নয়।'[১৯] জ্ঞানার্জন ও তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে যেসব কথার দীর্ঘ উচ্চারণ রয়েছে তাহল, 'যারা তাদের বুদ্ধিমত্তার চর্চা করে' (ইয়া'কিলূন), 'যারা চিন্তা করে' (ইয়াতাফাক্কারুন), 'যারা জানে' (ইয়া'লামূন), 'যারা বিবেচনা করে' (ইয়াতাদাব্বারুন), এবং 'যারা অনুধাবন করে' (ইয়াফকাহূন)-এসব শব্দ প্রয়োগ করে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করেছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে চিন্তাধারা, বিচার বিশ্লেষণ, অভিমত ও জ্ঞানের কথা অবশ্যই প্রকাশ ও আদান প্রদান করতে হবে; কেবল তাহলেই তা আল্লাহর প্রতি ঈমান বৃদ্ধি ও মানবজাতির কল্যাণে সঠিকভাবে কাজে আসবে।

ঘ. বিধিনিষেধ

কোন সমাজ পরিপূর্ণ ও অনিয়ন্ত্রিত বাক স্বাধীনতা অর্জন বা অর্জনের চেষ্টা করেছে তা ভাবা যায় না। জীবনের বাস্তবতা ও বাকস্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ বহাল থেকেছে। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বাকস্বাধীনতার অধিকারের তেমন একটা পরিবর্তন ঘটে না। বর্তমানে আমরা যেটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি; এক শতাব্দী এমনকি এক প্রজন্ম আগেও তা ছিল একটি প্রশ্নাতীত ব্যাপার। বাকস্বাধীনতার ওপর যেসব শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; তার অধিকাংশই ছিল আইন বহির্ভূত। এ ধরনের স্বাধীনতার গ্রহণযোগ্য সীমা কি হবে-বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনমত তা নির্ধারণ করে থাকে এবং যা অগ্রহণযোগ্য বা অতিরঞ্জিত তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তথাপি জনমত কোন স্বাধীন এজেন্ট নয়; এতে নৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আইনগত প্রভাবের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। আইনগত বিধি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থানের একটা ভালো সূচক। এর দ্বারা সমাজের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাকস্বাধীনতা অপরের অধিকার লঙ্ঘন করলেই কেবল সেক্ষেত্রে আইন হস্তক্ষেপ করে অথবা সরকারের নীতি ও স্বার্থের বিষয়টি নির্দেশ করে। সমাজ ও সংস্কৃতি, এ ব্যাপারে যে ব্যাপক বিস্তৃত বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে-তাহলো একটা পছন্দের বিষয়। শরীয়ার বিধান অনুযায়ী তা হলো মৌলিক অনুমোদনপ্রাপ্ত সাধারণ নীতিমালা বা ইবাহা'র অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়বস্তু। অন্যান্য আইনের সঙ্গে তুলনা করলে সম্ভবত

www.pathagar.com

এটি সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এমনটি হওয়ায় কেউ স্বাধীনতার ব্যাপারে এ আইন থেকে অফুরন্ত দিকনির্দেশনা লাভের আশা করবে না এটি স্বাভাবিক, কেননা জনমত, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক প্রথা বা রসম-রেওয়াজ-স্বাধীনতার সুযোগ ও মাত্রা নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাকস্বাধীনতার ব্যাপারে শরীয়ার মূল নীতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্য আমাদের আরব সমাজের অবস্থা ও দর্শন, তারা যে ধরনের স্বাধীনতার চিন্তা-ভাবনা করত ও গ্রহণ করতে পারত, তা জানতে হবে। সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে ইসলাম পরিচালিত হয় না, এ কথা সত্য, তথাপি ইসলাম যে সমাজের সংস্পর্শেই এসেছে তার বাস্তবতা ও সম্ভাবনা-উভয়কে বিবেচনায় এনেছে। ইসলামের পবিত্র নীতিমালা ও উদ্দেশ্যের বিষয় আরব সমাজের অথবা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থেকেছে, এ কথা কোথাও দাবি করা হয়নি। আলেম-উলামা তাদের সময়ের বাস্তবতার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ'র নীতিমালা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অভ্যুদয়ের উষালগ্নে যারা ইসলামকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, ইসলাম তাদের সঙ্গে সংলাপ শুরুর চেষ্টা করেছিল। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, রাসূল (সা) অবশ্যই যুক্তিপূর্ণভাবে জবাব প্রদান করবেন। উপরন্তু কুরআন ধর্মীয় বিষয়েও বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি প্রদর্শনকে উৎসাহিত করেছে এবং সৃষ্টি জগতের প্রায় সকল বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যকথায় কুরআন ব্যক্তির বাকস্বাধীনতার অধিকারের বৈধতা প্রদান করেছে। মুসলিম লেখকরা এ বিষয়ে তাদের লেখায় অব্যাহতভাবে একথা বলে এসেছেন যে, ইসলাম কেবল মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বৈধতা প্রদান করেছে তাই নয়, উপরন্তু মত প্রকাশের ব্যাপারে নিরব অথবা উদাসীন না থাকতে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছে, কেননা এ মতামত সত্য ও ন্যায়বিচারের পক্ষে সহায়ক অথবা সমাজের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। এ বিষয়ের সমর্থনে প্রায়ই উদ্ধৃত একটি আয়াতের প্রতি আমরা নজর দিলে এ আভাস পাই যে, কুরআনের বাণী একই সাথে এটিকে একটি অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অনুমোদিত মূল্যবোধের অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআন যোগ্য ব্যক্তিদেরকে হিসবাহ, ইজতিহাদ, শুরা, ইত্যাদিকে কেবল চর্চার অনুমোদনই দেয়নি উপরন্তু তা করা তাদের কর্তব্যেও পরিণত করেছে। আমরা এখানে শরীয়া ও পার্লামেন্ট অনুমোদিত আইনের রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে ধরতে চাই। আধুনিক আইনসভার আইনে যেভাবে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, শরীয়া সেভাবে অধিকার ও কর্তব্যের দ্বৈত ধারণাকে পরস্পর থেকে পৃথক বলে গণ্য করতে চায় না।

www.pathagar.com

৩. অধিকার ও মৌলিক অধিকার

আমি যে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই, সে সম্পর্কে প্রায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে, কিন্তু বিষয়ের লেখকদের রচনায় তার জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী আইনে এটি হল স্বীকৃতির প্রশ্ন অথবা বাধ্যবাধকতার বিপরীত। স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী প্রশ্ন হল: বিশেষ মৌলিক অধিকার সাধারণ অধিকারের থেকে পৃথক কি-না এবং তা শরীয়ার আওতায় টিকতে পারে কিনা। এগুলো ও পদ্ধতিগত গুরুত্বপূর্ণ আরও কতিপয় বিষয়-মুসলিম আইন বিশারদদের রচনায় আলোচিত হয়নি। তাই এসবের কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি। আমি এর কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং নিম্নে তার বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি, যদিও এ বিষয়টি এ গ্রন্থের মূল আলোচনার জন্য জরুরি নয়;তৎসত্ত্বেও আধুনিক সাংবিধানিক আইনের কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতিগত দিক ও তার তুলনা করা এ ক্ষেত্রে বিবেচনার দাবি রাখে।

ক. হক এর প্রেক্ষাপট

পশ্চিমা বিশ্লেষকরা ঢালাওভাবে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামে মানুষের সহজাত অধিকার ও স্বাধীনতা, মৌলিক বা অন্য যে কোন অধিকারের ধারণার কোন স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। শাক্ত (Schacht)-এর মতে "ইসলামি আইন হচ্ছে একই ধর্মীয় আজ্ঞাধীন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কর্তব্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আইন ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার একটি ব্যবস্থা'[২১]। হেমিলটন গিব(Hamilton gibb) মন্তব্য করেন, "ইসলামি সরকার তত্ত্বে নাগরিকদের কর প্রদান ও অনুগত প্রজা হওয়া ছাড়া আর কোন মর্যাদা বা কাজ নেই।'[২২] একই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন ও মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আরেকজন বিশ্লেষক আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, ব্যক্তির অধিকারের মতো কোন বিমূর্ততার অস্তিত্ব ইসলামে নেই। এমন এক ব্যবস্থায় 'ব্যক্তির কোন অধিকার বা স্বাধীনতা থাকতে পারে না, তার কেবল বাধ্য বাধকতা থাকবে।'[২৩] বিতর্কে জড়িত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং এমন কতিপয় অভিমত তুলে ধরা উচিত যা সঠিক ও প্রমাণসিদ্ধ নয়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি।

শুরুতেই একথা বলতে চাই যে, ইসলামি আইনে অধিকার ও কর্তব্যের উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাঃ এর সহীহ হাদিস। শরীয়ার আইনগত ম্যানুয়েলে প্রায় হুকম শার'ই বলা হয়, যেটি হলো একটি রায় বা সিদ্ধান্ত, যা

www.pathagar.com

আদেশ অথবা নিষেধের আকারে বিশেষভাবে জানানো হয়। বৈধভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তির (মুকাল্লাফ) আচরণ এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে বৈধ অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়সহ বিভিন্ন ধরনের-ধারা প্রকাশ করা যেতে পারে। হুকুম জ্ঞাপনের এ যোগাযোগের প্রকৃতি অধিকার নয় বরং কর্তব্যের প্রতি অধিকতর যত্নশীল বলে প্রতীয়মান হলেও এর গভীর বিশ্লেষণে ইসলামের হুকম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে অধিকার ও স্বাধীনতার নিজস্ব প্রেক্ষাপট থাকার বিষয়টি নিশ্চিত অনুধাবন করা যাবে। এছাড়া কুরআন-সুন্নাহতে মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকারের মধ্যে কোন বাহ্যিক পার্থক্য নেই; অথবা এ বিষয়ে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যেও কোন বিভাজন করা হয়নি। এটি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক : আইনের বিচার সংক্রান্ত কাঠামোর বর্ণনায় শরীয়ার বিষয়সমূহে তাওহীদ বা একত্ববাদের ব্যপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে এবং সকল জ্ঞানের সূত্র ও উৎসের ঐক্য বজায় রয়েছে । এ ছাড়া তাওহীদ ভিত্তিক মূলনীতিগুলো সামষ্টিক ও একক দর্শনে সম্ভাব্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিষয় প্রবেশে বাধা সৃষ্টির প্রবণতাও রয়েছে'[২৪] এবং পরিকল্পিত হয়েছে। যেহেতু শরিয়তে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তাই হুকুমের ক্ষেত্রে যেকোন ধারণার চেয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও আল্লাহর হক বা দাবীব প্রতিও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এটা মূলত আইনদাতা ও গ্রহিতার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন; যা তাদের পারস্পরিক স্বার্থের দ্বৈততার ভিত্তিতে নয় বরং তাদের আদর্শের ঐক্য ও সংহতির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা হলো: রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষমতা ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি ভীতিকর বলে বিবেচনা করার প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় প্রণীত হয়: আধুনিক সাংবিধানিক আইন ও সাংবিধানিক পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামি আইন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে উৎপত্তি হয়নি; শরীয়ার আহকাম পালনের মাধ্যমে এ আইন রূপায়িত হয়েছে।'[২৫] রাষ্ট্র যখন এটি করতে সফল হয়েছে, তখন সে ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত করাসহ নিজের অস্তিত্বের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণেও সফল হয়েছে। এটি করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ে শরীয়ার হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। তাই আধুনিক সংবিধানে প্রায়শ দ্বৈত স্বার্থের যে কথা বলা হয়েছে; ইসলামি সরকারে সে ধরনের কোন চিত্র পাওয়া যায় না।

ইসলামি আইন আল্লাহর অনুগত বান্দাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। তারা মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী কোন কাজ করেন অথবা তা করা থেকে বিরত থাকেন এবং নির্দিষ্ট পন্থায় পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করেন। ব্যক্তিকে অবশ্যই

www.pathagar.com

আল্লাহতা'আলার ইবাদত বন্দেগী করতে হবে ও তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে. আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন ধরনের সম্পর্কের পথ তাঁর জন্য খোলা নেই। তিনি তাঁর করুণার নিদর্শন হিসেবে মানুষের কতিপয় অধিকারও প্রদান করেছেন। যেসব বিশ্লেষক শরীয়ায় প্রদত্ত অধিকার থাকার বিষয় ও বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন. তারা তাদের যুক্তি পেশের সময় এ প্রেক্ষাপটের কথা উচ্চারণে বাধ্য। তবে এরপরও আমরা একথা বলতে পারি যে. আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম প্রকাশ করেছেন যা মানুষের ওপর আরোপিত করেছে কিছু অধিকার; যা তাঁর স্বর্গীয় অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। যেসব বিশ্লেষক শরীয়ায় অধিকারের স্থান ও বাস্তবতা মানেননা; তারা তাদের যুক্তিতে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি এবং তারা যে ভাসা ভাসা আলোচনা করেছেন তাতে অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে শরীয়ার সমর্থনসহ ইসলাম এ সম্পর্কে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, সে সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন। শত শত বছর ধরে মুসলিম বিচারক ও বিশেষজ্ঞরা অব্যাহতভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলার সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে এসেছেন। তবে এ সত্ত্বেও তারা ব্যক্তির অধিকার এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা ও পবিত্রতার ব্যাপারে কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেননি। তারা অনুরূপভাবে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন, শরীয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণসাধন। অপরদিকে, এসব বিশেষজ্ঞ হুকম এর সামগ্রিক ধারণার কেন্দ্র যে জনগণের অধিকার-সে বিষয়ে কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এমন কোন সুযোগ খোলা রাখেননি। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিক আইনের সংজ্ঞা ও দর্শন সম্পর্কে তত্ত্ব হিসেবে উথাপন করার মতো বিস্তৃত বর্ণনা এতে নেই। সম্ভবত এর আংশিক কারণ হচ্ছে পরহেযগারি দৃষ্টিভঙ্গি ও পবিত্র আইনদাতার প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। দৃশ্যত কতিপয় বিশ্লেষক অধিকার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা গ্রহণের জন্য এ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। অধিকারের চেয়ে কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতার আনুকূল্য প্রদর্শনের বিষয় প্রায় সকল আইনি ব্যবস্থায় কম বেশি বিদ্যমান, ইসলামি আইনও এর ব্যতিক্রম নয়। অধিকারের চেয়ে বাধ্যবাধকতার ভিত্তি অধিকতর শক্তিশালী এবং বাধ্যবাধকতার যে শক্তি রয়েছে অধিকারের ধারণায় তার অভাব রয়েছে। তবে ইসলামি আইনে অধিকারের বাস্তবতা এবং এর অস্তি ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শরীয়া এমন একটি কাঠামো যাতে এসব ধারণা সমূহ আন্তসম্পর্কিত; বাস্তবতাকে অস্বীকার করার পরিবর্তে যা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

খ. মৌলিক অধিকারের প্রেক্ষাপট

সপ্তম ও অষ্টম শতকের ইউরোপীয় লেখকদের রচনা, বিশেষ করে লক (Locke) ও রুশো (Rousseau)-এর লেখায় মৌলিক অধিকারের উৎস পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে প্রাকৃতিক আইন ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের-অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে অনেকটা ভাসা ভাসা ও খসড়া ধারণা গ্রহণ করেন আমেরিকান মহাদেশে বসতি স্থাপনকারীরা। তারা সেখানে এ ধারণাকে আরও পরিশীলিত করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী কালে এর আরও সংশোধন করা হয়। মার্কিন বিচারকরা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে এসব অধিকারের আরও সংশোধন করেন। এ ঘটনা দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ও জনগণকে প্রভাবিত করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৩০টি মানবাধিকারের একটি তালিকা অনুমোদন করে যাতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার বোধসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৬]

মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকারের পার্থক্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উভয়ই পরিবর্তনপ্রবণ। কেননা এতে কোন বিশেষ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয় প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্যের আইনের দর্শন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, Blackstone তার ব্যক্তি স্বাধীনতার আলোচনায় বাকস্বাধীনতার বিষয় উল্লেখ করেননি। এবং তিনি অন্যায় ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করেছেন; সেখানেই রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত তার অনন্য অনুচ্ছেদটি। 'ব্যক্তির অধিকার' (Right of person) নিয়ে আলোচনাকালে ব্লাকস্টোন দুর্দশা লাঘবের জন্য রাজা অথবা সংসদের কাছে আবেদন জানানোর অধিকারের বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে বাকস্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৭] সংবিধান প্রসঙ্গে অন্যান্য পর্যবেক্ষণে ডাইসী (Dicey) স্বীকার করেছেন যে, বৃটিশ আইনে 'বাকস্বাধীনতা' বা 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'র মতো বিষয় তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। তিনি লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডে আলোচনার স্বাধীনতা কোন কিছু লেখা বা বলার স্বাধীনতার চেয়ে তেমন ভিন্নতর কিছু নয়, যাতে ১২ জন দোকানীর সমন্বয়ে গঠিত জুরি মনে করেন যে, বলার অথবা লেখার সুযোগ থাকা উচিত।'[২৮] এ বিবৃতিতে সংখ্যালঘু অথবা ধর্মের পরিপন্থি কোন মতামত প্রকাশকে একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আধুনিক সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণেতারা অন্যান্য অধিকার থেকে মৌলিক অধিকারকে পৃথক করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি সনাক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

পশ্চিমা আইন ও সম্ভবত মুসলিম দেশগুলোর সংবিধানেও এর মধ্যে যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বিষয়টি সংবিধানে উল্লেখ থাকতে হবে এবং যে অধিকারের প্রশ্ন করা হচ্ছে তা যথারীতি অভিব্যক্ত বা লিখিত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যেসব দেশে লিখিত সংবিধান নেই সেসব দেশে রায়ের উল্লেখ, সনদ ও বিচারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে মৌলিক অধিকার চিহ্নিত করা যেতে পারে যাতে আইন ব্যবস্থার কাঠামো ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্ব পাবার মত কতিপয় অধিকার সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।[২৯]

কোন অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে আখ্যায়িত করার অর্থ হচ্ছে আদালত সমাজের অস্তিত্বের জন্য এ অধিকারকে রাজনৈতিকভাবে অত্যাবশ্যক অথবা ব্যক্তি এবং তার মর্যাদা ও আত্মসম্মানের জন্য প্রয়োজনীয় বলে স্থির করেছে। তাই দু'ধরনের মৌলিক অধিকার রয়েছে যা প্রায়ই যুগপৎভাবে ঘটে : এক ধরনের মৌলিক অধিকার মৌলিক মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে এবং অপরটি সামাজিক নীতি বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নীতিগতভাবে আমরা যেমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করার অধিকার অথবা তার গোপনীয়তা ও কথা বলার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করে থাকি; তেমনি সামাজিক নীতি হিসেবে আমরা সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মতো রাজনৈতিক পদ্ধতির শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। যদি নীতির ভিত্তিতে একটি অধিকার মেনে চলা হয়, তাহলে কেবল অত্যন্ত জোরালো যুক্তির ভিত্তিতে তা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে সামাজিক নীতির ভিত্তিতে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার আলোকে অগ্রাহ্য বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক শ্রেণীর গুরুত্বের নির্দিষ্ট ক্রম নিরূপণ করতে হবে। এভাবে গোপনীয়তার চেয়ে জীবনের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয় এবং সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তুলনায় একজন পুলিশ কর্মকর্তার অস্ত্র বহন করাকে একটি সাধারণ সামাজিক অধিকার বলে দেখা হয়। প্রথম শ্রেণীর অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারের পরিপন্থী হলে সেক্ষেত্রে আদালত প্রথম শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দেবে, এটা মনে করাই সঠিক। কেননা ব্যক্তির মর্যাদার বিনিময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করা উচিত হবে না।[৩০]

কোন বৈধ অধিকার মৌলিকভাবে নৈতিক অধিকার বা মূল্যবোধে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হলে তাকে মৌলিক অধিকার বলা যেতে পারে। এ ধরনের কোন অধিকার যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে বিকশিত হয়, সেসব মূলনীতি প্রশ্নাতীতভাবে কোন

নৈতিক বিধানের মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত হলে তখনই তাকে মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে পাশ্চাত্যের আইনশাস্ত্রে কর্তৃত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আইনের সামাজিক যোগাযোগতত্ত্বের মতো বহু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের মৌলিক মূল্যবোধ কাঠামো নিরূপণের লক্ষ্যে এগুলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যাকে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক এবং ক্রমের দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে।[৩১]

অধিকারের বিষয় মূল্যায়নে শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে যে প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকে, এসব তত্ত্বের অধিকাংশ বিষয় তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলিম জুরিরা মাসআলাকে শরীয়ার একটি লক্ষ্য বা দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন যারা তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুত পক্ষে মাসলা হচ্ছে কতিপয় খোদায়ী মূল্যবোধের অধীনে সহায়ক অন্যতম একটি বিধান।[৩২]

অন্যক্ষেত্রে অধিকারের পর্যায়ে পড়ে এমন অনেক বিষয়ে পশ্চিমা আইনগত তত্ত্বের সাথে শরীয়ার মিল রয়েছে, যা নৈতিকতার মৌলিক নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মনিরপেক্ষ আইনের থেকে শরীয়ার পার্থক্য রয়েছে। শরিয়তে নৈতিক ও আইনগত মূল্যবোধ নিরূপণের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের প্রত্যাদেশকে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। শরীয়ার অধীনে কুরআন-হাদিসের প্রাথমিক মূলনীতি ও কর্তৃপক্ষীয় সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে কোন অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। একথা স্বীকার্য যে, এসব উৎসে মৌলিক অধিকারকে পৃথক শ্রেণীর অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে কুরআনে এ সম্পর্কিত কতিপয় মূলনীতির ঘোষণা আছে, হাদিসে যা পুনর্ব্যক্ত ও সমুন্নত হয়েছে এবং ইসলামি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। এসব মূলনীতিকে ইসলাম ও এর আইন ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা ইসলামে সব ধরনের আইনগত ভাবনা ও এর বিকাশের প্রায় সকল পর্যায়ে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, যা আমি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করবো।

ইসলামি আইনের সবচেয়ে বড় উৎস আল-কুরআনের আলোকে ইসলামে মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে অনেক অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট আদেশ রয়েছে। যেমন বেঁচে থাকার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, চলাচলের স্বাধীনতার অধিকার, সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকার, ন্যায়বিচার পাবার অধিকার, ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

সম্মান ও মর্যাদার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার ইত্যাদি। এগুলোকে মৌলিক অধিকারের শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া পবিত্র কুরআনে কতিপয় বিধি ও মূলনীতির বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা শরীয়াকে স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রদান করেছে এবং এর বিধিবিধান ও মতবাদের ওপর যার সুদূর প্রসারি প্রভাব রয়েছে। এভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (হিসবাহ), বিশ্বাস ও আস্থা (আমানাহ), সৎকাজে সহযোগিতা (তা'আউন)-ইত্যাদি কুরআনের মূলনীতি অনেক মৌলিক অধিকারকে সনাক্ত করার কর্তৃত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করতে পারে। এসব অধিকার ব্যক্তি, সমাজ অথবা পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং জাতীয় সীমানার ভিতর বা বাইরে যার কোন হেরফের হয় না। পবিত্র কুরআনের এ ধরনের মূলনীতির বহু দৃষ্টান্ত যেমনঃ কষ্ট দূর করা (রাফ 'আল হারাজ), হাদিসে এর স্বপক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।

অধিকন্তু শরীয়ার আইনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিচিত্র বিষয়ের বিস্তৃত ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের কথা হয়ত সরাসরি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথবা হয়নি; তৎসত্ত্বেও তা মৌলিক অধিকারের ভিত্তি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অধিকারকে চিহ্নিত করা যায়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় অধিকার-যেমন-জীবন, ধর্ম, জ্ঞানবুদ্ধি, মর্যাদা ও উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে। আমি এখন এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এসব বিধিবিধান ও মূলনীতির অনেকগুলোকে মুসলিম জুরিগণ আইনগত নীতিমালা (কাওয়াইদ কুল্লিয়া) হিসেবে সনাক্ত ও গ্রন্থিত করেছেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়ার উদ্দেশ্যের প্রতিফলন রয়েছে এবং যা মৌলিক অধিকারের ইসলামি তত্ত্বের দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইত:মধ্যে মিশর ও পাকিস্তানের আলেমদের মধ্য থেকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব ইউরোপের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এব্যাপারে কিছুটা কাজ করা হয়েছে। এরপরও শরীয়ায় অধিকারের সীমানা ও তা সনাক্তকরণের বিষয়ে আরও গবেষণা করার বিপুল সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে।

C Luca ১৯৭৫ সালে তাঁর Arab Middle East গ্রন্থে আরব-মধ্যপ্রাচ্যে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ওপর এক গবেষণা চালান। এতে তিনি মন্তব্য করেন যে, 'আরবদের মনে তাদের দেশের সংবিধানের বিধিবিধানের চেয়ে কুরআনের বাণীর প্রভাব অনেক বেশি দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। এ গবেষণায় যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তা অন্যান্য মুসলিম দেশের মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বললে অত্যুক্তি হবে না,[৩৩] একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে,

মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণের ওপর কুরআনের গভীর প্রভাব রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে কর্তৃত্ব ও প্রভাবের একটি স্থিতিশীল উৎস হিসেবে অভিহিত করাই উত্তম, যা আংশিক ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত; তবে এর সুনির্দিষ্ট আদেশ নিষেধ বা হুকুম আহকাম ও মৌলিক মূল্যবোধের কাঠামো অপরিবর্তনীয়। অতএব কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল্যবোধের ধারাবাহিকতা। অত:পর একথা বলা যায়, কুরআন-সুন্নাহতে মৌলিক অধিকারের মূল ধারণা ও তার সনাক্তকরণের বিষয় কেবল গ্রহণযোগ্যই নয় বরং শরীয়ায় একে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এবং একে একটি সুস্পষ্ট রূপ দেয়া হয়েছে-যা কুরআনের মূল্যবোধের সাধারণ নিয়মের আওতায় একটি নির্দিষ্ট অধিকার, বিধি বিধান ও মূলনীতির মৌলিক সূচক বা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

একটি সমান্তরাল বিষয় হলো: জনস্বার্থ বিবেচনা বা মাসলাহা। আলেমগণ একে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, তা হলো : 'অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ (যারুরিইয়াত) সম্পূরক স্বার্থ (হাজিইয়াত) ও কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যবিধান (তাহসিনিয়াত)। অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ বা মাসালিহ (একবচন-মাসলাহা) কে এমন স্বার্থ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং যখন এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়; তখন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মনীতি ভেঙ্গে পড়ে। পাঁচটি, মতান্তরে ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় মাসালিহ রয়েছে তা হল: জীবন, ধর্ম, বিবেকবুদ্ধি, সংখ্যালঘুর মতামত ও উত্তরাধিকার। কতিপয় বিশেষজ্ঞ এর সাথে যোগ করেন মর্যাদা ('ইরদ), তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ একে 'জীবন'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। যে কোন মূল্যে এসব স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে; কারণ এগুলো বিপন্ন বা ভেঙ্গে পড়ুক সমাজ এটা প্রত্যাশা করতে পারে না। ইসলামি সরকারের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হলো: এসব মাসালিহ রক্ষা করা এবং এর আরও উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা। এরপর গুরুত্বের ক্রমানুসারে আসে সম্পূরক স্বার্থ। তারপর কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য। এ শ্রেণীর স্বার্থের বিষয় প্রায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তা বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য উন্মুক্ত। যে পরিস্থিতিতে এগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে, তার আলোকে এর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এক পক্ষ সম্পূরক স্বার্থকে উচ্চতর স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং অপর পক্ষ নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্থান দিয়ে থাকেন। অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবোধ রক্ষার উপায় ও পদ্ধতির মধ্যে পরিস্থিতির আলোকে পার্থক্য দেখা দিতে পাওে; তবে এর মৌলিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অনেক গ্রন্থকার ইসলামী আইনের অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ (আল মাসালিহ) এবং আধুনিক সাংবিধানিক আইনের 'মৌলিক অধিকারের' মধ্যে

www.pathagar.com

একটি সমান্তরাল রেখা টেনেছেন। মুহাম্মদ এর 'ইমারা'র আল ইসলাম ওয়া-হুকূক আল-ইনসান : জারুরাত লা হুকূক' (ইসলাম ও মানবাধিকার : অধিকার নয়, অত্যাবশ্যক) হচ্ছে সম্ভবত এ ধরনের পার্থক্য নিরূপনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদ্যোগ। লেখক অত্যাবশ্যকীয় অধিকারের সাথে প্রয়োজনীয়তার ধারণার তুলনা করেছেন। তবে তিনি আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে শরীয়ায় মৌলিক মূল্যবোধের কাঠামোর স্বীকৃতিদান এবং তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হবে। তাই পরিভাষা কি হলো অথবা কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হলো তাতে কিছু যায় আসে না, মূলকথা হলো শরীয়া এর পক্ষে এবং একে রক্ষা করাকে আইনগত বৈধতা দিয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে বুনিয়াদি অধিকার ইমারাহ'র ব্যাপারে একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপট রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মাসলাহা'র মতো কোন নির্দিষ্ট আইনগত তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে এসব অধিকারকে নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে শরীয়ায় তাদের স্থান ও বৈধতা নিরূপণ করা। তৎসত্ত্বেও একই ধারায় মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয় শ্রেণী বিভক্তির ভিত্তি হিসেবে আমরা মাসালিহ'র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্তিকে ব্যবহার করতে পারি। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, শরীয়ায় এ ধরনের অধিকারের সমর্থনে মৌলিক অনুমোদনের কোন অভাব নেই।[৩৪]

সমসাময়িক মুসলিম দেশসমূহ ইতিমধ্যে সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্ত অর্জন করেছে; যা অধিকার ও স্বাধীনতা এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সাংবিধানিকভাবে অথবা প্রথা হিসেবে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। তবে উপনিবেশবাদ-পরবর্তী সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহে সংবিধানবাদের যে প্রচলন হয় তা ছিল একান্তভাবেই পশ্চিমা অনুসৃতি। এসব দেশের অধিকাংশ তাদের ইসলামি উত্তরাধিকারের সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র বজায় রাখার চেষ্টা করেনি। এ বিদেশী শেকড়ের কারণে এধরনের যোগসূত্র নির্মাণের চেষ্টা বরং শরীয়ার নির্দেশনার আলোকে অধিকাংশ উত্তরাধিকার বজায় রাখা অথবা নতুন করে নির্মাণ করা যেতে পাওে; এতে সমসাময়িক মুসলমানদের আইনগত ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গতি ও মিল বাড়বে যার ফলাফল অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

টীকা

১. 'হক' হল 'সঠিক' ও 'সত্যের' আরবি প্রতিশব্দ; 'হুকুম' অর্থ আইন অথবা রায়, অনুরূপ পরিভাষা 'হুকম শার'ই' শরীয়ার একটি আইন বা রায়; 'আদল' হল 'ন্যায় বিচারের' আরবি প্রতিশব্দ।

২. কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই এমন নতুন নতুন সমস্যা ও বিষয়ে শরীয়ার বিধিবিধান প্রণয়নের প্রধান উপায় হল সুযোগ্য বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইজতিহাদ বা স্বাধীনভাবে যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করা।

৩. মাহমাসানি, আরকান হুকূক আল-ইনসান ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪১; মুতাওয়াল্লি, মাবাদি নিজাম আল-হুকুম ফি'ল-ইসলাম। এখানে টীকা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। লোকের পুরা নাম, বইয়ের শিরোনাম ও প্রকাশের তারিখ জানতে হলে অনুগ্রহ করে জীবনপঞ্জি দেখুন।

৪. লাইলা, আল নুজূম আল-সিয়াসিইয়াহ, পৃষ্ঠা, ১১২২, ওয়াফি, হুকূক আল-ঈমান ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১১৪; আওদা, আল তাশরি আল যিনা'ই আল-ইসলামী মুকারানান বি'ল কানূন আল ওয়াদি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯; সায়িদ আল সাবিক, 'আনসার আল কুওয়াহ ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৩ ও উদ্ধৃতি।

৫. আল নাবহান, নিজাম আল-হুকম ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ২৩৯।

৬. তুলনীয়, মাহমাসানি, আরকান, পৃষ্ঠা, ১৪২, আল-নাবহান, নিজাম, পৃষ্ঠা, ২৩৪।

৭. তুলনীয়, নিম্নের হুররিয়াত আল রা'ই অংশ।

৮. তুলনীয়, মাহমাসানি, আরকান, পৃষ্ঠা, ৭২।

৯. এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানা, সপ্তদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৩।

১০. David H. Bailey, Public Liberties in the New States. পৃষ্ঠা, ২৭। আরও দেখুন, ওয়ান আব্দুল মানান'র, নিবন্ধ 'Freedom of Expression : Views from Academia', ১৯৮৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কুয়ালালামপুর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে মালয়েশীয় বার কাউন্সিল আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিবন্ধটি পাঠ করা হয়; পৃষ্ঠা, ১।

১১. Montgomery-Watt, Islamic Political Thought : The Basic Concepts, পৃষ্ঠা, ৯৭।

www.pathagar.com

১২. তুলনীয় Macdonald. Hakk. The Encyclopedia of Islam: সাঈদ : Percepts and practice of Human Rights in Islam, পৃষ্ঠা, ৬৩।

১৩. হামাদ, হুররিয়াত আল রা'ই ফি'ল-মায়েদান আলসিয়াসি, পৃষ্ঠা, ৪৩৩।

১৪. আল সুয়্যুতি, আল জামি আল সগির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১১; হাম্মাদ, হুররিয়া, পৃষ্ঠা-৭, হাদিস (বহুবচন আহাদিস)। শাব্দিক অর্থ 'কথা' বা 'বক্তব্য'। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর কথা বা শিক্ষা বুঝাতে হাদিস পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই একে সুন্নাহ'র সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৫. আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৩৮।

১৬. আল-বায়হাকি, আল-সুনান আল-কুরবা, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫৫। 'মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি সদয়, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ'।

الْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ .

১৭. বন কাইয়িম, ই'লাম আল মুয়াক্কিঈ'ন 'আন রব আল-'আলামীন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৭।

১৮. 'আওদা, আল-তাশরি' আল যিনা'ল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪।

১৯. আল-নাবহান, নিজাম, পৃষ্ঠা, ২৩৭।

২০. উদাহরণ হিসেবে, মাহমাসানি, আরকান, পৃষ্ঠা, ২৪২ এবং মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮০।

২১. Schacht, 'Law and Justice' পি, এম, হল্ট সম্পাদিত, The Cambridge History of Islam, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৪১।

২২. Gibb, 'Constitutional Organisation', এম, খাদুরি ও H. Liebesney সম্পাদিত Laws in the Middle East, পৃষ্ঠা, ১২।

২৩. Henry Siegman, 'The State and Individual in Sunni Islam'. The Muslim World, 54(1964), পৃষ্ঠা, ২৩।

২৪. তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ ও মূলভিত্তি।

২৫. আহকাম (বহু বচন, হুকম), শরীয়ার আইন ও অধ্যাদেশ বুঝাতে সাধারণ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

২৬. Universal Declaration of Human Rights, ডিসেম্বর ১০, ইউ. এন. জি. এ. নিউইয়র্ক। এ ঘোষণায় একটি প্রস্তাবনা ও ৩০টি ধারা রয়েছে। এছাড়া খান এর 'Human Rights in Islam'-এ এই ঘোষণার বিবরণ রয়েছে, পৃষ্ঠা, ৪-১০।

২৭. Barendt, Freedom of Speech, পৃষ্ঠা, ২৯।

২৮. Dicey, Introduction to the Study of the law of the Constitution, Ch, VI.

২৯. উদাহরণ হল, ইংরেজ আইনে ভোট দানের অধিকার এবং কোন ব্যক্তিকে আটক রাখার বৈধতা যাচাই করার জন্য তাকে বিচারকের সামনে বা আদালতে হাজির করার নির্দেশ দানের আবেদন জানানোর অধিকার উভয়ই মৌলিক অধিকার, তাই সংবিধানের যথাযথ কার্যকর করতে 'চর্চার বিষয় ও ইতিহাস হিসেবে' এটি করা প্রয়োজন, দেখুন, Bridge, Foundamental Rights. পৃষ্ঠা, ৮।

৩০. Murphy, An Introduction of Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ৮৮-৯৮।

৩১. Bridge, Fundamental Rights, no. 28 at 9ff এভাবে Kant, Kelson, Hart ও Rawls এর মত অনুযায়ী আইনের দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

৩২. মাসলাহা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, এম, এইচ কামালি Have we Neglected the Shariah Law Doctrine of Maslaha? Islamic Studies, 27, (১৯৮৮), পৃষ্ঠা, ২৮৭-৩০৪।

৩৩. Luca, Discrimination in the Arab Middle East, Willem A. Veenhoven সম্পাদিত, Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫।

৩৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, কামালি, 'An Analysis of Rights in Islamic Laws.' American Journal of Islamic Social Sciences, দশম খণ্ড (১৯৯৩), পৃষ্ঠা, ৩৪০-৩৬৭।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমর্থনসূচক প্রমাণপঞ্জি

১. সূচনা বক্তব্য

মত প্রকাশের স্বাধীনতার সমর্থনে মৌলিক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে শরীয়ার এমন মূলনীতি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ অধ্যায়ে অনুসন্ধিৎসু আলোচনা করা হয়েছে। কারণ আইন সংক্রান্ত বিবরণীতে (ফিকহ)[১] বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আধুনিক সংবিধানের বর্ণনার মতো আলোচনা করা হয়নি, তবে এ বিষয়ে ফিকহে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণ অনেকটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং যা অপরিস্ফুট। অতএব সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (হিসবাহ)-এর মূলনীতির মতো বিভিন্ন বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে শরীয়াতের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ নীতিতে নিজস্ব মত প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপারে ব্যক্তিকে মৌলিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এখানে আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো, আন্তরিক সদুপদেশ দান (নসিহা); এতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আলেম-উলামা ও সরকারের কর্মকর্তাসহ যে কোন ব্যক্তিকে এ উপদেশ প্রদান করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কুরআনের পারস্পরিক পরামর্শ (শূরা) এর নীতিতে সমাজের সদস্যদেরকে সরকারের বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের নেতাদেরকেও যারা মতামত দিতে সক্ষম; তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া ও তাদের থেকে তা গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনভাবে যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশের (ইজতিহাদ) মূলনীতি জনগণকে সরকারের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করার (হাক আল-মু'য়ারাদাহ) অধিকার প্রদান করেছে। এসব নীতি শরিয়তে বাক ও মতপ্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতির সাক্ষ্য বহন করে।

আমি এসব বিষয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করেছি। মনোযোগের সাথে আমার আলোচনা পাঠ করলে পাঠকদের মনে হয়ত এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে হিসবাহ ও নসিহার মতো কতিপয় দিক এমন গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা ফিকহ'র গুরুত্বপূর্ণ কিতাবে কেবল নৈতিক বিষয়ের শ্রেণীভুক্ত করা হল কেন? কেন তা প্রায়োগিক আইনের বিধানে রূপান্তরিত করা হল না? একথা সত্য যে, এমনটি হওয়া সত্ত্বেও অতীতে ফকীহগণ যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন; তাই যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবশ্যই বহাল থাকবে,এমন চূড়ান্ত কোন যুক্তি প্রকাশের সুযোগ অবারিত করা হয়নি। আমাদের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে,

www.pathagar.com

সংবিধানবাদ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরনের উন্মেষের বহু আগেই মুসলিম আইনজ্ঞগণ (ফুকাহা, এক বচনে ফকিহ) এসব বিষয়ে তাদের আইন সংক্রান্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফকিহগণ তাদের দৃষ্টিতে সে যুগের বিরাজমান পরিস্থিতির উপযোগী বলে বিবেচিত ভাষায় এ অভিমত ব্যক্ত করেন। নিঃসন্দেহে শরীয়ার সমসাময়িক শিক্ষার্থীদেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত পদ্ধতি ও রূপে এসব সমস্যার সমাধান পেশ করা। এক্ষেত্রে মতপার্থক্য মৌলিক নীতির ব্যাপারে বিতর্কের পথ প্রশস্ত করবে, এমনটি অবশ্য কোনোভাবেই আশা করা যায় না। মুসলিম সমাজের পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাহ এবং শরীয়ার কতিপয় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক আইনে পরিণত করার অধিকার রয়েছে। উপরন্তু একথা জানা যায় যে, শরীয়ার যেসব শিক্ষা সুপারিশযোগ্য, অনুমোদনযোগ্য ও তিরস্কারযোগ্য (মানযুব, মুবাহ ও মাকরূহ) ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে; তা নৈতিক নির্দেশনার সমন্বয়ে গঠিত এবং জনগণের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলে তাকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। একথাও জানা যায় যে, আইনগত বিধিমালা ছাড়াও নৈতিক শিক্ষাকে শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যা একে অপরের সমর্থন ও সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। এর উদাহরণ হলো: একটি আইনি বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা যার সঙ্গে ইসলামের উচ্চতর নৈতিক ধারণার (তাকওয়া) সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে শরীয়ার আইনি বিধিতে স্থান দেয়া হয়েছে। অংশত এ কারণে বর্তমান আলোচনা প্রধানত আইন সংক্রান্ত হলেও তাকে কেবলমাত্র শরীয়ার আইনি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; যা প্রকৃতিগতভাবে আনুষ্ঠানিক আইনগত বিধিমালার পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। অতএব আলোচনার ক্ষেত্র কেবলমাত্র আইনি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা সঠিক হবে না এবং তা শরীয়ার পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা কেবল শরীয়ার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থিই হবে না উপরন্তু সেটিকে এর সমৃদ্ধ, নৈতিক শিক্ষার বিপুল ভাণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। অথচ এ শিক্ষা মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত সংস্কারের মৌলিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

২. হিসবাহ্ সম্পর্কে কুরআনের মূলনীতি

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমর বিল মারূফ ওয়াল-নাহি'য়ান আল-মুনকার) পবিত্র কুরআনের এমন একটি মূলনীতি; যাতে অনেক ইসলামি

www.pathagar.com

আইন ও বিধিবিধানের মূল নিহিত রয়েছে। খোদ ইসলামের বর্ণনায় এ মূলনীতি হচ্ছে শরীয়ার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও সরকারের ক্ষমতার নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র। অতএব নাগরিকগণ তাদের বিচার বিবেচনায় যেটাকে ভাল বলে গণ্য করবেন, তা বলবেন এবং তদনুসারে কাজ করবেন অথবা কোন খারাপ কিছু হতে দেখলে; তারা তা কথা ও কাজের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করবেন অথবা মনে মনে ঘৃণা পোষণ করবেন। হিসবাহ বলে পরিচিত কুরআনের এ মূলনীতি কতিপয় মৌলিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রদান করেছে; যা থেকে আধুনিক সংবিধানের মূলনীতির অনেক বিষয় রূপায়িত হয়েছে। হিসবাহ'র পরিধি এতোটা ব্যাপক যে, একে কেবলমাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, হিসবাহ'র ধারণায় এ স্বাধীনতাপ্রদান গুরুত্ব পেয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাকস্বাধীনতা ছাড়া সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ধারণা করা হবে একটি অচিন্তনীয় বিষয়। হিসবাহ'র ব্যাপকতর ক্ষেত্র ও উপলক্ষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় বিচারক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনায়। হিসবাহ'র পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য বহির্ভূত হওয়ায় আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে হিসবাহ'র প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এখানে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। অবশ্য আলেমগণ হিসবাহ'র প্রয়োগ যেভাবে করেছেন, সংক্ষেপে সে কথা বর্ণনা করে আমি এ মূলনীতি থেকে নির্যাস গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি যুক্তিগ্রাহী হিসেবে পেশ করেছি। ইমাম গাযালী হিসবাহকে "ধর্মের বৃহত্তম স্তম্ভ" (আল-কুত্ব আল-আযম ফি'ল দীন) বলে আখ্যায়িত করে বলেন, আল্লাহর প্রেরিত ওহির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি। তাই সমগ্র ধর্মের মূলকথা হচ্ছে হিসবাহ। একে পুরোপুরি উপেক্ষা করলে ধর্মের বিপর্যয় ঘটবে এবং দুর্নীতি ও অজ্ঞতার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে।[২] ইবনে কাইয়িম আল জাওযিইয়াহর দৃষ্টিতে ইসলামে সকল সরকারি কর্তৃত্বের (জামি' আল-বিলায়াত) মৌলিক উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে হিসবাহ। ইসলাম একে সম্মিলিতভাবে অবশ্য করণীয় কাজ (ফরযে কেফায়া) বলে গণ্য করেছে। প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।[৩]

হিসবাহ'র ব্যাপারে যত গুরুত্বই উচ্চারিত হোক না কেন শরীয়ায় একে কোন ইতিবাচক আইনের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। এর অর্থ হলো কেউ এর প্রতি অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এর পরিবর্তে হিসবাহ ইসলামে মাননির্ধারক নীতি অনুযায়ী প্রধান নৈতিক যুক্তি পেশ এবং ব্যবহারিক শরীয়ার বিভিন্ন শাখার বিস্তারিত বিধিবিধানের মূল ভিত্তি প্রদান করেছে।[৪] এর আংশিক কারণ হলো হিসবাহ এতোটাই বিস্তৃত যে, গোটা

www.pathagar.com

শরীয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব নয়। এ কারণেই হিসবাহকে সংক্ষিপ্ত করা অথবা একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধির অধীনে আনা প্রায় অসম্ভব। অতএব একে ইতিবাচক গুরুত্বসম্পন্ন সুস্পষ্ট বিধিমালার পরিবর্তে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি নৈতিক মতাদর্শ ও দিকনির্দেশনা, একটি দর্শন ও উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। কেবলমাত্র একটি পরিস্থিতিতে ব্যক্তির জন্য হিসবাহ অবশ্য করণীয় (ফরযে আইন) করা হয়েছে। তা হল, যখন সমগ্র সমাজে একজন মাত্র ব্যক্তি থাকবে অথবা অসৎ কাজ সংঘটনকালে একজন মাত্র ব্যক্তি যদি তার সাক্ষী হয়; তা হলে কেবল সে ক্ষেত্রেই হিসবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বে পরিণত হয়, অন্য আর সকল ক্ষেত্রে তা হবে সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরযে কেফায়া)।

সম্মিলিত বা ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে হিসবাহ একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বা ফরয কাজ। যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে 'আলেমদের' তাত্ত্বিক আলোচনায় হিসবাহ ব্যক্তির অধিকার, মৌলিক অথবা অন্য অধিকারও গঠন করে বা করে না কিনা অথবা সার্বিকভাবে একে সমাজের সম্মিলিত অধিকার বলা যায় কি-না, সে বিষয়ে কোন সুরাহা পেশ করা হয়নি। স্বীকৃতির প্রশ্ন অথবা ইসলামি আইনে মৌলিক অধিকারের বিষয় ইত:মধ্যে উত্থাপন ও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একথা বলা দরকার যে ইসলামি আইন মৌলিক অধিকারসহ অধিকার ও কর্তব্য-উভয়কে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, তৎসত্ত্বেও আলেমগণ মৌলিক অধিকারকে পৃথক শ্রেণীর অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেননি। অনেক ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে শরীয়া বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রধানত প্রেক্ষাপট ও ধরন বিবেচনায় আনতে চেয়েছেন। ব্যাপকার্থে হিসবাহ'র ক্ষেত্রেও এটি সত্য, একে বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও এতে প্রত্যেক মুসলমানকে হকের পক্ষে কথা বলার এবং না হক ও মন্দ কাজের বিরোধিতা ও সমালোচনা করার অধিকার সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদান করা হয়েছে। অধিকার ও কর্তব্য হিসবাহ'র দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের বিষয় এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া গেছে ইসলামি কাউন্সিল অব ইউএস প্রকাশিত ইউনিভার্সাল ইসলামিক ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এ। এ দলিলে হিসবাহকে, অপর ব্যক্তিবর্গের বা সমাজের অন্য সদস্যদের অধিকার প্রতি হুমকি দেখা দিলে বা লংঘিত হলে অপরের অধিকারের পক্ষে কথা বলা ও তা রক্ষা করাকে প্রত্যেক ব্যক্তির একইসঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ্য করা হয়েছে।[৫] এ জে হাম্মাদ একে দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'ঈমানের স্তম্ভ ও শরীয়ার মৌলিক নীতি হিসেবে হিসবাহ এমন একটি ভিত্তি রচনা করেছে' যা রাজনৈতিক বিষয় ও সরকারের কাজের ব্যাপারে মত প্রকাশের

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকে অনুমোদনের জন্য যথেষ্ট'।[৬] জায়েদান আরও জোরালো ভাষায় বলেন, 'মত গঠন ও প্রকাশের লক্ষ্যে হিসবাহ'র মূলনীতির যথাযথ উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। মোস্তফা আল শিবাই'র মতে, 'হিসবাহ'র প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের কল্যাণসাধন, আর এজন্য তার ভাষায়, তা সামাজিক স্বাধীনতার (হুররিয়াত আল ইজমাইয়া) ভিত্তি গঠন করে। এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা সামাজিক বিষয়ে মতামত গঠন করতে, স্বাধীনভাবে সে মত প্রকাশ করতে, এমনকি অন্যদের সমালোচনা করতে সক্ষম। 'আল শিবা'ই আরও বলেন, কেউ যদি কোন অন্যায় বা পাপ কাজ হতে দেখেন, যাতে শরীয়ার বিধিবিধান অথবা সদাচরণের মান লংঘিত ও অনুমোদিত রীতিনীতি ক্ষুণ্ন হয়; তাহলে নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তা রোধ বা নিন্দা করার বিষয় ওই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করবে।[৮]

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। হিসবাহর সম্পর্কে কুরআনিক দলিল হিসেবে আলেমগণ প্রায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যি থাকতে হবে, যারা নেক ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। (৩:১০৪; আরো দেখুন ৩: ১১০ এবং ২২:৪১)

আল-গাযালির মতে এসব আয়াত আদেশের (ওয়ালতাকুন) মাধ্যমে শুরু হওয়ায় তা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) বুঝাচ্ছে। অবশ্য এটা গোটা সমাজের জন্যই অবশ্য করণীয় কাজ। একই আয়াতে সম্মিলিতভাবে করণীয় আবশ্যিক কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যের আভাস রয়েছে, বিশেষ করে যেখানে 'তোমাদের মধ্য থেকে' বলা হয়েছে অর্থাৎ সমাজের একাংশ এ কাজ করলেই তা আদায় হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে হিসবাহ'র প্রসঙ্গ আসায় এটি পালনে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রের কল্যাণ লাভের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।[৭] সমাজের সকলের পক্ষে হিসবাহ পালন করা সর্বোত্তম তবে; সমাজের কিছু লোক-নারী বা পুরুষ অথবা উভয়ে এটি পালন করলেও; তা আদায় হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের আয়াতে এর সমর্থন রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে : 'ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু বা সংরক্ষক (আওলিয়া), তারা সৎ কাজে পরস্পরকে সহায়তা করে এবং অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকে' (৯:৭১)। অতএব এটি বোঝা যায় যে, হিসবাহ'র বিধান বাস্তবায়নের জন্য গোটা সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। হিসবাহ'র কোন নির্দিষ্ট দিকের বাস্তবায়নে কেবল মহিলাদের অথবা নারী পুরুষ-উভয়ের সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে তা করার অনুমোদন রয়েছে। উপরন্তু মজার বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ-ঈমানের সঙ্গে হিসবাহ'র সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় হিসবাহ'র মধ্যে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ নিহিত থাকার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়, যে সমাজ হিসবাহর চেতনার আলো থেকে বঞ্চিত সে সমাজ দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরাজিত হতে বাধ্য। স্পষ্ট ভাষায় কুরআনে একথা ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমানদার, সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে হকের পথে অটল থাকতে ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়"[১১] (১০৩:২-৩)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেদের সামর্থ্য ও পরিবেশ- পরিস্থিতি অনুযায়ী হিসবাহ'র দায়িত্ব পালন করার জন্য ঈমানদারদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নোক্ত হাদিসের আলোকে দেখা যায় যে, হিসবাহকে তিনভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।[১০]

مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وذَلِكَ اضْعَفُ الإيْمَانُ.

> কেউ যদি কোন অন্যায়কাজ হতে দেখতে পায়, তাহলে তাকে হাতের সাহায্যে তা বন্ধ করে দিতে হবে, সে যদি তা করতে অসমর্থ হয়; তাহলে তাকে এর প্রতিবাদ জানাতে হবে, আর সে যদি তাও না করতে পাওে, তাহলে তাকে মনে মনে একে ঘৃণা করতে হবে, তবে এটি হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।[১১]

মজার ব্যাপার হলো, এ হাদিসে উল্লিখিত হিসবাহ বাস্তবায়নের যে তিন ধরনের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথমটি পুরোপুরি বাস্তবসম্মত। তাহল, দৈহিক শক্তি প্রয়োগের (তাগির বি'ল-ইয়াদ) মাধ্যমে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করবে। অবশ্য প্রকৃত পদক্ষেপ গ্রহণের আগে কথার মাধ্যমে অন্যায় কাজ রোধ বা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে আর ভিন্ন চিন্তা থেকে সৃষ্টি হয় মৌখিক প্রতিবাদের। এটি হল কোন ঘটনার ব্যাপারে মানব প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু হাদিসখানি এ ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এতে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে; তা প্রায় এর সম্পূর্ণ উল্টো। অবশ্য এটি

www.pathagar.com

শরীয়ার আহকামের লক্ষণীয় বিষয় যে উপল্লিখিত বৈশিষ্ট্য যাতে প্রায় চিন্তার বাহ্যিক দিকের প্রতিফলন ঘটে থাকে এবং এ কারণে হয়ত এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের একটি নির্দিষ্ট ক্রম ধারা নির্ধারণ করা হয় যা মানব প্রতিক্রিয়ার প্রাকৃতিক ধরনের থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। উপরিউক্ত একটি পরিচিত হাদিসে যে 'জানে' বা 'শোনে' শব্দের পরিবর্তে 'যে দেখেছে' (মান রা'আ) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে; এতে কৃত অন্যায় কাজের বাহ্যিক ধরন এবং প্রত্যক্ষকারী কোণ্ উপায়ে তা পরিবর্তন করবে সে ব্যাপারে তার সামর্থ্যের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।[১২]

হিসবাহ'র দুটি বিষয়ের একটি হল: অসৎ কাজের নিষেধ, যা হচ্ছে এ হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য। এছাড়া এতে শরীয়ার পরিচিত নিয়মের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হলো কিছুটা লাভের আকর্ষণ থাকলেও তার চেয়ে অসৎ কাজ রোধের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ হাদিসে যে তিনটি ধাপের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে অসৎ কথা উচ্চারিত বা অসৎ কাজ হতে দেখেছে এমন সকল ব্যক্তির জন্যই হিসবাহ'র বিধান পালন প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ করতে দেখলে তার জন্য তা বন্ধ করা অবশ্য করণীয় কাজ (ওয়াজিব) হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে নিন্দনীয় (মাকরূহ) কোন কিছু রোধ করার লক্ষ্যে যদি তা করা হয়; তাহলে তা প্রশংসনীয় (মানযূব) বলে গণ্য হবে। বদ কাজ (মুনকার) এবং পাপ কাজ বা অবাধ্যতার (মাসিয়াহ) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাসিয়াহ'র চেয়ে মুনকারের পরিধি ব্যাপক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন শিশুকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখলে তা মাসিয়াহ'র মধ্যে পড়বে না, তবে মুনকার বলে বিবেচিত হবে, তাই তা-ও হিসবাহ'র পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৩]

হিসবাহ'র চারটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে হিসবাহ'র বিধিবিধান কার্যকর করার জন্য অগ্রাধিকারের সঠিক নির্দেশনা রয়েছে। তাহল, প্রথমত: কোন ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাকে মৌখিক বা লিখিতভাবে তার পাপাচার সম্পর্কে অবহিত করা বা জানানো (তা'রিফ)। এতে কোন কাজ না হলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নমনীয় ভাষায় তিরস্কারের (ওয়া'য) মাধ্যমে ওই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ ভীতি জাগিয়ে তোলা এবং শুভবুদ্ধি ও সুচিন্তার আবেদন জানানো। এতেও যদি কোন কাজ না হয় তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে কড়া ভাষা প্রয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে হুমকির বিষয় থাকতে পারে; তবে তা অভিযোগ বা অবমাননাকর হতে পারবে না। তার ক্ষেত্রে নিন্দা জ্ঞাপনমূলক শব্দ বা বাগধারা যেমন "ওহে স্বৈরাচারী"

www.pathagar.com

(ইয়া যালিম) "ওহে অজ্ঞ" (ইয়া জাহিল) অথবা "তোমার অন্তরে কি আল্লাহ ভীতি নেই?" প্রয়োগ করা যেতে পারে। হিসবাহ'র চতুর্থ ও সর্বশেষ দফায় রয়েছে রাগ বা ক্ষোভের প্রকাশ ও শক্তি প্রয়োগ। তবে একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠলে এবং তা অন্যায় কাজ রোধ করতে পারবে বলে বিবেচিত হলেই কেবল এটা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্য শক্তি প্রয়োগ বা তা করার হুমকির লক্ষ্য অবশ্যই হতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে অসৎ কাজ রোধ করা, অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা নয়।[১৪] পিতা, স্বামী ও রাষ্ট্রপ্রধান, এ তিন ক্ষেত্রে হিসবাহ'র ব্যবহারের কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা হিসবাহ'র চারটি পর্যায়ের সবগুলোর ব্যবহার করতে পারবেন না,. কেবল প্রথম দুটি প্রয়োগ করতে পারবেন। আল গাযালী এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইমাম রাগান্বিত হলে লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহ (ফিতনা) দেখা দিতে পাওে; তবে ইমামগণও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন এবং ফিতনা সৃষ্টির শঙ্কা না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তা করার সুপারিশও (মানযূব) করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের ফিতনা থেকে সৃষ্ট অরাজকতা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে বিবেচিত হলে এটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তবে আলেমদের অধিকাংশের মতে, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কঠোর ভাষার প্রয়োগ কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা দেখা দিলে; সে ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজ বিবেচনার অনুমতি রয়েছে। তবে সবসময়ই তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হবে অসৎ ও পাপের অপনোদন। হিসবাহ'র কারণে বড় ধরনের অন্যায় কাজ বা পাপের বিস্তার ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত হবে না।[১৫]

পূর্বে উল্লিখিত হাদিসের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে আল গাযালী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ, আহত হবার বা মাল সম্পদের ক্ষতির আশংকা থাকলে সে হিসবাহ'র কর্তব্য পালন করা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। এক্ষেত্রে কেবল মনে মনে ঘৃণা পোষণের মধ্যে তার হিসবাহ'র দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায়কারীকে কোন ধরনের সহায়তা করার কোন অনুমতি নেই। উপরন্তু যেসব অসৎ বা পাপ কাজ নিষিদ্ধ বা নিন্দা করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে পাপ এবং তার অবস্থা নিরূপণের জন্য কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে পাঁচটি মূল্যবান বিষয় যেমন জীবন, ধর্মবিশ্বাস, বোধশক্তি, সম্পত্তি ও বংশক্রম সংরক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়ার বিধিবিধানের আলোকে কোন কাজ কতখানি ভাল (মারূফ) অথবা কতখানি মন্দ (মুনকার) তা নির্ধারণ করতে হবে।[১৬]

www.pathagar.com

এছাড়া মালিকি ফকিহ আল কারাফি হিসবাহ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত যে তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তা হল : প্রসঙ্গত যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই জ্ঞানসমৃদ্ধ হতে হবে, কেননা যে ব্যক্তি অজ্ঞ সে তার নিজ অবস্থান সম্পর্কেই নিশ্চিত নয়; তাই তার পক্ষে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত: এই ব্যক্তিকে সুনিশ্চিত থাকতে হবে যে অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার কারণে বড় ধরনের অন্যায় কাজের বিস্তার ঘটবে না। তৃতীয়ত: কোন ব্যক্তি অবশ্যই এ নিশ্চিত সম্ভাবনার (আল যান্ন আল-গালিব) ভিত্তিতে কাজ করবেন যে, তার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হবে। প্রথম দুটি শর্তের কোন একটির অনুপস্থিতিতে হিসবাহ বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে বেআইনী (হারাম) কাজ যা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তবে তৃতীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে হিসবাহ অবশ্য করণীয় কাজ (ওয়াজিব) বলে বিবেচিত হবে না; তখন তা হবে নিছক অনুমোদিত (মুবাহ) কাজ।[১৭]

৩. অন্তর নিংড়ানো উপদেশ *(নাসিহাহ)*

আভিধানিক অর্থে নাসিহা'র মানে হল আন্তরিক উপদেশ, সানুরাগ ভর্ৎসনা ও সহৃদয় তাগিদ।[১৮] নাসিহা (মুনাসাহা) হচ্ছে একটি কুরানিক দৃষ্টিকোণ বা কনসেপ্ট। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে যেখানে নবুওতের উদ্দেশ্য ও কাজ প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে; সেখানে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, আল্লাহর নবী হযরত নূহ, সালিহ, হুদ ও শোয়াইব (আ:)-সকলেই তাঁদের জাতির লোকদের বলেছিলেন, তাদের মিশনের প্রকৃতি হচ্ছে একজন আন্তরিক সদুপদেশদাতার মতো, তাদেরকে সতর্ক করা। নূহ (আ:) তার অনুসারিদের বলেন, 'আমি তোমাদেরকে আন্তরিক উপদেশ দেব' এবং 'আমি তোমাদের জন্য একজন সদুপদেশদাতা - নাসিহুন আমিন' (৭:৬২ ৬৮ এবং একই সুরার ৭৯ ও ৯৩ আয়াত।)

ভৎর্সনার (তাওবিখ) থেকে নাসিহার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রে অনেক অভিন্ন দিক থাকতে পারে এবং সংশয় ও অস্পষ্টতাও থাকতে পারে।

আল [illegible] মতে, নাসিহা ও তাওবিখের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, প্রথমটি গোপনীয় ও প্রীতিপূর্ণ এবং অপরটি প্রকাশ্য ও বিচক্ষণতাহীন। এখানে ইমাম শাফেঈ রহ এর সঙ্গে আল গাযালীর মতের মিল রয়েছে। ইমাম শাফেঈ বলেন,

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইকে উপদেশ দেন, তখন তিনি গোপনেই দিয়ে থাকেন; তিনি তাকে সদুপদেশ দেন। আর তিনি যদি প্রকাশ্যে উপদেশ দেন, তাহলে তা হবে তার জন্য উপহাসকর ও অমর্যাদাকর।[১৯] উভয় মতকে হাদিসের ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। হাদিসে বলা হয়েছে :

الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

'কেউ যখন কাউকে সদুপদেশ দেবে, তখন সে যেন তা গোপনে দেয়।'

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে,

اِذَا اِسْتَشَارَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَشِرْ اليه .

'তোমাদের কেউ যখন তার অন্য এক ভাইকে উপদেশ দিতে চাইবে; তখন যেন সে তাকে তার অন্য সঙ্গীদের থেকে আলাদা করে নেয়।'

ইসলামে নাসিহার মূল কথা হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বনে উৎসাহদান, তবে এক্ষেত্রে ঈমানদারদের পক্ষ থেকে যত্নশীল আচরণ করা প্রয়োজন, তাঁরা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এটাই তাদেও কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়। তাই কোন ব্যক্তি যদি নিশ্চিত মনে করেন যে, তার উপদেশ অপরের জন্য কল্যাণকর হবে; তাহলে তিনি অন্যদেরকে আন্তরিক সদুপদেশ দানের অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। সাধারণত: নাসিহাকে হিসবাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। হিসবাহ'র দুটি প্রধান দিকের মধ্যে নাসিহাকে প্রথম ও অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন অন্যায় কাজ নিষেধ করার চেয়ে সৎকাজের আদেশ দানকে (আমর বিল ম'রুফ) বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে নাসিহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অধিকার হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন তিনি দেখতে পাবেন যে, তার অভিমত বা উপদেশ কল্যাণকর হবে; তখন তিনি আস্থার সঙ্গে অন্যদেরকে, সে সাধারণ মানুষ বা সরকারি কর্মকর্তা যিনিই হোন না কেন, তা দেয়ার অধিকার লাভ করবেন। এছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে অভিমত বা উপদেশ দেয়া যেতে পারে; তবে জনাব হাম্মাদ নাসিহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার (হুররিয়াত আল-রা'ই আল সিয়াসি) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

নাসিহা'র মূল প্রতিপাদ্য যে, সৎ কাজে উৎসাহদান এবং অসৎ কাজ নিষেধ, একটি হাদিসে এ বিষয়টি আবারও সমর্থিত হয়েছে। হাদিসটিতে নাসিহাকে ধর্মের নির্যাস বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইসলাম মুমিনদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব

www.pathagar.com

(উখওয়াহ) উৎসাহিত করে; তার প্রয়োজনীয় উপাদান হলো নাসিহা। নাসিহা হচ্ছে গীবতেরও (অগোচরে অপরের নিন্দা করা) প্রতিষেধক। কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের মধ্যে কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেলে অথবা তার জন্য কল্যাণকর হবে কোনকিছু মনে হলে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। অবশ্য এ আলোচনা হতে হবে ভ্রাতৃত্বের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বিনম্র পন্থায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَارَسُوْلَ للهِ قَالَ اللهِ

وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

> এক ঘটনায় মহানবী সাঃ তার সাহাবিগণকে বললেন, 'দ্বীন হল নাসিহা'। তার এ বক্তব্যে অবশ্যম্ভাবি প্রশ্ন উঠলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ), এটি কার জন্য; (নাসিহার অধিকার/কর্তব্য), উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের তাঁর নবীর এবং মুমিনদের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণের জন্য।'[২২]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় রিয়াজুস সালেহিন-এর প্রণেতা আল নববী আল খাত্তাবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ধর্ম হল আন্তরিক সদুপদেশ' (আল দ্বীন আল নাসিহা)-এ পরিভাষার অর্থ নাসিহা হলো দ্বীনের ধারক এবং দ্বীনের একটি স্তম্ভ (কিয়াম আল দ্বীন ওয়া ইমাদুহু)। উদাহরণ হলো, যখন একথা বলা হয়, আরাফাতের ময়দানে হাজীগণের উপস্থিতি হল হাজ্জ (আল-হাজ্জ 'আরাফা): এর অর্থ আরাফাত হলো একটি স্তম্ভ যা হল হজের অপরিহার্য শর্ত।[২৩] অপর এক তাফসিরে বলা হয়, এ হাদিসে নাসিহার তাৎপর্য তুলে ধরে একে খোদ ইসলামের প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ লোকদের নসিহাত করার অর্থ হলো তাদেরকে সৎ পথে চলতে সহায়তা করা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার চেতনা জোরদার করা।[২৪]

> ইসলামে নাসিহা ও সত্যিকার ঈমানের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাঃ এর দরবারে হাজির হয়ে ঘোষণা করলাম 'আমি আপনার কাছে ইসলামের অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি' '(উবাই'উকা আলাল ইসলাম)' অতপর রাসূলুল্লাহ সাঃ

> বললেন, 'এ শর্তে যে তুমি ঈমানদারদেরকে সদুপদেশ দেবে'... তখন আমি আনুগত্যের শপথ করে এটি করার প্রতিশ্রুতি দই।'[২৫]

আমরা আরেকটি হাদিস পাঠ করলে দেখতে পাব যে, প্রত্যেক মুসলমানের অপরাপর মুসলমানকে সদুপদেশ প্রদানের অধিকার রয়েছে। হাদিসটি এভাবে শুরু হয়েছে "মুসলমানের পরস্পরের ওপর সকল মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, ইত্যাদি। হাদিসটি নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে শেষ হয়েছে :

اِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ .

> 'যখন কেউ তোমাকে নসিহার অনুরোধ জানাবে তখন
> তুমি অবশ্যই তাকে নসিহাত করবে।'

উপরন্তু আল মাকদিসি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বরাত দিয়ে বলেছেন, হিসবাহর মত নাসিহাও সম্মিলিত কর্তব্য (ফরযে কেফায়া), সে কারণে এমনকি আবেদন বা অনুরোধ না জানালেও নসিহা প্রদান করা যেতে পারে। অপর একটি হাদিসে এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া গেছে। এতে রাষ্ট্রের নেতা বা প্রধানের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তার জন্য প্রজা সাধারণকে উপদেশ দেয়া প্রয়োজন। এতে বলা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই এ অনুযায়ী কাজ করবেন, তা যদি না করেন তাহলে, তার যেসব প্রজা বেহেশতে যাবেন তিনি তাদের সঙ্গী হতে পারবেন না।[২৬] ইমাম ইবনে হাম্বলের মতে, যখন অনুরোধ জানানো হবে, কেবল তখনই নসিহা করতে হবে একথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। উপরোক্ত দু'টি হাদিসের মধ্যে প্রথমটিতে অবশ্য এ শর্তের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এর উপসংহারে বলা হয়েছে, অনুরোধ জানানোর ওপর নাসিহার বিষয় নির্ভরশীল নয়, তাই মুসলিমদেরকে নিজ নিজ উদ্যোগেই নসিহার দায়িত্ব পালন করতে হবে।[২৭] দৃশ্যত নাসিহা ও হিসবাহ'র মধ্যে সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উভয় বিষয়ই সম্মিলিত কর্তব্য বা ফরযে কেফায়া, এদের কোনটিই বিশেষ অনুরোধের ওপর নির্ভরশীল নয়, যদি তা হতো তা হলে এদের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য অনেকখানি লোপ পেত। উপরন্তু দুটি হাদিসের প্রথমটি একটি সাধারণ 'মুসলমানের অধিকার' (হক আল মুসলিম) দিয়ে শুরু হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দেখলে বোঝা যায় যে, এ সুনির্দিষ্ট হাদিসে নসিহা দাবি করার অধিকার প্রকাশ পেয়েছে, বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়; এমনকি এ ধরনের কোন দাবি জানানো ছাড়াই যা পূরণ করা প্রয়োজন। সম্ভবত আলোচ্য হাদিসখানিতে সর্বোত্তম নসিহার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে, আর স্বাভাবিকভাবে একমাত্র

www.pathagar.com

গ্রহিতাই এ নসিহার জন্য অনুরোধ বা আবেদন জানাবেন। মহানবী সা: এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের উদাহরণ থেকে এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া গেছে।[২৮] দেশের নাগরিক (উম্মাহ) নারী-পুরুষ ও তাদের নেতৃবৃন্দ অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে, প্রকাশ্য মসজিদে, রাস্তায় এবং অন্যদের উপস্থিতিতেও নসিহা আদানপ্রদান করবেন। এ উদাহরণ থেকে নসিহার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যাপারে জোরালো যুক্তি নেই বলে উপসংহার টানার প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে।[২৯]

শরিয়া নসিহা প্রদানের কোন পদ্ধতি বাতলে দেয়নি; তাই সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি ব্যক্তির সুচিন্তা ও আন্তরিকতার বিষয় বলে গণ্য হবে। সুন্নাহতে একমাত্র দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, যাতে নসিহা দেবার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার পরিবর্তে সর্বোত্তম উপায় চিহ্নিত করা সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হল :

১. লোকদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও গোপনীয়তা (তাতাববু আল আওরাত) প্রকাশ বা অনুসন্ধানের কাজে অবশ্যই নসিহার কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না।

২. ঘটনা, সময় ও স্থানের উপযোগিতার ব্যাপারে সচেতন থেকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে নসিহা প্রদান করতে হবে।

৩. কোন আন্দাজ, অনুমান বা সংশয়ের ভিত্তিতে নয়-সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতে নসিহা করতে হবে।

৪. যতটুক প্রয়োজন ততটুকুই নসিহা করতে হবে এবং অতিরঞ্জন পরিহার করতে হবে।

৫. কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার সাথে এর মিল থাকতে হবে।[৩০]

এছাড়া অপর হাদিসের শর্ত অনুযায়ী, যখন কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের কোন ব্যক্তিকে নসিহা করার ইচ্ছা পোষণ করবেন; তখন প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করা তার উচিত হবে না বরং তাকে অন্যত্র ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে সেকথা বলতে হবে। তিনি যদি নসিহা গ্রহণ করেন, তাহলে এর উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে এবং তা গ্রহণ না করলেও নসিহা দাতার কর্তব্য যথারীতি আদায় হয়ে যাবে।

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْصَحَ لِذِىْ سُلْطَانٍ فَلاَيُبْدَه عَلاَنِيَةً

وَلٰكِنْ يَأخُذُ بِيَدِهٖ فَيَخْلُوْبِهٖ فَاِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَاِلاَّ

كَانَ قَدْ اَدَّا الَّذِىْ عليه .

মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও 'উলেমা-সকলকে' নসিহত করার অর্থ হবে সঠিক পথ অনুসরণে তাদেরকে সহায়তা করা, তাদেরকে তাদের কর্তব্য বিনম্রতার সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়া অথবা সতর্ক করে দেয়া এবং তাদেরকে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করা। মুসলমানদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী নসিহার অর্থ হল, তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণে কথা ও কাজ-উভয়ের মাধ্যমে আন্তরিক উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা; সে উপদেশ তাদের কাছে পছন্দ বা অপছন্দের যাই হোক না কেন, কেউ একে নিজের জন্য পছন্দ করতে পারে আবার অপছন্দও করতে পারে।[৩১] এ প্রসঙ্গে আল মাকদিসির লেখা থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দান বেশ চমকপ্রদ হবেঃ একদিন ইবনে মোবারক প্রশ্ন করেন, "আমার উপস্থিতিতে একজন দেউলিয়া লোক যদি একজন ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসা করতে আসেন, তাহলে কি করবো? আমি যদি জানি যে লোকটি দেউলিয়া কিন্তু ব্যবসায়ী লোকটি তা অবগত নন তাহলে আমি কি ব্যবসায়ীর কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দেব।" ইবনে মুবারক এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দেন এবং নিম্নোক্ত হাদিসের উদ্ধৃতি দেন :

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

'তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।'[৩৬]

আন্তরিকতা (ইখলাস) শূন্য উপদেশের কোন মূল্য নেই, প্রতারণার (রিয়া) ভিত্তিতে প্রদত্ত উপদেশ আরও ক্ষতিকর, এটি করা গুনাহের সামিল।[৩৪] নসিহাকে ফলপ্রসূ করতে হলে নৈতিক সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রয়োজন এবং নসিহত দাতার চেতনায় কর্তৃপক্ষের ভয়ভীতি অথবা বস্তুগত ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলেই কেবল এটি অর্জন করা যায়। ব্যক্তির অন্তরের শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হল আল্লাহর ওপর ঈমান এবং একথা বিশ্বাস করা যে, একমাত্র তিনিই প্রত্যেকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। নিম্নের হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ বার বার এ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

اِذَا رَأَيْتَ اُمَّتِى تَهَابُ اَنْ تَقُوْلَ لِلظَّالِمِ يَاظَالِمُ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهَا

"তোমরা যখন দেখবে আমার উম্মত স্বৈরাচার বা যালিমকে 'যালিম' বলতে ভয় পাচ্ছে; তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

মহানবীর সাঃ সুন্নাহ্তে নসিহার বিষয় অবহেলা না করার জন্য মুমিনদের প্রতি তাগিদ প্রকাশ পেয়েছে। তাই নসিহার দরজা কখনই কোন অবস্থায়ই বন্ধ করা

www.pathagar.com

যাবে না। আমরা নিম্নোক্ত হাদিস পাঠ করলে এ বিষয়টি দেখতে পাব। হাদিসটির সূচনা হয়েছে চমৎকারভাবে :

لاَيَحْقِرُ اَحَدُكُمْ نَفسَه، قَالُوايَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَحْقِرُ اَحَدُنَا نَفسَه قَالَ يَرَى اَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ مَقَالَ ثُمَّ لاَيَقُوْلُ فِيْهِ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ : مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ خَشْيَةَ النَّاس ، فَيَقُوْل، فَاِيَّايَ كُنْتُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَى .

> "কোন পুরুষ বা মহিলা যেন নিজেকে অবমাননা না করে" যে সকল সাহাবী একথা শুনতে পেলেন তারা প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (স:)কিভাবে একজন এটি (নিজের অবমাননা) করবে'? রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, কেউ কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে আল্লাহর জন্য তাকে সে ব্যাপারে কথা বলতে হবে; কিন্তু সে যদি তা না করে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহতা'আলা তাকে বলবেন, "ওই বিষয়ে কথা বলা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রেখেছিল"? লোকটি যখন জবাবে বলবে "জনগণের ভয়।" অতপর আল্লাহ বলবেন, "এটি সঠিক হতো সে যদি আমাকেই ভয় করতো।"

জানা গেছে, ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল র: এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে অমুসলমানদের (জিম্মি) নসিহা করা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ নয় কেবল মুসলমানদের জন্য তা বাধ্যতামূলক। একটি হাদিসের আলোকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক মুসলমানকে নসিহার দায়িত্ব পালনে শরিক থাকতে হবে, সদুপদেশ দান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য।' (আল-নুশ লি-কুল্লি মুসলিম), এ হাদিসে যিম্মিরা নসিহার আওতার বাইরে থাকবে কি-না, একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এ হাদিসে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা হল, আল মাকদিসি যেমনটি উল্লেখ করেছেন, নসিহা হচ্ছে সকল মুসলমানের জন্য সম্মিলিত কর্তব্য। অপর হাদিসে যিম্মিদেরকে নসিহার সুযোগের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। আল মাকদিসি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কথিত অভিমতকে উল্লেখ করেননি; তবে তিনি তার মন্তব্যের শেষে "আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন" কথাটি জুড়ে দিয়েছেন। সাধারণত কোন বক্তা বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সুনিশ্চিত হতে না পারলে একথাটি বলে থাকেন।

www.pathagar.com

এ বইয়ের লেখক বলেন, তার মতে এভাবে নসিহার সুযোগকে সীমিত করার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। প্রমাণের বিষয় পর্যালোচনা থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি তাতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, ইসলামের আকিদার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দিক ছাড়া নসিহাকে সীমাবদ্ধ করার এ ধরনের কোন সুযোগ নেই।

৪. পারস্পরিক আলোচনা *(শু'রা)*

পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী সরকার পদ্ধতির অন্যতম মূলনীতি হলো পারস্পরিক পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা বা শুরা। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের নেতৃবৃন্দকে সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শুরা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিধানে সরকারি আইন হিসেবে শুরার মৌলিক ভিত্তি স্থাপন সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়নের ধরন এবং যেসব বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পথ খোলা রাখা হয়েছে। সকল সামাজিক বিষয় আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে কিনা অথবা কেবল সরকারি কার্যক্রমে শুরার বিধান প্রযোজ্য হবে, আল-কুরআনে সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অবশ্য শুরার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের অনুপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংশ্লিষ্ট সকল পরিস্থিতিতে ও সব বিষয়ে শুরা প্রয়োগের ব্যাপক নমনীয়তা অবলম্বনের সুযোগ এনে দিয়েছে। শুরা সম্পর্কে কুরআনের বিধানে সাধারণ ভাষা প্রয়োগের ফলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় যে, শুরা হচ্ছে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তা নীতিগতভাবে শরীয়া অনুযায়ী সরকারের সকল ক্ষেত্রে; এমনকি ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআনের বাণীতে ইসলামের স্তম্ভসমূহ যেমন ঈমান, ফরয নামায (সালাত) ও যাকাত এর প্রসঙ্গের সাথে সাথে শুরার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে পুনরায় শুরার ওপর অনুরূপ গুরুত্ব দিতে এবং মুসলিম সমাজ ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আল-বাহীর মতে, শুরার ব্যবস্থা কুরআনের বিধানে যেসব বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তা কেবল সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত নয়; উপরন্তু পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, ব্যবসার অংশীদারের সাথে সম্পর্ক, মালিক ও কর্মচারির মধ্যকার সম্পর্ক এবং কার্যত জনগণের জন্য কল্যাণকর হতে পারে জীবনের এমন সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।[৩৭]

শুরা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতের মধ্যে নিম্নেরটিতে সামাজিক কার্যক্রম শুরার ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য প্রথম যুগের মুমিনদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আমি যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।' (৪২:৩৮)

বস্তুত এ আয়াতে ইসলামের তিনটি স্তম্ভের পাশাপাশি শুরার প্রসঙ্গ এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে এগুলোর অনুরূপ শুরাও গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিষয়। মজার বিষয় হল; এ আয়াতটি মক্কী আয়াত এবং ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হবার অনেক আগেই তা অবতীর্ণ হয়। পরে মদীনায় ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কুরআনের নির্দেশ হিসেবে পরস্পরিক আলোচনা করার বিষয় সরকারি নীতি হিসেবে গৃহীত হয় এবং ইসলামি সরকারের একটি মূলনীতি হিসেবে শুরার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী সাঃ এর প্রতি নির্দেশ এল :

وَشَاوِرْهُمْ فِىْ الاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

তাঁদের (সাহাবীগণ) সাথে (সামাজিক) বিষয়ে পরামর্শ এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তা বাস্তবায়ন কর) (৩:১৫৯)

আল তাবারি পরামর্শ করাকে শরীয়ার অন্যতম মৌলিক মূলনীতি ('আযাইম আল-আহকাম) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; যা ইসলামি সরকারের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ইবনে তাইমিয়াও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, রাসূল সাঃ এর ওপর ওহি নাযিল করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহতা'আলা সমাজের লোকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের জন্য কুরআনের এ আয়াত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তারা কখনও নবীকে সাঃ তাদের মধ্যে পাবে না এবং সরাসরি ওহির বাণীও তাঁদের কাছে পৌঁছুবে না।[৩৯] মুহম্মদ আব্দুহুও মনে করেন যে, এ আয়াতে পরামর্শ করাকে নিছক কোন সুপারিশ নয় বরং আবশ্যকীয় নির্দেশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার লক্ষ্য সরকারি কার্যক্রমে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা।[৪০] অন্যান্যের মধ্যে আসাদ, জায়েদান, আল বাহী, মওদুদি ও আওদা- সকলেই এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। মহানবী সাঃ এর সুন্নাহতে ও সাহাবীদের জীবনী থেকে এ মতের স্বপক্ষে আরও সমর্থন পাওয়া গেছে।[৪১] রাসূলের সাঃ সাহাবিগণের মধ্য থেকে আবু হুরায়রা

আব্দুর রহমান ইবনে সাখর রা: (মৃত্যু ৫৭/৬৭৬) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

مَا رَأيْتُ احَدًا اكْثَرُ مَشْوَرَةٍ لاَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

আমি রাসূল সা: এর মতো আর কাউকে তার সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে এতো আন্তরিক দেখিনি।[৪২]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: রাসূল সাঃ তাঁর দু প্রধান উপদেষ্টা আবূ বকর সিদ্দিক ও উমর ইবন আল খাত্তাবকে বলেন :

لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا .

একটি বিষয়ে তোমরা দুজন যদি একমত হও; তাহলে আমি তার বিরোধিতা করবো না।[৪৩]

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে রাসূল সা: ব্যক্তিগত ও সরকারি বিষয়ে সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজের মতের উপরে তাঁদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৪৪]

আরবি ভাষায় যে মূল শব্দ (শারা) থেকে শুরা শব্দটি এসেছে; তার শাব্দিক অর্থ মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা। শুরার আইনগত অর্থও এর শাব্দিক মূলের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তা হল কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত (রাশ'ই) গ্রহণ করা।[৪৫] কেউ সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের (ইজতিহাত ফিল রা'ই) ভিত্তিতে সঙ্গীদের সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে, তা প্রায়শ ইজতিহাদ চর্চা বলে বিবেচিত হয়, এটি সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। কিন্তু শুরা যেহেতু কোন একক জুরির মত নয়, সম্মিলিত অভিমত (রা'ই)- তাই এটি সঠিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত শুরার মূল শক্তি একত্র হয়ে অনেক লোকের আলোচনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এতে অভিন্ন কোন বিষয়ে তারা নিজ নিজ অভিমত প্রকাশের সুযোগ পায়। এভাবে শুরা জনগণের মধ্যে বিভক্তি ও অনৈক্য সৃষ্টি রোধ করে।[৪৬] তবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেলেই কেবল আলোচনা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হতে পারবে। মাহমুদ শালতুত ও আল-সিবা'ইর বক্তব্যে এ সত্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁরা শুরা বা আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে কুরআনের মূল নীতি প্রসঙ্গে বলেন, যাদের কাছে মতামত চাওয়া হবে তাদেরকে কথা বলার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। আব্দুল করিম জায়েদান এর চেয়ে আরও জোরালো ভাষায় এ স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন

www.pathagar.com

"ইসলামে সরকার পরামর্শ বা শুরার নীতিমালা মেনে চলার পরও যদি শুরায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা ভোগ করে তাহলে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ ও নিরর্থক হবে।[৪৮]

শুরার বিষয় কি হবে, সকল বিষয়ে কি এর প্রয়োগ করা হবে, না বাছাইকৃত বিষয়ে, এ ব্যাপারে আল কুরতুবি বলেছেন, ধর্মীয় ও সমসাময়িক উভয় বিষয়ে শুরার ভূমিকা রয়েছে; তবে ধর্মীয় বিষয়ে যারা আলোচনা করবেন তাদেরকে ধর্মীয় বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী হতে হবে। সমসাময়িক বিষয়ে অবশ্য পরামর্শদাতাকে যে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হবে; কেবল সে বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হবে এবং সঠিক পরামর্শ দেয়ার যোগ্য হতে হবে।[৪৯] ফকিহগণ (Jurists) মনে করেন যে, সাধারণভাবে ধর্মীয় ও সমসাময়িক উভয় বিষয়ে শুরার প্রয়োগ হতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে এ সূত্রে নির্দেশনা পাওয়া গেলে, সে ব্যাপারে আলোচনার কোন আবশ্যকতা নেই এবং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা লঙ্ঘন করার কোন অনুমতি দেয়া যাবে না, এ নীতি সাধারণভাবে মেনে চলা হয়। তৎসত্ত্বেও একথা বলা মোটেই ভুল হবে না যে, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত বিষয়ের ক্ষেত্রে শুরার কোনই ভূমিকা নেই। এসব ক্ষেত্রেও শুরা সহায়ক বিষয় হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম আহকামের সঠিক ব্যাখ্যাদান, অনুধাবন এবং তা প্রতিপালন বা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণের মতো বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ অর্থে বলা যায়, শরীয়ার নির্দেশনার ভিতরে ও বহির্ভূত সকল সামাজিক বিষয়ে শুরার একটি ভূমিকা রয়েছে।[৫০]

অনেক আলেম যুদ্ধের মতো কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়কে শুরা প্রয়োগের সঠিক বা একান্ত বিষয় হিসেবে আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এটি বোঝাবে না যে, সরকারের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে শুরার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।[৫১] এ সম্পর্কে সঠিক মত পবিত্র কুরআনের আয়াতে (৩:১৫৯) পাওয়া যেতে পারে। এতে সাধারণ নির্দেশ আকারে শুরার প্রসঙ্গ এসেছে এবং কোনভাবেই তাতে তাকিদ দেয়া হয়নি। ইসলামি আইনশাস্ত্র (উসূল আল-ফিকহ) অনুসারে সাধারণ (আম) ও নির্দিষ্ট (মুতলাক) আদেশ এর ওপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ (তাখসিস) বা অধিকতর গুরুত্ব (তাকিদ) প্রদানের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা পূর্বের মতোই থাকবে। ইতমধ্যে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া শুরার বিষয় কোনভাবেই সুনির্দিষ্ট করার কোন জোরালো যুক্তি নেই এবং শুরা কোনভাবেই শরীয়ার সুনির্দিষ্ট নির্দেশের পরিপন্থি হবে না।[৫২]

www.pathagar.com

সংক্ষেপে বলা যায়, শুরার সুযোগ ও বিষয়কে কোনভাবে সীমাবদ্ধ করার দরকার নেই। কারণ এতে সরকার-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিক, নারী অথবা পুরুষ, মুসলিম বা অমুসলিম- সকলকে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৫৩] অপরদিকে সরকারের কর্তব্য হল, বিশেষ করে যেসব বিষয়ে সমাজের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে; সেসব বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকের পরামর্শ গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট সকলে ও যাদের এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করার আগ্রহ রয়েছে, তাদের উচিত তাদের মতামত ও যুক্তি প্রকাশ করা। অত:পর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহর সবচেয়ে কাছাকাছি মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৫৪]

উপরন্তু শুরার ব্যাপারে কুরআনের বিধান প্রয়োগে সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কেবল এক বা একাধিক প্রতিনিধি পরিষদ গঠন জরুরি নয়, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করাও জরুরি। রাষ্ট্রীয় পরামর্শ পরিষদের (মজলিশ আল-শুরা) সিদ্ধান্তের ওপর নেতার ভেটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে কি-না এবং এ ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কিনা, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরে আবু হাবিব যথার্থই বলেছেন, এ বিষয়টি ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।[৫৫] রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজ ও ক্ষমতার বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে অথবা অন্যান্য আইনে শুরার বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে কিনা; তাও অনুরূপভাবে ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। অতএবঃ এ বিষয় ও আলোচনার অন্যান্য প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা ইজতিহাদের মাধ্যমে নিরূপণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের উদাহরণ থেকে যার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। শুরায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই সরকার সম্পর্কে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং প্রয়োজনে সমাজের সাধারণ কল্যাণ (মাসলাহা) বা উপকারের জন্য সরকারের সমালোচনা করারও স্বাধীনতা তাদের থাকবে। ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের এ মূলনীতি শুরাকে পবিত্র কুরআনে সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কোনভাবে একে কেবল সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুরাকে মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখা উচিত।

www.pathagar.com

৫. ব্যক্তিগত যুক্তিপূর্ণ অভিমত *(ইজতিহাদ)*

শাব্দিক অর্থে ইজতিহাদ হচ্ছে শ্রমসাধ্য কোন কাজ সম্পাদনে সংগ্রাম করা বা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, সূত্রের বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ও আভাস ইঙ্গিত থেকে শরীয়ার বিধান অনুযায়ী সম্ভাব্য সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ফকিহদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হলো ইজতিহাদ। শরীয়ার সূত্র বলতে বুঝায়, কুরআন ও সুন্নাহ। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে শব্দের সরাসরি প্রয়োগের মাধ্যমে বিধান স্থির হলে সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করার কোন সুযোগ নেই। অবশ্য তাতে কেবল পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে মুজতাহিদগণ সূত্রের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমাধান পেশ করবেন।[৫৬] সুন্নাহতে বিশেষ করে মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. (মৃত্যু : ১৮/৬৩৯) বর্ণিত হাদিসে ইজতিহাদের সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে। পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতেও এর স্পষ্ট অনুমোদন পাওয়া যায়।[৫৭] শরীয়ার বিধি-বিধান অনুযায়ী ইজতিহাদ হচ্ছেঃ সমাজের সদস্যদের সম্মিলিত কর্তব্য (ফরজে কেফায়া), কতিপয় সদস্য যদি তা চর্চা করেন তাহলে সকলের জন্য এ ফরয আদায় হয়ে যায়। অতএব ইজতিহাদ কেবল প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তির অধিকার নয়, এটি করা তার দায়িত্বও। ফলাফল নয়, এজন্য প্রচেষ্টা চালানোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নের হাদিসে বলা হয়েছেঃ

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَإِنْ اَخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ.

> ফলাফল যদি ভুলও হয় তাহলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। "কোন বিচারক বা ব্যক্তি যদি রায় (হাকিম) দেয়ার সময় সঠিক রায় দেন; তাহলে তিনি দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন, আর রায় যদি ভুল হয় তাহলেও তিনি পুরস্কার পাবেন।[৫৮]

এ হাদিসে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মুজতাহিদের প্রচেষ্টায় সঠিক ফল পাওয়া যাবে অথবা ভুল সিদ্ধান্তও হতে পারে। সমমর্যাদা সম্পন্ন মুজতাহিদগণ অবশ্য একই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ বা এর বিরোধিতা করতে পারেন। তৎসত্ত্বেও উভয় ক্ষেত্রে তিনি তার মতামত দিতে পারবেন। ফলাফল সত্য বা মিথ্যা যাই হোক-তা তাৎক্ষণিকভাবে ও সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ যোগ্য নাও হতে পারে। বস্তুত এ হাদিসে ইজতিহাদের চেষ্টার জন্য পুরস্কার মঞ্জুর করা হয়েছে। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে এবং এতে কল্যাণ থাকতে পারে, আর সে কারণেই সম্ভবত পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[৫৯] এ হাদিসের অর্থ থেকে আরও বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ অভিমত ও রায়

www.pathagar.com

দিতে সক্ষম; তাকে তা প্রদানের জন্য আরও উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা সঠিক না ভুল হলো তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে এ অভিমত প্রদান থেকে বিরত থাকা তার উচিত হবে না।[৬০] এ উৎসাহদান ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছে যা কুরআনের তাফসির, বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও সুফিবাদসহ ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ও মতবৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে আল-বাহ্যি 'বলেছেন, ফিকহ'র পরিভাষায় ইজতিহাদের আরেক অর্থ হচ্ছে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ ফিল রা'ই)। সাহাবীগণের সময়েও বিশেষজ্ঞগণ (উলেমা) ভিন্নমত ও যুক্তি প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি। জায়েদান যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করার বিষয় মেনে নেয়ার ব্যাপারে ব্যাপকভিত্তিক মতৈক্য রয়েছে।[৬২]

ইজতিহাদ চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয় নিশ্চিত করতে উসূল আল ফিকহ'র বিশেষজ্ঞগণ একজন মুজতাহিদের আবশ্যকীয় যোগ্যতাসহ কতিপয় শর্তারোপ করেছেন এবং ইজতিহাদের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা নির্ধারণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে যুক্তিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় গ্রহণ অথবা অন্যদের ভিত্তিহীন সমালোচনা করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইজতিহাদ তত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইজতিহাদের ফলাফল মেনে চলা স্বয়ং মুজতাহিদ ছাড়া আর কারোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এ থেকে এটি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তিনি অবশ্যই কেবল নিজের সত্যিকার ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল-বাহি যথার্থই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অন্যথায় মুজতাহিদের জন্য তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ বাধ্যতামূলক হওয়ার অন্য কোন যুক্তি থাকতে পারে না।[৬৩] ইজতিহাদের সকল শর্ত পূরণ করে যে ফলাফল লাভ হবে, তা অলঙ্ঘনীয় এবং বিরোধিতা বা সমালোচনার কারণে এর বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না, যতক্ষণ না সর্বসম্মত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়। এর আগে কেউ এর প্রণেতার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমালোচনা করার অধিকারী হবেন না। অপরদিকে 'সত্য' উদঘাটন এবং একটি সমস্যার সঠিক সমাধান-লক্ষ্যে একজন মুজতাহিদের প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য কাজ। কেবল একটি ক্ষেত্রে তাঁর ইজতিহাদ বৈধতা হারাতে পারে, তা হল আলেম বা বিশেষজ্ঞগণের চূড়ান্ত অভিমত (ইজমা) যদি ইজতিহাদকে বাতিল ঘোষণা করে অথবা এ ধরনের ইজমার বক্তব্যে যদি কোন ব্যক্তির ইজতিহাদের বৈধতা স্পষ্টত খণ্ডিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ইজমার বিধান মেনে চলতে হবে এবং তা ব্যক্তি অভিমতের ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। তবে কেবল বাস্তবসম্মত কারণে ব্যক্তির ইজতিহাদ তার কার্যকারিতা

www.pathagar.com

হারিয়ে ফেললেও দৃঢ় ঈমান ও ইজতিহাদের শর্তাবলী মেনে তিনি তা করলে তার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্নই থাকবে। বস্তুত শরীয়া ইজতিহাদকে বৈধ ও এর বিশুদ্ধতাকে সমর্থন করেছে, মাহমাসানি যাকে ইসলামে বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম ফল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৪] যে মুজতাহিদ নিজস্ব ইজতিহাদ চর্চায় সক্ষম, ইজতিহাদের তত্ত্ব অনুযায়ী অপরের ইজতিহাদের সত্যনিষ্ঠতা ও সততার ব্যাপারে তিনি একমত পোষণ না করা পর্যন্ত তার জন্য তা অনুসরণ করার অনুমতি নেই।[৬৫] এ বিধান অনুযায়ী বিচার সংক্রান্ত নির্দেশও অবশ্যই বিচারকের (কাযী) ব্যক্তিগত ইজতিহাদ প্রসূত হতে হবে এবং কোন ক্ষেত্রে এমনটি করা না হলে এবং কাযীর কোন সিদ্ধান্ত তার নিজের রায়ের পরিপন্থি হলে তাঁর এ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিচারক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণে অথবা তার বিশ্বাসের পরিপন্থী অপর কোন ব্যক্তির ইজতিহাদ গ্রহণ করলে, তার ঐ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিচারক-কাম-মুজতাহিদ অবশ্যই সবসময় তার সত্যিকারের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবেন এবং সঠিক ও যথার্থ বলে বিশ্বাস করার পরই কেবল তিনি কোন সিদ্ধান্ত বা রায় দেবেন।[৬৬]

বিচার-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অলঙ্ঘনীয়তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা ব্যক্তিগত রায় ও বিচারকের ইজতিহাদের ভিত্তিতে দেয়া হয়ে থাকে। ইসলামি বিচার সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী সমকক্ষ কেউ কারোর ইজতিহাদ পরিবর্তন করতে পারবেননা। (লা ইউনক্বাদ আল-ইজতিহাদ বি-মিসলিহি)। একজন বিচারক তার অকাট্য সুন্দর যুক্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন রায় দিলে তিনি নিজে অথবা অন্য কোন বিচারক নতুন করে ইজতিহাদের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। ইজতিহাদের দুটি দৃষ্টান্ত একই ধরনের শক্তিসম্পন্ন বলে মনে হলে তাত্ত্বিকভাবে এর একটির ভিত্তিতে আরেকটির পরিবর্তন করার কোন যুক্তি নেই; কেননা উভয়টি ইজতিহাদের শর্ত পূরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই উভয়টি অনুমোদযোগ্য (সাইগ) ও গ্রহণযোগ্য (মকবূল)। কেবল ভিন্নমত পোষণের কারণে একটির সাহায্যে অপরটিকে বাতিল করতে গেলে আল-আমিদির অভিমত অনুযায়ী সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইজতিহাদ কেন পরিবর্তন করা যাবে না? এটা ঠিক যে, এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে ধারাবাহিক ঘটনা (তাসালসুল) ঘটবে, যাতে জনগণের স্বার্থ (মাসলাহা) লঙ্ঘিত হবে; কারণ এতে লোকদের মধ্যে বিরোধ নিরসনের পথ রুদ্ধ হবে, সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি হবে এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হবে।[৬৭] এ যুক্তির বিষয় রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারীদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বাস্তবতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, ফিকহ্ শাস্ত্রের সকল ইমামের বক্তব্যে। তাঁদের সকলেই এ কারণের ওপর ভিত্তি করে যে অভিমত বা ফতোয়া[৬৮] দিয়েছেন; তা তদন্ত বা বিশ্লেষণ না করে তাঁদের ফতোয়া হুবহু অনুসরণ করতে লোকদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ বিষয়টিকে এবং অন্যান্য মুজতাহিদের[৬৯] মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের[৭০] প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সূচক হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল গাযালি।[৭১] একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে স্বাধীনতা ছাড়া ইজতিহাদ পুরোপুরি অকার্যকর।

ইসলামি আইন শাস্ত্রের ইতিহাসের গঠন পর্যায়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত দুটি ভিন্ন ধরনের দার্শনিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তাহল : আহল আল রা'ই বা ব্যক্তির অভিমত এবং আহল আল হাদিস বা হাদিসে উল্লিখিত সুন্নাহ। এতে শরীয়ার বিকাশে ব্যক্তিগত অভিমত বা রা'ইর ব্যবহারে 'আলেমদের' ব্যাপক সমর্থনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। ইজতিহাদ বিল রা'ই বা ইজতিহাদ ব্যক্তিগত অভিমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আহল আল রা'ই-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ব্যক্তিগত অভিমত বিশেষ করে হানাফিগণ ব্যাপকভাবে রা'ই-এর বিশ্লে-ষণধর্মী যুক্তি (কিয়াস) ও বিচারের অগ্রাধিকার (ইসতিহসান)-এর ব্যাপক ব্যবহারের ওপর নির্ভর করেন। এগুলো হলো ইজতিহাদের অধিকতর সুশৃঙ্খল ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতি: যা শরীয়ার বিকাশের মাধ্যম হিসেবে রা'ই'র ব্যবহারের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় হাদিস বিশেষজ্ঞগণের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও; কিয়াসের মৌলিক বৈধতার বিষয় সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যাপকার্থে বিচারের অগ্রাধিকার (ইসতিহসান), জনস্বার্থ বিবেচনা (ইস্তিসলাহ বা মাসলাহা) এবং সম্ভাবনীয় ধারাবাহিকতা (ইজতিসাহাব) অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের আবশ্যকীয় বৈধতায় ইজতিহাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সকল বিষয়কে উসুল আল ফিকহ'র আইন সংক্রান্ত তত্ত্বের মধ্যে সমন্বিত করা হয়েছে। এ ভিন্ন ভিন্ন মূলতত্ত্বের অভিন্ন দিক হলো: এগুলোর সবই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর এবং ব্যাপকভাবে অভিমত (রা'ই) এর উপর নির্ভরশীল। তাদের সকলেই এ মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হন যে, শরীয়ার বিধি অনুযায়ী সকল যুক্তিসঙ্গত উপায়ে জনগণের কল্যাণ ও সমাজের বৈধ চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা চালান কেবল তাদের অধিকারই নয়; তাদের দায়িত্বও বটে। এক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাওয়া গেলো বা না গেলো তা ধর্তব্যের বিষয় নয়।

www.pathagar.com

বিষয় অনুযায়ী ইজতিহাদ চর্চা করা যেতে পাওে; যা নিম্নোক্ত দু'টি শ্রেণীর যে কোনো একটির মধ্যে পড়বে।

ক. সমসাময়িক বিষয়ক যা তাৎক্ষণিকভাবে ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। খাল্লাফ এ ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন এবং ঘৃণা বিদ্বেষ, বৈরিতা সৃষ্টি অথবা বিদ্রোহে ইন্ধ যোগানর মতো বিষয় ছাড়া তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

খ. ধর্মীয় ও আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে একমাত্র যে শর্তটি মেনে চলা প্রয়োজনঃ তা হল বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়ার মৌলিক নীতিমালা ও লক্ষ্য লঙ্ঘন করা যাবে না। চতুর্থ হিজরি থেকে একাদশ হিজরি পর্যন্ত ইজতিহাদের সূচনা ও বিকাশকালের এ সময়পর্বে এ নীতি সাধারণভাবে অনুসৃত হয়। এরপর ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়ার বিষয় জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তবে কিছুটা বিতর্ক থেকে যায়। ইজতিহাদের সমাপ্তি ও নির্বিচার অনুকরণ (তাকলিদ) এর সূচনা হয়েছে বলে বর্ণনার জন্য এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে করা হয় যে, শরীয়া পুরোপুরি উন্মোচিত ও বিকশিত হয়েছে, সব প্রশ্নের যথারীতি অনুসন্ধান করে উত্তর জানা হয়ে গেছে, তাই পরবর্তী প্রজন্মের আলেমদের কর্তব্য হলো শীর্ষস্থানীয় ইমামদের প্রণীত বিধিবিধান ও আইন অনুসরণ করা এবং নতুন করে ইজতিহাদের চেষ্টা পরিহার করা। তথাকথিত "দরজা বন্ধ" হয়ে যাবার দাবি অবশ্য অতিরঞ্জিত হতে পাওে; কেননা সবসময়ই বলা হয়ে থাকে যে, ইজতিহাদ কখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তা না হলেও, ইজতিহাদ যে ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে সম্প্রসারিত বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা সৃষ্টি রোধে কি তৎকালীন আলেমগণ স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন?[৭২] অন্য কথায় বলা যায়, ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সৃষ্ট পরিবেশের অথবা শরীয়ার-মানস নির্ধারণ ঘোষণার কারণে কি ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়? এর উত্তর হয়ত প্রথমটি হবে। একজন পর্যবেক্ষক বলেন, 'ইজতিহাদের দরজা তথাকথিত বন্ধের মাধ্যমে তা

www.pathagar.com

পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে নীতি পরিবর্তনের জন্য নয় যে, ইজতিহাদের ওপর এক ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।[৭৩] তাই নীতিগতভাবে এই কথিত দরজা বন্ধের বিষয় আলেম ও বিশেষজ্ঞ এবং মুজতাহিদদের নতুন নতুন সমস্যা নিরসনে ইজতিহাদ করার স্বাধীনতার বৈধ অধিকারে কোন বাধা হতে পারবে না।

৬. সমালোচনার স্বাধীনতা *(হুররিয়াত আল-মু'য়ারাদাহ)*

শরীয়ার বিধান অনুযায়ী জনগণকে সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা করা ও পর্যবেক্ষণের (হুররিয়াত আল-মু'য়ারাদা যা হুররিয়াত আল-নাকদ আল-হাকিম বলেও পরিচিত) নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সরকার আইন লঙ্ঘনের মতো অপরাধ করলে, জনগণ তাকে আন্তরিক উপদেশ দেবে ও গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে, এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ে আনুগত্য করতে অস্বীকার পর্যন্ত করতে পারবে। পবিত্র কুরআনের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের নির্দেশের (আল-আমর বি'ল মা'রুফ ওয়া-ল নাহি 'আন আল-মুনকার) মূলনীতি প্রত্যেক ব্যক্তি শরীয়ার বিধান লঙ্ঘন বা শঠতা হতে দেখতে পেলে অথবা তা ঘটতে পারে বলে মনে করলে, তিনি তার সমালোচনা করতে এবং পরিবর্তন সাধন অথবা সংশোধন করতে পারবেন। ইসলামি সরকার পদ্ধতিতে মু'য়ারাদা হচ্ছে একটি মৌলিক নীতি। জনাব আফিফী লিখেছেন, 'এ নীতি ব্যক্তিকে সত্য কথা বলা এবং শরীয়াতের বিধান লঙ্ঘনের বিষয় প্রকাশ করে দেয়ার অধিকার প্রদান করেছে, তাতে যদি ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা বুঝায়, তাহলেও।'[৭৫]

কুরআন-সুন্নাহ'র বিধান অনুযায়ী এ অধিকার আমর বিল-মারুফ ওয়াল নাহি আন আল-মুনকার এর অনুরূপ, যা হিসবাহ নামেও পরিচিত।[৭৬] হিসবাহ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় ইত:মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এ নীতির গুরুত্বের ব্যাপারে কুরআনে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য এসেছে, এ বিষয়টি একজন মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অপরিহার্য শর্তে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের মূল বক্তব্য হলো: এ বিষয়টি এবং সুন্নাহতে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের নিয়মাবলী বিধৃত হয়েছে। এভাবে কুরআন হিসবাহ ও মু'য়ারাদা'র ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমমর্যাদা দিয়েছে। সরকারি নেতা, কোন নাগরিক অথবা যে কেউ অপরাধ করুক না কেন, এ বিধান লঙ্ঘনের বিরোধিতা ও নিন্দা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই রয়েছে।

এহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে মু'য়ারাদার অনুমোদন পাওয়া যায়। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ রা. এবং খোলাফায়ে রাশেদার

www.pathagar.com

জীবনে এর বহু উদাহরণও পাওয়া যায়। এক. যেমন এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উমার ইবন খাত্তাব রা. চুক্তির কতিপয় ধারার সমালোচনা করেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, ঐ ধারাগুলো মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। তিনি আরও প্রবীণ সাহাবী আবু বকর রা:-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন; কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এবং অবশেষে রাসূল সা: এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কঠোর সমালোচনামূলক অভিমত তুলে ধরলেন। রাসূল সা: উমারের বক্তব্য শুনলেন এবং জবাব দিলেন।[৭৭] আমরা হাদিসে আরও দেখতে পাই যে, রাসূল সা: ঘোষণা করেছেন:

افضَلَ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

'কোন স্বৈর শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।'[৭৮]

খলিফা নির্বাচিত হবার পর অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রথম খলিফা আবু বকর রা: বলেছিলেন, 'হে জনগণ, আমাকে আপনাদের ওপর কর্তৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অথচ আমি আপনাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমি সঠিক পথে থাকলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, ভুল করলে, শুধরে দিবেন।'[৭৯] এ বক্তব্যকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার আমন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে উৎসাহদান বলে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়। যেমনটি 'আবু হাবিব বলেছেন, আবু বকরের বক্তব্যে যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এ আভাস দেয়া হয়েছে যে,আত্মসমালোচনা কেবল সরকারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যই কল্যাণকর তা নয়; উপরন্তু একটি দায়িত্বশীল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণও।'[৮০]

দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবন খাত্তাবের জীবনে মু'য়ারাদা'র বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথম খলিফা আবু বকরের পদাংক অনুসরণ করে দ্বিতীয় খলিফা উমারও তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে জনগণের উদ্দেশে বলেন, যদি তাঁরা তাঁকে নীতি থেকে বিচ্যুত হতে দেখেন, তাঁহলে তাঁরা যেন তাকে সংশোধন করে দেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে বিচ্যুত হতে দেখলে আমরা আমাদের তরোবারি দিয়ে তা ঠিক করে দেবো'। একথা শুনে খলিফা আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, এমন লোকও রয়েছেন যারা ন্যায়ের পক্ষে এগিয়ে আসবেন এবং খারাপ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবেন।[৮১] দৃশ্যত মহরানা সংক্রান্ত অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, খলিফা লোকদেরকে অতিরিক্ত মহরানা ধার্যের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন। ফাতিমা বিনতে কায়েস নামক একজন

www.pathagar.com

মহিলা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তার যুক্তির পক্ষে মহরানা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের (৪:২০) উদ্ধৃতি দেন। উত্তরে উমার বলেন, 'ওই মহিলাই সঠিক। উমার সঠিক নয়।'[৮২]

আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি উমার রাঃ এর কাছে এসে অনেকটা তাঁকে থামিয়ে রেখে বললেন, "ওহে উমার, আল্লাহকে ভয় কর।" সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি লোকটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খলিফার সামনে তিনি আদবের খেলাপ করছেন, কিন্তু "উমার জবাবে বললেন, 'এভাবে তারা (জনগণ) যদি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে না দেন; তাহলে কোন কল্যাণ হবে না এবং আমরা যদি তাঁদের কথা না শুনি তাতে কোন কল্যাণ হবে না।"[৮৩]

আল সিবা'ই'র হিসাব মতে, আবু বকর ও উমার ইবন খাত্তাব রাঃ এর উদাহরণে সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সমালোচনা করার জনগণের অধিকারের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাস্তবতা এই যে, তাঁরা এমন সমালোচনা শুনেছেন এবং প্রায়ই এতে সাড়া দিয়েছেন, এ বিষয় ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[৮৪] আরেকজন পর্যবেক্ষকের মতে, বাক ও মতামত এবং প্রকাশের স্বাধীনতা মুসলমানরা তাদের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগ থেকেই ভোগ করে আসছিলেন এবং এ ব্যাপারে প্রেরণাদায়ক অনেক উদাহরণ রয়েছে। তৎকালীন ইসলামি সরকারগুলো এ স্বাধীনতাকে তেমন একটা সঙ্কুচিত বা খর্ব করেনি।[৮৫] খোলাফায়ে রাশেদার যুগের মু'য়ারাদাহ'র এসব ও অন্যান্য উদাহরণের ভিত্তিতে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তা কি করছেন এবং কি করতে অবহেলা করছেন, তা পর্যবেক্ষণ করার অধিকার ইসলাম জনগণকে দিয়েছে।[৮৬] মুহাম্মদ খিযর আল হুসাইন আরও জোরালো ভাষায় বলেন, "রাষ্ট্রপ্রধান ও তার কর্মকর্তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন এবং তাদের ওপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তা সম্পাদনে অবহেলা করতে দেখলে তাদেরকে সতর্ক করা সমাজের দায়িত্ব।"[৮৭] আল কাসিমি লিখেছেন, 'একথা বলা খুবই স্বাভাবিক যে বাকস্বাধীনতা না থাকলেমু'য়ারাদা'র অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার (হুররিয়াত আল-রা'ই) সঙ্গে একত্রে কার্যকর থাকে এবং কোন সরকার পদ্ধতি সাংবিধানিক স্বাধীনতার সুরক্ষার ব্যবস্থা না করলে এটি আর কার্যক্ষমথাকতে পারে না। তবে কোথাও কখনও এ ধরনের স্বাধীনতা বিরাজ করলে মু'য়ারাদা মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বাভাবিক উপায় হিসেবে কাজ করে।[৮৮] মুহাম্মদ সাদিক আল-আফিফি এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে, সমালোচনার অধিকারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন ধরনের সংশয় থাকতে পারবে না। এটি নিছক বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা নয় অথবা বর্তমান

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলগুলোর উদাহরণে পরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিরোধিতা হিসেবেও এটিকে গ্রহণ করা যাবে না।[৮৯] একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল তার নিজের অস্তিত্বের জন্য বিরোধিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমসাময়িক রাজনীতির বাস্তবতা এ বিরোধিতাকে উৎসাহিত করে; যা সম্ভবত ভারসাম্যহীন হয়ে থাকে। এ ধরনের বিরোধিতাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। হাদিসে মুসলমানদের নিম্নোক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'চরিত্রের দিক থেকে দুর্বল (ইম্মা'আহ) হয়ো না।' আরও বলা হয়। 'জনগণ সঠিকভাবে কাজ করলে আমরাও সঠিকভাবে কাজ করবো এবং তারা যদি অন্যায়ভাবে কাজ করে আমরা অনুরূপ কাজ করবো ...।'[৯০] সৎ কাজে অংশগ্রহণ, নিজ উদ্যোগে অথবা অন্যদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী যেভাবেই হোক না কেন, সাধারণত তা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে; কিন্তু কোন সৎকাজ যদি অন্যদের প্রদর্শনীর জন্য করা হয়, তাহলে তাতে শিক্ষণীয় তেমন কিছু থাকে না। দুর্বল চরিত্রের বা ইম্মাহ'আর উদাহরণ হলো: কোন কারণ ছাড়া কেবল অন্যদের দেখাদেখি কারোর নিন্দা বা প্রশংসা করা। খলিল একে বিশেষ করে কোন ব্যক্তির মর্যাদার জন্য হানিকর ও অশোভন বলে উল্লেখ করেন, কেননা সত্যিকার "বিশ্বাস ও ঈমান থেকে অনুকরণের বিষয় উৎপন্ন হয় না। ইম্মা'আহ হচ্ছে এমন এক অবস্থা যাতে কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে, যা সে বিশ্বাস করে না, অথবা এমন কিছু সে বিশ্বাস করে; কিন্তু তা সে বলতে পারে না।[৯১] উদ্ধৃত হাদিসটির দ্বিতীয় অংশে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুমিনদের প্রতি নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে :

لاَتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ حَسُنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا،
وَلَكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ تُحْسِنُوْا-وَاِنْ اَسَاؤُوا فَلاَ تَفْعَلُوْا .

বরং তোমরাই মনস্থির কর। লোকেরা ভালো কিছু করলে তোমরাও তা কর; তবে তারা অন্যায় কিছু করলে তোমরা তা করো না।

মু'য়ারাদা'র সঠিক চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্বশীলতার সর্বোচ্চ বোধের পরিচয় দান হচ্ছে: সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক। তদুপরি লিখিত বা মৌখিক যে কোন সমালোচনার সাফল্য নির্ভর করে সমালোচকের আন্তরিকতার ওপর। আরেকটি হাদিসে সুস্পষ্টনির্দেশ দেয়া হয়েছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ....

'তোমাদের সকলেই এক একজন রাখাল (রা'ই), সকলেই (তাদের 'হেফাজতে যা আছে সে ব্যাপারে) দায়িত্বশীল।'[৯২]

www.pathagar.com

অন্য কথায় প্রত্যেকেই জবাবদিহির যোগ্য; কেউই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় এবং নসিহার চেতনা নিয়েই সব ধরনের সমালোচনা করা উচিত।

উপরন্তু সমালোচনার স্বাধীনতাকে কোনভাবেই অনৈক্য বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি অথবা নিজের অবস্থার উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সার্বিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে সত্য উদঘাটন এবং আচরণের সঠিক পদ্ধতি অনুসন্ধানে সমালোচনার স্বাধীনতার আইনসম্মত প্রয়োগ আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, সন্দেহের ভিত্তিতে কোন অবস্থায় সমালোচনার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা যাবে না; কারণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সংশয় ও সন্দেহ-উভয়ই পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কৃত সমালোচনার বৈধতা নিশ্চিত করতে হলে, অন্তত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। তা হলো :

ক. যে ঘটনা ও কারণের ওপর ভিত্তি করে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা প্রতিষ্ঠা ও যাচাই করা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে সাধারণ অপরিহার্য শর্ত বিবৃত হয়েছে। এতে ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

> 'কোন ফাসিক (অসৎ) ব্যক্তি তোমার কাছে এসে কোন খবর দিলে, তার যথার্থতা যাচাই করে দেখবে, অন্যথায় অনিচ্ছাকৃতভাবে তুমি মানুষের ক্ষতিসাধন করবে এবং এরপর কৃতকর্মের জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে' (৪৯:৬)।

এভাবে কুরআন কোন সিদ্ধান্তে পৌছার আগেই, প্রথমে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার শর্তারোপ করেছে। তা না হলে খবরটি ভিত্তিহীন ও অনুশোচনাযোগ্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। একই সূরার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। যাতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

> "সন্দেহ-সংশয় (জান) পরিহার কর, কেননা কিছু কিছু বিষয়ে সন্দেহ করা পাপ।" (৪৯:১২)।

একারণে উপযুক্ত প্রমাণবিহীন ভাবে অন্যদের কথা ও আচরণের বিষয়ে সন্দেহ পরিহার করা উচিত। অবশ্য এ আয়াতে সব ধরনের সন্দেহ করা নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত কারণের ভিত্তিতে সন্দেহ (যন্ন) করা হলে, সে

www.pathagar.com

ব্যাপারে অবশ্যই সমালোচনা করা যেতে পারে। এ ধরনের সন্দেহকে সত্যের সন্নিকটে বলে গণ্য করা হয় এবং প্রায়ই একে অনুমোদিত সন্দেহ (আল-যন্ন আল-মুবাহ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৯৩] সমালোচনার কারণ নিরূপণের শর্তে বলা হয়েছে যে, ঘটনা অবশ্যই তদন্তকারীর ক্ষমতার আওতাধীন থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا .

'আল্লাহ কারোর ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।' (২:২৮৬)

অতএব কোন ব্যক্তি তার ক্ষমতা ও উপলব্ধির সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ঘটনা তদন্ত করলে, তা স্বাভাবিকভাবেই কিসের ভিত্তিতে সে সমালোচনা করেছে; তা প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। পবিত্র কুরআনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা কুরআন থেকে জানতে পেরেছি, আল্লাহর নবী মূসা আ: সুপরিকল্পিতভাবে একটি গরিব পরিবারের উপার্জনের একমাত্র সম্বল নৌকাটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য তার শিক্ষক খিয্‌র আ: এর সমালোচনা করেন। কুরআনে এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে : 'মুসা খিয্‌রকে বললে না;

قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا .

"আপনি নৌকাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলেন এজন্যে যেন সকল আরোহীকেই ডুবিয়ে দিতে পারেন? আপনার এ কাজটি তো বড় অসুবিধাজনক?" যাত্রীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যই কি আপনি নৌকাটি ভেঙ্গে ফেলেছেন? সত্যি কি আপনি একটি বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করেছেন? (১৮:৭১)।

তবে একে সঠিক কারণের ভিত্তিতে যথার্থ সমালোচনা বলা যায়। মূলত তিনি দৃশ্যত সীমা লঙ্ঘনের একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মূসা আ: অজ্ঞ ছিলেন, কেবল খিয্‌র আ:ই তা জানতেন। তিনি মূসাকে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলেন যে, এখানে যে রাজা আছেন তিনি যেসব ভাল নৌকা দেখতে পাবেন তার সবকটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাবেন। তাই তিনি (খিয্‌র) নৌকার তলায় একটি ছিদ্র তৈরি করে সেটিকে দখলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ উদাহরণ থেকে জানা যায়, সমগ্র ঘটনা মূসার জানা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমালোচনার কারণ সঠিক ছিল।

খ. সমালোচককে তার অভিমতের নৈতিক যথার্থতার ব্যাপারে অবশ্যই দৃঢ় আস্থাশীল থাকতে হবে। তাই কোন ব্যক্তি যা বলছে তা সত্য নয় বলে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত সে অবশ্যই তা বলা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় সে প্রতারণা বা

www.pathagar.com

মিথ্যা বলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। ইসলামে উভয়টিই নিষিদ্ধ। প্রথমটি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

'প্রতারকেরা (মোনাফিক) দোযখের সর্বনিম্নে অবস্থান করবে, (৪:১৪৫)।'

'এবং দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গে কুরআ: মুমিনদেরকে বলা হয়েছে।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

'মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে' (২২:৩০)।

অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সঠিক বলে বিশ্বাস করে সমালোচনাপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করে এবং সেক্ষেত্রে তা যদি সঠিক নাও হয়, তাহলে সে দোষী বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার সমালোচনার লক্ষ্য অর্জনে তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, এজন্য তাকে দোষারোপ করা হবে না কারণ সে সঠিক বলে বিশ্বাস করেই এটি করেছে। হাদিসে এ অন্তর্নিহিত বক্তব্য ফুটে উঠেছে:

مَنْ خَاصَمَ فِىْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللهِ حَتّٰى يَنْزِعَ .

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর রোষানলে পড়বে।

বিভিন্ন অর্থবোধকতার (মাফহুম আল-মুখালাফাহ্) আলোকে এ হাদিস থেকে বিষয়টি বোঝা গেছে যে :

কোন ব্যক্তি যদি একথা না জানে যে, সে ভুল কাজে লিপ্ত রয়েছে; তাহলে সে তিরস্কৃত হবে না।[৯৫]

গ. সমালোচনা অবশ্যই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এর অর্থ হল, উপলক্ষের সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ ও সমালোচনার ধরনের অবশ্যই সঙ্গতি থাকতে হবে। এটি অবশ্যই অতি কর্কশ হবে না; আবার অতি ক্ষীণও হবে না, এটি অবশ্যই ভদ্রোচিত ও কার্যকর হতে হবে। মাত্রাগত দিক থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি মাত্র সমালোচনা কি যথেষ্ট হবে? না বারবার ও স্থায়ীভাবে তা করতে হবে? নীতিগতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, বিশেষ করে যখন কোন সমালোচনায় ভাল ও কল্যাণকর হতে পারে বলে বিবেচনা করে বিনয়ের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বস্তুত যখন সমালোচনার লক্ষ্যে এমন বিষয়ও থাকে,

www.pathagar.com

যা ইসলামি মূল্যবোধের পরিপন্থী (আল-মুনকার) সেক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার সুপারিশ করা হয়েছে যতক্ষণ না সমালোচনার সুফল পাওয়া যায়। এতে ইত:পূর্বে উল্লিখিত হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, যা হিসবাহ'র তিনমাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে, তার উচিত হবে হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করা, তা করতে সক্ষম না হলে কথার মাধ্যমে তাকে তা পরিবর্তন করতে হবে, তাও করতে অসমর্থ হলে, তাকে তখন মনে মনে অন্যায় কাজকে ঘৃণা করতে হবে-তবে এটি হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।[৯৬]

উপরিউক্ত হাদিসে অব্যাহত প্রচেষ্টার উৎসাহদান করা হয়েছে, এমনকি অন্যায় কাজ রোধে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা পরিবর্তন করাও যাবে। অবশ্য হাদিসটির মূল বক্তব্য হচ্ছে: মুমিন লোকদের যখন কোন অন্যায় কাজ পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতা থাকবে তখন তাদেরকে এ ধরনের কাজের ব্যাপারে না দেখার ভান করা উচিত হবে না। হাদিসটিতে পরিস্থিতির আলোকে চাহিদা অনুযায়ী মুনকার রোধের পদ্ধতি, ধরন ও তীব্রতা নির্ধারণের বিষয়ও অভিব্যক্ত হয়েছে। উদ্দিষ্ট সমালোচনার ভাষা বা পদ্ধতি প্রয়োগ করার আগেই স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি ও ধরন নির্ণয়ের জন্য সমালোচকের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কতিপয় বিচার বিশ্লেষণ ও নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োজন।

শরীয়ার আরেকটি মূলনীতির ভিত্তিতে সমালোচনার অধিকারের যথাযথ চর্চার বিষয় অনুসৃত হয়। তাহলো, বৈধতার মূলনীতি: (আসল আল-সিহ্হা) যদিও এ মূলনীতির মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে, লোকদেরকে সংশয়ের সুফল লাভের সুযোগ প্রদান করা, ইসলাম লোকদের কথা ও কাজ সত্য ও বৈধ বলে নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে চায়, যতক্ষণ না তা সঠিক নয় বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না যায়। আমরা এখন এ মূলনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

সঠিক বলে মেনে নেয়া *(আসল আল-সিহ্হা)*

এটি ধরে নেয়া হয় যে, একজন মুসলমানের কথা ও কাজ সঠিক ও বৈধ, যতক্ষণ না তা এর বিপরীত বলে জানা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি কোন কথা বললেন, লেনদেন করলেন অথবা কোন ইবাদত বন্দেগি করলেন কিন্তু সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে এগুলো সঠিক হলো কিনা-সঠিক বলে মেনে নেয়ার নীতির আলোকে যে কথা ও কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে; তা যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত; তাকে সঠিক বলে মনে করতে হবে। শাফি মাযহাবের

www.pathagar.com

ফকিহ তাজ আল দিন আন সবকি'র অভিমত হলো "আমাদের নীতি (আল-আসল ইন্দানা) হলো যে, আমাদের কারো কাজ অবশ্যই শরীয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। তাই শরীয়ার আহকাম অনুযায়ী সন্দেহজনক বিবেচনা করার (আল-তুহমাত) কোন অবকাশ নেই, কেননা তা অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল। শরীয়ার আহকাম সঠিক কারণ সম্পর্কে (আল-আসবাব আল জাল্লিয়াহ) চিন্তা করে এবং এতে কোন গোপন অর্থ (আল-মনি আল-খাফিইয়াহ) প্রকাশ করে না। তাই নিয়ম অনুযায়ী কারোর কথা বা কাজ ভুল বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা সঠিক বলেই গণ্য করতে হবে।[৯৭]

আল-সুবকি আরও বলেন, ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন কাজের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে, এ যুক্তিতে তা সঠিক নয় বলে মনে করতে হবে যে, এতে সঠিক ও ভুলের মধ্যে (আল সিহ্হা ওয়া'ল ফাসাদ) দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে আর তাতে ভুলটিই বহাল থাকতে পারে।

ইমামী শিয়াসহ শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে : সত্যের স্থান সন্দেহের উপরে। The Mejelle (Art-74)-এ লিখিত এক আইনগত প্রবচনে আরেকটি উক্তিকে সঠিক বলে মনে করার বিষয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, সন্দেহের কোন বৈধতা নেই (লা 'ইবরাহ লি'ল–তাওয়াহহুম)। যথার্থ বলে মনে করার মৌলিক অনুমোদন প্রসঙ্গে আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াতের উল্লেখ করতে পারি, যাতে ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, 'বেশি বেশি সন্দেহ পোষণ পরিহার করতে, কেননা কিছু কিছু সন্দেহ আছে যা গুনাহর কাজ' (৪৯:১২)। এ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ এবং খারাপ উদ্দেশ্যে অপরের কথা ও কাজের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে ঈমানদারদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'লোকদের কাছে উত্তম কথা বল' (১১:৮৩)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে, বক্তব্য দান ও তা প্রয়োগের স্বাধীনতায় অপরের প্রসঙ্গ এলে সব সময়ই শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করতে হবে। এভাবে পবিত্র কুরআনে মানব আচরণের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে। উভয় বিষয় অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। মহান আল্লাহতা'আলা মানবজাতিকে যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, সে আলোকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই বিনয়পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

www.pathagar.com

সঠিক বলে মনে করার সমর্থনে হাদিসে আরও প্রমাণ রয়েছে। রাসূল সা: একজন মুসলিম কি বলেন অথবা করেন সে ব্যাপারে অপর মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেন :

اذا بلغك عن اخيك شئ فاحمله على احسنه حتى لم تجد له محملا .

> তোমার কোন ভাই এর পক্ষ থেকে তোমার কাছে কোন কথা পৌঁছুলে, তুমি তাকে উত্তম (ব্যাখ্যা) বলে গণ্য করবে; যতক্ষণ না তুমি অনুরূপ করতে না পারবে।[৯৮]

আলী ইবনে আবু তালিব রা: তাঁর এক বক্তব্যে এ হাদিসের মূল বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে মুমিনদেরকে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ মেনে চলার উপদেশ দেন :

> তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সর্বোত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে, যতক্ষণ না তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে, তোমার ভাই যা বলেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না এবং তার একটি ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেয়ার উপায় খুঁজে পাবার চেষ্টা তারপরও করবে।[৯৯]

সঠিক বলে মনে করার সাথে অনুমান সম্পর্কিত অপর একটি ইসলামি আইন: দৃষ্টান্ত স্বরূপ চলমানতার আইন (ইস'তিশাব) বহাল থাকায় এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললে চলবে না, উভয় বিষয় অনুরূপ মনে হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসতিশাবের মূলনীতিতে পরিবর্তন হবার মতো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিরাজমান অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যকথায় ইস'তিশাব বলতে এমন ঘটনা, আইনের শাসন বা উপাত্ত বুঝাচ্ছে যা পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব থাকলে তা অপরিবর্তনীয় থেকে যাবে।[১০০] বৈধ বা সঠিক বলে গণ্য করার সাথে ইস'তিশাবের পার্থক্য হলো: আসল আলসিহ্হা অতীতের সঙ্গে বর্তমানে সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট নয়। অন্য কথায় সঠিক বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি অবস্থান বজায় রাখা নয়, শুধুমাত্র সঠিক কিনা, তার সাথে সংশ্লিষ্ট। উপরন্তু তা ইস'তিশাবের মতো দু'টি পরিস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট নয়, সঠিক বলে মনে করার বিষয়, কোন অবস্থায় বিষয়টি যথার্থ বলে গণ্য হবার ক্ষেত্রে সন্দেহের সুফল লাভ এবং একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আশাবাদী অথবা অনুকূল রায় ঘোষণা।

কোন ব্যক্তির তার অধিকারে থাকা কোন বস্তু বা সম্পত্তি তিনি বৈধভাবে কি অবৈধ উপায়ে অর্জন করেছেন; সে সম্পর্কেও সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের সংশয়ের জবাবে সঠিক বলে ধারণা করে তার অধিকার থাকা সম্পত্তি

www.pathagar.com

বৈধভাবে অর্জিত বলে মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে নিছক সন্দেহবশত ব্যক্তি চরিত্রের অখণ্ডতায় অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজের বৈধতায় হস্তক্ষেপের কোন অনুমোদন নেই। উপরন্তু এ ধরনের সন্দেহ ও সংশয়কে গুরুত্ব দেয়া হলে দৈনন্দিন কাজকর্ম ও লেনদেনে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে।[১০১]

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, কোন ব্যক্তি যখন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে উদারহস্তে দান করেন, কিছু লোক তার এ দানকে হীন স্বার্থ প্রণোদিত,ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বলে সন্দেহ ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যখন কোন নির্দিষ্ট মত বা পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন অথবা অপর কোন ব্যক্তির সমালোচনা করেন এবং এতে ইতিবাচক ব্যাখ্যা থাকলেও সমালোচকরা এর মধ্যে তার অসৎ উদ্দেশ্য থাকা ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারেন। অথচ এ সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখতে হবে, সঠিক সংক্রান্ত ধারণা মূলনীতিতে এমনটি করারই সুপারিশ করা হয়েছে।[১০২]

নেতিবাচক দিকের পরিবর্তে ইতিবাচক বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের উপদেশ দানের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও আস্থা জোরদারে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এর পিছনে কোন অশুভ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করার কোন যথার্থ প্রমাণ না থাকলেই কেবল তা হতে পারে। তৎসত্ত্বেও সঠিক বলে গণ্য করার মূলনীতি সন্দেহ উদ্রেককারী কথা ও কাজের সন্দেহের সুফল লাভের সুযোগ করে দিয় থাকলে তবে মূলত কোন অশুভ উদ্দেশ্যবিহীন নিছক রায়ের ত্রুটির কারণে তা হয়ে থাকে।

উপরন্তু সঠিক বলে মনে করার মূলনীতি ইবাদত বন্দেগির বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করার অনুমোদন আমাদেরকে দেয়নি। ইমাম জাফর আল-সাদিক এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'সন্দেহের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে দুর্বল মানসিকতার লক্ষণ।'[১০৩] এক ব্যক্তি তার ওযূ ও নামাযে ত্রুটি হয়েছে বলে সন্দেহ করে বার বার ওযূ করেন এবং নামায পড়েন।' এ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন বলে জানা গেছে। ইমাম জাফর সাদিক লোকটির এ সন্দেহকে "শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করে বলেন, এটি শুধু তার দক্ষতা ও সতর্কতাকে দুর্বল করে ফেলছে।"[১০৪]

এরপরও প্রশ্ন রয়ে গেছে যে, সন্দেহজনক ও প্রশ্নের যোগ্য চরিত্রের ব্যক্তিসহ প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঠিক ধারণার মূলনীতি প্রযোজ্য হবে কিনা? যারা তাদের অশুভ উদ্দেশ্য গোপন করে রাখে তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তাহলে কিভাবে

www.pathagar.com

রক্ষা পাবো? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, সঠিক বলে ধারণা করার মূলনীতিতে ন্যায়বিচার এবং মধ্যপন্থা ও সংযমশীলতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নিছক সন্দেহবশত: তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সঠিক বলে গণ্য করার মূলনীতিতে সুস্পষ্ট যুক্তি অথবা বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতির যে লক্ষণ প্রকাশ পায়; তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। স্বাভাবিকভাবে আমরা একথা মনে করি বা প্রত্যাশা করি যে, সঠিক বলে প্রতীয়মান পরিস্থিতিতে ভাল বা মন্দ থাকবে, যদিও মাঝে মাঝে আমরা আশাভঙ্গে বিস্মিত হই, কারণ ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে অভ্রান্ত কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের হাতে নেই।[১০৫] সঠিক বলে ধারণার মূলনীতিতে সংযম ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে; যাতে কেউ কারোর কাজ খারাপ বা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে তাকে সন্দেহ বা পূর্ব ধারণাবশত দোষী সাব্যস্ত করতে না পারে। এছাড়া এ নীতি সচেতনতাকেও উৎসাহিত করে। যে কোন কাজ বা বিবৃতিতে কোন বিষয় লুকায়িত থাকতে পারে এবং কেবল বাহ্য দৃশ্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়, তদন্তের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সঠিক বলে গণ্য ধারণার মূলনীতি অথবা যা দেখেছি সে ব্যাপারে অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কেবল উৎসাহিত করা হয়নি; উপরন্তু অনুকূল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত কোন ধরনের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত না নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ফকিহগণ এ সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি অন্যদের কথা ও কাজ থেকে কল্যাণ পাবে না বলে ধরে নিলেও; তার জন্য বিরোধিতা করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, যতক্ষণ সন্দেহ বা ভাল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা অপসারিত না হয়।

এমন এক পরিস্থিতির উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে, এক ব্যক্তি যেতে যেতে কিছু কথা উচ্চারণ করলো-যা গালমন্দ না সম্ভাষণ, শ্রোতা তা বুঝতে পারলো না। সঠিক ধারণা পোষণের নীতি অনুযায়ী এসব কথাকে গালি বলে মনে করা অথবা সম্ভাষণ বলে বিবেচনা করাকে সমর্থন করে না, তাই তার জবাব দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এখানে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা হলো, অতি সামান্য পরিমাণে হলেও ইতিবাচক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত নেতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত হবে না। শেষাবধি সঠিক বলে ধারণার নীতিতে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোন কাজ বা কথাকে খারাপ বলে মনে হলেও; তার একটা লঘু ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে এবং এর পূর্ব পর্যন্ত একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হবে, আর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংযমী হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি দৃশ্যত আপত্তিকর বক্তব্য দিলো, প্রকৃতপক্ষে তা

www.pathagar.com

সত্যও। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সুপরিকল্পিতভাবে ইচ্ছাকৃত ভুল কথা উচ্চারণ করা হয়েছে; না-কি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষতিকর বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা সাধারণত গুনাহর কাজ অথচ এক ব্যক্তিকে দিনের বেলায় খাবার খেতে দেখা গেল। এক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে, লোকটি হয়ত অসুস্থ অথবা মুসাফির। উভয় ক্ষেত্রে রোযা ভাঙার অনুমতি রয়েছে। কারোর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই সম্ভাব্য বৈধ কোন পথ খোলা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এভাবে সঠিক ধারণার নীতির অনুসরণ সমাজে শুভেচ্ছা ও আস্থা বৃদ্ধি করে। এছাড়া এ নীতি ব্যক্তিকে ভিত্তিহীন তথ্য থেকে রক্ষা করে এবং লোকদেরকে তড়িঘড়ি করে অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা থেকে বিরত রাখে।[১০৬]

৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা *(হুররিয়াত আল-রা'ই)*

বাকস্বাধীনতার সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: মত প্রকাশের স্বাধীনতা কারণ এর সাথে ঘটনার সাধারণ বর্ণনা বা রসাত্মক বিবরণদান বা কল্পিত কাহিনী বলার মতো অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় প্রকাশের সম্পর্ক থাকতে পারে। বিশেষ করে কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে হলে এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্টতা, প্রতিশ্রুতি ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন; যাতে কেবল ঘটনার বাস্তব বিবরণ থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। 'বাক স্বাধীনতা' বুঝাতে অধিকতর নিকটবর্তী 'হুররিয়াত আল-কাওল' শব্দের পরিবর্তে যে হুররিয়াত আল-রা'ই ব্যবহার করা হয়েছে; তার আংশিক ব্যাখ্যা হয়ত করা যেতে পারে। হুররিয়াত আল-রা'ই এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে: মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামি বিশেষজ্ঞ ও ফকিহ্গণ সম্ভবত বাকস্বাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করে বাকস্বাধীনতা বোঝাতে অব্যাহতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষা “রা'ই” বা ব্যক্তিগত অভিমত ব্যবহার করেছেন।

'রা'ই'কে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, তা হল : প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় ও সন্দেহজনক। এদের প্রত্যেকটিকে আবার কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশংসনীয় অভিমতের যেসব মূল দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তার মধ্যে অনেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের মতামত- ইজতিহাদের সমন্বয়ে গঠিত রা'ই এবং পরামর্শের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাপ্ত রা'ই। নিন্দনীয় অভিমতকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, তা হলো ক্ষতিকর উদ্ভাবনা (বিদহআ)

www.pathagar.com

খেয়ালখুশি (হাওয়া) ও সীমালঙ্ঘন (বাগি)। এখানে আমি কেবল প্রশংসনীয় শ্রেণীর রা'ই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, কারণ আমি এ গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে নিন্দনীয় রা'ই সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; এমন বিষয়ে অভিমতকে রা'ই বলা হয়ে থাকে। কোন বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণে কোন ব্যক্তির একাগ্র গভীর চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টার ফল হিসেবে এ অভিমত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সামান্য কিছু আইন বা আভাস (আমারাত) হয়ত পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এসব আভাসে এমন কিছু থাকে, যা বিশ্লেষকদেরকে ভিন্ন ভিন্ন উপসংহারে উপনীত হবার পথ প্রশস্ত করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, রা'ই-এ কিছুটা স্বেচ্ছাচারিতা বা অযৌক্তিকতার উপাদান থাকতে পারে। কেননা এটি আত্ম-অনুপ্রেরণায় অভিব্যক্ত অভিমত এবং এর সাথে কুরআনের বাণী বা সুন্নাহ অথবা ফকিহগণের সর্বসম্মত অভিমতের (ইজমা) সংশ্লিষ্টতা নেই। আরবরা রা'ই-এর ব্যবহার করে এমন বিষয়ে যা দেখা যায় না, তবে যুক্তি প্রমাণ, আত্মজ্ঞানের বিচার-বিবেচনা বা অন্তরের আলোয় তা উপলব্ধি করা যায়। যেসব বিষয় সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যা অবশ্যই ঘটবে বলে লক্ষণ পাওয়া যায়, যেমন সপ্তাহের দিনের সংখ্যা এবং সত্য কথা বলার গুণ-এসব রা'ই-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবার সুযোগ নেই। তাই বাস্ত ব ঘটনা বা যৌক্তিক জ্ঞানের আওতাধীন কোন বিষয়ে কেউ কোন অভিমত জানাতে পারেন না; কারণ এর জন্য সতর্ক বিচার বিশ্লেষণ বা চিন্তা ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, প্রদত্ত লক্ষণ ও আভাস ইঙ্গিতের ভিত্তিতে বিশেষভাবে রা'ই গঠিত হয়।

কোন ব্যক্তি আবেগপ্রবণ হয়ে বা অন্যভাবে তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। ধর্ম অবমাননা, দেশদ্রোহিতা-ইত্যাদি আইন লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত সে অবাধে তার মত প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। আইন তার অযৌক্তিক মতামত প্রকাশকে যতক্ষণ সহ্য করবে; ততক্ষণ সে নতুন নতুন ধারণা পেশ এবং জ্ঞান ও সত্যান্বেষণে ভূমিকা পালন করতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় কোন দুর্বল প্ররোচণাদাতা বা বিভ্রান্ত ব্যক্তিও একটি সঠিক মত প্রকাশ ও তা করতে প্রেরণা যোগাতে পারে। ফিকহ'র কিতাবে রা'ই ও নির্ভরযোগ্য উৎস (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা)-উভয় বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। অবশ্য রা'ই এর যথার্থতা বিচারের মাপকাঠি কি হবে- নির্ভরযোগ্য উৎসের মানদণ্ডে তা নির্ধারিত হয়। ইত:মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার ক্ষেত্রে রা'ই এর কোন ভূমিকা নেই। তবে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যখন এ ধরনের কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না এবং বর্তমান নির্দেশনায় আভাস ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই থাকে না, সেক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান ও তাতে হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত থাকে এবং রা'ই-এর জন্যও তা উন্মুক্ত হবে। নাসিহাত চেতনার কতটা কাছাকাছি তা বিবেচনায় সবসময় রা'ই এর যথার্থতা নিরূপণ করা হয়। রা'ইকে বৈধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র স্বীকৃত পদ্ধতি হলো: সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা)। রা'ই-এর ত্বরিৎ মূল্যায়নে রা'ই ছাড়া আর কোন পদ্ধতি নেই। এছাড়া ইজমা সাধারণত কার্যকর করার গতি খুবই ধীর এবং অতীত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে যথার্থ রা'ই স্বেচ্ছাচারমূলক রা'ইকে অকার্যকর বা দুর্বল বলে ঘোষণা করে থাকে। যথার্থ ও সত্যনিষ্ঠ রা'ই এর মাধ্যমে রা'ই পরিবর্তন করার পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণও ইজতিহাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবে সঠিক ইজতিহাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ অভিমতের একটি ভূমিকা রয়েছে। সম্ভবত এ সত্যনিষ্ঠতার দৃষ্টিকোণের কারণে মহানবী সাঃ একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে 'সত্য উদঘাটনে কোন সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ বা মুজতাহিদের যেকোন প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য, এক্ষেত্রে তিনি সফল হউন বা না হউন।' ইত:মধ্যে ইজতিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় আমি হাদিসটি বর্ণনা করেছি।[১০৮]

প্রাথমিক যুগের ফকিহ্গণের চিন্তার দার্শনিক প্রেক্ষাপটে রা'ই ক্রমবর্ধমান হারে ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার অনুযায়ী উদারতা ও সত্য উদঘাটনের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এটি ছিল মত প্রকাশের সমর্থক বা আহল আল-রা'ই-এর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হাদিসের সমর্থক বা আহলে হাদিস পন্থীদের প্রধান অভিযোগ। এটি রা'ই-এর ব্যাপারে অনেকটা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করলেও প্রধানত আহল আল-রা'ই, বিশেষ করে হানাফিদের অব্যাহত নিরলস প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে। হানাফিগণ মনে করেন যে, ইসলাম কখনো যুক্তি ও ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করেনি এবং এতে ইসলামের কোন মূলনীতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়নি। নিজেদের প্রচেষ্টাকে সংহত করার লক্ষ্যে রা'ই এর সমর্থকগণ সামঞ্জস্যশীল যুক্তি প্রমাণ (কিয়াস), বিচার সংক্রান্ত অগ্রাধিকার (ইসতিশান), সুবিধাবাদী মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ রোধ (সা'দ আল-জারা'ই') এবং অব্যাহত বলে গণ্য করার (ইসতিশাব) নীতির মাধ্যমে রা'ই-এর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবন ও নিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসব নীতিসহ উসূল আল-ফিকহ'র অন্যান্য নীতি যেমন মুজতাহিদদের মতামতের উপরে সাহাবিগণের (রা:) মতামতকে (ফতোয়া আল-সাহাবি) স্থান করে দেয়া হয়েছে, এর লক্ষ্য হলো রা'ই এবং আইন ও কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।[১০৯] রা'ই-এর ব্যবহার নিয়ে আহল আল হাদিস ও আহল আল-রা'ই এর মধ্যকার মতপার্থক্য হলো: পরিপার্শ্বিক উপলব্ধির পার্থক্য এবং

www.pathagar.com

কোন পক্ষই রা'ই-এর মৌলিক যথার্থতাকে প্রত্যাখান করেনি। বাতেনিয়া বা তালিমিয়া নামে পরিচিত একটিমাত্র গোষ্ঠীগত আন্দোলন রা'ই এর যথার্থতাকে অস্বীকার করেছে।[১১০] আবু হামিদ মুহম্মদ আল গাযালি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "রা'ই এর আকারে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা নিষিদ্ধ করার মূলনীতি অবলম্বন করার কারনেই এ গোষ্ঠীকে তালিমিয়া বলা হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের নির্ভুল ইমামদের নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেন, কারণ তাদের বিশ্বাস, কেবল উপদেশ, শিক্ষা ও তালিমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।[১১১]

ব্যক্তিগত অভিমত প্রদান যে বৈধ ও সঠিক; তার সমর্থনে কুরআন-হাদিসে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। সরকারি কাজের ব্যাপারে সলাপরামর্শ (শূরা) করার অনুমোদন কুরআনে (৪২:৩৮) দেয়া হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এছাড়া পবিত্র কুরআন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তা কর্তৃপক্ষকে (উলুল আম) জানানোর জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছে; কারণ সঠিক মতামত গঠন ও সুবিচার করার যোগ্যতা তাদের রয়েছে (৪:৫৯)। একই সুরার পরবর্তী আরেকটি আয়াতে এ মতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে (৪:৮৩); যাতে সঠিক যুক্তি ও রা'ই অবলম্বন করে সূত্রের কোন আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মুয়ায বিন জাবাল রা: থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল সা: মুয়ায ইবন জাবালকে বিচারক (কাযী) নিয়োগ করে ইয়েমেনে পাঠান। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, কোন সূত্রের ভিত্তিতে তিনি বিচার ফায়সালা করবেন? জবাবে মুয়ায ইবন জাবাল একে একে বলেন, কুরআন, সুন্নাহ, এবং তার নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমতের (ইজতাহিদ রা'ইয়ী) ভিত্তিতে। এ হাদিসে বিচার কাজ ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রা'ই-এর প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন দেয়া হয়েছে।[১১২] রাসূলের (সা:) সুন্নাহ এবং সাহাবীদের জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে যে, দূরবর্তী এলাকায় নিয়োগকৃত বিচারক ও গভর্নরগণ এ বিষয়টি জানতেন যে, তারা কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোন নির্দেশনা না পেলে যে সেক্ষেত্রে তাঁদেরকে ব্যক্তিগত রা'ই ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করতে হবে।[১১৩] আরও বলা যায়, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মানুষকে চতুর্পার্শ্বের বিশ্বকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং অন্ধের মতো অন্যদের অনুসরণ ও তাদের কথা মেনে না নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ ও বিচার বিবেচনার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

'আল্লাহ তোমাদের সামনে তার নিদর্শনাবলী তুলে ধরেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করতে পার।' (২:২৬৬)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِي مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

"তারা কি আসমান ও যমিনের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন- তা দেখে না?" (৭:১৮৫)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবু জাহরা বলেন, পবিত্র কুরআন আমাদেরকে আমাদের চতুর্পার্শ্বের বিশ্বকে যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহিত করেছে। তাই মত প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতা ছাড়া কারোর পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়।[১১৪] আমরা এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারি যে, সত্যের সন্ধান ও ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ যৌক্তিক প্রচেষ্টাকে কুরআনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একত্ববাদের (তাওহীদ) মৌলিক সত্য এবং কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে অস্বীকার করে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের সূত্রপাত হতে পারে না।[১১৫] সাধারণ মানুষের বিরোধিতার মুখেও যৌক্তিক অনুসন্ধান ও সত্যের সন্ধানে অবশ্যই অনড় থাকতে হবে, এসব মূল্যবোধ থেকে আমরা এটাই উপলব্ধি করতে পেরেছি। লোকজন হয়ত অনবহিত থাকতে পারে অথবা তাদেরকে বিষয়টি জানানোর দরকার হতে পারে। পবিত্র কুরআনের আয়াতে এরূপ তাৎপর্য প্রকাশিত হতে দেখা যায় (৬:১১৬)। এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সুস্পষ্ট নির্দেশনা আসার পর নিছক আন্দাজ-অনুমান, এমনকি লোকদের বিরোধিতার কারণে কখনও তার অন্ত রায় সৃষ্টি করতে দেয়া উচিত হবে না।

তৎসত্ত্বেও একটি বৈধ সরকারের আনুগত্য করাকে কুরআনে অবশ্য করণীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। যে আয়াতে (৪:৫৯) এ কর্তব্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ .

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হও।"

স্পষ্টভাষায় কুরআনের এ আয়াতে শাসক ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে আগাম ধারণা পেশ করা হয়েছে এবং এতে এ বিষয়টি নিশ্চিত

www.pathagar.com

করা হয়েছে যে, আনুগত্য করার কর্তব্যের শর্তে সরকার ও নেতাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপনে জনগণের অধিকার বাতিল হয়ে যায়নি।

বিরোধ বা জাদাল এর ইতিবাচক অর্থ রয়েছে এবং কুরআনে এর সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কুরআনের অন্তত ২৫টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীব হিসেবে যুক্তির প্রতি মানুষের প্রবণতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।[১১৬] কুরআনের এমনই এক আয়াতে এক মহিলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হলেন রাসূলের (সা:) সাহাবী আউস বিন সাবিতের স্ত্রী খাওয়ালা বিনতে সালাবাহ। তিনি রাসূলের (সা:) নিকট উপস্থিত হয়ে তার ওপর তার স্বামীর অবমাননা ও নির্যাতনের অভিযোগ পেশ করেন। এরপর নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَاوَ تَشْتَكِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا .

> 'আল্লাহ এ মহিলার কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে স্বামীর ব্যাপারে বিতর্ক করেছে। সে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছে এবং আল্লাহ আপনাদের আলোচনা শুনেছেন।' (৫৮:১)

এর ফলশ্রুতিতে এ মহিলাকে তার স্বামীর থেকে পৃথক হবার অধিকার প্রদান করা হয়। এ পৃথক হওয়াকে জিহার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ নির্দিষ্ট আয়াতে ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এখানে একজন মহিলার প্রসঙ্গ এসেছে: যিনি আল্লাহর নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান এর কাছে তার সমস্যা তুলে ধরেন। এ আয়াতে 'তুজাদিলুকা' তোমার সঙ্গে বিতর্ক', 'তাশতাকি' সে যে অভিযোগ করে' 'তাহাউরাকুমা' 'তোমাদের আলোচনা-এর মতো শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে ফরিয়াদি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এ কারণেই সম্ভবত উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সূরাটি নাযিল হওয়ায় সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'আল মুজাদিলাহ,' অর্থ: যে বিষয়ে সে বিতর্ক করেছে।'

মূল শব্দ হল জাদাল। এর দুটি অর্থ হতে পারে : প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। আমি অন্যত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অর্থের বিষয়ে আলোচনা করেছি। প্রশংসনীয় জাদাল সাধারণ সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোন দোষত্রুটি বা নিয়ম লঙ্ঘন হতে দেখলে তা সংশোধনের মানসে এটি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি কাউকে এমনভাবে কথা বলতে শুনতে পেলো; যাতে ঈমানের মূলনীতিকে বিকৃত করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি যদি সত্যের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ় যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের সাহায্যে তার ত্রুটি তুলে ধরেন, তা হলে এটি হবে তার জন্য প্রশংসনীয় কাজ। কারোর বিকৃতি সংশোধন করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নীরব ভূমিকা অবলম্বন তার জন্য প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী যুক্তি পেশ করতে হবে এবং তা অবশ্যই অতি উত্তম পন্থায় হতে হবে:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ اَحْسَنُ ...

- وَلاَتُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلاَّ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

> 'যা সর্বোত্তম (বিল্লাতি হিয়া আহ্‌সান), 'আহলি কিতাবদের কাছে এ পন্থা ব্যতীত যুক্তি পেশ না করার নির্দেশ' অবশ্যই মেনে চলতে হবে, 'তবে ব্যতিক্রম হল তাদের মধ্যকার অসৎ/যালিমরা' (২৬:১২৫; ২৯:৪৬)।

এভাবে কুরআন সুষ্ঠু ও বিনম্র বিতর্ককে উৎসাহিত করেছে, যদি তা কল্যাণকর হয়; তবে শ্রোতারা যদি এতোটা বৈরি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয় যাতে বিনম্র ভাষায় যুক্তি প্রমাণ পেশ ও উদ্বুদ্ধকরণের থেকে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে কুরআনের এ আয়াতের আলোকে যুক্তি পেশের চেষ্টা করা উচিত হবে না। বরং সেখানে আরও কার্যকর নির্দেশনা অনুযায়ী সংকট নিরসনে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।[১১৭]

ধর্মীয় নীতির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়; এমন পার্থিব বিষয়েও যদি জনগণের কল্যাণ নিহিত থাকে অথবা তাদের জন্য সম্ভাব্য অনিষ্টকর বিষয় রোধ হয়, তাহলে সে বিষয়েও যুক্তি পেশকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন ভাষণ দেন যাতে জনগণের স্বার্থ লংঘিত হয় এবং, জনগণকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করে, তাহলে বিষয়টি অবগত হয়ে প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে সুষ্ঠু যুক্তি ও বিতর্কের মাধ্যমে তার ত্রুটি তুলে ধরা। জনগণকে অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির কর্তব্য। এভাবে প্রশংসনীয় জাদাল এর দু প্রকারেরই লক্ষ্য হলো ধর্মীয় নীতির সুস্পষ্ট বিকৃতির সংশোধন এবং যে কোন ক্ষতির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।[১১৮]

এছাড়া তৃতীয় আরেক শ্রেণীর প্রশংসনীয় জাদাল রয়েছে, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে ব্যবহৃত হয়। এ জ্ঞান বিকাশ ধর্মীয় বিজ্ঞান অথবা জ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যেমন যুক্তিবিদ্যা ও সাহিত্য-উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাদালে কুরআনের যে নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়, এক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য হবে। বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে অবশ্যই এটি করতে হবে এবং এর লক্ষ্য হবে সত্য উদঘাটন। এক্ষেত্রে অন্যের দুর্বলতা প্রকাশ করার মানসিকতা অবশ্যই পুরোপুরি পরিহার করতে হবে।

সাধারণভাবে আরও বলা যায়, কুরআন-সুন্নাহ যথাযথ বক্তব্য প্রদানের ব্যাপারে নৈতিক উৎসাহদান ও নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। ইসলামি নীতিশাস্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হলো অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় যথাযথ শব্দের প্রয়োগ ও সৌজন্য প্রকাশ করা; যাকে প্রায়ই সঠিক উপদেশের (হিদায়াত) সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। পবিত্র কুরআন ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দিয়েছে:

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا صِرَاطِ الْحَمِيْدِ

"লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায় সুন্দর শব্দের প্রয়োগ কর" (২:৮৩) এবং তাদেরকে উত্তম কথার (কালিমা ত্বাইয়িবা) সাহায্যে অন্যদেরকে উপদেশ প্রদান ও আল্লাহর পথে ডাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ .

"তারা লোকদেরকে উত্তম কথার মাধ্যমে হেদায়েত দেয় এবং প্রশংসনীয় (আল হামিদ) পথে পরিচালিত করে।" (২২:২৪)

পবিত্র কুরআনে উত্তম কথাকে (কালিমা তাইয়েবা) একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যার গুড়ি ও কাণ্ড এবং পত্রসমূহ সুদৃঢ় ও মজবুত। (১৪:২৪)। সুন্নাহতে একে দান ও সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; যা প্রত্যেকে প্রদান করার ক্ষমতা রাখে।[১১৯] উপরন্তু কুরআন (১৭:২৩) বার বার পিতামাতা গরিব-মিসকিন (৪:৮), অজ্ঞ (৪:৫) এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার সময় (১১:৮৩, ১৭:৫৩, ১৬:১২৫, ২৯:৪৬) বিনম্রতার সঙ্গে সঠিক বক্তব্য (কাউলান মা'রুফান) পেশ করাকে উৎসাহিত করেছে। এসব আয়াতে একথা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে বাকস্বাধীনতার নির্লজ্জ অপব্যবহার রোধে আইনানুগ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগের চর্চা এবং বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও সততার বিষয়টি ব্যাপক অর্থে নৈতিক উৎকর্ষ ও উচ্চমানের সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন করে। এছাড়া কুরআন কথা বলার সময় বুদ্ধিমত্তা ও সুবিবেচনার পরিচয় দিতে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে (৩৩:৭০)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে সঠিক মত প্রকাশ অথবা এমনকি সত্য কথা বললে একটি মহৎ লক্ষ্যার্জন করা সম্ভব হবে কি না, তার কি ফল অর্জিত হতে পারে এবং তার লক্ষ্যই বা কি, বক্তাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।[১২০] প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক উদাহরণও রয়েছে যেখানে সুন্নাহ সত্যের ব্যাপারে নীরব থাকার অনুমতি দিয়েছে, এমনকি মিথ্যাকথা বলারও অনুমতি দেয়া হয়েছে, যদি তা কোন ব্যক্তিকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সহায়ক হয়। সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, মত প্রকাশ

www.pathagar.com

ও বাক স্বাধীনতা হচ্ছে ন্যায় বিচারের সাধারণ নীতিমালারই সহায়ক বিষয়, নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى :

'এবং তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে, তা যদি তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের বিপক্ষেও যায়' (৬:১৫৩)।

কুরআনের এ নির্দেশনা আদালতের কোন সাক্ষী, খোদ বিচারক, পরিবারের প্রধান এবং ব্যাপকার্থে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এতে যখনই তারা কারোর সম্পর্কে অথবা একে অপরের সাথে কথা বলবে, তখনও তাদেরকে সততা ও পক্ষপাতহীনভাবে তা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রা'ই এর শ্রেণীবিভাগ

রা'ই এর প্রকৃতি এবং এর পরিধি ও বিষয়বস্তুর ব্যাপক বৈচিত্রের কারণে এর পূর্বনির্ধারিত কাঠামোর ধারণায় স্থির থাকা সম্ভব হয়নি। আলেমগণ তাই নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে রা'ইকে বিভক্ত করেছেন : বৈধ বা প্রশংসনীয় অভিমত (আল-রা'ই আল-সহীহ), বাতিল অভিমত (আল-রা'ই আল-বাতিল), নিন্দনীয় বা আপত্তিকর অভিমত (আল-রা'ই আল-মাযমূম) এবং বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহজনক অভিমত (আল রা'ই ফি মাওদী আল-ইস্তিবাহ)।[১২১]

আল-রা'ই আল-সহীহ হচ্ছে অতীতের প্রামাণ্য নযির এবং অতীত আলেমদের অনুমোদিত অভিমত। তারা এ ধরনের রা'ই এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতেন এবং তাদের নিজস্ব ফতোয়া প্রদান ও ইজতিহাদে নীতিগতভাবে তা মেনে নিয়েছিলেন।[১২২] অন্য কথায়, শরীয়াতের গ্রহণযোগ্য নীতিমালার সঙ্গে এর সামঞ্জস্যশীলতা প্রশ্নাতীত। অতীতের কর্তৃপক্ষ বৈধ প্রমাণ করেছে এমন ঘটনাবলী প্রয়োজনে পরীক্ষা করা আবশ্যক, কারণ একে একটি মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে তার সাহায্যে নতুন অভিমতের মূল্যায়ন করা হবে যাতে ভবিষ্যতের চিত্র সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের কোন অভিমত প্রাথমিকভাবে অনিশ্চিত ও সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে। একে বৈধ শ্রেণীভুক্ত বলে কেবল তখনই গণ্য করা যাবে; যখন এর থেকে সব ধরনের সন্দেহজনক বিষয় ও অসঙ্গতি দূর ও নিরসন করা হবে। এ ধরনের সংশোধনের প্রধান প্রক্রিয়া ইসলামি চিন্তার আদর্শ প্রণালী ইজমা বা সাধারণ মতৈক্য বলে পরিচিত। এবং কখনও এ প্রক্রিয়ায় কোন অভিমত গৃহীত ও সমর্থিত হলে, তা প্রামাণ্য বিষয়ে পরিগণিত হবে এবং প্রশ্নাতীত বৈধ বলে

www.pathagar.com

বিবেচিত হবে। ইজমা হলো অন্য কথায় কোন অভিমতের চূড়ান্ত অনুমোদনের সিলমোহর মেরে দেয়া; যা নিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় বিতর্ক থাকলেও এখন আর এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে না। আধুনিক যুগে উচ্চ আদালতে আইন ও বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কখনও যথাযথ আইন পরিষদ অথবা বিচার কর্তৃপক্ষ কোন প্রস্তাব বা অভিমত অনুমোদন করলে, তা অন্তত বাস্তব কাজে বৈধ বলে ব্যবহৃত হবে এবং বিষয়টি নিয়ে আর কোন বিতর্ক করা যাবে না। পক্ষান্তরে পেশাজীবী ও প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার সম্মিলিত ও আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত প্রস্তাবও একইভাবে স্বতন্ত্র অভিমতের গুরুত্ব ও মূল্য বৃদ্ধি করে। সমসাময়িক সমাজে জনমত ও সংবাদ মাধ্যমও কুরআন সুন্নাহ–অনুযায়ী বা সাধারণ মতৈক্যের (ইজমা) মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা যায়নি; এমন কোন সন্দেহজনক অভিমতের পক্ষে বা বিপক্ষে সম্ভাব্য মতৈক্যের বিষয় চিহ্নিতকরণে কাজ করতে পারে। নেতৃস্থানীয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (মৃত্যু ৩২/৬৫২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে বর্ণিত একটি মশহুর হাদিসে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে :

مَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوْا عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ .

"মুসলমানরা যা উত্তম বলে মনে করে তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও উত্তম।"[১২৩]

অন্য কথায়, বিশেষজ্ঞ অথবা সরকারি ও প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে আলোচনার ফলাফল যদি ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের, সমাজের নেতৃবৃন্দ ও যাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত (আহল আল-শূরা) তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায়; তাহলে ওই অভিমতের গুরুত্ব ও মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তা কুরআনের পরামর্শের মূলনীতির আওতায় ন্যস্ত করতে হবে।

বৈধ অভিমতের বিপরীতে রয়েছে বাতিল অভিমত (আল-রা'ই আল বাতিল)। আদৌ এর কোন মূল্য নেই, নেই কোন গুরুত্বও। ইবনে আল কাইয়িম আল-জাওজিয়াহ এ ব্যাপারে অতীতের উদাহরণ টেনে লিখেছেন, "এটি এমন এক অভিমত অতীতের আলেমগণের অনুমোদিত দৃষ্টান্তের সঙ্গে স্পষ্টত যার কোন মিল নেই। তারা নীতিগতভাবে একে বর্জন করেছেন এবং তাদের বিচারিক সিদ্ধান্ত ও ফতোয়াতে এর স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন।"[১২৪]

ইবনে কাইয়িম বৈধ রা'ইকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন : রাসূল সা: এর সঙ্গীদের রা'ই (ফতোয়া আল সাহাবি), নুসুস এর ব্যাখ্যা ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ রা'ই (আল-রা'ই আল-তাফসিরি), পরামর্শমূলক রা'ই এবং ইজতিহাদের সমন্বয়ে রা'ই (আল-রা'ই আল-ইজতিহাদি)।

www.pathagar.com

আলেমগণ ধর্মীয় ও বিচারিক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাহাবীগণের (রা:) ফতোয়াকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান প্রশ্নে পুরোপুরি একমত পোষণ করেন। সাহাবীগণ সাধারণভাবে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা পবিত্র কুরআন ও রাসূলের (সা:) শিক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন, তাই তারা যে অভিমত ব্যক্ত ও প্রচার করেছেন; তার গুরুত্ব রাসূলের সুন্নাহর কাছাকাছি বলে গণ্য করা হয়। নিজের এ অভিমতের সমর্থনে ইবন কাইয়িম ইমাম শাফেঈ (র:) এর একটি বিবৃতির উদ্ধৃতি দেন : সাহাবীগণের রা'ই এর অসীম গুরুত্ব রয়েছে এবং তাঁকে আমাদের নিজস্ব অভিমতের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।"[১২৫] এরপর তিনি সাহাবীদের রা'ই সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেন : কুরআনের আয়াত নাযিল করে এধরণের কয়েকটি ঘটনাকে সমুন্নত ও যথার্থ বলে সমর্থন করা হয়। তাদের প্রতি "এ করুণা ও অধিকার অতুলনীয় ও অনন্য।" তাই উপসংহারে একথা বলা যায় যে, সাহাবীদের অভিমত বা ফতোয়া আল-সাহাবি হল অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাই আলেমদের ফতোয়ার সঙ্গে তার তুলনা করার যে কোন চেষ্টা হবে "অর্থহীন ও অশুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।"[১২৬]

দ্বিতীয় ধরনের বৈধ রা'ই হলো: এমন রা'ই যা নুসূস এর ব্যাখ্যা প্রদান, অর্থ স্পষ্ট করা এবং তার থেকে আইনগত বিধি হ্রাস করার চেষ্টা করে। এ ধরনের রা'ই এর লক্ষ্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট অনুধাবনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের মানুষের জীবনকে প্রসারিত করতে পাওে, এমন বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা লাভের চেষ্টা করা। এ ধরনের অভিমতের উৎকর্ষ নির্ভর করে এর প্রণেতার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জ্ঞান এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি ও এর বিকাশে তার গভীর সাধনার ওপর।[১২৭]

তৃতীয় প্রকার বৈধ বা প্রশংসনীয় রা'ই হলো: পরামর্শমূলক রা'ই। কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এ রা'ই পাওয়া যায় না, বরং একদল লোকের বিশেষ করে যাঁরা পরামর্শ দিতে সক্ষম তাদের পরামর্শের ফসল হলো এ রা'ই। মহান আল্লাহতা'আলা সামাজিক বিষয়ে আলোচনাকালে এই উম্মাহর (মুসলিম জাতি) অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেছেন আর আল্লাহর রাসূল সা: বাস্তবে এর প্রয়োগ করেছেন এবং এটি হলো অন্যতম উত্তম রা'ই। [১২৮]

চতুর্থ প্রকার প্রশংসনীয় অভিমত বা রা'ই যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এতে ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কেউ কোন বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে চাইলে; তাকে প্রথমে পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে কি বলা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে কোন নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হলে,

www.pathagar.com

তাকে রাসূল সা: এর সুন্নাহ এবং সাহাবিগণের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এরপরও তিনি যে বিষয়ে দিকনির্দেশনা কামনা করছেন, তা পেতে ব্যর্থ হলে তখন তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীগণ রা: যেভাবে তাদের অভিমত প্রদান করেছেন; ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় নিজস্ব অভিমত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে হবে। বস্তুত মুয়ায ইবনে জাবাল বর্ণিত একটি হাদিসের আলোকে পদ্ধতির ভিতটি রচিত হয়েছে। ইত:পূর্বে হাদিসখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হচ্ছে ইজতিহাদের আদর্শ নমুনা। কোন অভিমত প্রণয়ন ও প্রকাশ করলে তা সঠিক হতে পারে, আবার সঠিক নাও হতে পারে অথবা সে সময়ে হয়ত সঠিক বলে মনে হবে; কিন্তু পরে সময়ের আবর্তনে তা অসঙ্গতও হয়ে পড়তে পারে। এখানে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে, সে সম্পর্কে বিচারকদের উপদেশ দিয়ে তাদের কাছে লেখা খলিফা 'উমার ইবন খাত্তাব রা: এর এক চিঠিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে : "যদি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আপনারা প্রথমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সঠিক ছিল না, তাহলে আপনারা ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কেবল এ কারণেই যেন আপনাদেরকে তা পরিবর্তন করা থেকে নিবৃত করতে না পারে। সত্য চিরন্তন, তাই তাকে কোন কিছুই বাতিল করতে পারবে না, মিথ্যা আঁকড়ে থাকার জিদ করা থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসা অনেক অনেক উত্তম।"[১২৯] এখানে যে মূলনীতির উদ্ধৃতি দেয়া হলো, তা বিচার বা অন্য যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা প্রযোজ্য হবে। এ নীতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সামঞ্জস্যহীনতা এবং বিচার বিভাগের তথাকথিত বিশ্বাসযোগ্যতার নামে সত্যকে বিসর্জন দেয়ার যে কোন চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং যে কোন প্রশংসনীয় অভিমতের মূল কথা হচ্ছে কল্যাণসাধন। 'যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের কল্যাণে প্রচেষ্টা চালালে, তাকে মুহসিনের (খোদাভীতি ও সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তি) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হবে। কেননা শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে সত্য কথা বলাকে তাকওয়ার শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা বলে গণ্য করা হয়।'[১৩০]

যে বিষয়ে সন্দেহ করার সুযোগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে রা'ই বৈধ । রা'ই হলো অনুমান বা ধারণার (যন্ন) সমার্থক। জরুরি পরিস্থিতিতে অথবা কোন উত্তম বিকল্পের কথা অজানা থাকলে এ ধরনের রা'ইকে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইনগত মতামত (ফতোয়া) দেয়ার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। আদালতের রায় হিসেবে গৃহীত না হলে, সন্দেহজনক অভিমত বা ধারণা মানা কারোর জন্য

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক হবে না। আলেমগণ একে অনুমোদন করেননি আবার বাতিলও করেননি, বরং গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন।[১৩১] তবে যেহেতু অনেক সময় আমাদের কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব থাকে অথবা সত্য জানা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে নিছক সম্ভাব্যতা বা অনুমান বলে বিবেচিত সুচিন্তিত অভিমতকে কখনও কখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুদীর্ঘ বিলম্ব এড়ানোর লক্ষ্যে এটি করা হয়। কেননা প্রকৃত সত্য উদঘাটনে এ ধরনের বিলম্ব ঘটতে পারে। বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুলত্রুটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে, বিশেষ করে, সাক্ষ্য- প্রমাণ গ্রহণের বিধির ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব সঠিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও অভিমত বৈধ বলে মনে করা হবে, এমনকি তাতে যদি কিছুটা আন্দাজ-অনুমান অথবা সহনীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহলেও।

বিষয় ও আপেক্ষিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রা'ইকে পুনরায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত: বিচার বা শরীয়া বিষয়ক রা'ই। শরীয়ার প্রমাণ যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তাকে শক্তিশালী করতেই কেবল একে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হবে। এ রা'ই কোন একক ব্যক্তি অথবা অনেকে পেশ করেছেন কিনা সেটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত: আরেক ধরনের রা'ই রয়েছে। সব সাধারণ বিশেষ বিষয় সংশ্লিষ্ট-যা এর জন্য কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কোন সুচিন্তিত অভিমত পেশের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কেবল বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করা হয় এবং এরপর তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিমতের মূল্যায়ন করা হয়। তৃতীয় রা'ই হচ্ছে বাস্তবধর্মী রা'ই। এ রা'ই এ জনগণের অংশগ্রহণ ও মেনে নেয়ার বিষয় সংশ্লিষ্ট, যেমন রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করা, সরকারি কাজ, সংবিধান ও পৌর কার্যক্রম সম্পর্কে অভিমত দান। এ রা'ই সার্বিকভাবে সমাজ সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতিগত দিক থেকে এসব বিষয় জনমত নির্ভর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পদক্ষেপ গ্রহণ ও অংশগ্রহণ হচ্ছে এসব অভিমতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।[১৩২]

৮. সংগঠন করার স্বাধীনতা

মত ও বাক প্রকাশের স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আসে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে সংগঠন করার অধিকারের বিষয়টি। শরীয়া বৈধ লক্ষ্যার্জনে সংগঠন করার অধিকারকে কেবল সমর্থনই দেয়নি; উপরন্তু তা করতে উৎসাহিত

www.pathagar.com

করেছে। পবিত্র কুরআন ভাল কাজে পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতা করাকে উৎসাহিত করেছে; তবে সীমালংঘনমূলক ও খারাপ কাজে সহযোগিতা করাকে নিষিদ্ধ করেছে।[১৩৩]

মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা বলেছি যে, আলেমগণ একে অন্যান্য অধিকার থেকে আলাদা করে ভিন্ন শ্রেণীর অধিকার বলে গণ্য করেননি। সংগঠন করার স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণে আমরা একান্তভাবে এ বিষয় নিয়ে আলেমদের কোন গবেষণাকর্ম দেখতে পাইনি। সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার ব্যাপারে শরী'আতের প্রমাণপঞ্জি অসংহত অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে বিধায়; বিভিন্ন বিষয় থেকে এগুলোকে সনাক্ত করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর যেসব মূলনীতিতে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অনুমোদন দেয়া হয়েছে; তার মধ্যেই সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআনের হিসবাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, নাসিহা বা আন্তরিক উপদেশ বা পরামর্শ দান, শূ'রা বা পারস্পরিক পরামর্শ, অনুরূপভাবে মুতাতিস মুতান্দিস এর মূলনীতিকে শরী'আতে সংগঠন করার স্বাধীনতার অনুমোদনের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শূ'রা হচ্ছে গণতন্ত্রের সমার্থক ইসলামি ব্যবস্থা। তবে উভয়ের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর শূ'রা হচ্ছে অধিকতর সমাজমুখী। যাদের কিছু বলার রয়েছে এবং যারা মতামত দিতে চায়; তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাহচর্যের মাধ্যমে তাদের সুচিন্তিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত জেনে নেয়া হয়। উপরন্তু সুযোগ্য ফকিহগণের ইজতিহাদ-এর মূলনীতি এবং সরকারের আচরণ বা কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের গঠনমূলক আলোচনা করার অধিকার (হাক্ক আল-মু'য়ারাদাহ) শরী'আয় বাক ও মত প্রকাশ এবং সংগঠন করার মৌলিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

উপরে যেসব মূলনীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে হিসবাহ হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক। নাসিহা, মু'য়ারাদাহ, শূ'রা, অথবা ইজতিহাদ-এসবের প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে এবং তাদের সমন্বিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো সৎকাজের বিকাশ সাধন এবং অসৎকাজ রোধ করা। অবশ্য সার্বিকভাবে নাসিহা ও ইজতিহাদের মতো হিসবাহও একটি সম্মিলিত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য (ফরযে কেফায়া)। এগুলো হলো অভিন্ন বিষয়; তাই এর দাবি হচ্ছে সমাজের সদস্যরা এসব বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরস্পরকে তাদের বক্তব্য জানাবে। আমরা একথাও বলতে পারি যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক পরামর্শের ফলশ্রুতি হিসেবে কেবল কুরআনে বিবৃত শূ'রার বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আসাদ ও 'আব্দুল্লাহ আল-'আরাবি উভয়ে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে- শরী'আহতে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক স্বীকৃতির শর্তের মধ্যেই অভিন্ন লক্ষ্যার্জনে জনগণ সংগঠিত হতে চাইলে তা করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। জনগণ যদি মনে করে যে, বৈধ অধিকার অর্জনে দল, গ্রুপ বা সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, তাহলে জনগণকে তা করার অধিকার দিতে হবে।[১৩৪] আব্দুল হামিদ আল-আনসারির মতে, আমাদের সময়ে শরী'আহর আওতায় লক্ষ্যার্জন (আল-মাকাসিদ), সমাজের বিভিন্ন কল্যাণ (আল-মাসালিহ্) যা সমাজের মানুষের জীবন নির্বাহে অত্যাবশ্যকীয় (আল-যারিয়াত), সমাজের লোকদের দুর্দশা লাঘব অথবা সৌন্দর্যবর্ধন (আল হাজিইয়াত তাহসিনিয়াত) এর মতো পারস্পরিক কল্যাণ (আল-মাসালিহ্) সাধনের মতো সকল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনে রাজনৈতিক দল গঠন করা প্রয়োজন।[১৩৫] এক্ষেত্রে আরো বলা যেতে পারে যে অসীম কল্যাণের সাধারণ ক্যাটাগরির (আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্) অধীনে রাজনৈতিক দল গঠনকে শ্রেণীভুক্ত করা সত্ত্বেও এ থেকে যে কল্যাণ পাওয়া যায়, তা কতিপয় উচ্চতর ক্যাটাগরির দমাসালিহ অর্জনের উপায় হিসেবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে মাসালিহ্ শর'য়ী মূল্য অর্জনের মাধ্যমে উচ্চতর ক্যাটাগরির মাসলাহতে উন্নীত হয়।

অবশ্য কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যাতে ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের মধ্যেই তাদের মৌলিক ঐক্য নিহিত রয়েছে, তাই অন্য কোন পর্যায়ে ঐক্য বা জোটভুক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। মোস্তফা কামাল ওয়াসফি'র মতে, 'ইসলাম ঈমানের ঐক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন জোটভুক্তির অনুমতি দেয়নি। ঈমানি ঐক্যই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট। যখন মুসলমান সমাজের একাংশ কোন দলের সঙ্গে জোটভুক্ত; তখন তারা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে মুসলিম সমাজে অনৈক্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়।'[১৩৬]

এ অভিমতের যথার্থতার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে, এতে এ ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকটির সাধারণ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামে অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিকে প্রভাবিত করে না, এমন ঘটনা বা বিষয়ে ভিন্ন মতপোষণ অবশ্য ঈমানি ঐক্যের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নয়। এটা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, একই নীতি ও আদর্শের অনুসারি ব্যক্তিবর্গ কোন ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। যেসব সংগঠন কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধন

www.pathagar.com

এবং সমাজের সেবা প্রদানের জন্য কাজ করছে; সেসব সংগঠন করা অবৈধ নয়, কেবল ক্ষতিকর ও ঐক্য বিনষ্টকারী সংগঠন করা নিষিদ্ধ।

রাজনৈতিক দল-এর বিরোধীরা তাদের মতামতের পক্ষে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। এসব আয়াতে ঐক্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এমন কতিপয় আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا .

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (৩:১০৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْادِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَئٍ .

যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ডখণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে,
তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার সম্পর্ক নেই। (৬:১৫৯)

وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করোনা,
তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। (৮:৪৬)

ঐক্য ধারণা সম্পর্কে কতিপয় হাদিসেরও উদ্ধৃতি দেয়া হয়। যেমন, يَدُا اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে।'

তবে এসব উদ্ধৃতি রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা অন্য প্রসঙ্গে কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যে দল লোকদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন দল গঠনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে ইতিবাচক সমর্থন রয়েছে। মূলত কুরআনে প্রাথমিকভাবে অনৈক্য পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গঠনের মতো বিষয়কে কোন ইস্যু করা হয়নি। উপরন্তু রাজনৈতিক দল গঠনের সমর্থকগণ তাদের সমর্থনে কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারবেন। আমরা এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যারা রাজনৈতিক দল গঠন করার বিরোধী তারা আরও বলেন যে, রাসূল সা: এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং তাদের ভিন্ন মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ছিল। জনগণ অতি সহজে খলিফাদের কাছে যেতে পারতো। সরকারের নেতারা নাগরিকদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতেন এবং তাঁরা একত্রে বসে সরকারি কার্যক্রম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। বিরোধী কোন বিশেষ দল গঠন ছাড়াই সরকারের পক্ষে এটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এ সুযোগের নিশ্চয়তা থাকায় সমাজের প্রত্যেক সদস্য এ ধরনের আলোচনায় অংশ নিতো। তাদের কোন কিছু বলার থাকলে আলোচনায় অংশ নিয়ে তা বলতো এবং এজন্য তারা কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়াকে প্রয়োজন মনে করতো না।[১৩৭] আরও বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনে একটি সূরায় (রাজনৈতিক) দলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে "দলসমূহ" (আল-আহযাব) নামক এ সূরায় রাসূল সা:এর বিরোধিতা করার জন্য গঠিত দলে যোগদানকে অনুমোদন দেয়া হয়নি (দেখুন : ৩৩:২০)। আরও বলা হয়েছে, যে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের অধিকাংশ ইতিহাস হচ্ছে সাধারণভাবে বিভক্তির ইতিহাস এবং তা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে।[১৩৮]

এখানে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে, তা কোনক্রমে চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সূরা আল-আহযাবে দল গঠনের যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে; তাতে ইত:মধ্যে আভাস দেয়া হয়েছে যে, সেটি গঠন করা হয়েছিল একান্তভাবেই রাসূল সা:এর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে। উপরন্তু শিয়া ও খারিজিসহ অন্যান্যদের দলীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা কল্যাণকর উদ্দেশ্যে দল গঠনের নৈতিক মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হিসেবে বিবেচিতও হবে না।[১৩৯] অপরদিকে সংগঠন করার স্বাধীনতার সমর্থকরা মনে করেন যে, ইসলাম রাজনৈতিক দল ও সমিতি গঠনকে বৈধ করেছে; কারণ পারস্পরিক পরামর্শ, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো ইসলামের বহু সরকারী আইনের সাধারণ নীতি রাজনৈতিক ভাবাপন্ন এবং এসব নীতি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেবে, এমন সব রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে।[১৪০] আরও বলা যায় যে, শূরার মতো মূলনীতির কার্যকর বাস্ত বায়নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ মত পক্ষে হতে পারে; আবার বিপক্ষেও যেতে পারে। কোণ পক্ষে সমর্থন রয়েছে তা সনাক্ত করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে এ উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক দল গঠন সামঞ্জস্যশীল এবং এতে সংগঠিত হওয়া ও সুশৃঙ্খল হবার সুযোগ পাওয়া যায়। উপরন্তু আমাদের সময়ের বৈচিত্র্যময় ও জটিল জনজীবন, নগরীসমূহের বিরাট আয়তন, সেগুলোর বিপুল

www.pathagar.com

সংখ্যক অধিবাসী এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিকাশ ও কলেবর বৃদ্ধির ফলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন তা জানা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান জনজীবনে সংগঠন করা, প্রভাব বিস্তার (লবিং) করা, চাপ প্রয়োগকারী গ্রুপ (প্রেসার গ্রুপ) ও সমিতি গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে লোকদের সরাসরি যোগাযোগ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মতো বর্তমানে অতোটা কার্যকর হতে নাও পারে।[১৪১] লক্ষ্য নির্ধারণে আমাদেরকে সঠিক দায়িত্বশীল অবস্থান ও প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত করা দরকার, তা না হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না করার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। সার্বিকভাবে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ শূরার প্রস্তাব দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর অবস্থানে রয়েছে এবং তাদের অনেক উপায় জানা আছে। তাই দলসমূহ বাক স্বাধীনতার ওপর হুমকি মোকাবিলায় অধিকতর সক্ষম, বিশেষ করে যখন বক্তব্যে ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনার বিষয় প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন সরকার অব্যাহতভাবে আন্তরিক উপদেশ (নাসিহা) উপেক্ষা করে এবং বিভ্রান্ত হয়ে একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে অটল থাকলে লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনাস্থা পেশ করতে পারে। 'একজন অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ'-এ হাদিসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন ব্যক্তি কিভাবে কাজ করবেন যদি তার এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করছেন তার নিরাপত্তার কোন আশ্বাস ও সমর্থন না থাকে? এমনকি কোন সরকার উন্মুক্ততা ও বাকস্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও বৈধ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দল গঠনসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। বরং একথা বলা হয়েছে যে, জনগণকে রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে বাক স্বাধীনতা ও সৎ কাজের আদেশ দানের (আমর বিল-মা'রুফ) বিষয় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং এ বিষয়টি বাক স্বাধীনতার প্রতি সরকারের সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষাও বটে।[১৪২]

উপরন্তু আমরা কুরআন থেকে এ প্রমাণ পেয়েছি যে, ভিন্ন ভিন্ন মতপোষণ ও মতপার্থক্য হলো সমাজ জীবনের স্বাভাবিক বাস্তবতা। উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে;

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ .

'তোমার রব চাইলে গোটা মানব গোষ্ঠীকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে' (১১:১১৮)।

www.pathagar.com

এখানে কুরআনের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে স্পষ্টত বহুত্ববাদের একটি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে; যা ব্যক্তিগত অভিমত ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি ও জাতিসমূহের সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আরেকটি আয়াতে এ বিষয়টি আরও জোরালো ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে :

يٰاَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

> হে মানব জাতি, আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে পয়দা করেছি; এরপর গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পার। আল্লাহর দৃষ্টিতে-তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে। (৪৯:১৩)

জনগণ ও জাতির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে, তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। এ বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে উন্নততর ও কল্যাণকর মত বিনিময়ের পথ প্রশস্ত করতে পারে। তথাপি পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্র্যের ধারণার অর্থ একজন নারী ও পুরুষ থেকে মানব জাতির সৃষ্টির মৌলিক ধারণার বিচ্যুতি বোঝাবে না। বহুত্ববাদের প্রকৃত অর্থ হল, ভিন্ন মত পোষণ অনুমোদন ও মতপার্থক্য সহ্য করা। এটি বস্তুত মানব অস্তিত্বের জন্য করা প্রয়োজন। তাই এটি হচ্ছে তাদের অধিকার, যারা ভিন্ন মত পোষণ করে, কেউ তাদেরকে এটি করা থেকে নিষেধ করবে না অথবা ভিন্ন মতকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে না।[১৪৩]

রাজনৈতিক দল গঠন অনুমোদনযোগ্য কি-না; সে সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম ইবনে তাইমিইয়া বলেন, যেসব দল জনগণকে সত্য ও কল্যাণের (খায়ের ওয়া হক) পথে আহ্বান জানায় এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করে-সেসব দল গঠন বৈধ। তিনি আরও বলেন যে, কুরআনের আয়াতে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে, যাতে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তারা হলো আল্লাহর দল এবং বস্তুত আল্লাহর দলই সফলকাম (৫৮:২২)।

আর বিপরীতে কুরআন শয়তানের দল (হিজব আল-শয়তান) হিসেবে উল্লেখ করেছে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাঃ অবাধ্য।

اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

www.pathagar.com

'তারা শয়তানের দল। জেনে রেখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত (৫৮:১৯)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিইয়া বলেন, এ ধরনের দল অথবা কোন দল বা সমিতি ইসলামের শিক্ষাকে অস্বীকার করলে, তারা হিজব আল-শয়তানের অর্থের মধ্যে পড়বে, তাই এ ধরনের দল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১৪৫] উপরন্তু মুহাম্মদ আল-গাযালী বলেছেন, ইসলাম এ শর্তে রাজনৈতিক দল গঠনকে অনুমোদন করে যে; তারা মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা করবে না। তবে তিনি বলেন, যদি উম্মাহকে বিভক্ত করার লক্ষ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে; তাহলে দল গঠন হবে অবৈধ।[১৪৬]

আইন ও ধর্মতত্ত্ব-স্কুল (মাযহাব) শিক্ষার বিকাশের ইতিহাসে ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে মতপার্থক্য ও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণের ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। আমরা জানি যে, রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন, কোন ব্যক্তি সত্য উদঘাটনের জন্য ইজতিহাদ করলো; কিন্তু সে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হলো না, তা সত্ত্বেও তার এ প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য, আর যদি সে সত্য উদঘাটনে সক্ষম হয়, তাহলে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।[১৪৭]

ইসলামি আইন সংক্রান্ত আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ'তে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই এমন সব বিষয়ে আইনগত ভিন্নমত ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের আরেক নাম হচ্ছে ইজতিহাদ। এল আওয়া (El-Awa) বলেছেন, 'রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে দল ও গ্রুপের ইতিহাস।'[১৪৮] এমনকি সাহাবীদের রা:যামানায়ও উপদল, দল ও গোষ্ঠীর উত্থানে কখনো বাধা প্রদান করা হয়নি এবং নিছক কোন পক্ষ অবলম্বনের জন্য তাদেরকে কেউ নিন্দাও করেননি। এ ধরনের দলের উত্থানের সমালোচকরা সব সময়ই দলগুলোর আদর্শ, কার্যক্রম এবং লক্ষ্য– উদ্দেশ্য কি সেদিকেই দৃষ্টি দিতেন এবং সে অনুসারেই সেগুলোকে মূল্যায়ন করতেন। উপরন্তু মতপার্থক্যের বিজ্ঞান (ইলম আল-ইখতিলাফ) নামে ইসলামি শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট শাখা বিকশিত হয়। মাযহাব সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে এ শাখা বিকাশকে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে বহুত্ববাদ ও সহনশীলতার একটি বাস্তব প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। [১৪৭]

কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যাখ্যা দান ও ইজতিহাদকে বৈধতা প্রদান করেছে-সেই সাথে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে ভাল ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা (তা'আউন) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কার্যকর সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন ঐক্য ও সংগঠন এবং এ বিষয়ে কুরআন স্পষ্টভাষায় মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে:

www.pathagar.com

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

"সৎ ও কল্যাণকর কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে, তবে অন্যায় ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কোরনা (৫:২)।

এ আয়াত ভাল কাজে (আল-বিরর) সহযোগিতা করার ব্যাপারে আমাদের মূল বক্তব্য সম্পর্কিত এবং হিসবাহ'র মতো ব্যাপক অর্থবোধক যা রাজনৈতিক দল গঠন, পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা অথবা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার লক্ষ্য হচ্ছে- সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করা এবং শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণ আচরণ করা।

খারাপ কাজে সহযোগিতা হচ্ছে পাপ ও সীমালংঘন। এর একটি উদাহরণ হলো- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র বিক্রি বন্ধ করে দেয়া। উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের মধ্যেকার এ ধরনের সহযোগিতা অত্যন্ত অনিষ্টকর, এমনকি এতে জনগণের প্রতি বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়াহর মতে, এমন পরিস্থিতি হলে সরকার ন্যায্য বাজারমূল্যে (কি'মাত আল-মিসল) পণ্য সরবরাহ করতে সরবরাহকারীদের বাধ্য করবে। এক্ষেত্রে সরকার কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ অনুসারে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা, যেমন পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন উচ্চ বেতন ও পণ্যের দাম বাড়াতে পরস্পরের সাথে অথবা মুদা ফরাসের সহযোগিতা করলে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে বাজার নিয়ন্ত্রক (ওয়ালি আল-হিসবাহ) ন্যায্য বাজার মূল্যে পণ্য ও সেবা প্রদানে তাদেরকে বাধ্য করবেন।[১৪৯]

আমরা পবিত্র কুরআনে একটি সুনির্দিষ্ট আয়াত দেখতে পেয়েছি-মুফাসসিরগণ যাকে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দানের দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে আয়াতটিতে বলা হচ্ছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো কাজে নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করবে তাঁরাই সফলকাম হবে (৩:১০৪)।

www.pathagar.com

এ আয়াতে হিসবাহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য প্রকাশ এবং সমাজের সদস্যদের নৈতিক ও বস্তুগত কল্যাণ লাভের উপায়-উপকরণ সংগ্রহের জন্য এক বা একাধিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। একথা বলা যায় যে, এ আয়াতে দল গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তা হিসবাহ সম্পাদন সম্পর্কিত নয়। বরং আয়াতটির সূচনা হয়েছে এ বিষয়ে একটি নতুন উপাদান দিয়ে, যা হিসবাহ সম্পর্কে কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে একে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে- মুসলিম সমাজে অন্তত একটি দল অবশ্যি গঠন করতে হবে; যাঁরা আয়াতটির পরবর্তী অংশে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এখানে 'উম্মাহ' শব্দের অর্থ হবে একটি দল, একাধিক দল, অথবা জামা'আত, সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হলেও; এখানে তা মুসলিম সমাজ বুঝাচ্ছে না। এ আয়াতের শব্দ প্রয়োগ প্রণালীতেই এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থের বিষয়টি পুনরায় সমর্থিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে মুসলমানদের একটি দল অবশ্যি থাকতে হবে; তবে মুসলমানদের অবশ্যি একটি পক্ষ হতে হবে, তা নয়। [১৫০] উপরন্তু আয়াতটি 'ওয়ালতাকুম' (তোমাদের মধ্যে অবশ্যি থাকবে) শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যা একটি আদেশ। তাই অধিকাংশ আলেমের মতে: দল গঠন হচ্ছে একটি অবশ্যকরণীয় কাজ, সমাজ সাধারণভাবে এ ধরনের দল গঠন করবে। [১৫১]

উল্লিখিত দলটিকে রাজনৈতিক দল হতে হবে; যা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সরকারের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও এর কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার অধিকারের চর্চা করবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় জানা যায়- আলোচিত আয়াতের অন্যতম মূল বক্তব্য খায়েরের প্রতি (ভালো কাজে) আহ্বান জানানোর দায়িত্ব একটি সমিতি দল বা সংস্থা পালন করতে পারে এবং তার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য নয়। হিসবাহ'র অন্যতম প্রধান দিক হলো- সরকারের জবাবদিহিতায় উৎসাহ প্রদান। অসৎ ও খারাপ কর্মকর্তাদের অবশ্যি তিরস্কার করতে হবে এবং কেবল একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তা করা সম্ভব। [১৫২]

আমরা দেখতে পেয়েছি যে আলোচ্য আয়াতে একটি না একাধিক দল থাকবে তা বলা হয়নি। অন্তত একটি দল থাকা অত্যাবশ্যক; কিন্তু আয়াতটিতে একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না, এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। কারণ 'উম্মাহ' শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের আকারে গঠিত, যা একটি ধারণাকে বৈধতা প্রদান করেছে, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাকে নয়।এখানে এ বৈয়াকরণিক ব্যবহার সেদিকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; যা আমি হিসবাহ'র বিষয়ে আলোচনাকালে একাধিকবার উদ্ধৃত করেছি। এতে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"তোমাদের কেউ কোন খারাপ বা অন্যায় কাজ হতে দেখলে তাকে হাতের সাহায্যে তা রোধ করতে হবে।যদি তা করতে সমর্থ না হয় তাহলে তাকে কথার মাধ্যমে তা বন্ধ করতে হবে।সে যদি তাও করতে না পারে তাহলে তাকে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে,কিন্তু এটি হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।"[১৫৩]

এই হাদিসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনেক মন্তব্য রয়েছে, যা আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকও; কিন্তু আমি এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবো না, এটুকু বলাই যথেষ্ট যে- 'খারাপ বা অন্যায়' (মুনকার) শব্দটি একবচন কিন্তু এর অর্থ এক ধরনের খারাপের মধ্যে সীমিত থাকেনি। আমার উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতের 'উম্মাহ' শব্দটি যেকোন ধরনের এক বা একাধিক দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই দেখা যাচ্ছে যে একটি বা একাধিক দল গঠন বৈধ, তবে কেবল একটি দল গঠিত হলেই সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া) পালন হয়ে যাবে। একটি দল গঠিত হবার পর সমাজের অন্য সদস্যরা তাদের বৈধ লক্ষ্যার্জনে দ্বিতীয় দল গঠন করতে চাইলে তারা তা করতে পারবে এবং কেউ তাদের এটি করা থেকে বাধা দিতে পারবে না। [১৫৪]

কুরআনে বহুদলের আরো স্বীকৃতি রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সঠিক হিদায়াত পাবার পর কিছু লোক বুঝতে পারে ও আন্তরিকভাবে তা অনুসরণ করে কিন্তু সব সময়ই কিছু লোক থাকে- যারা এর বিরোধিতা করে এবং এরপরও আরেক ধরনের কিছু লোক থাকবে যারা মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতে পারে:

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ

> এরপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি, যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী (৩৫:৩২)।

লোকদের ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্য ও মেধা থাকবে এটি স্বাভাবিক এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিশ্রুতিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাই দেখা যায়- যারা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ও নিবেদিত, তারা নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে। তারা লোকদের বিবেকের কাছে আবেদন জানাতে পারে এবং ভালো কাজে জনসমর্থন পেয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণিত কুরআনের আরেকটি আয়াতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে :

www.pathagar.com

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে (অন্যায়) আচরণ থেকে তারা (অমুসলিম) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন? (৯:১২২)

কুরআনের এ উদ্ধৃত আয়াতে দেখা গেছে যে, যথার্থ ও কল্যাণকর বলে বিবেচনা করে কোন লক্ষ্যার্জনে ব্যক্তিবর্গ আত্মনিয়োগ করলে তাদের প্রধান কাজ হবে লোকদেরকে সে ব্যাপারে সতর্ক ও স্মরণ করানো। এ লক্ষ্য ভালভাবে অর্জন করতে এবং অনিষ্টের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে তারা ধর্মীয় জ্ঞানের বিস্তার, বিকাশ অথবা অনুরূপ অন্যান্য কল্যাণকর লক্ষ্যার্জনে দল, কমিটি বা সমিতি গঠন করতে পারে।

রাসূল সা. মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। সে সময় কুরআন রাসূল সা. কে অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমাজের লোকদের সাথে সলাপরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয় (৩:১৫৯)। এতে দেখা যায় যে, শূরা হলো ইসলামি সরকারের একটি সাধারণ নীতি, এমনকি খোদ রাসূল সা. এর জন্যও তা মেনে চলা প্রয়োজন ছিল। কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময়ের ভিত্তিতে শূরার কার্যক্রম পরিচালিত হয় কারণ- বিশেষ করে কুরআন-হাদিসে যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সেসব বিষয়ে লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তাই তারা যেসব পরিকল্পনা ও ধারণাকে তাদের জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচনা করে; তার পিছনে তাদের সমর্থন জানানোর সুযোগ প্রদানের এটিই হচ্ছে একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। সাংবিধানিক বিষয়সমূহ, সরকারের ধরন ও নীতিমালা এবং আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি-ইত্যাদি ক্ষেত্রের লক্ষ্য সমাজের ঐক্য ও সাফল্য অথবা বিভক্তি ও ব্যর্থতার ভিত্তি ও হতে পারে। কিন্তু এসবই নির্ভর করে কার্যকর সংগঠন, দক্ষ নেতৃত্ব ও জনসমর্থনের ওপর। অতএব এসব কিছুই যদি ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো মাত্র একটি কাট্যাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে- মুসলমানরা ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, দল গঠনের এ ধারণা গ্রহণযোগ্য হবেনা; কারণ তা হবে বিষয়টির অতিসরলীকরণ।[১৫৫] আর যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে নজর দেই তাহলে দেখতে পাবো যে, এ ধরনের

www.pathagar.com

নিষ্ক্রীয় আচরণ-তা যদি ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়- অথবা কার্যকর ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের প্রশ্ন-বিস্মৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়, তাহলে তা স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত ও ইসলামের উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হবে না।

কুরআন অন্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে উৎসাহিত করেছে; তবে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গোপন বৈঠক করাকে অনুমোদন করেনি। সভা-সমাবেশ অথবা সমিতি করার বৈধ ভিত্তি কি হবে-সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে :

لاَخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعْرُوْفٍ اَوْاِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

লোকদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শে কোন কল্যাণ থাকে না, তবে যদি কেউ গোপনে সদকা ও দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় অথবা কোন সৎ কাজের জন্য বা জনগণের পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে অবশ্য এটি ভালো কথা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করবো (৪:১১৪)

উপর্যুক্ত আয়াতে তিন প্রকার সমিতি করার বিষয় অনুমোদন করা হয়েছে। তা হল : দাতব্য কাজ ত্বরান্বিত করা, সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কোন্নয়ন। কুরআনের ভাষ্যকারগণ (মুফাসসিরগণ) এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় (তাফসিরে) বলেছেন, এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষ তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। অতএব জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, বিশেষ করে বিভেদ-বিভ্রান্তি দেখা দেয়ার ফলে অসাধুতার বিস্তার ঘটার আশংকার প্রেক্ষাপটে সংগঠন করার বিষয়কে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনেক হাদিসে জনগণকে বিচ্ছিন্নতামুখী প্রবণতার সময় ঐক্যবদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাহমুদ আলুসি এ সম্পর্কিত হাদিসের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৫৬] সংগঠন ও সমিতির সঙ্গে জনকল্যাণ জোরদারের যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে, আর এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে মানবজাতির বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি জোরদার করা।[১৫৭]

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, তাই সকল সংগঠনের লক্ষ্য ও কার্যক্রম অবশ্যই বৈধ কল্যাণ জোরদারের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের এটিই হল মূল কথা :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَاتَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالاِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوْا ... اِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطنِ .

> হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বল, তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানির কথাবার্তা নয় বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথাবার্তা বল;... কানা-ঘুঁসি করা তো শয়তানের কাজ (৫৮:৯-১০)।

এছাড়া লোকেরা যখন কোন অভিন্ন লক্ষ্যে একত্রে সমবেত হবে, তখন তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। এখানে কুরআন শৃঙ্খলাকে ঈমান ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছে। জন-সমাবেশে যারা এসব নীতির কথা স্মরণ রাখে তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। এক আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَاقِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِيْ المَجلِسِ فَافسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا العِلْمَ دَرَجتٍ .

> হে ঈমামদার লোকেরা, তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি কর, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের প্রশস্ততাদান করবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা তোমরা কর, আল্লাহ বিষয়ে পূর্ণ অবহিত' (৫৮:১১)।

তাই জন-সমাবেশ ও সংগঠনসমূহে যোগদানকারী ব্যক্তিদেরকে শান্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে যেসব অনুরোধ জানানো হবে, তাদেরকে সে ব্যাপারে যথাযথ সাড়া দিতে হবে। যেসব লোক জন-সমাবেশ স্থল ব্যবহার করবে, তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐস্থান ব্যবহারকারী অন্যদের যেন কোন অসুবিধা না হয় এবং

সমাবেশের জন্য হুমকি বা ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন কিছু করা কারোর উচিত হবে না।[১৫৮] কুরআনের এ আয়াতের তাফসিরে আরও বলা হয়েছে যে, কোন বড় নেতা সমাবেশে উপস্থিত হবার সময় সমবেত লোকদেরকে বিশৃঙ্খলভাবে সামনে এগুবার জন্য চাপ দেয়া যাবে না, এতে ঐ নেতার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়তে পারে। এছাড়া সমাবেশে যোগদান করার সমাধিকারসম্পন্ন অন্য লোকদেরকে সমাবেশে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না।[১৫৯]

পবিত্র কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, কোন উদ্দেশ্যে লোকেরা কোথাও সমবেত হওয়ার পর নেতার অনুমতি ছাড়া তাদের কারোর সে স্থান ত্যাগ করা উচিত হবে না।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى امْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَاذِنُوْهُ ... فَإِذَا اسْتَاذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ.

> তবে মূলত মুমিন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহ ও রাসূলকে (সা:) অন্তর হতে মেনে নেয়। আর কোন সামাজিক সামগ্রিক কাজে তারা যখন রাসূলের (সা:) সঙ্গে একত্রিত হয়; তখন তার অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। ... অতএব তারা যখন নিজেদের কোন কাজের কারণে অনুমতি চাইবে; তখন তুমি যাকে ইচ্ছা যাবার অনুমতি দান কর ...(২৪:৬২)

অতএব সভা-সমাবেশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যি যথাযথ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এর একটি উদ্দেশ্য থাকবে এবং তা অর্জিত হবার পরই কেবল এর সমাপ্তি টানতে হবে, কখন সভা-সমাবেশ সমাপ্ত করা হবে এবং যোগদানকারী ব্যক্তিরা চলে যেতে পারবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নেতার।

উপসংহারে আমি একথা বলতে পারি যে, শরীয়া সমাজের কল্যাণ অর্জনে রাজনৈতিক দল ও অরাজনৈতিক সমিতি-উভয় ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করাকে বৈধতা প্রদান করেছে। এটাও সত্য যে, এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনে সব ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপকে ইসলাম সমর্থন ও অনুমোদন করেছে। আলোচ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুমোদিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট (মাসালিহ মু'তাবারাহ) বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হলে তার প্রতি শরীয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি থাকবে, তখন তা অর্জনের উপায়ের ক্ষেত্রে শরীয়া মূল্যপ্রাপ্ত হবে এবং শরীয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে পর্যায়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়, এক্ষেত্রে তা সে ধরনের গুরুত্ব পাবে। কোন দল,

www.pathagar.com

সমিতি অথবা সোসাইটির ভাল অথবা মন্দ দিক বিচার করা হয় তারা যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তার ভিত্তিতে। কোন দল বা সমিতি যদি শরীয়ার পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবোধ যেমন- জীবন, ধর্মবিশ্বাস, মাল সম্পদ, বুদ্ধিজ্ঞান ও বংশধারার কোন একটির সুরক্ষা ও উন্নয়ন করতে চায়-তাহলে তাদের কাজ অবৈধ বলার প্রশ্ন উঠবে না এবং তা বাস্তবায়নে যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তা বৈধ বলে গণ্য হবে। কোন দল বা সমিতি তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করে, শরীয়ার সাধারণ লক্ষ্যসমূহ (মাকসিদ আল-শরীয়া) এবং সমাজের অবারিত স্বার্থের (আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ) আলোকে তার মূল্যায়ন করা হয়। পরের কথাটির আরবিতে সুনির্দিষ্ট অর্থ আগে ভাগে দেয়া সম্ভব নয় কারণ- উদ্ভূত পরিস্থিতি, নতুন ঘটনাবলি ও সমস্যা যা নিরূপণ করা হয় আর এসব সমস্যা দেখা দেয়ার পর তা বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।[১৬০]

কোন দল বা সমিতি যদি সন্দেহজনক, গোষ্ঠী স্বার্থ ও অনিষ্টকর উদ্দেশে গঠিত হয়-যা অনৈক্য, বিভেদ ও সংঘাতের সৃষ্টি কওে, তাহলে তাদের তৎপরতা একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে; যা শরীয়ার বৈধতার মান অর্জন করতে পারবে না। এসব দল ও সমিতির বিরুদ্ধে ফিতনা বা বিদ্রোহের আইনি বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।

৯. ধর্মীয় স্বাধীনতা *(আল-হুররিয়াত আল-দীনিয়া)*

ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম প্রমাণ হলো: কোন ধরনের জোরজবরদস্তি ব্যতিরেকে নিজের পছন্দমত ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। এছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ ভয়ভীতি অথবা বাধা ছাড়াই নিজ নিজ ধর্ম পালন ও চর্চা করার স্বাধীনতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামি বিধান অনুযায়ী অমুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না এবং তাদের ধর্ম পালনে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টিও করা যাবে না। মুসলিম-অমুসলিম উভয় সম্প্রদায় তাদের নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে এবং যে কোন ধরনের আক্রমণ বা বিদ্রোহজনোচিত উস্কানী (ফিৎনা) থেকে তা রক্ষা করার অধিকার তারা ভোগ করবে। এ আক্রমণ নিজ সম্প্রদায় বা অন্য যেকোন পক্ষ থেকেই হোক না কেন।[১৬১]

ইসলামি আইনগত বিধান শরীয়ায় ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিধানে ধর্মীয় ও আইনগত রীতিনীতির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য টানা

www.pathagar.com

হয়নি। ইসলামি বিধি বিধানের মূলে রয়েছে শরীয়ার বহু নীতি ও শিক্ষা। তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করা বা না করার স্বাধীনতার বিষয়টি।[১৬২] অবশ্য কেবল এ বিষয়টি ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক অর্থ ও বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। কেউ ইসলামি দৃষ্টিকোণ অথবা অন্য কোন আইনের আলোকে ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতার কথা বললো কি বললো না-সেটা কোন বড় কথা নয়। স্বাধীনতার মৌলিক ধারণায় কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে কোন কিছু আরোপ করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যান্য স্বাধীনতার মতো ধর্মীয় স্বাধীনতাও শক্তিধরদের সম্ভাব্য নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। ইসলামের স্বাধীনতার ধারণার দৃষ্টিতেও এ বিষয়টি সত্য। ফাতহি উসমানের মতে, "ইসলামি রাষ্ট্রের কোন শক্তিই লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। এক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো কোন শক্তি জনগণকে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে কিনা-তা দেখা এবং প্রতিরোধ করা।"[১৬৩]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে এ মজার বিষয়টি চোখে পড়বে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুশরিকদের বৈরি আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কি হবে-তা জানার পরও তাদেরকে নতুন ধর্মের পথে আসার দা'ওয়াত দেন। এ ঘটনা আল-ইলি নির্দেশিত উপসংহারে আসার প্রতি সমর্থন জানায় যে, যুক্তি ও সত্যের ভিত্তিতে লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়েও; এতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ইসলাম তার ঊষালগ্ন থেকে প্রদান করে আসছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলাম যদি তার নিজস্ব সূচনাকালের নীতিতে অটল থাকে, তা হলে সে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে অনুমোদন করবে বলে আশা করা যায়।[১৬৪] আলেমগণ এ নীতিকে গ্রহণ ও সমুন্নত রেখেছেন : উসূলে ফিকহ ও তাওহীদ বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়েছেন যে, কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান না আনলে তা বৈধ হবে না। তাই জোর করে ধর্মান্তরকরণ করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৬৫] প্রখ্যাত হাম্বলি ফকিহ ইবনে কুদামাহ অনুরূপ মত প্রকাশ করে লিখেছেন :

> 'অবিশ্বাসীদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোন অনুমতি প্রদান করা হয়নি।' উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোন অমুসলিম নাগরিক (জিম্মি) অথবা নিরাপত্তা হেফাজতে অবস্থিত (মুস্তা'মান) ব্যক্তিকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলে; সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে না। তবে মতামত জানানোর আগেই

www.pathagar.com

> যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তাকে অমুসলিম বলে গণ্য করা হবে। ... এ বিরোধিতার কারণ হলো মহান আল্লাহতা'আলার বাণী:"ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই।"[১৬৬]

উপরের অনুচ্ছেদে ইবনে কুদামাহ কুরআনের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা আমাদের এ আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং আমি পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোকপাত করবো। আমি এখানে কয়েকজন আধুনিক লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই। এসব গ্রন্থের জন্য উৎসগুলো থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রশ্নে পুরোনো ও আধুনিক লেখকদের রচনায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো যে, প্রবীণ লেখকগণ এ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এমন পূর্বেকার অনেক আয়াত পরবর্তীকালের অধিকতর কড়াকড়ি আয়াতের দ্বারা রহিত বা বাতিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে, আধুনিক লেখকগণ এ ব্যাপারে তাদের এ যুক্তিকে দুর্বল বলে নাকচ করে দিয়েছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের অভিমত জানা যাবে। ইসলামি আইনের ওপর অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ সম্পর্কিত অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সৌদি আরব ও ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ এতে অংশ নেন। ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে প্রত্যেকে স্বাধীন। ধর্ম গ্রহণে কারোর ওপর জোরজবরদস্তি করা বেআইনি কাজ। কুরআনের আয়াতের আলোকে এ বিবৃতি প্রদান করা হয়। এ সব আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ .

"ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই" (২:১৫৬)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِى الاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ

النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ .

"তোমার আল্লাহ চাইলে দুনিয়ার সব মানুষ ঈমানদার হয়ে যেতো, তুমি কি লোকদের ঈমান আনতে জোরজবরদস্তি করবে? (১০:৯৯)[১৬৭]

www.pathagar.com

মক্কা মুয়ায্যামায় নবুওতের প্রথম দিকে এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল। রাসূল সাঃ মদীনায় হিজরত করার পরও এ নীতি সমর্থিত ও স্বীকৃত হয় পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে, সূরা আল-বাকারায় (২:২৫৬)। এভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি শরীয়ার একটি বিধান (আসল আল-তাশরি) হিসেবে কাল ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে অব্যাহতভাবে ঘোষিত হয়ে এসেছে।[১৬৮]

১৯৫২ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত 'উলামা' কনভেনশনে কুরআনের এ বিধানকে সমুন্নত রাখা হয়। 'ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি' শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয় ঐ সম্মেলনে। এ বিবৃতিতে নিম্নলিখিত ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় : প্রত্যেক নাগরিক সব ধরনের অধিকার ভোগ করবেন... আইনের আওতায় তাকে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে...।'[১৬৯] অনুরূপভাবে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ প্রণীত সার্বজনীন ইসলামিক মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয় : 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করবেন' (ধারা-১৩)[১৭০]। মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানসহ সমসাময়িক অনেক মুসলিম দেশের সংবিধানে এ ধরনের বিধান সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে গৃহীত মালয়েশিয়ার ফেডারেল সংবিধানে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' শীর্ষক ধারায় (২) বলা হয় : (১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্ম গ্রহণ ও পালন করার অধিকার ভোগ করবেন এবং তা প্রচার করতে পারবেন (উপধারা-৪); (২) যে কর থেকে অপরের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হবে, তা দিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না।

এ ধারার (৩) উপধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় ব্যবস্থাপনার অধিকার ভোগ করবে, তারা ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে এবং এ লক্ষ্যে সম্পদ সংগ্রহ ও এর মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে। উপধারা (৪) এ বলা হয়েছে, রাজ্যের আইন এবং কুয়ালালামপুর ও লুবানের মতো ফেডারেল অঞ্চলে ফেডারেল আইন ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যেকোন ধর্মীয় মতাদর্শ বা ধর্ম প্রচার নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

মালয়েশিয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনাম জামালুদ্দিন বিন উসমানের মামলায়[১৭১] মালয়েশিয়ার সুপ্রিমকোর্ট ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আখ্যায়িত করে পেশ করা মন্ত্রীর আপিলকে খারিজ করে দিয়ে সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারাকে সঠিকার্থে সমুন্নত রাখেন। এ মামলায়

www.pathagar.com

আসামি জামালুদ্দিনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন ৮(১), ১৯৬০ এর আওতায় আটক করেন। প্রকৃতার্থে এটি ছিল স্বধর্ম ত্যাগের ঘটনা। অথচ তার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অপরাধ করার অভিযোগ দায়ের করা হয়। মূলত আসামিকে মালয়েশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো তৎপরতার দায়ে আটক করা হয়।'[১৭২] ইসলাম ত্যাগ করে নিজে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ এবং মালয়েশিয়ার মুসলিমদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করার অভিযোগ দায়েরের কারণে জামালুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। আরও অভিযোগ করা হয় যে, এক্ষেত্রে তিনি কর্মশিবির ও সেমিনারে অংশ নেন এবং এসব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে তিনি ছয়জন মালয়ীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। আসামি আদালতে আরয করেন যে, মন্ত্রী বিনা বিচারে তাকে আটক রাখতে পারেন না, তার সে ক্ষমতা নেই। বাদীর রিট আবেদনের জবাবে কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট-এর ট্রায়াল জজ বিচারপতি আনোয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন, 'কোন ব্যক্তিকে তার পছন্দের ধর্ম গ্রহণ ও চর্চা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন ক্ষমতা মন্ত্রীর নেই। ফেডারেল সংবিধানের ১১নং ধারায় এর গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। তাই মন্ত্রী ধর্ম গ্রহণ ও পালনের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চাইলে তার কাজ সংবিধানের ১১ ধারার পরিপন্থি বলে পরিগণিত হবে অতএব তার গ্রেফতারির আদেশ বৈধ বলে গণ্য হবে না।'[১৭৩] বিচারপতি আসামিকে মুক্তির আদেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ রায়ের বিরুদ্ধে কুয়ালালামপুর সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন এবং ফৌজদারি আপিল বিভাগ এ আপিল খারিজ করে দেন। এ রায়ের কারণ হিসেবে আদালত নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন :

> এ মামলায় আটকের প্রকৃত কারণ ছিল মালয়ীদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে আসামির অংশগ্রহণ। আমরা একথা মনে করিনা যে কোন ব্যক্তি কেবল সভা সমাবেশ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করলে দেশের নিরাপত্তার জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ছ'জন মালয়ীর কথিত ধর্মান্তরকরণ সত্যি হলেও আমরা একে দেশের জন্য কোন হুমকি বলে মনে করছি না।[১৭৪]

আপিল খারিজ করে দেয়ার সময় আদালত বলেন, এ মামলায় গ্রেফতারের যে কারণ দেখানো হয়েছে, সঠিক প্রেক্ষাপটে পাঠের সময় তা অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়; কেননা কোন ব্যক্তির কাজ স্বাভাবিকভাবে ধর্ম গ্রহণ ও চর্চার সীমার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার শীর্ষক ১১ নম্বর ধারায় দেয়া গ্যারান্টি অবশ্য সমুন্নত রাখতে হবে।

১৯৭৩ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান যে সংবিধান প্রণয়ন করে, দেশটিতে

এখনো তা কার্যকর রয়েছে। এর মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা অধ্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে :

> আইন, সরকারি আদেশ ও নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী (ক) প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ ধর্ম প্রকাশ, পালন ও প্রচার করার অধিকার ভোগ করবে (২) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও শাখা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করার অধিকার ভোগ করবে (ধারাঃ ২০)।

এছাড়া পাকিস্তানের সংবিধানে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর করারোপ, শিক্ষানীতি, তহবিল বরাদ্দ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ধারা : ২১, ২২, ৩৪)

এ বিষয়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে মুতাওয়াল্লি ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন : কেবল অপরের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মবিশ্বাসের নিছক অনুসরণ বা তার সাথে বাহ্যিক মিল থাকার কারণে নয়, দৃঢ় বিশ্বাস ও সুচিন্তিত পছন্দের ভিত্তিতেই ধর্মীয় বিশ্বাসের সৌধ নির্মিত হতে হবে। শরীয়া ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নিষিদ্ধ করেছে, কারণ ইসলাম প্রচারের জন্য কুরআন যে শোভন ও বিনম্র পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে, এটি তার পরিপন্থী। নিজের মন্তব্যের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণ পেশকালে এ লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিকের উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম শাসক ও গভর্নরগণ অমুসলিম প্রজাসাধারণের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে সাধারণভাবে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মুতাওয়াল্লি থমাস আর্নল্ড (Thomas Arnold) এর মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। থমাস আর্নল্ড অনুসন্ধান চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে বলে যে কথা বলা হয় তা সঠিক নয়; বরং সম্পূর্ণ মিথ্যা। থমাস আর্নল্ড তার গ্রন্থ “The Preaching of Islam”-এ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খ্রীস্টান ঐতিহাসিকগণ ইসলামের সত্যিকার মিশনারি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন[১৭৫] এবং এ কারণেই তারা ইসলাম প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে তরবারি ব্যবহারের ওপর জোর দেন। ইসলাম কেবল অস্ত্রের জোরে বিস্তার লাভ করেছে বলে বিবৃতি অত্যন্ত দুর্বল[১৭৬];কেননা আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যত্র ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে কেউ এর ঠিক উল্টো চিত্র দেখতে পাবেন। আর্নল্ড ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন : ‘এ অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণে এটি কোন নির্ধারণী উপাদান ছিল না,

www.pathagar.com

খ্রীস্টান ও মুসলিম আরবদের মধ্যকার সুসম্পর্কের ভিত্তিতেই তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[১৭৭] আর্নল্ডের লেখা থেকে আরও উদ্ধৃতি দেয়া যায় :

> উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে প্রথম হিজরিতে বিজয়ী মুসলমানরা খ্রীস্টান আরবদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিল। এ সহনশীল আচরণ পরবর্তী সময়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অব্যাহত থাকে। যেসব খ্রীস্টান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে তা করেছে। বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে খ্রীস্টান আরবদের বসবাস করার বিষয়টি এ সহনশীলতার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।[১৭৮]

মুতাওয়াল্লি তার মন্তব্যে বলেছেন, মুসলিম শাসকদের সহনশীলতার রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এমনটি হতে পারে এবং এর পিছনে ইসলামি আইনের মূলনীতির কোন সমর্থন ছিল না।[১৭৯] ইসলামের প্রাথমিক যুগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদা তাঁদের বাস্তব কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে কুরআনের বিধিবিধান অনুসরণে করেছেন; যাতে ব্যক্তির বিবেকের সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে আবু জাহরান ও মুতাওয়াল্লি-উভয়ই এ বিষয়টি যথার্থভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু জাহরানের মতে, 'প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ধর্মের ব্যাপারে কেউ যাতে কোনক্রমে জোর জবরদস্তির শিকার না হয়; সে ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।' তিনি এ ব্যাপারে একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন: একজন বয়স্ক খ্রীস্টান মহিলা খলিফা 'উমার ইবনে খাত্তাব রা: এর কাছে একটি আবেদন নিয়ে আসেন। 'উমার তার আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত দেন। কিন্তু ঐ মহিলা দা'ওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ পর্যায়ে খলিফা তাঁর দা'ওয়াত জোরজবরদস্তির পর্যায়ে পড়তে এ আশঙ্কায় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং নিম্নলিখিত ভাষায় তার অনুতাপ প্রকাশ করেন : 'হে আল্লাহ আমি তো তার প্রতি জোরজবরদস্তির কিছু প্রকাশ করিনি, আমি জানি ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। বিভ্রান্তি থেকে সত্যের ব্যাখ্যা প্রদান উচ্চকিত করা হয়েছে।' এভাবে খলিফা 'উমার একথাই প্রকাশ করেছেন যে কেবল মহান আল্লাহই ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে মানুষের মন মস্তিষ্কের বিষয়টি অবহিত।[১৮০]

খোলাফায়ে রাশেদার উদাহরণ ও আচরণে শরীয়ার বিধিবিধানের সঠিক উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছে, যাতে পরিষ্কারভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান

www.pathagar.com

করা হয়েছে এবং এ স্বাধীনতার কোন ধরনের লঙ্ঘন ও যে কোন ধরনের নির্যাতনকে বেআইনি বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৮১]

কুরআনে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে আপেক্ষিক সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কুরআন-এর অন্যান্য আয়াতের কারণে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন সময় এসব আয়াতের ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। উপরন্তু কতিপয় মুফাসসির যেসব আয়াতে জিহাদ ও অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে অনুমোদন করা হয়েছে, সেসব আয়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন; যদিও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত কুরআনের ঘোষনায় এসব আয়াত বাতিল হয়ে গেছে। মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান সংক্রান্ত হাদিসের অন্যান্য প্রমাণের যথার্থ বিবেচনা ব্যতিরেকে; একটি হাদিসের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে এ বিতর্ক আরো জটিল রূপ নিয়েছে। ঐ হাদিসে ধর্মত্যাগের সাথে সাথে বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কেউ দণ্ডিত হলেই কেবল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। ইংরেজি ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[১৮২] তাই আমি এখানে গৃহীত কতিপয় মন্তব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো, এর বাইরের অন্য বিষয়ে অযথা আলোচনা করবো না।

এস এ রহমান ইসলামে মুরতাদের শাস্তি (The Punishment of Apostasy in Islam) শীর্ষক এক নিবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহতে এ বিষয়ে যেসব তথ্য প্রমাণ রয়েছে, তার বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কুরআনে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি অথচ পবিত্র কুরআনে অন্তত ২০ বার এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এরপর এম এ রহমান মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের ঘোষণা দান সংক্রান্ত হাদিসের সনদ সূত্র বিশ্লেষণ করেছেন:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

'কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে হত্যা কর।'

এটি একক জাতীয় হাদিস (আহাদ); এস এ রহমান এই হাদিসের সনদে কিছু দুর্বলতা দেখতে পান। বস্তুত রাসূল সাঃ নিজে এবং তার সাহাবীদের রাঃ কেউই কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি এবং ধর্ম ত্যাগ করার কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেননি।[১৮৩] এ আলোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক বিশিষ্ট আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্মত্যাগ কোন দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। সাহাবীদের পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ও

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস ইবরাহীম আল নাখা'ই (মৃত্যু ৯৫/৭১৩) এবং হাদিসের ব্যাপারে 'মুমিনদের শাহজাদা' (আমীরুল মু'মিনিন ফি'ল হাদিস) বলে সুপরিচিত এবং আল-জামি আল-কবির ও আল-জামি আল-সগির শীর্ষক দু'টি হাদিস গ্রন্থের সংকলনকারী সুফিয়ান আল-সাওরী (মৃত্যু ১৬১/৭৭২) উভয়েই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুরতাদকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরে আসার দা'ওয়াত দিতে হবে এবং তাদেরকে কখনই মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তারা এমত প্রকাশ করেন যে, ধর্মত্যাগী ব্যক্তিবর্গ তাদের মনোভাব পরিবর্তন ও অনুতপ্ত হবে বলে যতদিন আশা জিইয়ে থাকবে; ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের পথে ফিরে আসার দা'ওয়াত দিয়ে যেতে হবে।[১৮৪] আব্দুল ওয়াহাব আল শা'রানিও আল নাখা'ল ও আল-সাওরীর অভিমতের উল্লেখ করে বলেছেন যে, ধর্মত্যাগীদেরকে অনুতপ্ত হবার জন্য স্থায়ীভাবে দা'ওয়াত দিয়ে যেতে হবে।[১৮৫] প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ শামস আল-দ্বীন আল-সারাখসি অবশ্য এ ব্যাপারে এতোটা স্পষ্টভাষায় না হলেও লিখেছেন, ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ ইহলৌকিক শাস্তির যোগ্য নয়। ধর্মত্যাগ সুনির্দিষ্ট শাস্তির (হাদ) বিধানযুক্ত কোন অপরাধ নয় বলে তিনি তার মত প্রকাশের সূত্রপাত করে বলেন, যখনই মুরতাদ অনুতপ্ত হবে; তখনই তার শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে :

> সাধারণত অনুতপ্ত হবার কারণে সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হুদুদ) মওকুফ হয় না; বিশেষ করে যখন জানাজানি হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম) তা জানতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাসড়কে ডাকাতির শাস্তি অনুতপ্ত হবার কারণে মওকুফ হয় না, তা মাফ হয় কেবল গ্রেফতারির পূর্বে মালিকের কাছে ডাকাতির মালামাল ফেরত দিলেই...। ধর্মত্যাগ এবং কুফরির পথে ফিরে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় অপরাধ, তথাপি এটি হলো মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার বিষয়, তাই এর শাস্তি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত (ফা'ল-জাযা 'আলাইহা মু'য়াখখার ইলা দার আল-জাযা) স্থগিত হয়ে গেছে। পার্থিব জীবনে যেসব শাস্তি কার্যকর করা হয়, তা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে, যেমন ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ, যার লক্ষ্য হচ্ছে জীবন রক্ষা করা...।[১৮৬]

আল সারাখসি যিনা, চুরি, মিথ্যা অপবাদ দান, মদ্যপান ও মহাসড়কে ডাকাতির মতো অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তবে তিনি এ তালিকায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগের বিষয়টিকে স্থান দেননি। মালিকি ফকিহ আল বাজিও (মৃত্যু, ৪৮৪ হিজরি) মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মত্যাগ একটি পাপের কাজ; যার কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান (হাদ) নেই এবং এ ধরনের পাপের শাস্তি কেবল

www.pathagar.com

স্বেচ্ছামূলক শাস্তি তা'যিরের অধীনে দণ্ডযোগ্য হতে পারে।[১৮৭] বিশিষ্ট হাম্বলি ফকিহ্ ইবনে তাইমিইয়াও মুরতাদের জন্য এ ধরনের শাস্তির ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দান করেছেন।[১৮৮]

আধুনিক বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে 'আব্দুল হাকিম আল-'ইলি ও ইসমাইল আল-বাদাবি মন্তব্য করেন যে, আল-নাখা'ইর যুগে ইসলাম কাফের ও মুরতাদদের দুশমনি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তারা মনে করেন যে, এ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে; উপরে বর্ণিত রাসূলের হাদিসের মর্ম তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এ হাদিসে; ধর্মত্যাগকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রাজনৈতিক এবং এর লক্ষ্য হলো ইসলামের চির শত্রুরা।[১৮৯] একই বিষয়ে মাহমুদ শালতুত কুরআনের প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, মুরতাদের জন্য কোন পার্থিব শাস্তি নেই। এক্ষেত্রে কুরআনে যে নির্দিষ্ট পাপের কথা বলা হয়েছে; তার শাস্তি কেবল আখেরাতের জন্য:

> ধর্মত্যাগ বা মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদিসের ওপর ফকিহ্গণ নির্ভরশীল। এ হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল সা: বলেছেন, যে ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা কর (মান বাদ্দালা দীনাহু ফাকতুলূহু)। এ হাদিসের ব্যাপারে আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। তাদের অনেকে একমত হয়েছেন যে, একটিমাত্র হাদিসের ভিত্তিতে এমন দণ্ডের বিধান (হুদুদ) স্থির করা সম্ভব নয়। আর সে কারণেই কেবল ধর্ম ত্যাগ করলে মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানানো যাবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা ও দুশমনি করা হলে এবং ইসলাম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিদ্রোহ (ফিতনা) রোধের মতো জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল; এ দণ্ড প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে। কুরআনের অনেক আয়াতে স্পষ্টত এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়েছে। এসব আয়াতে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৯০]

মাহমাসানির অভিমত হল, ইসলামে নিছক ধর্ম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না, এর সঙ্গে সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার মতো রাজনৈতিক কারণ জড়িত থাকলেই কেবল এ দণ্ড দেয়া হতে পারে। মহানবী সা: কেবল ধর্মত্যাগ করার কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেননি। এর অর্থ হল, একজন কেবল ধর্মত্যাগ করলেই তার মৃত্যুদণ্ড হবে না; তবে এর সাথে শত্রুদের সাথে হাত মেলান ও বিদ্রোহের মতো বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ সংশ্লিষ্ট থাকলে এ ধরনের দণ্ড দেয়া হতে পারে।[১৯১]

www.pathagar.com

মরহুম আয়াতুল্লাহ মুতাহারী ইসলামের চেতনার সঙ্গে কঠিন দণ্ডের অসঙ্গতি এবং ইসলামের বাণী প্রচারে এ ধরনের অপরিমিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, ইসলাম যে ধরনের ঈমান আনার দাবি করে, কারোর উপর বল প্রয়োগ করে তা আদায় করা সম্ভব নয়, যেমনটি কোন শিশুকে দিয়ে মুহূর্তেই জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সে যাতে এর সমাধান করতে পাওে, সেজন্য তার মন মস্তিষ্ককে অবশ্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে, ইসলামি ধর্মীয় বিশ্বাসও অনেকটা এ ধরনের।[১৯২]

সেলিম এল-আওয়া (Selim el-Awa) ধর্মত্যাগের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ'র মূলনীতির পুনরায় ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।" তিনি বলেন যে, বস্তুত কুরআন মুরতাদের শাস্তির ব্যাপারে একেবারেই নীরব ভূমিকা পালন করেছে এবং সুন্নাহর প্রমাণসমূহ ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।[১৯৩] এল-আওয়া বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন যে, সুন্নাহ'তে কেবল ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়নি; এর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বা হিরাবাহ'র সম্পর্ক থাকলেই কেবল এ দণ্ড দেয়া যায়। হিরাবাহ'র অর্থ হল ধর্মত্যাগের সাথে জাতি ও তার বৈধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুশমনি ও বিদ্রোহের অপরাধ। 'কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে হত্যা করা হবে',-হাদিসের এ বক্তব্য একটি সাধারণ (আম) নির্দেশ; যার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা (তাখসিস) দেয়া প্রয়োজন। এটি একটি সাধারণ নির্দেশ-যা এর উদ্দেশ্যের বাইরেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে, কেবল মুসলমান নয়, খ্রীস্টান থেকে ইহুদি বা ইহুদি থেকে খ্রীস্ট ধর্ম যারা গ্রহণ করবে, তাদের ক্ষেত্রেও একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আল-শাওকানি এ ব্যাপারে বলেন যে, এ হাদিসের সাধারণ উদ্দেশ্যকে কুরআন সীমিত করে দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, কেউ বিপদে পড়ে প্রকাশ্যে ধর্মত্যাগের কথা ঘোষণা করলেও, সে প্রকৃত পক্ষে ঈমানদার।[১৯৪] আল শাওকানি কতিপয় শাফেঈ ফকিহ'র সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন যে, তারা হাদিসের আক্ষরিক ও সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে ত্রুটিপূর্ণভাবে মনে করেছেন যে, নিজ ধর্মত্যাগী অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ড সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তিনি এ বিষয়ে বলেন যে 'এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইসলাম গ্রহণকারী অমুসলিদের ক্ষেত্রে এ হাদিসের আক্ষরিক অর্থ বাতিল হয়ে গেছে।'[১৯৫] উপরন্তু হানাফিগণ অন্য প্রসঙ্গে ও হাদিসের সাধারণ ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে বলেছেন, মহিলা ধর্মত্যাগীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, কেবল কারাদণ্ড দেয়া যাবে (কারণ হাদিসের ভাষায় পুরুষ লিঙ্গের ব্যবহার করা হয়েছে)। উসূল আল-ফিকহে ঘোষিত ব্যাখ্যাদানের বিধি অনুযায়ী এক সময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের (কা'তি)

বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়, এর কোন অংশ যদি অস্পষ্ট থাকে, তাহলে তা সন্দেহজনক (যন্নি) হয়ে পড়বে এবং এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যাদান ও সুনির্দিষ্টকরণ (তাখসিস) এর পথ উন্মুক্ত হবে। তবে এ কথা বলা যায় যে, আলোচ্য হাদিসের আরও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হতে পারে এবং ধর্মত্যাগের সাথে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার (হিরাবাহ) বিষয় জড়িত থাকলেই কেবল মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।[১৯৬]

ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানের সমর্থন রয়েছে, এমন দ্বিতীয় হাদিসের প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। এ হাদিসেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

لا يحل دَمُ اِمْرءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وَاِنِّى رَسُوْلُ اللهِ اِلاَّ بِاِحْدى ثَلاثٍ، اَلثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفس بِالنَّفس، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِه مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ .

> যে মুসলমান ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্তপাত নিষিদ্ধ, তিনটি ঘটনা ছাড়া, তাহল : বিবাহিত যিনাকারী, কোন মানুষকে হত্যাকারী, নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার (মুফারিক লিল জামাহ) সময় স্ব ধর্মত্যাগ কারী।[১৯৭]

এখানে লক্ষ্যণীয়, এ হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ধর্মত্যাগী তার সম্প্রদায়কেও অবশ্যই পরিত্যাগ করে (মুফারিক লি'ল জামা'আহ) এবং বৈধ নেতৃত্বের প্রতি হুমকি (চ্যালেঞ্জ) হয়ে দাঁড়ায়, আর এ কারণেই সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[১৯৮]

কুরআনে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার (হিরাবাহ) জন্য তিন পর্যায়ের শাস্তির বিধান রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো মৃত্যুদণ্ড (৫:৩৪)। ইমাম ইবনে তাইমিইয়া কুরআনের সঙ্গে এ হাদিসের বক্তব্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে বলেন যে, হাদিসে উল্লিখিত আলোচ্য শাস্তির বিধান ধর্মত্যাগের (রিদ্দাহ) জন্য নয়, চরম বিশ্বাসঘাতকতার (হিরাবাহ) মতো অপরাধের জন্য।[১৯৯] রাসূল সাঃ কেবল ধর্মত্যাগের কারণে কখনো কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি, এ বিষয়টি এ অভিমতের পক্ষে বড় সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হয়। কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর, পুনরায় তা ত্যাগ করলে রাসূল সাঃ তাদের কোন দণ্ড দেননি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নের ঘটনায়। বুখারী ও মুসলিম-উভয়েই তাদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থে এ ঘটনা

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ : جَاءَ اَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الِاسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ : اَقِلْنِي، فَأَبَى ثَلَاثَ مِرار فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

একজন বেদুঈন রাসূল সা: এর কাছে এলো এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কাছে বা'ইআত গ্রহণ করলো। পরের দিন সে আবার এলো, সে সময়ে তার শরীরে জ্বর ছিল। সে বললো, আমার অঙ্গীকার আমাকে ফিরিয়ে দিন, কিন্তু রাসূল সা: তিনবার তা করতে অস্বীকার করেন। তারপর রাসূল সা: বললেন, মদিনা হলো বায়ু প্রবাহিকার (হাপরের) মতো; যা খাদ নিংড়িয়ে ফেলে শুধু বিশুদ্ধটুকুই গ্রহণ করে।[২০০]

এটি ধর্মত্যাগের একটি স্পষ্ট ঘটনা। এ ঘটনায় রাসূল সা: আদৌ কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করেননি এবং বার বার ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও, বেদুঈনকে নিরাপদে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হয়।[২০১]

উপরন্তু কুরআনের নিম্নের আয়াতের সাথে উপরিউক্ত হাদিসের মর্মার্থ সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা আবারও ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে আরেকটি শক্ত যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا .

যারা ঈমান আনার পর আবার কুফরির দিকে ফিরে যায়, আবারও ঈমান আনে, এরপরও কুফরির দিকে ফিরে যায়, অত:পর সেই কুফরিতেই সম্মুখে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না, সৎপথও দেখাবেন না (৪:১৩৭)।

এখানে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ভুল হবার কোন উপায় নেই। প্রাথমিক কাজের শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হতো; তা হলে এ আয়াতে বার বার ঈমান আনা ও কুফরির পথে ফিরে যাবার প্রসঙ্গ হয়ত আসতো না। মজার ব্যাপার হলো যে, কুফরির পথে ফিরে যাবার প্রাথমিক উল্লেখের পর আবারও তা নিশ্চিত করা হয়েছে; এরপর "কুফরির মাত্রা বৃদ্ধির" কথা বলা হয়েছে। কেউ হয়ত ভাবতে

www.pathagar.com

পারেন যে, ধর্মত্যাগের প্রথম দৃষ্টান্ত মৃত্যুদণ্ডযোগ্য না হলেও বার বার ধর্মত্যাগের ঘটনায় এ দণ্ড দানকে উৎসাহিত করতে পারে। কুরআনে কি এ ধরনের শাস্তি দেয়ার কথা কখনও বলা হয়েছে?

রাসূল সাঃ ধর্মত্যাগকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ (হাদ) বলে গণ্য করেননি। অপরদিকে যারা ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করে এবং পরে আবার তা গ্রহণ করে, তখন অনেককে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ। তিনি ছিলেন উসমান ইবনে আফফান রাঃ-এর পালিত ভাই ও এক সময়ের ওহি লেখক। উসমান তার পক্ষে মধ্যস্থতা করার পর রাসূল সাঃ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এ ধরনের অন্যান্য ঘটনায় যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আল-হারিস ইবনে সুয়াইয়িদ ও মক্কার একদল লোক। এরা ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করেন। এরপর তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের প্রতিও ক্ষমাসুন্দর আচরণ করা হয়। ইবনে তাইমিইয়া এ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনা ও অনুরূপ অন্যান্য কাহিনী হাদিস বিশেষজ্ঞগণ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন।[২০২] ইবনে তাইমিইয়া আরও বলেন যে, রাসূল সাঃ এর ওফাতের পর সাহাবাগণ এ ব্যাপারে মতৈক্যে (ইজমা) পৌছেন। সে সময় মক্কা, মদিনা ও তায়েফের অধিবাসীরা ছাড়া অধিকাংশ আরব ধর্মত্যাগ করে, অনেকে আবার আবার নবী দাবি করে, তাদের মধ্যে ছিল মুসাইলিমা, আল-আনাসি ও তুলাইহা আল-আসাদি। তারা পুনরায় ইসলামের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত আবু বকর আল সিদ্দিক রাঃ ও অন্যান্য সাহাবী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইসলাম ত্যাগের জন্য তাদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি এবং একজনকেও হত্যা করা হয়নি। ইমাম তাইমিইয়া একে সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেন। ।[২০৩]

ধর্ম প্রচারের উপায় হিসেবে ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে কিনা-প্রশ্নের জবাবে অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কেবল ধর্মপালনের স্বাধীনতার হেফাযত এবং যুলুম নির্যাতন রোধের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কুরআন ধর্মীয় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি (ফিতনা) এবং ধর্মবিশ্বাসের কারণে লোকদের নির্যাতন করাকে নিষিদ্ধ করেছে। আবু যাহরাহ'র মতে, কুরআন ফিৎনাকে হত্যার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। তাই কুরআন স্বৈরতন্ত্র ও ফিৎনা রোধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ . وَيَكُوْنَ
الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا

'এবং ফিৎনার অবসান না ঘটা এবং দীন একান্তভাবে আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। অত:পর তারা যদি বিরত হয়, তবে যালিমদের ছাড়া কারো ওপর কঠোরতা অবলম্বন বৈধ হবেনা।' (২:১৯৩)।

এ আয়াতের আলোকে আবু ঐাহরাহ এ উপসংহার উপনীত হন যে, কেবল ধর্মের স্বাধীনতার হেফাযত ও ধর্মীয় বিষয়ে যুলুম নির্যাতন রোধের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে।[২০৪] তিনি তার এ অভিমতের পক্ষে কুরআনের আরেকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। এ আয়াতে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ

'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেইসব লোক যাদেরকে বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের অপরাধ ছিল এতটুকুই যে,তারা বলতো, 'আমাদের রব আল্লাহ।'(২২:৩৯)।

এ দুটি আয়াতের প্রথমটির ব্যাপারে রশিদ রিযা তাঁর মন্তব্যে বলেন, এ আয়াত সূরা আল-বাকারার (২:২৫৬) আয়াতের ঘটনাকে নিশ্চিত করেছে। উভয় আয়াতে ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উভয় আয়াতে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালনের ব্যাপারে লোকদের স্বাধীনতার অধিকারের ঘোষণাদান ও একে সমুন্নত করা হয়েছে। কাউকে তার নিজের ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা যাবে না অথবা ধর্মের কারণে কাউকে শাস্তি প্রদান অথবা যুলুমের শিকারে পরিণত করা যাবে না।[২০৫]

সূরা আল-বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে (২:২৫৬) ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্টভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে:

لاَ اِكْرَاهَ فِىْ الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى.

'দীনের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত গুমরাহি হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে ঈমান আনলো; সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো, যা কখনও ছিঁড়ে যাবার নয়।'

আনসারদের মধ্যকার কতিপয় সাহাবী রাসূল সা: কাছে ইসলাম গ্রহণে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে বাধ্য করার অনুমতি চাওয়ার সময়-এ আয়াতখানি নাযিল হয়।

www.pathagar.com

এসব ব্যক্তির মধ্যে অনেকে শৈশব থেকে খ্রীস্টান বা ইহুদি ধর্ম পালন করে আসছিল এবং মদিনার ইহুদি গোত্র বনি নজিরের সাথে অনেক সাহাবীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তবে ইহুদি পিতামাতা যাদেরকে লালন-পালন কওে, কেবল তাদেরকেই ইহুদি বলে গণ্য করা হতো। রাসূল সাঃ মুসলমান ও বনু নজিরের মধ্যে সংঘর্ষ রোধের লক্ষ্যে তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিলে কতিপয় সাহাবী এর পরিবর্তে তাদের আত্মীয়স্বজনকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে চাইলেন। এ সন্ধিক্ষণে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল সাঃ ধর্মের ব্যাপারে কারোর ওপর জোরজবরদস্তি না করার নির্দেশ দেন এবং কোন্ ধর্ম তারা অনুসরণ করবে সে বিষয়টি স্থির করার ভার তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দিতে বলেন।[২০৬]

ইবনে কাসির ও রশিদ রিযার মতো কুরআনের মুফাস্সিরগণ মনে করেন যে, এ আয়াতে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, দীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, কেননা কোন ব্যক্তির মন মস্তিষ্ক সত্যের আলো ও নির্দেশনা থেকে রুদ্ধ রেখে জোর করে এটি করা হলে; তার জন্য তা কোনই কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে রশিদ রিযা বলেন, ইসলামের স্তম্ভ ও মূল হচ্ছে ঈমান। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের এ ঘোষণা দিতে হয়। জোর করে এটি আদায় করা সম্ভব নয়। দৃঢ় প্রত্যয় ও যুক্তির ভিত্তিতেই এটি অর্জন করতে হয়। তাই ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তির কোন স্থান নেই। রশিদ রিযা বলেন, এ আয়াতের পরবর্তী অংশে এর সাধারণ মর্মবাণীকে অনুমোদন করা হয়েছে। এতে বলা হয়, দীন হচ্ছে দিক নির্দেশনা ও আলো যুক্তির মাধ্যমে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। লোকেরা এক সময় সঠিক পথের দিশা লাভ করার পর তা অনুসরণ করবে না পরিত্যাগ করবে, সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। রশিদ রিযা আরও বলেন :

> বিচক্ষণতা ও সদুপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে দা'ওআত দিতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে...। এতে ইসলামে পবিত্র যুদ্ধের (জিহাদ) স্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। জিহাদ ধর্মের মর্মবাণী নয়, এর লক্ষ্যও নয়। এটি কেবল আত্মরক্ষামূলক ঢাল এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসেবে এর প্রয়োগ করা হয়। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের বিভ্রান্ত অনুসারীরাই মনে করে যে ইসলাম তার গুণের কারণে নয়; কেবল তরবারির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০৭]

কতিপয় ভাষ্যকার বা মুফাসসির আলোচ্য আয়াতের (২:২৫৬) সাধারণ অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেন এভাবে যে, প্রাথমিকভাবে এটি কার্যকর ছিল এবং

পরবর্তী সময়ে ইসলামের বিজয়ের পর তা বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান এর জবাবে নিম্নের যুক্তি পেশ করেন :

> এ ধরনের মন্তব্য করার কোন বৈধতা নেই, কুরআনের কোন আয়াতে তা পাওয়া যাবে না। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের যুক্তির জবাব দেয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে...। উপরন্তু কঠোর নিয়ন্ত্রিত ও বিজ্ঞোচিত অর্থ উপলব্ধি করতে হবে এমন কথা মূলে কোথাও আভাস দেয়া হয়নি, এছাড়া এমন পদ্ধতি অনুসরণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রকাশ করারপক্ষেও কোন শানে নুযূল পাওয়া যায়নি।[২০৮]

এস এ রহমান সূরা আল-বাকারাহর (২:২৫৬) আয়াতকে পবিত্র কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়াত বলে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধের ক্ষেত্রে নির্দেশনার জন্য মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এর পরিধির ওপর সীমারেখা আরোপ করে এর ব্যাপক মানবিক অর্থকে খর্ব করার চেষ্টা করায় তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন।[২০৯]

কুরআনের সাক্ষ্য-প্রমাণের আরেকটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তা হলো: ইসলাম-পূর্ব মহান ধর্মগুলোর প্রতি সুস্পষ্ট স্বীকৃতিদান। কুরআনের অনেক আয়াতে এসব ধর্মকে বৈধ ও তা পবিত্র উৎস থেকে উৎসারিত বলে কেবল ঘোষণাই করা হয়নি; উপরন্তু তাদের শিক্ষারও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কুরআন সকল আসমানি ধর্মের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করছে। আমরা সূরা আল মায়েদায় (৫:৪৪) দেখতে পাই: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ 'আমরা তাওরাত নাযিল করেছি যাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো।'

এরপর এ আয়াতে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কিত আইনসহ তাওরাতের কতিপয় আইনের ব্যাখ্যাদান ও সমর্থন দান অব্যাহত থাকে; যা ইসলামি শরীয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এ সূরার পরবর্তী আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিল (নিউ টেস্টামেন্ট) উভয়ের প্রতি আরও সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَقَفَّيْنَا عَلَى اٰثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌوَّ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

www.pathagar.com

তাদের (এ পয়গম্বরদের) পরে আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাত হতে যা কিছু তার সম্মুখে ছিল; তিনি ছিলো তারই সত্যতা প্রতিপাদনকারী হিসেবে এবং আমরা ইঞ্জিল দান করেছি যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং তা হ'ল যা কিছু তাওরাতের সম্মুখে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত ও নসিহত। আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইনজিলে বিশ্বাসীগণ আল্লাহর নাযিলকরা আইন অনুযায়ী ফায়সালা ও বিচার করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবে না তারাই ফাসিক (৫:৪৬-৪৮)।

এরপরে আরও সমর্থন ব্যক্ত করে রাসূলকে সাঃ সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.

আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। তার সামনে আল-কিতাবের যা কিছু-তার সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। (৫:৪৮)

সত্য ও ঘোষিত ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি কুরআনের স্বীকৃতি খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; উপরন্তু মুসা আঃ ও ঈসা আ:সহ সকল নবীর নবুওত ও তাদের শিক্ষা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই এ কথা বলা যায় যে, তাদের সকলের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى
وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ .

বল, "আমরা আল্লাহর,উপর এবং আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের ওপর যা নাযিল হয়েছে-তাও মানি। সেই হিদায়াতের প্রতিও আমাদের ঈমান আছে-যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য পয়গম্বরকে তাদের রবের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা ... (৩:৮৪)

অন্যান্য আহলে কিতাবের প্রতি সমর্থন ঘোষণা হচ্ছে কুরআনের অন্যতম মূল বক্তব্য। কুরআনের অনেক স্থানে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে অব্যাহতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ইসলাম তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর ও বাহির-উভয়স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেনি, তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ধর্মগ্রহণ, সংরক্ষণ ও চর্চা করার অধিকার ভোগ

www.pathagar.com

করবে।[২১০] কুরআনের সামগ্রিক সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে মুফাসসিরগণ এ মন্তব্য করেছেন। এসব আয়াতের উল্লেখ করে ফাতহি উসমান লিখেছেন, 'ইসলাম জবরদস্তি বাতিল করেছে এমনকি তা খোদ ইসলামে হলেও... কারণ আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয় যদিনা মানুষ ভয় মুক্ত থাকে।'[২১১]

কুরআনে স্বতন্ত্র ও সম্মিলিতভাবে মানবমর্যাদা ও মহানুভবতার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে এবং এতে বার বার এ বক্তব্যই প্রকাশ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির মর্যাদার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে তার স্বাধীনতা, বিশেষ করে বিবেকের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুরআন অব্যাহতভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করেছে এবং লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা মঞ্জুর করা ছাড়া শরীয়ার লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়-এ সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দিক হল: ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের বিষয় আর এ কারণে অন্য লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে দা'ওআত পেশের একমাত্র উপায় হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণ ও উপদেশ দান। নিম্নে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ ও রাসূল সা:-এর কাজ এবং নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوا وَاِنْ تَوَلَّوا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ .

অত:পর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ কওে, তাহলে নিশ্চয়ই সঠিক পথ লাভ করবে, আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল দা'ওআত পৌঁছে দেয়া। (৩:২০)

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .

'তুমি উপদেশ দিতে থাক; কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। তুমি তাদের ওপর যবরদস্তিকারী নও। (৮৮:২১-২২)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلٰغُ .

'এখন যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমরা তো তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার করে পাঠাইনি। কথা পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব।" (৪২:৪৮)

وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ .

www.pathagar.com

"তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চল এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) সতর্ক থাক। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ আমাদের রাসূলের দায়িত্ব হল সুস্পষ্টভাবে হুকুমগুলো পৌঁছে দেয়া। (৫:৯২, আরো দেখুন, এ: সম্পর্কিত, ৫:৯৯)

কুরআনের আরেকটি বিষয় অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো: ইসলামের দিকে দা'ওআত অবশ্যই বিনম্র ভাষায় উপদেশের মাধ্যমে বিচক্ষণতার সাথে পেশ করতে হবে। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও মধুর ভাষায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ আহ্বান জানাতে হবে। ইসলাম প্রচার-প্রসারে জোরজবরদস্তি করার বিষয় নিষিদ্ধের কথা এখানে আবারও বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু একথা বুঝা গেল যে; এ প্রসঙ্গে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত অর্থ জিহাদ বা সংস্কারের নামে খর্ব করার যে কোন চেষ্টা দৃঢ়তার সাথে অনুৎসাহিত করতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কুরআনের মূলনীতিকে ব্যাহত করার চেষ্টা করা হলে, তা জিহাদের অপব্যবহার হবে।

ওয়াফি ও আওদা-উভয়েই এ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, ইসলাম অন্তত তিনটি উপায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছে। প্রথমত: কাউকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে ও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। সূরা আল-বাকারায় (২:২৫৬) যার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। মুসলিম শাসক ও দেশ বিজয়ীগণ সাধারণভাবে এ মূলনীতি মেনে চলেন এবং তাদের প্রজা সাধারণকে নিজ নিজ ধর্ম পালন অব্যাহত রাখার অনুমতি দেন, এ শর্তে যে: তারা তাদের নিরাপত্তা-কর (জিযিয়া) প্রদান করবে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের আনুগত্য করবে। অপরদিকে তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং তার বিকল্প হিসেবে তারা জিযিয়া প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত: ইসলাম বলিষ্ঠ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ ধর্ম প্রচার করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। কুরআনে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে মুসলমানদেরকে বিনম্র ভাষায় যুক্তিপূর্ণ দা'ওআত পেশ করতে বলা হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি দেয়া হয়েছে (২১:৪৬, ১৬:১২৫, ২:১১১)। তৃতীয়ত: কুরআন সুনিশ্চিত হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় থেকে উৎসারিত ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করার রীতিকে অনুমোদন করে; নিছক ভাসা ভাসা বিশ্বাসের ভিত্তিতে অনুসরণ করা নয়। এ কারণেই নিম্নের আয়াতে স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে অন্ধভাবে পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি ও ধর্ম অনুসরণ করার প্রাক ইসলামি মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَااَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
اٰبَاءَنَا اَوَلَوْكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ .

'তাদেরকে যখনই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনই উত্তরে বলে, আমরা তো সেই পন্থারই অনুসরণ করবো; আমাদের বাপদাদাকে যে পন্থার অনুসারী দেখতে পেয়েছি। তাদের বাপদাদাগণ যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ নাও করে থাকে, ও সঠিক পথে নাও চলে... তবুও কি এরা তাদেরই অনুসরণ করতে থাকবে? (২:১৭০)

কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াফি আবদুহ'র সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে তার প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আবদুহ বলেন, 'চিন্তাভাবনাহীন অনুসরণে বিচক্ষণতা ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব থাকে এবং তাতে কাফেরদের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। কোন ব্যক্তি তার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করলে এবং তার ধর্মের সত্যতার ব্যাপারে যদি সন্তুষ্ট না থাকে-তাহলে তাকে একজন ধর্মভীরু বা বিশ্বাসী ব্যক্তি (মুমিন) বলা যাবে না।'[২১৩] আওদা আবদুহ'র সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন, তবে তিনি একথা বলেছেন যে, শরীয়া একজন মুমিনকে তার ঈমানের সংরক্ষণ ও নিরাপদ করাকে অবশ্য করণীয় বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের কারণে অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হবার মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তার স্বাধীনতার হিফাযত করার কোন উপায় না থাকে- তাহলে তার কর্তব্য হবে এমন স্থানে হিজরত করা; যেস্থানে গেলে তার ঈমান ও আত্মমর্যাদা হিফাযত করা সম্ভব হবে। আওদা তার মন্তব্যে বলেন, 'কোন লোকের হিজরত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, তা না করলে সে নিজের প্রতি যুলুম করবে।' আওদা এ মন্তব্য কুরআনের আয়াতের (৪:৯৭-৯৮) ভিত্তিতে করেছেন। এ আয়াতে বিবেকের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে হিজরত করতে যারা আগ্রহী নয় তাদের মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে।[২১৪]

এক কথায় বলা যায়, কুরআন ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ইসলামের বিধান ও মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করেছে। সূরা বাকারায় (২:২৫৬) এ ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এরপর কুরআনের আরও অনেক আয়াতে বার বার একে অনুমোদন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু লোক বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালিয়ে ঘোষণা করেছে যে, ইসলামঃ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে এবং কুরআনের যেসব আয়াতে এ স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, তা পরবর্তী সময়ে জিহাদের বিধান জারির মাধ্যমে বাতিল বা মানসূখ হয়ে গেছে।[২১৫]

www.pathagar.com

এ মতের সমর্থকরা বাতিলকরণের মতো একটি অত্যন্ত বিরোধপূর্ণ বিষয়কে তাদের প্রাথমিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে কুরআনের একটি প্রধান মূলনীতিকে খর্ব করার জন্য।[২১৬] সমগ্র ইতিহাসে সম্প্রসারণবাদী ও সামরিক কৌশল প্রণেতাদের মধ্যে এ গ্রুপটির উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে কিছুটা সমর্থন থাকলেও; সাধারণভাবে তা কখনও গ্রহণযোগ্য বা সমর্থিত হয়নি। উপরন্তু এ চিন্তাধারায় অকাট্য যুক্তিরও অভাব রয়েছে এবং বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত কুরআনের বাণীর মর্মার্থকে লঘু করার চেষ্টাও হালে পানি পায়নি। মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান সংবিধানে এ স্বাধীনতার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানানো হয়েছে; যা নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতাসহ ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পক্ষে চূড়ান্ত আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতকের মুসলমানদের মধ্যে শরীয়া ও সমসাময়িক সাংবিধানিক আইনে ধর্মীয় স্বাধীনতার সার্বজনীন বৈধতার সমর্থনে একটি মতৈক্য গড়ে উঠেছে।

উপসংহার

কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পেয়েছি; তাতে বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। কেবল কুরআনের হিসবাহ'র মূলনীতিতে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকাংশ বস্তুগত ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনে হিসবাহ সংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে, এসব আয়াত মূলত মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হলেও; তা অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা অমুসলিম নাগরিকরাও বক্তব্য দান ও গঠনমূলক সমালোচনা করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার ভোগ করে থাকে। সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের ব্যাপারে হিসবাহ'র দায়িত্ব থেকে অমুসলিমদেরকে দূরে রাখা হয়নি, অবশ্য এর ব্যতিক্রমী অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাউকে পানিতে ডুবে যেতে দেখলে তাকে বাঁচানো প্রত্যক্ষদর্শী সকলেরই অপরিহার্য কর্তব্য, এক্ষেত্রে ডুবে যাওয়া লোকটি মুসলিম কি অমুসলিম তা দেখার বিষয় নয়। তবে কাউকে মদ পান করতে দেখলে; তাকে তা করা থেকে বাধা দেয়া যাবে না, কারণ তার ধর্মীয় বিধানে হয়ত মদ্যপান কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়।

পরামর্শ সংক্রান্ত কুরআনের মূলনীতিও অনুরূপ, যদিও প্রাথমিকভাবে তাতে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে, তবে অমুসলিম নাগরিকদেরকে তার প্রয়োগের আওতা অথবা পরামর্শ পরিষদের (মজলিশে শূ'রা) সদস্য পদ লাভের

www.pathagar.com

বাইরে রাখা হয়নি। তাই অমুসলমানরা পরামর্শ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে এবং তার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কুরআনের নিম্নের আয়াতে ধর্মীয় বিষয় বহির্ভূত সামাজিক বিষয়ে সলাপরামর্শের ক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে :

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

'জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, যদি তোমরা না জান।' (১৬:৪৩)

সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমালোচনা করা এবং সরকারের কর্মকাণ্ড সমালোচনা করে বা সমর্থন করে অভিমত প্রকাশ করা অথবা অপর কোন ব্যক্তির কোন বক্তব্য বা অভিমতের জবাবে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করা-মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার। শরী'আয় কেবল মুসলমানদের জন্য হাক আল মুয়া'রাদাহ সংরক্ষিত রাখা হয়নি। অবশ্য এখানে এ সাধারণ অভিমতের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের মূলনীতি অথবা কুরআন-সুন্নাহ'র সরাসরি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যেসব বিষয়ে-সেক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কারোর কোন সমালোচনা গ্রহণ করা হবে না; কেননা কোন ব্যক্তিগত অভিমত বা জনমতের কোন কর্তৃত্ব এ ধরনের বিষয়ের ওপর থাকতে পারে না। মূলত ইসলাম হচ্ছে কর্তৃত্বশালী ধর্ম এবং জনমত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এর ভাল মন্দ বা অধিকার ও কর্তব্যের বিষয় নির্ধারিত হয় না, অবশ্য আহকামের বিষয় (ইজমা ও মাসালাহ) নির্ধারণে এর নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তবে একারণে শরীয়ার বিধান অনুযায়ী ব্যক্তির মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা রয়েছে; তার কোন কিছু খর্ব করার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ আইনি ব্যবস্থার আইনগত বিকাশের ইতিহাসে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সমাজের বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। ইসলামি আইনও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের যুগের বহুমাত্রিক ও বহু ধর্মীয় সমাজে সম্প্রীতি ও ঐক্যের আদর্শ হিসাবে বর্তমান আইনি ব্যবস্থা ভূমিকা পালনে যে সমর্থ নয়-তার অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আর এ কারণে কুরআন-সুন্নাহ'র ব্যাপক ভিত্তিক ন্যায়বিচারের মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ার মূল উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ-আল-শরীয়া) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার সুপারিশ করা যেতে পারে। সাম্য ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কুরআনের মানদণ্ডের আলোকে অধিকতর সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে; এমন ধরনের পরিবর্তনের লক্ষ্যে অবাধ ইজতিহাদের সত্যিকারের চেতনা নিয়ে এটি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

টীকা

১. 'ফিকহ' সাধারণত 'শরীয়ার' সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, উভয় পরিভাষা ইসলামি আইনের সাধারণ কাঠামো বুঝিয়ে থাকে; তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে, তাহল: 'ফিকহ' প্রধানত বিচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সমন্বয়ে গঠিত অন্যদিকে 'শরীয়া' পবিত্র কুরআনের বাণীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

২. আল গাযালী, 'উলূম আল দীন (আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়া সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১০।

৩. ইবনে কাইয়িম, আল-তুরুক আল-হুকমিয়া ফি'ল সিয়াসাহ আল শরীয়া (আল মু'য়াস্‌সাসাহ আল আরাবিয়া, ১৯৬১ সংস্করণ), পৃষ্ঠা, ২৭৮

৪. হিসবাহ সম্মিলিত কর্তব্য (ফরযে কেফায়া) অথবা ব্যক্তিগত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ফরযে আইন) সে ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের 'আলেমগণ' বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে ফরয নামায (সালাত) ও অন্যান্য ফরয ইবাদত। বিস্তারিত জানতে দেখুন, হাম্মাদ হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ২২১।

৫. আয্যাম সম্পাদিত, Universal Islamic Declaration of Human Rights, পৃষ্ঠা, ৮

৬. হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ২২১।

৭. জায়দান, মাজমু'য়াত বুহুস ফিকহিইয়া, পৃষ্ঠা, ১২৮।

৮. আল সিবা'ই ইশতিরাকাইয়াত আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৫২।

৯. আল গাযালী, ইহইয়া, (আল মাকতাবাহ আল-তিজারিইয়া সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৪।

১০. "হাদিস" সম্পর্কে জানতে দেখুন, প্রথম অধ্যায়ের টীকা ১৪ অথবা শব্দকোষ।

১১. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা, ১৬, হাদিস নং ৩৪।

১২. তুলনীয়, হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ২২১।

১৩. আল মাকদিসি, আল-আদাব আল-শারীই'আহ ওয়াল মিনাহ আল-মারিইয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯৪।

১৪. জুয়ার সরঞ্জাম ধ্বংস অথবা মদের স্রোত বয়ে যাওয়ার ঘটনা হিসবাহ'র

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে আল গাযালী যে বিবরণ দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি দৃষ্টান্তমূলক।

১৫. আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯৪।

১৬. আল গাযালী, ইহ্ইয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৪।

১৭. আল কারাফি, কিতাব আল ফুরুক, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫৫।

১৮. Hans wehr, Arabic-English Dictionary, পৃষ্ঠা, ৯৭০।

১৯. আল গাযালী, কিতাব আদাব আল-সুহবাহ ওয়াল মু'য়াশারাহ মা' আসনাফ আল-খালক, পৃষ্ঠা, ২৭০।

২০. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৮।

২১. তুলনীয়, হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা ২০৭।

২২. আল-বুখারী, সহীহ, কিতাব আল-ঈমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩; মুসলিম, সহীহ মুসলিম,... কিতাব আল-ঈমান, বাব আল দীন আল-নাসিহা, ইবনে মাজাহ এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেন এবং এর প্রথম বাক্যাংশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন অপরদিকে আল নাসাই প্রথম বাক্যাংশটুকু সামান্য পরিবর্তন করে উদ্ধৃত করেন; তাহল, ইন্নামা আল দীন আল নাসিহা।'

২৩. আল নববী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা, ১১৩, হাদিস নং ১৮৬।

২৪. তুলনীয়, নাহবী, মালামিহ আল-শূ'রা, ফি'ল-দাওয়া আল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা, ৭০৩।

২৫. আল নববী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা, ১১৩, হাদিস নং ১৪৭।

২৬. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৭, এ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেন:

مَا مِنْ امَيْرِ يَلِىَ أمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَيَجْتَهِدْلَهُمْ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ.

'মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন আমির যদি তাদের কল্যাণ সাধন করতে ব্যর্থ হন এবং তাদের আন্তরিক সদুপদেশ প্রদান করতে না পারেন তা হলে তিনি তাদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না।'

২৭. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৭।

২৮. খোলাফায়ে রাশিদা, শাব্দিক অর্থ, সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাগণ। রাসূল সা:-এর ওফাতের পর প্রথম চারজন খলিফার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তারা হলেন: আবু বকর সিদ্দিক (মৃত্যু ১২ হিজরী/৬৩৪ খৃস্টাব্দ), উমর ইবনে খাত্তাব (মৃত্যু : ২৩/৬৪৩), উসমান

www.pathagar.com

ইবনে আফফান (মৃত্যু : ৩৫/৬৫৬) এবং আলী ইবনে আবি তালিব (মৃত্যু : ৪০/৬৬১)। তাদের শাসনকাল ৪০ বছর স্থায়ী হয়।

২৯. তুলনীয়, আবু হাবিব, দিরাসাহ ফি মিনহাজ আল ইসলাম আল-সিয়াসি, পৃষ্ঠা, ৩৩৭।

৩০. আল নববী, রিয়াদুস্ সালেহীন, পৃষ্ঠা, ১০৩-১০৭।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. জায়েদান, মাযমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ১২৮; আবু হাবিব, দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৩৩৪।

৩৩. এটি সর্বসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (মুত্তাফিকুন আলাইহি) এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন নববী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা, ১১৩, হাদিস নং ১৮৮; আল মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৭-২৮।

৩৪. আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৩৩৬।

৩৫. ইবনে হাম্বল, ফিহরিস আহাদিস মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬২; আল স্যুয়ুতি, আল জামি আল-সগির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১।

৩৬. ইবনে মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাব আল ফিতান, বাব আল-আমর বিল মারুফ ওয়াল-নাহি 'আন আল-মুনকার।

৩৭. আল বাহি, আল-দীন ওয়া'ল-দৌলাহ মিন তাওজিহাত আল কুরআন আল-করিম, পৃষ্ঠা, ৩৪৯।

৩৮. আল তাবারি, তাফসির আল তাবারি, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫২।

৩৯. ইবনে তাইমিইয়া, আল সিয়াসাহ আল শরীয়া ফি ইসলাহ আল রা'ই ওয়া'ল-রা'ইয়াহ, পৃষ্ঠা, ১৬৯।

৪০. রিযা, তারিখ আল-উস্তায্ আল ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০৭; আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৬৪২।

৪১. আসাদ, Principles of State and Government in Islam, পৃষ্ঠা, ৯৭; যায়েদান, আল-ফারদ ওয়া'ল দৌলাহ ফি'ল শরীয়া আল-ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা, ৩৭; আল বাহি, আল দ্বীন ওয়াল দৌলাহ, পৃষ্ঠা, ৩৮৭, আরও দেখুন আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৬৪২, এখানে তিনি আবুল আলা মওদুদী ও আব্দুল কাদের 'আওদা'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, শূ'রা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী একটি অবশ্যকরণীয় কাজ।

৪২. আল তিরমিযি, সুনান আল তিরমিযি, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৩।

www.pathagar.com

৪৩. ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭৭।

৪৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল-খালিদি, কাওয়াইদ নিজাম আল-হুকম ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১৪৫।

৪৫. তুলনীয়, আল-খালিদি, কাওয়াইদ, পৃষ্ঠা, ১৪১-৪২।

৪৬. আল-বাহি, আল-দ্বীন ওয়াল দৌলাহ, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৪৭. শালতুত, আল-ইসলাম আকিদা ওয়া-শারীয়া, পৃষ্ঠা, ৫৫৬; আল-সিবা'ই, ইশতিরাকাইয়া, পৃষ্ঠা, ৫।

৪৮. যায়েদান, মাজমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ১২৮।

৪৯. আল কুরতুবি, আল জামি লি আহকাম আল কুরআন। (তাফসির আল কুরতুবি বলে পরিচিত), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫০-৫১।

৫০. তুলনীয়, আল খালিদি, কাওয়াইদ, পৃষ্ঠা, ১৫৫; El-Awa, On the Political System of the Islamic State, পৃষ্ঠা, ৯০।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৫৫।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৫৭।

৫৩. আহল আল-শূরা এবং তাতে মহিলা ও অমুসলিমদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল-খালিদি, কাওয়াইদ, পৃষ্ঠা, ১৭৬, ১৮৫; আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৬৬১ এবং আল নাবহানি, মুকাদ্দিমাত আল দাস্তুর, পৃষ্ঠা, ১১৪-১১৭।

৫৪. ইবনে তাইমিইয়া, আল সিয়াসা, পৃষ্ঠা, ১৬৯।

৫৫. আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৬৮১-৮২।

৫৬. আল-আমিদি, আল ইহকাম ফি উসুল আল আহকাম, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬২; আল শাওকানি, ইরশাদ আল ফুহুল মিন তাহকিক আল-হক ইলা 'ইলম আল-উসূল, পৃষ্ঠা, ২৫০

৫৭. ইজতিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার গ্রন্থ: Principles of Islamic Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ৪৭০-৭৩।

৫৮. আবু দাউদ, সুনান, ইংরেজি অনুবাদ, আহমদ হাসান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১৩, হাদিস নং ৩৫৬৭।

৫৯. তুলনীয়, যায়েদান, মাজমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ২৮৮।

৬০. তুলনীয়, গাযাবি: আল হুররিইয়া আল আম্মাহ ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৬০।

www.pathagar.com

৬১. আল বাহি, আল দীন ওয়াল দৌলাহ, পৃষ্ঠা, ৪১৫।

৬২. যায়েদান মাজমু'য়াহ, পৃষ্ঠা ২৮৮; আল সিবাই, ইশতিরাকাইয়াহ, পৃষ্ঠা, ৪৮; মুনায়মিনাহ, মুশকিলাত আল হুররিইয়া ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১৫।

৬৩. আল-বাহি, আল-দীন ওয়াল দৌলাহ, পৃষ্ঠা, ৪১৫।

৬৪. মাহমাসসানি, আরকান, পৃষ্ঠা ১৪৩।

৬৫. আল কাসানি, বাদা'ই আল সানা'ই, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪; ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪০-৪১।

৬৬. মায্কুর, আল-কাদা ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৬৩।

৬৭. আল আমিদি, ইহকাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩২; আল কারাফি, আল ফুরুক, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৩; ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৭।

৬৮. 'ফতোয়া' প্রায় 'ইজতিহাদ' এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো আইনগত বা ধর্মীয় বিষয়ে কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিমত যা প্রায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে।

৬৯. মুজতাহিদ: (বহুবচন : মুজতাহিদুন) যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার যোগ্য। সাধারণত: মূল সূত্র বিশ্লেষণ করে তিনি এই ইজতিহাদ পেশ করে থাকেন।

৭০. বিস্তারিত জানতে দেখুন, গাযাবী, আল হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৬০।

৭১. খাল্লাফ, আল-সিয়াসাহ আল-শরীয়া, পৃষ্ঠা, ১৩৬; মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮১; রামাদান, Islamic Law : Its Scope and Equity, পৃষ্ঠা, ৭৮।

৭২. বিস্তারিত জানতে দেখুন, গাজাবী, আল হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৬০।

৭২. আল্লাহর যাত ও গুণাবলী, কুরআন সৃষ্ট না সৃষ্টি, ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা কতখানি অতিক্রম করা হয়েছিল সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আলবাহী, আল-দীন ওয়াল দৌলাহ,·পৃষ্ঠা, ৫৫২।

৭৩. মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮২।

৭৪. ইজতিহাদ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার গ্রন্থ: Principles of Islamic Jurisprudence, বিশেষ করে, পৃষ্ঠা, ৪৮৪ এবং আমার নিবন্ধ: "The Approval and Disapproval Varieties of

www.pathagar.com

Ray (Personal Opinion in Islam) আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোশ্যাল সায়েন্সেস, খণ্ড, ৭, নং ১, ১৯৯০, পৃষ্ঠা, ৩৯-৬৪।

৭৫. আফিফি, আল মুজতামা আল ইসলামি ওয়া উসূল আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৯৩, আরো দেখুন, আল সিবা'ই, ইশতিরাকাইয়া, পৃষ্ঠা, ৫০।

৭৬. আল-কাসিমি, নিজাম আল হুকম ফি'ল শারি'আহ ওয়াল তারিখ, পৃষ্ঠা, ২০১।

৭৭. যে ধারাটির ব্যাপারে উমর রাঃ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাতে বলা হয় যে, কুরাইশ গোত্রের কোন সদস্য তার অভিভাবকের (ওয়ালি) বিনা অনুমতিতে রাসূল সাঃ এর কাছে গেলে তাকে তার গোত্রের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। তবে রাসূল সাঃ এক পক্ষ থেকে কুরাইশ গোত্রের কেউ তার নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলে তাকে রাসূল সাঃ এর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। 'উমার ও মহানবী সাঃ এর মধ্যকার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হয়, এভাবে : 'উমার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি আল্লাহর নবী নন?' 'হ্যাঁ আমি নবী, রাসূল সাঃ জবাব দেন। 'উমার ফের প্রশ্ন করেন, 'তাহলে আমাদেরকে কেন আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে অপদস্থ হতে হচ্ছে?' এর জবাবে রাসূল সাঃ বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আমি কখনো তাকে অমান্য করবো না এবং তিনিও আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিবেন না।' (ইবনে হিশাম, আল সিরাহ্ আল নবোবিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৩১)।

৭৮. ইবনে মাজাহ্, সুনান, কিতাব আল-ফিতান, আল আমর বিল মারুফ ওয়াল নাহি 'আন আল-মুনকার, হাদিস নং ৪০১১।

৭৯. ইবনে হিশাম, আল সিরাহ্, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬২; আবু হাবিব, দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৭২৫; আল কাসিমি, নিযাম আল-হুকম, পৃষ্ঠা, ১০৬।

৮০. আবু হাবিব, দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৭২৭।

৮১. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ ওয়াল-উকুবাহ ফি'ল ফিকহ আল ইসলামি, পৃষ্ঠা, ১৬০; আল সিবাই, ইশতিরাকাইয়াহ, পৃষ্ঠা, ৫০; আল-নাবহান, নিজাম আল-হুকম, পৃষ্ঠা, ২৫০।

৮২. আল খুদারি, মুহাদারাত ফি তারিখ আল উমাম আল ইসলামিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭-১৮; আল নাবহান, নিযাম আল হুকম, পৃষ্ঠা, ২৪০; আবু হাবিব দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৭৪৩।

৮৩. আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃষ্ঠা, ১৩

www.pathagar.com

৮৪. আল সিবাই, ইশতিরাকাইয়াহ, পৃষ্ঠা, ৫০।

৮৫. খলিল, ফি'ল নাকদ আল ইসলামি আল মু'য়াসির, পৃষ্ঠা, ৩৫।

৮৬. আবু হাবিব, দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৭৪৩।

৮৭. হুসাইন, নাক্দ কিতাব আল ইসলাম ওয়া উসূল আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৮৯।

৮৮. আল-কাযিমি, নিযাম আল হুকম, পৃষ্ঠা, ১০০।

৮৯. আফিফি, আল মুজতামা আল ইসলামি, পৃষ্ঠা, ৯৪।

৯০. আল তিরমিযি হাদিস, মিশকাত আল-মাসাবিহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪১৮, হাদিস নং ৫১২৯।

৯১. খলিল, আল নাক্দ, পৃষ্ঠা, ৩৩-৩৪।

৯২. আল বুখারী, জাওয়াহির সহিহ আল বুখারী, কিতাব আল-জুমা'আহ, বাব আল জুমা'আহ ফি'ল কুরা ওয়া'ল মুদুন।

৯৩. তুলনীয়, হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৪১৬।

৯৪. ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭০।

৯৫. তুলনীয়, হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৪১৬।

৯৬. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা, ১৬, হাদিস নং ৩৪।

৯৭. আল-সুবকি, আল আশবাহ ওয়াল নাযাইর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭৫; তুফফাহা, মাসাদির আল তাশরি আল ইসলামি ওয়া কাওয়াইদ আল সুলুক আল-আম্মাহ, পৃষ্ঠা, ৪৬।

৯৮. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, ৩৪০; তুফ্ফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৪৬।

৯৯. তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৪৭।

১০০. ইস্তিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমার গ্রন্থ: Principles of Islamic Jurisprudence পৃষ্ঠা, ৩৭৭।

১০১. আবু সুলায়মান, মায়যযালাত জামিয়াত আল-মালিক আব্দুল আজিজ এর মধ্যে আল 'নাজারিয়াত ওয়াল কাওয়াইদ ফিল ফিকহ আল ইসলামি' অধ্যায়, নং ২, জমাদিউসমানি, ১৩৯৮ হিজরি, মে, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা, ৫৬; তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৮৯।

১০২. তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৮৭।

১০৩. ইমাম জাফর আল-সাদিক, রাসূল সা: এর বংশধর এবং শিয়াদের ষষ্ঠ

www.pathagar.com

ইমাম। শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায় তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। অসাধারণ আধ্যাত্মিক গুণাবলির পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ, এবং হাদিস বিজ্ঞানে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কুরআনের প্রাচীনতম মুফাসসিরদের অন্যতম হলেন তিনি। ইমাম জাফর সাদিক ১৪৮ হিজরি/৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

১০৪. তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৮৮।

১০৫. আল-সুবকি, আল-আশবাহ ওয়াল-নাযাইর, প্রথম খণ্ড, ২৭৫; তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৮৮-৯২।

১০৬. তুফ্‌ফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ৯৩-৯৫।

১০৭. তুলনীয়, ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিইয়া, ইলাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১০৮. আবু দাউদ, সুনান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০১৩, হাদিস নং ৩৫৬৭।

১০৯. পাঠক এটা জেনে খুশী হবেন যে আমার বই Principle, of Islamic Jusisprudence এর একটি অধ্যায়ে এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলাচনা করা হয়েছে।

১১০. আল-গাযালী 'তা'লিমিয়া' 'বাতিনিয়া'র সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেন, যার অর্থ হল: 'রহস্যবাদ'। পরিভাষাটি অত্যন্ত ঢিলাঢালাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইবনে তাইমিইয়া প্রচলিত ব্যবহার রীতির পাশাপাশি নির্দিষ্ট কয়েকজন সুফী ও দার্শনিকের ক্ষেত্রে পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। পরের কথাটি ইসমাইলিয়াদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতে বিশেষ করে তাদের রহস্যময় গোষ্ঠীগত মূলনীতির আলোকে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এর অনাক্ষরিক অর্থ গ্রহণের (তা'বিল) ওপর জোর দানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের এ মূলনীতি বংশ পরম্পরায় গোপনীয়ভাবে চলে আসছে। ইসমাইলিয়ারা কয়েকটি জটিল শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন, কারামাতিয়া, আসল ফাতেমী (যারা পাল্টা শিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিল যা ৩৫৮/৯৬৯ সাল থেকে দু'শতাব্দি ধরে মিসর শাসন করে), নিযারী ও মুস্তালিয়ান ইসমাইলিয়া। সাধারণভাবে ইসমাইলিয়ারা হলো শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, আলী ইবনে আবি তালিবের অনুসারী বা ভক্ত। তারা বিশ্বাস করে যে রাসূল সাঃ-এর ওফাতের পর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই রাসূলের জামাতা আলীর প্রাপ্য ছিল, যা এরপর রাসূলের সাঃ-এর মেয়ে ফাতেমার মাধ্যমে তার উত্তরসূরিদের প্রাপ্য। আশা'রিয়াদের শাখা

www.pathagar.com

ইশানার মতো ইসমাইলিয়ারা ইমামাতকে গুপ্ত বা রহস্যজনক বলে মনে করে না। তারা একে অব্যাহত ও জীবন্ত ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করে এবং ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, তারা মনে করে যে, তাদের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের উপলব্ধির আলোকে ধর্মীয় আইন পরিবর্তন এমনকি আমূল পরিবর্তন পর্যন্ত করা যেতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলোঃ গোপন শক্ত ঘাঁটি আলামুতের চতুর্থ ধর্মগুরু হাসান কর্তৃক ১১৬৪ সালে 'পুনরুত্থানের' ঘোষণা। তারা গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হাসানের এ ঘোষণাকে রহস্যময় ধর্মের পরিসমাপ্তি বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। (সম্পাদক)

১১১. আল-গাযালী, আল-মুনকিয মিন আল দালাল, Mac Carthy অনুদিত, পৃষ্ঠা, ১২২ ও ১৯৩।

১১২. অনুরূপ দাউদ, সুনান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০১৯, হাদিস নং ৩৫৮৫।

১১৩. তুলনীয়, সালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৫৫৫।

১১৪. আবু যাহরাহ, তানযিম আল-ইসলাম লিল-মুজতামা, পৃষ্ঠা, ১৯৪।

১১৫. তুলনীয়, আল-বাহি, আল-দিন ওয়াল-দৌলাহ, পৃষ্ঠা, ৩৭৬।

১১৬. আ'য়িশা আব্দাল রহমান, আল-কুরআন ওয়া কাদাইয়াল-ইনসান, পৃষ্ঠা, ১১৬।

১১৭. তুলনীয়, ফিকরি, আল-মু'য়ামালাত আল-মাদাইয়াহ ওয়াল-আদাবিয়াহ, পৃষ্ঠা, ৮৪-৮৫।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮৭।

১১৯. এভাবে আমরা হাদিস পাঠে জানতে পারি যে উত্তম কথা (আল কালিমা আল-তাইয়েবা) হচ্ছে এক ধরনের সেবা।' দেখুন, আল নববী, রিয়াদুস সালেহীন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ২৮৪, হাদিস নং ৬৯৯।

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

১২০. The Holy Qur'an, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী কর্তৃক অনুদিত ও তাফসির এর পাদটিকা নং ৩৭৭৫।

১২১. তুলনীয়, ইবনে কাইয়িম, ইলাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।

১২২. প্রাগুক্ত।

১২৩. প্রায় একে রাসূল সাঃ এর হাদিস বলে উদ্ধৃত করেছেন ইল-আমিদি (আল-ইহকাম, প্রথম খণ্ড, ২১৪) এবং আল শাতিবি, (আল-ইতিসাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯) উভয়ে। অথচ এটি প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবনে মাসউদ রাঃ এর উক্তি হবার সম্ভাবনাই বেশি। (তুলনীয় আহমদ হাসন, The Doctrine of Ijma in Islam, পৃষ্ঠা, ৩৭

১২৪. ইবনে কাইয়িম, ইলাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১২৫. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৭।

১২৬. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৮।

১২৭. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৯।

১২৮. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭০।

১২৯. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭২।

১৩০. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২০।

১৩১. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১৩২. তুলনীয়, আল-খালিদি, আল-শূ'রা, পৃষ্ঠা, ৯১।

১৩৩. তুলনীয়, The Holy Qur'an, দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৪. তুলনীয়, আসাদ, Principles, পৃষ্ঠা, ৬; আল-'আরাবি, নিযাম আল-হুকম ফি'ল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৯২।

১৩৫. তুলনীয়, আল-আনসারি, আল-শূরা ওয়া আশারুহা ফি'ল ডিমুক্রাতিয়া, পৃষ্ঠা, ৪৩২।

১৩৬. ওয়াসফি, আল নিযাম আল দুস্তুরি ফি'ল ইসলাম মুকারিনান বি'ল-নুজুম আল আসরিয়াহ, পৃষ্ঠা, ৭৬।

১৩৭. মাওদুদী, আল হুকূমাত আল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা, ২১৭।

১৩৮. আব্দুল্লাহ, নাজারিয়াত আল দৌলাহ ফি'ল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১৫৩।

১৩৯. যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ এর অনুসারী (শিয়াত আলী), তারা বিশ্বাস করেন যে রাসূল সাঃ এর ওফাতের পর ধর্মীয়-রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকার একান্তভাবেই রাসূল সাঃ এর জামাতা আলী এবং রাসূল সাঃ এর মেয়ে ফাতিমার বংশধরদের। এভাবে তারা খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম তিন খলিফার এ ধরনের অধিকার থাকার কথা অস্বীকার করেন।

খারিজি শব্দের অভিধানিক অর্থ হল: বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ। এরা হলো প্রথম যুগের একদল চরমপন্থী, যারা হযরত আলী রাঃ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আলী খলিফা উসমান রাঃ এর হত্যাকারীদের বিচার সংক্রান্ত বিরোধ প্রশ্নে মুয়াবিয়া রাঃ এর সঙ্গে (যিনি পরবর্তী কালে প্রথম

www.pathagar.com

উমাইয়া খলিফা হন) সালিশীতে সম্মত হলে খারেজিরা তার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ করে। আলী রা: খারেজিদের পরাজিত করেন কিন্তু পরে তাদের একজন এর প্রতিশোধ হিসেবে তাঁকে হত্যা করে। খারেজিরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের মাধ্যমে মুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা বিশ্বাস করে, বড় ধরনের গোনাহের কাজ করলে ঈমানদারের মর্যাদা বিলুপ্ত হয় এবং খারেজিদের মতে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করা একটি বড় গোনাহের কাজ। বাস্তবে এর অর্থ হল, তারা তাদের মতের বিরোধী অসংখ্য মুসলমানকে কার্যত কাফের বলে মনে করে এবং তাদের রক্তপাতকে বৈধ বলে ঘোষণা করে।

এ গ্রুপ সম্পর্কে লেখকের আলোচনার বিষয় জানতে দেখুন, চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্রোহ (ফিৎনা) অনুচ্ছেদের আওতায় ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ। শিয়া ও খারেজিদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, Encyclopaedia of Islam, নতুন সংস্করণ, Leiden: Brill, ১৯৭৮। (সম্পাদক)।

১৪০. তুলনীয়, আল-আনসারি, আল-শূ'রা, পৃষ্ঠা, ৪২৯।

১৪১. El-Awa এর মতে বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমেই কেবল জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উম্মাহর ভিন্ন ভিন্ন মত নিরূপণ ও প্রকাশ পেতে পারে।' (দেখুন, Pluralism in Islam' সম্পর্কিত সম্মেলন প্রতিবেদন, The American Journal of Islamic Social Sciences (১৯৯১), পৃষ্ঠা, ৩৫৩।

১৪২. আনসারি, আল শূ'রা, পৃষ্ঠা, ৪৩১।

১৪৩. El-Awa 'Pluralism in Islam' The American Journal of Islamic Social Sciences (১৯৯১), পৃষ্ঠা, ৪৩১, টিকা, ১৩৪০।

১৪৪. ইবনে তাইমিইয়া, মাজমু'য়াত আল-রাসা'ইল ওয়াল-মাসা'ইল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্টা, ১৪১।

১৪৫. একই গ্রন্থ।

১৪৬. মুহাম্মদ আল-গাযালী, কায়রোয় Pluralism in Islam', শীর্ষক আই আই আইটি সম্মেলন প্রতিবেদনে উদ্বৃত করা হয়, American Journal of Islamic social Sciences. (৮, ১৯৯১), পৃষ্ঠা, ৩৫৩।

১৪৭. আবু দাউদ, সুনান, হাসান অনূদিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০১৩, হাদিস নং ৩৫৬৭।

www.pathagar.com

১৪৮. El Awa, 'Pluralism in Islam', the American Journal of Islamic Social Sciences, ৮/ (১৯৯১) পৃষ্ঠা, ৩৫৩, টিকা, ১৩০, আরও দেখুন একই লেখকের, ফিল নিযাম আল সিয়াসি, পৃষ্ঠা, ৮৩-৮৪।

১৪৯. ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ, আল তুরুক আল হুকমিয়া ফি'ল সিয়াসি আল শরীয়া, পৃষ্ঠা ৮৯।

১৫০. তুলনীয়, আল খালিদি, কওয়াইদ', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০৫।

১৫১. আল গাযালি, আল-মুস্তাফা মিন' 'ইলম আল উসূল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭।

১৫২. আল নাবহানি, মুকাদ্দিমাত আল দুস্তুর, পৃষ্ঠা, ১০১।

১৫৩. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৪।

১৫৪. আল নাবহানি, মুকাদ্দিমাত, পৃষ্ঠা, ১০৪, আরো দেখুন, আল-খালিদি কাওয়াইদ, পৃষ্ঠা, ২৯০

১৫৫. উদাহরণ হিসেবে লক্ষনীয়, সাই আল-রহমান আল-মুবারাকপুরি'র পুস্তিকা আল-আহসাব আল-সিয়াসিহ ফি'ল ইসলাম, আল-জামি'য়াহ আল-সালাফিযাহ, ভারত, ১৪০৭/১৯৮৭। এর সামগ্রিক আলোচনায় ইসলামের ঐক্যের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবহারের কথা এক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে।

১৫৬. আল-আলুসি, রব আল-মা'নি ফি তাফসির আল-কুরআন আল-আযিম, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৪।

১৫৭. খান, Human Rights, পৃষ্ঠা, ৪৫।

১৫৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪৬।

১৫৯. ইউসুফ আলী, The Holy Qur'an, টিকা, ৫৩৪৭।

১৬০. মাসলাহা মুরসালাহ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমার গ্রন্থ: Have we Negleced the Shariah Law Doctrine of Maslaha', Islamic Studies, ২৭ (১৯৮৮) পৃষ্ঠা, ২০৭-৩০৪।

১৬১. তুলনীয়, আল যাহরাহ, তানযিম আল ইসলাম লিল-মুজতামা, পৃষ্ঠা, ১৯০; আল-ইলি, আল-হুরারিয়া আল-আম্মাহ, পৃষ্ঠা, ৩৩০।

১৬২. তুলনীয়, ফাতহি উসমান, হাক আল-ইনসান বায়ান আল-শরীয়া আল-ইসলামিয়া ওয়াল ফিকর আল কানুনি আল-গারবি, পৃষ্ঠা, ৯৭।

www.pathagar.com

১৬৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৯১।

১৬৪. আল-ইলি, আল-হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৩৩০।

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৩৫৬ (রশিদ রিযা'র তাফসির আল-মানার এর উদ্ধৃতি, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৮৪)।

১৬৬. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনি, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৪।

১৬৭. নাদওয়াত আল-রিয়াদ, পৃষ্ঠা, ৩৩।

১৬৮. তুলনীয়, আবদ আল-রহমান, আল-কুরআন ওয়া কাদাইয়াল-ইনসান, পৃষ্ঠা, ৯৬।

১৬৯. এ সম্মেলনে উপস্থাপিত পূর্ণ বিবৃতি, মওদুদী, The Islamic Law and Constitution পৃষ্ঠা, ৩৩৩।

১৭০. আয্যাম সম্পাদিত Universal Islamic Declaration পৃষ্ঠা, ১১, The Islamic Council of Europe, ১৯৮১।

১৭১. Malayasian Law Journal, (১৯৮৯) ১, পৃষ্ঠা, ৩৬৮-৭০, ৪১৮-২০।

১৭২. Malayasian Law Journal, (১৯৮৯ ১, পৃষ্ঠা, ৩৬৮।

১৭৩. Malayasian Law Journal, (১৯৮৯) ১, পৃষ্ঠা, ৩৬৯।

১৭৪. Malayasian Law Journal, (১৯৮৯) ১, পৃষ্ঠা, ৪৬৯।

১৭৫. Arnold, The Preaching of Islam, পৃষ্ঠা, ৪৬।

১৭৬. প্রাগুক্ত।

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৭-৪৮।

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৫১-৫২।

১৭৯. মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮৭।

১৮০. আবু যাহরাহ, তানযিম, পৃষ্ঠা, ১৯২।

১৮১. মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮৭।

১৮২. টীকা, যেমন, এস, এ রহমান, The Punishment of Apostasy in Islam, আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান, The Islamic Theory of International Relations: New Dihection for Islamic Methodology and Thought, El-Awa, Punishment in Islamic Law.

১৮৩. এস এ রহমান, The Punishment of Apostasy, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪; আল ইলি, আল-হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৩৩৯।

www.pathagar.com

১৮৪. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সারিম আল মাসলূল আল-শাতিম আল-রাসূল, পৃষ্ঠা, ৩২১; আল শাওকানি, নায়ল আল-আউতার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩০

১৮৫. আল-শা'রানি, কিতাব আল-মিযান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫২।

১৮৬. আল-সারাখসি, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১০।

১৮৭. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সারিম আল-মাসলূল আলা শাতিম আল-রাসূল, পৃষ্ঠা, ৩১৮; আল-শা'রানি, কিতাব আল-মিযান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৪; El-Awa Punishment, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১৮৮. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সিয়াসা, পৃষ্ঠা, ১২৪।

১৮৯. আল-ইলি, আল-হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৪২৬; বাদাবি, দা'আইম আল-হুকুম, পৃষ্ঠা, ১৬৬।

১৯০. শালতুত, আল-ইসলাম আকিদাহ ওয়া শরীয়া, পৃষ্ঠা, ২৯২-৯৩; আল-সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ ফি আল শারীয়া আল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা, ১১৪।

১৯১. মাহমাসসানি, আরকান, পৃষ্ঠা, ১২৩-২৪।

১৯২. মুতাহহারি, 'Islam and the Freedom of Thought and Belief', আল তাওহীদ, পৃষ্ঠা, ১৫৪।

১৯৩. El-Awa, Punishment, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১৯৪. আল শাওকানি, নায়ল আল-আউতার শারহ মুনতাকা আল-আখবার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৮।

১৯৫. একই গ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৯।

১৯৬. একই গ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৯; El-Awa, Punishment, পৃষ্ঠা, ৫৫।

১৯৭. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ আল বুখারি, পৃষ্ঠা, ২৭১ হাদিস নং ১০২৩।

১৯৮. El-Awa, Punishment, পৃষ্ঠা, ৫২।

১৯৯. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সারিম আল-মাসলূল, পৃষ্ঠা, ৫২।

২০০. আল বুখারি, জাওয়াহির সহিহ আল বুখারি, পৃষ্ঠা ১৫০, হাদিস নং ২২৯

২০১. তুলনীয়, El-Awa, Punishment, পৃষ্ঠা, ৫৪।

২০২. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৩১৮।

২০৩. একই গ্রন্থ, একই ধরনের তথ্য এবং মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাঃ আগে যেসব মুরতাদকে ক্ষমা করেছিলেন তাদের নাম জানতে দেখুন, ইবনে হিশাম, সীরাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩।

www.pathagar.com

২০৪. আবু যাহ্‌রাহ, তানযিম, পৃষ্ঠা, ১৯২।

২০৫. রশিদ রিযা, তাফসির আল মানার, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৬৫, বৈরুত: দার আল মারিফা, ১৩২৪।

২০৬. একই গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭; আল-ইলি, আল হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৩৩৩-৩৪।

২০৭. ইবনে কাসির, তাফসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১০; রিযা, তাফসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৭-৩৯।

২০৮. এস, এ, রহমান, The punishment of Apostasy, পৃষ্ঠা, ২১; শান-ই-নুযূল হচ্ছে ফার্সি ও উর্দুতে আরবি আসাব আল নুযূল এর সমার্থক, এর অর্থ হল, কুরআনের আয়াত নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট।

২০৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৬।

২১০. কুরআন, ২:৯১ ও ৯৭; ৪:৪৬; ৩৫:৩১ এবং ৪৬:৩০।

২১১. উসমান, আল ফারয, পৃষ্ঠা, ২৭-২৮, আরও দেখুন, গাযাবি, আল হুররিইয়া, পৃষ্ঠা ৬০ এবং 'আয়িশা আব্দুর রহমান, আল-কুরআন ওয়াল কাদাইল–ইনসান, পৃষ্ঠা, ৯৭।

২১২. ওয়াফি, হুকুক আল ইনসান, পৃষ্ঠা, ১২২-২৩।

২১৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১২৪।

২১৪. আওদা, আল তাশরি আল-জিনা'ল, পৃষ্ঠা, ৩১-৩৩।

২১৫. মধ্যযুগে জিহাদের ওপর মুসলিম ফকিহদের রচনাসমূহ কিভাবে সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, আবু সুলায়মান, The Islamic Theory of International Relations

২১৬. বাতিল হয়ে যাওয়ার (নাসখ) তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, আমার গ্রন্থ Principles of Islamic Jurisprudence, অধ্যায়, ৭

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় : নৈতিক সংযম

১. সাধারণ বিষয়সমূহ

১. সূচনা বক্তব্য

বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘনের কতিপয় ঘটনাকে শরী'আত সুনির্দিষ্টভাবে ইতিবাচক আইনগত শর্তের আলোকে ব্যাখ্যা করেছে যা কার্যকর করতে সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। যেমন, মিথ্যা অপবাদ দেয়া (কাযফ) একটি অপরাধ এবং কুরআনে এর জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির (হাদ) বিধান রয়েছে। অনুরূপভাবে ধর্মের অবমাননা, বিদ্রোহ ও মর্যাদাহানি করাও আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘনের এসব সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে এ বিষয়ে শরীয়াতের দিকনির্দেশনার বৃহৎ অংশে নৈতিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সার্বিকভাবে মুমিনদের বিবেককে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে তারা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘনের বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। বাকস্বাধীনতার নৈতিক লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে তিরস্কারযোগ্য কথা বলা, যেমন- মিথ্যা বলা, অসাক্ষাতে কারোর দোষ বর্ণনা করা (গীবত করা), অন্যদের উপহাস করা এবং তাদেরকে খারাপ নামে ডাকা। কুরআন ও সুন্নাহ এবং শত শত বছর ধরে আলেমদের দেয়া শিক্ষায় এসব বিষয়ে বিপুল উপদেশ- নির্দেশনা রয়েছে। এসব লঙ্ঘনের অনেক বিষয়ে কুরআনের ভাষায় জোরালো তাগিদ থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে ইসলামী আইনের ব্যবহারিক বিধিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। অবশ্য এটি কুরআনের অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্যেরই স্বাক্ষর বহন করছে, যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আচার আচরণের মৌলিক মূল্যবোধ ও বুনিয়াদি নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং বিস্তারিত ও ব্যাপকভিত্তিক নির্দেশনার আকারে এভাবে তা পৌঁছে দেয়াই উত্তম হয়েছে। সরকার ও সমাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ (যেমন, উলু'ল-আমর) সমাজের স্বার্থের অনুকূল এবং অসৎ কাজ থেকে নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজন মনে করলে এ মৌলিক কাঠামোর আদলে ইসলামের এসব নৈতিক শিক্ষাকে আইনগত অধ্যাদেশে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

২. কুৎসা রটনা, অপবাদ ও উপহাস

এগুলো হলো কয়েক ধরনের অশ্রাব্য কথা। কুরআন ও রাসূল সা: এর সুন্নাহতে এসব বিষয়ের প্রতি বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াতে

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্টভাবে খারাপ বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে অন্যদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয় এবং তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। নিম্নের আয়াতে এ ব্যাপারে মুমিনদের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ.

> হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে (নিয়ে) কোনো উপহাস না করে, কেননা এমনও তো হতে পারে যে, যাদের (আজ) উপহাস করা হচ্ছে, তারা উপহাসকারী ব্যক্তিদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে; কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে অনেক ভালো। (আরো মনে রাখবে) একজন আরেকজনকে খারাপ উপনাম ধরেও ডাকবে না, (৪৯:১১)

এরপরই আরেকটি আয়াতে অসাক্ষাতে কুৎসা রটনার (গীবত) কথা পৃথকভাবে বলা হয়েছে এবং এর ক্ষতিকর দিককে বিশেষ জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে :

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ .

> হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো (কেননা) কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ, একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চায় (৪৯:১২)।

কুরআনে 'নিন্দুক' (আল হুমাযাহ) নামে একটি সূরা রয়েছে। সব ধরনের কুৎসা রটনাকারীদের (১১৪:১) দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিন্দা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। গোটা সূরাতে গীবতকারীদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

রাসূল সাঃ সব সময়ই মুমিনদেরকে গীবতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কি জান গীবত কি?' জবাবে তারা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন?' রাসূল বলেন, 'তা হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বললে, যা সে অপছন্দ করে।' তখন একজন সাহাবী প্রশ্ন করেন, 'আমার ভাই

www.pathagar.com

সম্পর্কে আমি যে কথা বলি, তা যদি সত্য হয়, তাহলে কি গীবত হবে?' রাসূল সাঃ এর জবাবে বলেন, 'তুমি যা বল তা সত্য হলেও তা গীবতের পর্যায়ে পড়বে, আর তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে নাথাকে, তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছো।'[১]

وَعَنْ ابى هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عليه وسلم : اَتَدْرُوْنَ مَاالغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ ذِكْر اخَاكَ بِمَايَكْرَهُ. قِيْلَ اَرَ اَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اخِى مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ إِغْتَبْتَهُ وَاِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

> এ হাদিসের তাৎপর্য তুলে ধরে আল গাযালী বলেন যে, গীবত হল তোমার কোন মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে, এমনকি তা সত্য হলেও। আল গাযালী আরও বলেন, মুখের ভাষা, আকার-ইঙ্গিত, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়া অথবা অন্যভাবে অপরের নিন্দা জ্ঞাপনের মূল ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কিছু প্রকাশ করাও গীবত বলে পরিগণিত হবে।[২]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় রিয়াদুস সালেহিন গ্রন্থের প্রণেতা আল নবাবী উল্লেখ করেন যে, বাহ্যিক দিক থেকে গীবত বলে মনে হলেও অসৎ কাজ রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনে তা বলার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন অত্যাচারি ব্যক্তির আচরণ প্রকাশকারী সাক্ষী, আবেদনকারী অথবা আইনজীবী ন্যায় বিচারের সহায়ক বলে বিবেচিত হলে; তার চরিত্রের ব্যাপারে কথা বলতে পারবেন। তাই কেবল ন্যায়বিচার লাভে সহায়ক ও সত্য উদঘাটনের জন্য গীবতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্য এমন বড় ধরনের কোন উদ্দেশ্য পূরণ না হলে; কেবল সত্যের জন্য গীবত করা সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হবে না। গীবতকে বড় গুনাহর (আল-কবীরা) কাজ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য কতিপয় আলেম একমত হয়েছেন যে, এটি একটি ছোট গোনাহ বা ছগিরা গোনাহ। গীবত সম্পর্কিত উপরোক্ত আয়াতের (৪৯:১২) উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ খিযর আল হুসাইন উল্লেখ করেন যে জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে (যরুরাত) অন্যদের অনুপস্থিতিতে গীবত বা সমালোচনা করার ব্যতিক্রমী অনুমতি রয়েছে। এ ছাড় দেয়ার কারণ হলোঃ হাল্কা প্রকৃতির গোনাহের মাধ্যমে বড় ধরনের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের গীবত ন্যায় বিচার লাভ, গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং সমাজের অনিষ্ট রোধে সহায়ক হয়ে থাকে।[৪]

আলেমদের লেখা থেকে নিম্নে অনুমোদনযোগ্য গীবতের উল্লেখ করা হল :

ক. সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা (জারহ্ আল শুহুদ) : আইনের শর্ত অনুযায়ী বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে। এ কারণেই শরীয়া বিচারকগণকে সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিক চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াকে কর্তব্য গণ্য করেছে। প্রয়োজনে গীবতের বিনিময়ে হলেও তারা সাক্ষীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তদন্ত করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারবেন।

খ. আলেমগণ হাদিস বর্ণনাকারী ও রাসূল সাঃ এর বক্তব্য বিবৃতকারী ব্যক্তিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করাকে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছেন। হাদিস বর্ণনাকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন-করার মতো কোন চারিত্রিক দুর্বলতা ছিল কিনা-তা যাচাই করতে হাদিস বিশারদগণ তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

গ. যেসব ব্যক্তি দুষ্কৃতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং যারা অন্যদের কাছে নিজেদের অন্যায় কাজ লুকানোর কোন চেষ্টা তো করেই না; উপরন্তু তাদের পাপ কাজের কথা খোলামেলাভাবে ঘোষণা করে, তাদের বিরুদ্ধে গীবত করার অনুমতি রয়েছে। কোন ব্যক্তি তার বক্তব্যে যদি আইনহীনতা, পাপ, শরীয়ার শিক্ষা লঙ্ঘনের সুপারিশ করে এবং সে যদি এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে-তাহলে তার ব্যক্তিগত মর্যাদাও অন্যদের সুস্পষ্ট বিরোধিতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে না। হাম্বলি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এক বিবৃতিতে বলেন, যে ব্যক্তি তার পাপাচারের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় (মুজাহির বিল মা'য়াসি); তার বিরুদ্ধে বললে কোন গীবত হবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শিষ্য ইবনে তাইমিইয়া এবং মালিকি ফকিহ ইবন আব্দুল বার তার এ অভিমতকে সমর্থন করেন। অবশ্য অপর এক দল আলেম সুন্নাহ'র আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গীবত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; তবে ব্যতিক্রম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার কথা ও কাজের দ্বারা অন্যদের অনিষ্ট করার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত।[৫]

ঘ. কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছেঃ

لَايُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ .

আল্লাহতা'আলা প্রকাশ্যভাবে মন্দ কথা বলাকে (কখনো) পছন্দ করেন না,

www.pathagar.com

তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে, তার কথা আলাদা। আল্লাহতা'আলা ভালোভাবেই শুনেন এবং জানেন (৪:১৪৮)।

এ আয়াতের ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে; তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, এ আয়াতে অবিচারের শিকার ব্যক্তিকে তার ওপর কৃত যুলুমের ঘটনা প্রকাশ, প্রয়োজনে নির্যাতনকারীর (যালিম) নিন্দা জ্ঞাপন এবং তার বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের চেষ্টার জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুরআনের এ ঘোষণায় একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে; নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে যালিমেরবিপক্ষে কথা বলার অধিকার দেয়া ছাড়া নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ঙ. এছাড়া গীবত যদি আন্তরিক সদুপদেশ বা নসিহার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়; তাহলে তা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সম্ভাব্য বর তার কনের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা অথবা কোন ব্যক্তি কারোর সঙ্গে ব্যবসায় অংশীদার হবার প্রস্তাব করলে; ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে, অসাক্ষাতে তাদের দোষের কথা জানানোর অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো, পরামর্শদাতাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। যার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তার চরিত্রের দুর্বলতা প্রকাশ অথবা তার খারাপ কাজের রেকর্ড থাকলে এক্ষেত্রে তা জানানোর অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের উপদেশ দেয়া না হলে বড় ধরনের পাপ বা অন্যায় সংঘটিত হতে পারে বলে মনে হলেই কেবল তা দেয়া যেতে পারে।

চ. অন্যায় ও দুস্কৃতির শিকার ব্যক্তিকে তা থেকে রক্ষার জন্য গীবত করার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা জানতে পারলাম যে, কেউ চুরি বা অন্য ধরনের অপরাধ করেছে; কিন্তু তা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে, আমরা এটিও জানতে পারলাম যে, বিষয়টি প্রকাশ না করলে সে অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত হবে না, তাহলে এক্ষেত্রে গীবত করার কেবল অনুমতি নেই; বরং এটি করা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কুরআনের মূলনীতি- হিসবাহ'র অংশ হিসেবে অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। অনুরূপভাবেঃ প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো তার আয়ত্তাধীন লোকদের থেকে যে কোন উপায়ে অন্যায় প্রতিরোধ করা, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ প্রতিরোধের চেষ্টার কারণে যেন বড় ধরনের ফ্যাসাদের সৃষ্টি না হয়।

www.pathagar.com

ছ. কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে মনে করে যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা বা নিন্দা করা না হলে ধর্ম বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির ক্ষতি (যারার) হবে, তাহলে তার তা করার অনুমতি রয়েছে; তবে এতে ধারণার চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে বলে মনে করলেই কেবল সে তা করতে পারবে।

জ. কারোর জীবন বিপন্ন হবার মুখে পড়লে এবং অপর কারোর চরিত্রের দুর্বলতার কথা প্রকাশ এবং প্রকাশ্যে তার সমালোচনা না করলে, এ বিপদ এড়ানো যাবেনা মনে হলে, তার জন্য গীবত করার অনুমতি রয়েছে।

ঝ. সর্বশেষে বলা যায় যে, শরীয়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সমালোচনা করার অনুমতি দিয়েছে, এমনকি এতে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তা ও চরিত্রের ক্রটি প্রকাশ পায়, তাহলেও। সত্য সমুন্নত করতে এবং মিথ্যা দূর করতে প্রয়োজনীয় মনে হলে এভাবে ভুল-বিভ্রান্তি সংশোধন করা যেতে পারে।

আল গাযালি তার "ক্ষতিকর বক্তব্য (আফাত আল-লিসান) শীর্ষক আলোচনায় পাঁচটি বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো : মিথ্যা, অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা, কটু কথা (মুমারাত), মুসাহেবি (মায্) ও নিয়ন্ত্রণহীন রসিকতা। এর বিস্ত ারিত আলোচনা করে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ। অতএব প্রত্যেকে সব সময় এমনকি কল্পনা ও চিন্তাভাবনায়ও মিথ্যা পরিহার করবে, তার চিন্তাভাবনায় মিথ্যার বীজ বপন যাতে না হয়; সে জন্য তাকে সদাসর্বদা সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সব সময়ই তা পরিহার করতে হবে।' এছাড়া আল গাযালী তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে রাসূল সাঃ এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উদ্ধৃত করেন :

لا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا .

> কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা বলে অথবা মিথ্যার পক্ষে যুক্তি প্রকাশ করে; তাহলে তার নাম আল্লাহর খাতায় একজন মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'

মিথ্যা বলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ার একটি উদাহরণ হল, কোন নির্দোষ ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে সহায়তা করা। ধরুন, কোন ব্যক্তি একজন নির্দোষ লোককে ধরার ও হত্যার চেষ্টা করছে, সে যদি কারোর কাছে ঐ লোকটি কোথায় আছে জানতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে তার জীবন বাঁচাতে মিথ্যা বলা যাবে। রাসূল সাঃ এর

www.pathagar.com

হাদিসে আরও তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা হল : প্রথমত: তা যদি দু'পক্ষের মধ্যে বৈরিতার অবসান ও সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়ক হয়, দ্বিতীয়ত: তা যদি যুদ্ধের সময় শত্রুকে বিভ্রান্ত করে, তৃতীয়ত: কোন ব্যক্তি এমনকি আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা বললে, যদি তার স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়; তাহলে তার জন্য স্ত্রীর মিথ্যা প্রশংসা করা ও উৎসাহদানের অনুমতি রয়েছে। এছাড়া শিয়া মতবাদ অনুযায়ী এক্ষেত্রে মনোভাব গোপন করা বা সুবিধাজনক গোপনীয়তার (তাকিয়া) নীতি অনুযায়ী আসন্ন বিপদ রোধ এবং কারোর জীবন, মর্যাদা বা মালের ওপর হামলা রোধে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। নীতিগতভাবে সম্পদ রক্ষায় তাকিয়া অনুসরণের অনুমতি রয়েছে; তবে অনেক শিয়া আলেম সামান্য মালের (আল-মাল আল-ইয়াসির) জন্য তাকিয়া ও সত্য গোপন করার নীতি অনুসরণ করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।[৯] এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ক্ষতিকর বক্তব্যের বর্ণনা দিয়ে আল গাযালী বলেন, লোকেরা সচরাচর ক্ষমতাশালী ও ধনীদেরকে তাদের উপস্থিতিতে এবং বিশেষ সভা-সমাবেশে তাদের যোগদানের সময় তাদের প্রশংসা করে থাকে। অবশ্য তোষামোদকারীর পক্ষ থেকে তোষামোদের সাথে মিথ্যা ও প্রতারণার (কিযব ওয়া রিয়া) সম্পর্ক থাকে এবং অপরদিকে যাদের প্রশংসা করা হয়, তাদের মধ্যে থাকে আত্মম্ভরিতা (ই'জাব)। তাই উভয়ের উচিত এ ধরনের আচরণ পরিহার করা।

আল গাযালী ক্ষতিকর কথার যে তালিকা তৈরি করেন, তার মধ্যে আরও রয়েছে, অসংযত ক্রোধ, মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা ও কূট বিতর্ক (মুমারাত)। লেখক ক্রোধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, রাগ (গাদাব) সাধারণত গালিগালাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং যার গালমন্দ করা হয়; তার দুর্বলতা প্রকাশের দিকে ধাবিত করে। হামলাকারীর হামলা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংযত ও আত্মরক্ষামূলক ক্রোধ প্রকাশ নিষিদ্ধ নয়। ক্রোধ যখন তার অগ্রাধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাবে; তখনই তা বৈধতা হারিয়ে ফেলবে। এ ধরনের শৃঙ্খলার উৎসের মধ্যে রয়েছে শরী'আত, মানবিক কারণসমূহ এবং ভদ্রতা (হিলম) ও সৎ চরিত্রের (হুসন আল-খালক) মতো নৈতিক গুণাবলির বিকাশ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।[১০]

কূট বিতর্কের (মুমারাত) ক্ষেত্রে কেবল অন্যদের ওপর একজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়। (নিম্নে পৃথক অধ্যায়ে মুমারাত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

আল গাযালী মন্তব্য করেন যে, মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা কোন ব্যক্তির হৃদয়ের আলো নিভিয়ে ফেলে এবং তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।[১১] নীতিগতভাবে রসিকতা

www.pathagar.com

করার অনুমতি রয়েছে। বিশেষ করে তা যদি লোকদেরকে রুচিশীল আনন্দ দান করে এবং মজাদার ও সত্য হয় (ইয়াসিরান সাদিকান)। রাসূল সা: প্রায় রসিকতা করতেন (শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয় এবং তাদের সাথে কৌতুক করতেন)। কিন্তু তাতে কোন ধরনের বিকৃতি ছিল না। মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে; কারণ তাতে এক ধরনের বিকৃতি ও অমর্যাদার বিষয় জড়িত থাকে।[১২]

এ তালিকায় আমরা মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন (কাসারাত আল-সু'য়াল) করাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি; যা করাকে কুরআন অনুৎসাহিত করেছে এবং রাসূল সা: এর শিক্ষাতেও এ বিষয়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেবল অপ্রয়োজনে প্রশ্ন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, অবশ্য জ্ঞান অন্বেষণ ও সত্যের সন্ধানের জন্য প্রশ্ন করার অনুমতি রয়েছে।[১৩]

৩. অপরের দুর্বলতা প্রকাশ করা

অপরের কোন ক্ষতি না করা এবং কোন মানুষের দুর্বলতা গোপন রাখা হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন আকার, প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে যে বার্তা পৌছানো হয়েছে, তার সারকথা হল: অপরের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তির মানসম্মান ও মর্যাদা এবং তার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতি ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

لاَيَستُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব জীবনে অপরের (দুর্বলতা) গোপন রাখে, তা হলে পরকালে আল্লাহতা'আলা তার (দুর্বলতা) গোপন রাখবেন।'[১৪]

ভিন্নভাবে আরেকটি হাদিসে একথারই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে :

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيهِ رَدَّاللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّار يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'কেউ যদি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা কওে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলা তাকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।'[১৫]

আরেকটি হাদিসে আমরা জানতে পাই :

لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْا وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهُمْ فَاِنَّ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ.

www.pathagar.com

'অন্য মুসলমানদের ক্ষতি করো না, তাদেরকে গাল দিয়ো না এবং তাদের দোষত্রুটি অন্বেষণ করো না। যে তার ভাইয়ের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহতা'আলা ঐ লোকের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবেন।'[১৬]

অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখা এবং গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদিসের মূল বক্তব্য :

مَا مِنْ اِمْرِءٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ عِرضِهِ وَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهُ اِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نَصْرَهُ وَمَا مِنْ اِمْرَءٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِىْ مَوْطِنٍ تَنْتَهِكُ فِيْهِ حُرْمَتَهُ اِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ فِىْ مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيْهِ نَصْرَتَهُ

একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানের মর্যাদা ও মান-ইয্যতের উপর আক্রমণের সময় তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলে সে যখন মহান করুণাময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে, তখন আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। তবে কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানের মর্যাদা ও মান-ইয্যতের উপর আক্রমণের সময়, তাকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে যখন আল্লাহর সাহায্য চাইবে; তখন আল্লাহতা'য়ালা তাকে পরিত্যাগ করবেন।[১২]

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ইবনে খাত্তাব রাঃ এক রাতে মদিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি একজন পুরুষ ও নারীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। পরের দিন খলিফা অন্যান্য সাহাবীকে বিষয়টি জানালেন এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে 'যিনা'র জন্য নির্ধারিত শাস্তি (হাদ) তিনি কার্যকর করতে পারেন কিনা তা জানতে চাইলেন। আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ এর জবাবে বললেন যে, ইসলামি আইনে যিনা'র শাস্তি কার্যকর করার জন্য চার জন সাক্ষী থাকা অপরিহার্য এবং এ বিধান খলিফার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য সাহাবীও হযরত আলীর মতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এ হাদিস উদ্ধৃত করে আল গাযালী অভিমত ব্যক্ত করেন যে শরী'আত যে পাপের বিষয় গোপন রাখার (সত্‌র আল ফাওয়াহিশ) দাবি করে, এটি হচ্ছে তার অকাট্য প্রমাণ। এছাড়া এর মাধ্যমে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা অথবা তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করাকেও অনুৎসাহিত করা হয়েছে।[১৮]

www.pathagar.com

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুর্নীতি ও ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে সাধারণভাবে জানা নেই; কেবল এমন ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রেই গোপন রাখার (সতর) সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, যারা খারাপ লোক তাদের অপরাধ গোপন না করার এবং তা কর্তৃপক্ষকে জানানোর সুপারিশ করা হয়েছে। কারণ এ ধরনের লোকের ক্ষেত্রে দোষ গোপন (সতর) করার একমাত্র অর্থ হবে দুর্নীতি ও আইন শৃঙ্খলাহীনতাকে আরও উৎসাহিত করা।

এসব হাদিস অতীতে যে পাপ (মাসিয়াহ) সংঘটিত হয়েছে তা গোপন করার সাথে সংশ্লিষ্ট। অতীতে কারোর সামনে মাসিয়াহ সংঘটিত হলে তাকে অবিলম্বে অবশ্যই তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রতিরোধ বা নিন্দা করতে হবে।

এছাড়া হাদিস বর্ণনাকারী ও মামলার সাক্ষীদের সাথে সাথে দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও এতিমদের ট্রাস্টির দোষক্রটিও প্রকাশের অনুমতি রয়েছে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই এটি করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টিরা তাদের কর্তব্যের সঠিক শর্তাবলী লঙ্ঘন করলে তাদের ক্ষেত্রে সতর এর বিধান প্রযোজ্য বলে গণ্য হবে না।[১৯]

কুৎসা রটনা বা গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে অপরের দোষক্রটি প্রকাশকে বিশেষভাবে তিরস্কারযোগ্য কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। নিম্নের হাদিসে লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَعَيَّرُوْا.

> সন্দেহ পোষণ করা থেকে সাবধান। সন্দেহ হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা। একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করোনা এবং পরস্পরের গোপনীয়তা ফাঁস করো না।[২০]

একসময় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে নিম্নের হাদিসটির সঠিক অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। হাদিসটি হল :

اِذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ عَنْ اَخِيْكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى اَحْسَنِه حَتَّى لَاتَجِدَ لَهُ مَحْمَلاً.

> ‘তুমি যখন তোমার কোন ভাইয়ের থেকে অথবা তার সম্পর্কে কিছু শুনতে পাবে, তখন এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যাই গ্রহণ করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর ব্যতিক্রম কিছু দেখতে না পাবে।’ এখানে একজন মুসলিম কোন কিছু বলে বা করে থাকলে ভাল কিছু করে থাকবেন বলে ধরে নেয়া হয়েছে।[২২]

জবাবে ইমাম ইবন হাম্বল বলেন : ‘সে হয়ত একথা বলেছে অথবা এ ধরনের কিছু বুঝিয়ে থাকতে পারে বলে উল্লেখ করে তার জন্য একটি কৈফিয়ত খুঁজে বের

www.pathagar.com

করতে হবে।' আরেকটি হাদিসে আরও বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اِعْتَذَرَ اِلَيهِ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَلْيَقْبَلْ عُذْرَهُ مَالَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ

'কোন মুসলিম অপর মুসলমানের কাছে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে হবে; যতক্ষণ না ক্ষমাপ্রার্থী ব্যক্তি যে মিথ্যুক সে কথা প্রকাশ পায়।'

এসব হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে তুফফাহ যথার্থই বলেন যে, এখানে ভাই (আখু) শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও এর সাধারণ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে এবং এর সুবিধা কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত রাখার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ ইসলামে সুবিচার ও সদাচরণ (আদল ওয়া ইহসান) কেবল মুসলমানদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। সমাজের অন্যান্য নাগরিক এবং মানবসমাজে তাদের ভাইবোনদের সঙ্গে লোকেরা কিভাবে আচরণ করবে, এ প্রশ্নের সাথে কুরআনের আদল ও ইহসান এর ধারনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এর বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপোষ করার মতো কোন ধরনের বিধিনিষেধকে মানতে অস্বীকার করা হয়েছে।[২৩] এটিই হলো কুরআনের নিম্নের আয়াতের মূল কথা :

وَلاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَاى.

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (মনে রাখবে, বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা ন্যায় ও ইনসাফের (পথ) থেকে সরে আসবে, তোমরা ইনসাফ করো, কারণ এ কাজটি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলার অধিক নিকটবর্তী' (৫:৮)।

এছাড়া আলী ইবনে আবু তালিবের ছেলে হাসান রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, "কেউ যদি আমার এক কানে গালি দেয় এবং অপর কানে ক্ষমা চায় তাহলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো।'[২৪]

এভাবে কোন বক্তব্যে যখন অপরের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশের বিষয় আসে; সে ক্ষেত্রে নীরবতা পালনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অপরের দোষত্রুটি নিয়ে কারোর কথা বলা উচিত নয়, এমনকি কেউ যদি এ ব্যাপারে জানতে চায়, তাহলেও।[২৫] অপরের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ, ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা-অবশ্যই পরিহার করা উচিত। সমাজে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ

সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এর সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৪. সুপারিশকৃত নীরবতা

রাসূল সাঃ এর হাদিসে আরেকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা হলঃ নীরবতা পালনের আপেক্ষিক মূল্য, বিশেষ করে যখন কথা বললে তা কোন ভাল কাজে আসবে না। বহু হাদিসে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তারই একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا او لِيَصْمُتْ .

> যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস কওে, সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে অথবা নীরবতা পালন করে।[২৬]

কথা বলার সময় আসলেই কেবল কথা বলা উচিত অথবা কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলেই তা বলা উচিত, এর মধ্যেই আল্লাহভীরুতা বা তাক্ওয়ার পরিচয় প্রকাশ পায়। নিম্নের হাদিসে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে :

مِنْ حُسْنِ اِسلامِ المَرْءِ انْ يَسْكُتْ فِيْمَا لايَعْنِيْهِ .

> ইসলাম অনুযায়ী কোন ব্যক্তির চরিত্রের সৌন্দর্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হল; যে বিষয়ে সে সংশ্লিষ্ট নয়, সে সম্পর্কে সে নীরবতা পালন করে।[২৭]

ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,[২৮] 'সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকদেরকে বিষয়ে কথা বলার অথবা অপ্রয়োজনে কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষেত্রের বাইরে কথা বললে, তা হবে বাড়াবাড়ির সামিল'। ইবনে আব্বাস আরও বলেন, 'বিদ্বান বা বোকা যেই হোক না কেন, কারোর সঙ্গে তিক্ত আলোচনায় লিপ্ত হবেন না। কারণ বিদ্বান ব্যক্তিটির কাছে আপনি হেরে যেতে পারেন এবং বোকা লোকটি আপনাকে অপমান করতে পারে। তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে কথা বলবে, এমন কথা বলবে না, যা শুনলে সে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে।'[২৯]

সর্বোত্তম বক্তব্য হলো সেটিঃ যাতে ততটুকুই বলা হয় যতটুকু প্রয়োজন, কমও নয়, বেশিও নয় এবং কথাগুলোর মধ্যেই অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ পায়।[৩০] কোন ব্যক্তির বক্তৃতা দানের প্রলোভন সংবরণ করা উচিত এবং কিছুটা কল্যাণ লাভ করা যাবে বলে মনে হলেই কেবল বক্তব্য দেয়া উচিত। বক্তব্য থেকে সুফল লাভের ব্যাপারে কোন সন্দেহ দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে নীরবতা পালন করাই উত্তম।[৩১]

www.pathagar.com

কুরআনে মুমিনদেরকে কথা বলতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে কেবল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা করতে হবে। বরং এমন ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালনকেই তিরস্কারযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কুরআনের বহু আয়াতে এর নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নের আয়াতে বলা হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا.

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং (সবসময়) হক কথা বলবে।' (৩৩:৭০)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহতা'আলা রাসূল সাঃ কে অন্যদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা দান করেন :

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُوْلُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا .

"আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন উত্তম কথা বলে। শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করছে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।' (১৭:৫৩)

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের তফসিরে বলেছেন যে, এতে মুমিনদেরকে উত্তম পন্থায় কথা বলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এমনকি তারা যদি তাদের দুশমন অথবা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘনকারীদের উদ্দেশেও কথা বলে; তাহলেও যেন তাদের বক্তব্যে অন্যদের সম্পর্কে সন্দেহজনক বিষয়ের স্থান না থাকে এবং অন্যদের ব্যাপারেও দা'ওআত দানের সর্বোত্তম মান বজায় রেখে বিনম্র ভাষায় যেন বক্তব্য পেশ করে। ভুল অথবা অসৌজন্যমূলক বক্তব্য দান করলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক উন্নয়নে কারোর প্রচেষ্টায় অর্জিত সুফল সহজেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।[৩২]

উপরন্তু পবিত্র কুরআনে মন্দ কথার জবাবে মন্দ কথা না বলাতে রাসূল সাঃ কে উপদেশ দেয়া হয়েছে :

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ .

"হে নবী! (সঃ) সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো, যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল; সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে" (৪১ : ৩৪)।

www.pathagar.com

এ আয়াতের অর্থ হলো: মন্দ কাজের পুনরাবৃত্তি কোনক্রমেই হতে দেয়া যাবে না, মন্দ কাজের জবাব মন্দ কাজের মাধ্যমে দিলে তার পরিণতি এমনটি হবে। এটি পরিহারের লক্ষ্যে কুরআনে রাসূল সা: কে মন্দ কাজ রোধে উত্তম পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ করা হলে সম্ভাব্য বিদ্বেষ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হবে।[৩৩] এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহতা'আলা কাউকে, এমনকি রাসূল সা: কেও নিরংকুশ বাকস্বাধীনতা প্রদান করেননি। রাসূল সা: কে তাঁর দীনের দা'ওয়াত তিনি ঠিক কিভাবে প্রচার করবেন এবং সদুপদেশ ও বিনয় নম্র -পদ্ধতির মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবেন-এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[৩৪]

মুমিনদেরকেও চিন্তাশীল হতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কেবল বিচক্ষণতা ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কথা বলতে বলা হয়েছে; যাতে তার কথা ফলদায়ক হতে পারে। যাঁরা এ ধরনের কাজ করবে নিম্নোক্ত হাদিসে তাদের জন্য বিরাট পারলৌকিক পুরস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছে :

إِنَّ الْعَبْدَ إِنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (اى يُفَكِّرُ انَّهَا خَيْرٌ امْ لا)
يَزِلُّ بِهَا مِنَ النَّارِ ابْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (متفق عليه)

> যখন আল্লাহর কোন বান্দা সুস্পষ্ট ও সঠিক কথা বলে (একথা বিবেচনা করে যে তাতে কল্যাণ লাভ হবে কিনা), (একথার) মাধ্যমে তার ও দোযখের মধ্যে বিশাল দূরত্বের সৃষ্টি হয়, যে দূরত্বের পরিমাণ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যকার দূরত্বের চেয়েও বেশি।

এ হাদিসটি উদ্ধৃত করার সময় আল নববী নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন: কল্যাণকর কাজের উদ্দেশ্যে যদি আলাপ-আলোচনা করা না হয়, তাহলে সাধারণভাবে তা করার অনুমতি নেই, অবশ্য মেহমানের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা এবং সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের (সালেহীন) স্মৃতিচারণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি।[৩৫]

সুচিন্তিত অভিমত (রা'ই) আন্তরিক উপদেশ (নসিহা) অথবা পারস্পরিক পরামর্শ (শূ'রা)-এর আদলে বক্তব্য পেশ করা যেতে পাওে, যা ভাল কথা (কালিমা তাইয়েবা) আবার মন্দ কথা (কালিমা খাবিছা) অথবা বুদ্ধিহীন বক্তব্য (লাগউ) আকারেও বক্তব্য আসতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে প্রথম চারটি বিষয়ে কথা বলাকে উৎসাহিত করেছে এবং মন্দ কথা বলাকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং মুমিনদেরকে শেষের কথাগুলো উপেক্ষা করতে এবং এর জবাবে

www.pathagar.com

নীরবতা পালন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এভাবে এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ لاَيَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِمَرُّوْا كِرَامًا.

> 'তারা এমন লোক যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং তাদের সামনে যখন নির্বুদ্ধিতার কথা (লাগ্‌উ) বলা হয়; যখন তখন মর্যাদার সাথে তারা সেখান থেকে চলে যায়।' (২৫:৭২)

৫. ব্যক্তিগত অভিমতের *(রা'ই)* অপব্যবহার

মত প্রকাশের স্বাধীনতা (হুররিইয়াত আল রা'ই) বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত ও প্রশংসনীয় রা'ই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে অনুমোদিত ও নিন্দনীয় মতামত এবং উপবিভাগ যেমন ক্ষতিকর উদ্ভাবনী (বিদ'আহ) সীমালংঘন (বাগি), খেয়ালখুশি (হাওয়া) এবং ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ (ইখতিলাফ) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিন্দনীয় অভিমত (আল রা'ই আল মায্‌মুম) হলো এমন এক ধরনের রা'ই: যা পুরোপুরি মিথ্যা নয় আবার পুরোপুরি সঠিকও নয়, তথাপি তা; লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে। তাই এ রা'ই তিরস্কারযোগ্য। এটি বিদ'আহ বা হাওয়ার আকারে সংঘটিত হতে পারে। এছাড়া চতুর্থ ধরনের একটি রা'ই রয়েছে, যাকে বলা হয় অজ্ঞতা (জাহাল) রা'ই, যাকে জ্ঞাত বিষয় থেকে ভিত্তিহীন অজ্ঞাত বিষয় অন্বেষণের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কিছু মনে করা হয় না। অজ্ঞতা থেকেই এর উদ্ভাবন ঘটেছে। এ শ্রেণীর সকল রা'ই প্রাথমিকভাবে বাকস্বাধীনতা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে। কারণ বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এসব ক্ষেত্র পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়নি। এখানে বিধিনিষেধ পরিভাষাটির অর্থ নিষিদ্ধ বোঝাবে না। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এ বিভাগের সব বিষয় আইনগত নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে পরিচালিত হয় না বরং নৈতিক উৎসাহদান এবং আন্তরিক উপদেশ ও; উদ্বুদ্ধকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও কয়েক ধরনের বিদ'আহ ও হাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনগত ব্যবস্থা সব সময় সুস্পষ্ট করা হয় না; তাই ব্যাপকার্থে বলা যায়, এগুলো হলো বাক স্বাধীনতার অশাস্তিযোগ্য লংঘন।

একথা মনে রাখা দরকার যে, এ শ্রেণী বিভাগের সমগ্র দিকটা অংশত অনেকটা একই রকম, বিশেষজ্ঞ বা আলেমগণ কখনও কখনও এসবের পরিভাষা অদলবদল করে ব্যবহার করেন। সম্ভবত এর অনুমানযোগ্য ধারণার কারণে তারা এরূপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অজ্ঞতা বা সীমা লংঘনের বিষয় প্রায়

www.pathagar.com

খেয়ালখুশির অভিমতে (হাওয়া) এবং ক্ষতিকর উদ্ভাবনী (বিদ'আহ) এর ব্যবস্থার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সর্বশেষ এ দুটি সীমা সংঘনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো: হাওয়া স্বার্থপরতার জোরালো উপাদান এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা কি-তা বিবেচনা না করেই কোন ব্যক্তির ইচ্ছার অনুসরণের সমন্বয়ে গঠিত। অন্যদিকে বিদ'আহর বৈশিষ্ট্য হলো: কোন ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামের মূলনীতিকে বিকৃত করা অথবা তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা। তাই একথা বলা যায় যে, হাওয়া আইনকে অমান্য করে এবং বিদ'আহ তাকে 'বিকৃত' করে। সাধারণত 'বিদ'আত' শব্দটি সুন্নাহ থেকে 'পার্থক্য' বুঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এটিই হলো এর মান নির্ণায়ক ও পরিচিত প্রয়োগ। এ অর্থে বিদ'আহ রাসূল সা: এর সুন্নাহর বিকৃতি ঘটায় অথবা তাকে 'অতি প্রাকৃত' রূপে প্রকাশ করে। একটি মতানুযায়ী বিদ'আহ ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হতে পারে আবার না ও পারে; এ কারণে বিদ'আহ ও হাওয়ার মধ্যে সব সময় পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে ইসলামি আইনের দু'ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁহলো তালাক আল সুন্নাহ ও তালাক আল বিদ'আহ। তালাক আল সুন্নাহ'তে তালাক প্রদান রীতি ইসলামি আইন ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে পরের তালাককে তালাক আল বিদ'আহ বলা হয়। প্রথমত এ কারণে যে, এতে তালাকের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। এ নিয়মে বলা হয়েছে যে, তালাক প্রদানকারীর পক্ষ থেকে তার স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় তুহর বা দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে, একবার করে ঘোষণা দিয়ে তিন তুহরে সর্বোচ্চ তিনবার তালাক দেয়ার কথা জানানো প্রয়োজন। অপরদিকে তালাক আল বিদ'আহতে এভাবে তিন বারে তিনটি ঘোষণা দেয়ার নিয়মকে উপেক্ষা কওে, এক সাথে তিন তালাক দেয়ার বিধান চালু করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীর হীন স্বার্থপরতার বিষয় (হাওয়া)-এ তালাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে কিনা। এর উত্তর অবশ্য সব সময় পরিষ্কার নয়, তবে হ্যাঁ সূচক হবার সম্ভাবনা বেশি। আলোচ্য এ ধারণার মধ্যে পার্থক্য রূপরেখার দিক থেকে ব্যাপক হবে বলে মনে হলেও কার্যত তা ততোটা নয়।

বিদ'আহ ও হাওয়া-উভয়ের থেকে 'বাগি' দ্বারা এর পার্থক্য করা যেতে পারে, এতে ব্যক্তি নিজে যেটা সঠিক মনে করে, তা চরিতার্থ করে এবং নিজের মত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এর সাথে প্রায়ই যারা এর বিরোধিতা করে তাদের সকলের নিন্দা করার বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। এ বাহ্যিক পার্থক্য ছাড়া আলোচ্য ধারণাগুলো প্রায় একইরকম এবং প্রায়ই তা অদলবদল করে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যাতে বিদ'আহ ও 'বাগি'

www.pathagar.com

উভয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমরা আরও দেখতে পেয়েছি যে, বহু আলেম বিদ'আহকে এতো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন যে, সব ধরনের তিরস্কারযোগ্য অভিমতকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। উপরন্তু এদের কোনটিই কেবলমাত্র মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রত্যেকটির সংজ্ঞা, বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল আছে এমন প্রতিটি কাজই এক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

ক. ক্ষতিকর উদ্ভাবনী ও খেয়ালখুশি *(বিদ'আহ ও হাওয়া)*

আক্ষরিকভাবে বিদ'আহর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু উদ্ভাবন করা, যা প্রামাণিক সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা যথার্থ বলে প্রমাণিত নয় অথবা ক্ষতিকর উদ্ভাবনী যা স্বাভাবিক ও প্রতিষ্ঠিত রীতি থেকে অনেক দূরে সরে যায়।[৩৬] বিদ'আহর সংজ্ঞায় বলা যায়, এটি ধর্মের বিষয় নতুন উদ্ভাবন যা শরীয়ার সুস্পষ্ট অনুমোদিত বিষয়ের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় এবং এতে এও মনে হয় যে, শরীয়ার ঘোষিত কোন লক্ষ্য পূরণই যেন এর উদ্দেশ্য।[৩৭] অবশ্য সংজ্ঞায় উল্লিখিত বিদ'আহ ও শরীয়ার প্রতিষ্ঠিত বিধানের মধ্যকার সাদৃশ্য নিছক নামমাত্র, বাস্তবে বিদ'আহ শরীয়াতের প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড লংঘন করে। সংজ্ঞা থেকে আরও আভাস পাওয়া যায় যে, সাধারণত বিদ'আহর লক্ষ্য হচ্ছে কল্যাণ (মাসালিহ্) লাভ করা, শরীয়ার বিধির আওতায় কোন নিয়মনীতির বিচ্যুতি ঘটানো নয়। এর উদ্ভাবকগণ মূলত: এ উদ্দেশ্যে এর প্রচলন করেছেন। অবশ্য বিদ'আহর পশ্চাতে ভালো উদ্দেশ্য থাকার কোনই গুরুত্ব নেই। আবু ইসহাক ইবরাহীম আল শাতিবি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, কারণ বিদ'আহর উদ্ভাবকেরা এমনভাবে বিধান প্রণেতার কর্তৃত্ব দাবি করেন, যাতে আইনের উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হয়ে যায়।[৩৮] বিদ'আহকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন যথার্থ বিদ'আহ (বিদ'আহ আল হাকিকিয়াহ্) ও আংশিক উদ্ভাবনী বিদ'আহ (আল বিদ'আহ আল ইযাফিয়াহ্)। প্রথম শ্রেণীর বিদ'আহ অযৌক্তিক এবং কুরআন, হাদিস বা ইজমা অথবা কোন দৃষ্টান্ত বা সুচিন্তিত অভিমত থেকে এর পক্ষে পুরোপুরি বা আংশিক কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্য কথায় বলা যায়, যথার্থ অর্থে এটি হলো একটি উদ্ভাবন বা নতুন আবিষ্কার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ'আহর দুটি দিক রয়েছে। এর একটির বৈশিষ্ট্য যথার্থ বিদ'আহর অনুরূপ, যা নযীরবিহীন ও অসমর্থনযোগ্য; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ'আহর অপর দিকটির পক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিধি থেকে সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। অন্য কথায় আল বিদ'আহ আল ইযাফিয়ার হচ্ছে দ্ব্যর্থবোধক উদ্ভাবনী যা

www.pathagar.com

সুন্নাহর আলোকে হয় গ্রহণযোগ্য হবে অথবা এর দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হবে।[৩৯]

আরও দু' শ্রেণীর বিদ'আহ রয়েছে, তাহলো, আলবিদ'আহ আল তারকিয়াহ ও আল বিদ'আহ আল গায়ের তারকিয়াহ। আলবিদ'আহ তারকিয়ার বলতে কোনকিছু বর্জন করা হয়েছে এমনটি বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি শরীয়ার বিধান অনুযায়ী কোন বৈধ জিনিস নিজে বর্জন করে অথবা অন্যদেরকে তা করার পরামর্শ দিলে, সেটি এ বিদ'আহর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এর ঠিক বিপরীত হল: আলবিদ'আহ আল গায়ের তারকিয়াহ। এটি হলো এক ধরনের উদ্ভাবনী, এতে কোন কিছু বর্জন করা হয় না, বরং শরীয়ার কোন বিষয়ে পরিবর্তন করা অথবা সে সম্পর্কে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয় যা উদ্ভাবনী বুঝায়, বর্জন নয়।[৪০]

বিদ'আহর বড় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর নির্দেশনার চেয়ে খেয়ালখুশি ও অদ্ভূত অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া। আমরা কুরআনে নবী দাউদ আ: কে সম্বোধন করে নাযিল করা আয়াত পাঠ করে এ সম্পর্কে জানতে পারি :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

হে দাউদ আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের শাসন চালাও এবং নফসের খায়েসের আনুগত্য করো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে (৩৮:২৬)।

নিম্নের আয়াতে বলা হয় :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ .

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গোমরাহ কে হতে পারে, যে আল্লাহর হিদায়াতের ব্যাপারে শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে, আল্লাহ এ ধরনের যালেমকে কখনো হিদায়াত দান করেন না (৩৮:৫০)।

এছাড়া কুরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি খেয়ালখুশির অনুসরণ করে অন্যরা তার আনুগত্য করে না,

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا .

এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার দিলকে আমরা আল্লাহর স্মরণশূন্য করে দিয়েছি এবং যে লোক নিজের নফসের খায়েসের আনুগত্য কার নীতি গ্রহণ করেছে; আর তার কর্মনীতি সীমালঙ্ঘন মূলক। [৩৮:২৮]

আয়াতগুলো উল্লেখ করে আল শাতিবি বলেন, উপরের আয়াত তিনটিতে যে দুটি বিষয়ের যে কোন একটিকে অনুসরণ করার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে, তাহলো : আল্লাহর নির্দেশিত পথ (হুদা, যিকর) অথবা খেয়াল খুশি (হাওয়া)। উদ্ভাবক (মুবতাদি) দ্বিতীয়টি অনুসরণ করে। সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত থাকলেও সে কিন্তু নিজেকে বিভ্রান্ত বলে মনে করে না। আল শাতিবি কুরআনের আরেকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, যাতে ঐ ব্যক্তিদের নিন্দা করা হয়েছে। যারা বিভ্রান্তি ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআনের অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে:

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ .

তিনিই খোদা যিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দু'প্রকারের আয়াত রয়েছে। এক. মুহকামাত, যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ; আর দ্বিতীয়. মুতাশাবিহাত। কিন্তু যাদের মনে কুটিলতা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার গোপাল অর্থ বের করার চেষ্টা করে (৩:৭)।

রাসূল সাঃ এর পত্নী আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়, রাসূল সাঃ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর বললেন, 'যখন তোমরা দেখবে যে লোকেরা কুরআন সম্পর্কে বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, তারা বলছে, আল্লাহতা'আলা এ অর্থই বুঝিয়েছেন, তখন তোমাদের উচিত হবে তাদেরকে পরিহার করা।[১] আল শাতিবি এ প্রসঙ্গে বলেন : রাসূল সাঃ যে বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো কুরআনের দ্ব্যর্থবোধক আয়াত (মুতাশাবিহাত) সম্পর্কিত, এ ধরনের বিতর্ক অনৈক্যের পথ প্রশস্ত করে এবং কুরআনের নির্দেশনা থেকে বিচ্যুতি ঘটায়। নিম্নের আয়াতে একথাই প্রকাশ পেয়েছে :

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

এটাই আমার সোজা ও সরল পথ অতএব তোমরা এ পথেই চল; এছাড়া অন্যান্য পথে চল না তাহলে তা এ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। (৬:১৫৩)।

কুরআনের বিশ্লেষকগণ (মুফাসসিরগণ) এর মতে, 'তাদের পথ অনুসরণ করো না' বলতে সঠিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে যারা, যেমন, উদ্ভাবনকারী ও সন্দেহবাদীদের (আহল আল বিদ'আহ ওয়াশ শুবহাত) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১]

এসব বিবৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আল শাতিবি আরও বলেন, 'মুবতাদিরা বিধানদাতার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে না দেখেই কুরআনের আক্ষরিক অর্থ (জাওয়াহির) তুলে ধরে নানাভাবে শরী'আতকে বিকৃত করে।' খারিযিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে[৪২] আল শাতিবি লিখেছেন: তারা কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থের (মুহকামাত) পরিবর্তে অস্পষ্ট (মুতাশাবিহাত) অর্থ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়। রাসূল সা: এর অধিকাংশ সাহাবীকে রা: তারা কাফের বলে ঘোষণা করে, এমত পোষণ করে যে, কোন ইমাম কাফের হলে তার অনুসারিরাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাফের হবে এবং যিনাকারীদের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রাজম) নয়। খারিযিরা আরও যেসব অভিমত পোষণ করে তার, মধ্যে রয়েছে মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগকারীর মিথ্যা অভিযোগের (কাযফ) জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে; কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে কেউ অনুরূপ অভিযোগ করলে তার জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। ফিকহ'র বিস্তারিত দিক (ফুরু) সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে একটি (গ্রহণযোগ্য আইনী) ওযর; আল্লাহতা'আলা আমাদের (অনারব) মধ্য থেকে একজন নবী পাঠাবেন যিনি একটি কিতাব নিয়ে আসবেন এবং এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর শরীয়া পরিত্যক্ত হবে; সূরা ইউসুফ কুরআনের অংশ নয়, ইত্যাদি (দেখুন, স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট, অধ্যায় দ্বাদশ।) খারিযিগণ এখানে যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও সমর্থন করেছেন; তা ইসলামের মূলনীতি ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৪৩]

কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়া লিখেছেন, কুরআন সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাওয়া সুস্পষ্ট বিষয়ের স্থলে অস্পষ্টতাকে তুলে ধরার ওপর অগ্রাধিকার দিলে কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা ও তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা যায়। এমনকি এরচেয়েও জঘন্য কাজ হলো কোন মুতাশাবি খুঁজে বের করে তার সাহায্যে কোন মুহকামকে বাতিল করার হীন চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর মুহকামের মধ্যে কিছু দুর্বলতা বের করার চেষ্টা চালান এবং মুহকামের মান কমিয়ে মুতাশাবিহ এর পর্যায়ে নামিয়ে আনা

www.pathagar.com

আর এভাবে এর সুনিশ্চিত গুরুত্বকে বাতিল করা হয়।' কুরআনের কোন কোন অংশের অর্থ সম্পর্কে জাহমিয়া ও কাদিরিয়ার (এরা হলো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের দুটি উপদল) দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] লেখক তাঁর আলোচনার উপসংহারে বলেছেন, সাহাবীগণ, শীর্ষস্থানীয় ফকিহ্ এবং বিশেষজ্ঞগণ যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী : মুহকামের আলোকে অবশ্যই মুতাশাবিহ'র অর্থ উপলব্ধি করতে হবে, এর বিপরীত নয়, যাতে কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসিরের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও পূর্বাপর মিল বজায় থাকে।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে বাতিনিয়ার (এরা ইসমাইলিয়া বলেও পরিচিত) দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ ও বিশ্বাসের বিষয়, বিশেষ করে ফরয নামায (সালাত), গরিবদের সম্পদের অংশ প্রদান (যাকাত), রমাযানে রোযা পালন (সাওম) এর মতো কুরআনের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে তাদের গৃহীত অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে তারা যে অর্থ গ্রহণ করেছে, তা এ ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমের গৃহীত অর্থের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাতেনিয়ারা নামাযকে (সালাত) রাসূল সাঃ এর সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয় নামায তোমাদেরকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে' (২৯:৪৪)। বাতিনিয়াদের মতে নামায নয়, রাসূল সাঃই খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখেন, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তারা যাকাত বলতে আত্মর পরিশুদ্ধি, সাওম বলতে 'অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা' বেহেশত (জান্নাত) বলতে 'মানুষের শরীরের সুঘ্রাণ বুঝিয়া থাকেন।' ওযূ হচ্ছে 'অপেক্ষমান ইমামের অনুসরণ; পানির অভাবে পরিষ্কার মাটি দিয়ে ওযূ করার বিধান তাইয়ামমুম। বাতিনিয়াদের দৃষ্টিতে তাইয়ামমুম হল 'ইমামের অনুপস্থিতিতে ইমামের ডেপুটির অনুসরণ', গোসল অর্থ হল, 'ইমামের প্রতি আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতির নবায়ন'[৪৭] এসব কারণ দুর্শিয়ে এবং কুরআনের বিষয় সম্পর্কে এ ধরনের দূরতম ও প্রতীকী ব্যাখ্যা দিয়ে সম্ভবত তারা তাদের এ 'বাতেনিয়া' নাম গ্রহণ করেছে।

অতি সম্প্রতি কিছু মুসলমান যে বিদ'আতটি গ্রহণ করেছে, তা হল সুন্নাহর অপরিহার্যতা অস্বীকার করা। তারা মনে করে যে, কুরআন স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্ভুল এবং সুসমন্বিত, যা শরীয়ার একমাত্র উৎস। এ মতের অনুসারিরা নিজেদেরকে কুরআনের দল বা ফিরকা আল কুরআনিয়া বলে থাকে। মিশর, লিবিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য স্থানে এ মতের অনুসারীরা রয়েছে বলে জানা গেছে।

কতিপয় বিশিষ্ট ফকিহ বিশেষ করে ইমাম আল শাফেঈ ভাল উদ্ভাবনীর

(বিদ'আহে হাসানা) ধারণাকে মেনে নিলেও ইবনে তাহমিইয়া বিদ'আতকে ভাল (হাসানা) বা খারাপ বিদ'আহ হিসেবে বিভক্ত করাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, সব বিদ'আহই খারাপ। পূর্বোক্ত গ্রুপ মনে করেন যে, মুসলিম সমাজ যদি বিদ'আতে হাসানাকে গ্রহণ ও সাধারণভাবে অনুমোদন করে নেয়; তাহলে তা আর ক্ষতিকর উদ্ভাবনী বলে গণ্য হবে না। ইবনে তাইমিইয়া এ মতকে খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে (দশম শতাব্দী) এ মত চালু হয়। সব বিদ'আহই খারাপ, হাদিসে সুস্পষ্টভাবে একথাই বলা হয়েছে। এরপর তিনি নিম্নের তিনটি হাদিস উদ্ধৃত করেন : 'সব বিদাতই বিভ্রান্তিকর। কুল্লি বিদ'আতিন যালালাহ-' প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই বিদ'আহ, কুল্লি মুদাসাতিন বিদ'আহ-, নতুন উদ্ভাবনীই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস',। ইন্না শার আল-উমুর মুহদাসাতুহা' ভাষ্যে ইবনে তাইমিইয়া বিদ'আহ সম্পর্কে যে উদাহরণ পেশ করেছেন তা হল, প্রধানত ইবাদত-বন্দেগি সংক্রান্ত, যেমন বছরের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে রোযা রাখা, অননুমোদিত নামায (আল সালাত আল মুহদাসাহ) এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত নয় এমন উৎসব পালন।[৪৯]

কতিপয় বিদ'আহ ভাল বলে যে মত প্রকাশ করা হয়, তার মূলে রয়েছে 'উমার ইবন খাত্তাব রাঃ এর একটি দৃষ্টান্ত। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি রমযান মাসে জামাআতবদ্ধভাবে তারাবির নামায প্রচলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : 'নিয়ামাল বিদ'আহ', 'কি চমৎকার বিদ'আত।' এর জবাবে ইবনে তাইমিইয়া বলেন, 'তারাবির নামায আদৌ নতুন কোন উদ্ভাবনী ছিল না, বরং রাসূলের সাঃ সুন্নাতের মধ্যে এর মূল নিহিত ছিল এবং সাহাবীগণ এ নামায আদায় করতেন; তবে কিছু সময় রাসূল সাঃ তা পালন থেকে বিরত ছিলেন। এ কারণে যে, তিনি নিয়মিত তারাবির নামায আদায় করলে লোকেরা একে বাধ্যতামূলক বা ফরয বলে মনে করতো। অতএব 'উমার ইবন আল-খাত্তাব রাঃ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর।' বিষয়টি হাদিসের পরিপন্থী নয়, ইবনে তাইমিইয়া এ সম্পর্কে বলেন,' 'উমার রাঃ অবশ্য বিদ'আহ শব্দটি ভাষাগত অর্থে ব্যবহার করে থাকতে পারেন, যার অর্থ হলো, বিস্মৃত কোনকিছুকে স্বাগত জানানো। তিনি শরিয়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন নতুন উদ্ভাবনীর অর্থে (বিদ'আহ শারী'ইয়া) এর ব্যবহার করেননি।'[৫০]

অপরদিকে ইমাম আল শাফেঈ স্বীকার করেন যে, উদ্ভাবনী বা বিদ'আহ দু'প্রকার, এর একটি কুরআন ও সুন্নাহ, এবং সাহাবীদের দৃষ্টান্ত ও ইজমার বিধান লংঘন করে, অপরটির অবশ্য কিছুটা কল্যাণকর দিক রয়েছে। প্রথমটি বিভ্রান্তিকর উদ্ভাবনী (আলবিদ'আহ আল দালালাহ) কিন্তু দ্বিতীয়টি তা নয়। শাফেঈ ফকিহ

'ইয্‌য আলদিন আব্‌দ্‌ আল সালাম এ বিশ্লেষণকে গ্রহণ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, কল্যাণকর বিদ'আহর সঙ্গে নৈতিক বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে, যেমন আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা অথবা সাধারণ শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনের মতো প্রশংসনীয় কোন কাজ (মানদুব) করা। বিভ্রান্তিকর বা দোষণীয় বিদ'আতেরও বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। নিছক তিরস্কারযোগ্য (মাকরুহ) কাজ দিয়ে শুরু হলেও এর ব্যাপকতা বেশ গভীর। যেমন কোন মসজিদের মাত্রাতিরিক্ত অলংকরণ ও সাজসজ্জা করা, এটি করা নিষিদ্ধ (হারাম), অথবা কুরআন এমনভাবে তিলাওয়াত করা যাতে তার অর্থ বিকৃত হয়। আরেক ধরনের বিদ'আহ রয়েছে, যাকে নিরপেক্ষ (মুবাহ) বিদ'আহ বলা যেতে পারে। যেমন খাদ্যে রং ব্যবহার করা। যারা কল্যাণকর বা ভাল বিদ'আহর সমর্থন করেন তারা "সকল বিদ'আহই বিভ্রান্তিকর"-রাসূলের সাঃ এর এ হাদিসের ব্যাখ্যা এমনভাবে করেন যে এখানে 'বিদ'আহ' শব্দটির মাধ্যমে কেবল এমন ধরনের উদ্ভাবনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহকে লংঘন করে।[৫১] অপরদিকে ইমাম মালিক 'ভাল বিদ'আহ এর ধারণা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হাদিসের শব্দের এধরনের অর্থ গ্রহণ করা হলে হাদিসটিকে সুস্পষ্টভাবে বিকৃত করা হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[৫২]

বিদ'আহ সম্পর্কে যারা পুরোপুরি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, তারা বিদ'আহকে ধর্মের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনী বলে গণ্য করে থাকেন; যা বৈধ নয়, যেমন, বছরের নির্দিষ্ট কোন সময়ে (রজব মাস ও আশূ'রার সময়) অতিরিক্ত নামায পড়া, অথবা যা মৌলিকভাবে বৈধ তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা, যেমন, নামাযে সূরা কির'আত পাঠের সময় সুর করে গানের মতো বা নেচে নেচে পাঠ করা (নামাযে কুরআন উচ্চৈস্বরে পড়া বা তিলাওয়াত করা জায়েয কিন্তু নৃত্য করা ও সুর করে পড়াকে বিদ'আহ বলে গণ্য করা হয়) অথবা এর ঠিক উল্টো, কোন ক্ষেত্রে ঠিক যতটুকু করা উচিত তার চেয়ে কম করা, যেমন 'এককভাবে' ইবাদত বন্দেগির সময় আল্লাহর অন্যান্য নাম যেমন, সুবহান আল্লাহ, রাহমান, রহীম ইত্যাদি বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহ নাম জপ করা অথবা কোন ইবাদতের সঠিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন, যেমন ঈদের নামাযের আগে খুতবা প্রদান করা, প্রকৃতপক্ষে নামাযের পরে এ খুতবা প্রদান করার নিয়ম।

খিযর আল হুসাইন সবচেয়ে খারাপ কতিপয় বিদ'আহর কথা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে সম্পদ ও জীবনের ক্ষতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কোন মাযারে (মৃত ব্যক্তির কবরে) খাদ্য দ্রব্য ও মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করা, এর চেয়েও ক্ষতিকর হল; মৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য পশু উৎসর্গ বা যবাহ করা, আর এভাবেই

www.pathagar.com

দুর্ভোগ ও অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করা।

অবশ্য একজন সুবিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের (মুজতাহিদ) গবেষণার ফলাফল এসব থেকে ভিন্ন। তার মতে, উদ্ভাবনমূলক ও অধিকাংশ মতের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিদ'আহ বলে অভিহিত করা যাবে না। এ ধরনের অভিমত বা ইজতিহাদ এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই, একে দুর্বল অভিমতের বেশি কিছু বলে গণ্য করা হয় না। তবে কোন ইজতিহাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ'আহ পরিভাষা ব্যবহার সঠিক হবে না।[৫৩]

আল শাতিবি ভাল বিদ'আহ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং জনস্বার্থ (মাসলাহা মুরসালাহ) বিবেচনা ও ইসতিহসান এর সাথে এর যথেষ্ট মিল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখেছেন। আল শাতিবি অবশ্য এ বিষয়টি প্রমাণের সকল যুক্তি পেশ করেছেন, তবে এগুলোর সবই যে সমান্তরাল দৃষ্টিভঙ্গি, তেমন কোন মন্তব্য করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, অনেক লোক মনে করেন, মাসালাহ মুরসালাহ এক ধরনের প্রয়োজনীয় কল্যাণকর বিদ'আহ (বিদ'আহ মুস্তাহসানা) এবং এটি বৈধ নীতি মাসলাহা হিসেবে গৃহীত হলে কল্যাণকর বিদ'আহ এর ধারণাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকবে না; কারণ উভয় ধারণা হুবহু একই ধরনের। কোন পরিস্থিতিতে (যেমন আল-ইতিবার আল মুনাসিব) কি ব্যবস্থা গ্রহণ সঠিক হবে তার উপরই নির্ভর করে উভয় বিষয় গড়ে উঠেছে এবং শরীয়ায় এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। মাসলাহা মুরসালাহর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা যদি থাকে-তাহলে বিদ'আহ মুস্তাহসানার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হওয়া উচিত।[৫৪]

আল শাতিবি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ইমাম মালিক এবং অধিকাংশ হানাফি বিশেষজ্ঞ মাসলাহা মুরসালাহ ও ইসতিসানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি এ পর্যন্ত বলেই তার আলোচনার ইতি টানেন এবং এ মতের দিকে ফিরে যান যে, মাসলাহা মুরসালাহ ও ইসতিহসান এর সঙ্গে বিদ'আহর সম্পর্ক নেই; তাই এদের কোনটির সাথে বিদ'আহর তুলনা করা যাবে না; কেননা সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তিকর-এ কারণেই কল্যাণকর বিদ'আহ বলতে কিছু নেই।

যুক্তির ভিত্তিতে মন্তব্য করলে অবশ্য এ কথা বলা যাবে যে, মাসলাহা মুরসালাহ ও বিদ'আহ হাসানা যথার্থ অর্থে সমান্তরাল অভিমত এবং তার একটিকে গ্রহণ করা এবং অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করা দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ হবে না। মাসলাহা মুরসালাহর অনুমোদনযোগ্য কোন প্রমাণ শরীয়ায় পাওয়া গেলে, তা বিদ'আহ হাসানার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে গণ্য হবে। আমার মতে, বিদ'আহ

www.pathagar.com

হাসানার ধারণা গ্রহণ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর সমর্থনসূচক দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ ও যৌক্তিক। এছাড়া রাসূল সাঃ এর এ সংক্রান্ত হাদিসের অর্থ অনুধাবনেও এ অভিমত সহায়ক বিবেচিত হবে। রাসূল সাঃ কেবল ক্ষতিকর বিদ'আহ যা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও শরীয়ার মূলনীতির লংঘন করে সেসব বিদ'আহ বর্জন করতে বলেছেন।

আল গাযালী উদ্ভাবনকারীদেরকে (মুবতাদি) দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ এক. যারা বিদ'আতর দিকে অন্যদেরকে দা'ওয়াত দেয়, দুই. যারা ভয় বা ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে নীরব থাকে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত মুবতাদিরা এমন মত প্রচার করে থাকতে পারে যা অস্বীকৃতির (কুফরি) পর্যায় বলে গণ্য হবে না, এ ক্ষেত্রে বিষয়টি একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যে থাকে (ফাআমরুহু বাইনাহু ওয়া বাইন আল্লাহ)। তবে যদি সে কুফরির পর্যায়ে পড়ে এমন বিষয়ে দাও'আত দেয় তাহলে সে প্রকৃত কাফেরের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে। কোন কাফেরের অন্যায় কাজ তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে না কারণ সবাই জানে যে, সে একজন বিধর্মী তাই ঈমানদার ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই তার কথায় কান দেবে না। অপরদিকে সক্রিয় একজন মুবতাদি বিদ'আতের প্রচার কাজে নিয়োজিত থাকে, সে একে সঠিক বলে দাবি করে এবং সত্যের ছদ্মাবরণে দুর্নীতি বিস্তারের চেষ্টা চালায়-এ ধরনের অপরাধ সংক্রামক ব্যাধির মতোই মারাত্মক। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুবতাদিকে অবশ্য বর্জন করতে হবে এবং তার দুষ্কর্ম প্রকাশ করে দিতে হবে। প্রকাশ্যে তার কাজের বিরোধিতা করতে হবে এবং তাকে কোন ধরনের সহায়তা দান পরিহার অথবা অথবা তার সাথে কোন ধরনের সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যেসব সাধারণ মানুষ (আল মুবতাদি 'আল 'আম্মি) বিদ'আত অনুসরণ করে কিন্তু অন্যদেরকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম নয় এবং কারোর নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনাও তাদের তেমন একটা নেই, এমন ক্ষেত্রে তাদের সাথে কঠোর আচরণ ও অবমাননাকর ব্যবহার করা যাবে না, এর পরিবর্তে তাদেরকে উত্তম পরামর্শ (নসিহাত) ও সদয় উপদেশ দান করতে হবে। তবে নসিহাত যদি নিষ্ফল প্রমাণিত হয় এবং বর্জনের (ই'রাদ) আহ্বান জানানো হয়, তাহলে অবশ্য এ ধরনের কঠোর আচরণ করা যেতে পারে। কেননা বিদ'আতকে যদি নিন্দা না করা হয় তাহলে তার বিস্তার ঘটার আশঙ্কা রয়েছে এবং এতে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত মনোভাব বৃদ্ধি পেতে পারে।[৫৫]

আল শাতিবি সত্য বা মিথ্যা কিনা তা অজ্ঞাত এমন বিদ'আতর ব্যাপারে বাকসংযম অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন : সত্য প্রকাশিত না হওয়া

www.pathagar.com

পর্যন্ত এ ধরনের অভিমত প্রচার না করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৫৬] বিদ'আত প্রচার করে বেড়ায় এমন ব্যক্তিদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত বলে কতিপয় আলেমের অভিমতের জবাবে আল শাতিবি বলেন, তাদের অসদাচরণের মাত্রা অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা উচিত। বিদ'আত যদি হালকা ধরনের হয় তাহলে তাদের শাস্তিও হালকা হওয়া উচিত, তবে তা যদি মারাত্মক লংঘনের পর্যায়ে পড়ে তাহলে শাস্তিও তদনুরূপ বৃদ্ধি করা উচিত। এরপর লেখক উপসংহারে একথা বলেন যে, বিদ'আত কোন একক ধারণা নয়, আবার একক অপরাধও নয়, তাই প্রতিটি বিদ'আতকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে ও মূল্যায়ন করতে হবে এবং কঠোরভাবে এরই ভিত্তিতে যারা বিদা'আত অনুসরণ করবে তাদের সাথে আচরণ ও শাস্তির বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।[৫৭]

এই আলোচনার শেষে আমি এখন বিদ'আত সম্পর্কে যে কোন ধরনের আলোচনা এমনকি তা কেবল খণ্ডন করাও পরিহার করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের ব্যাপারে ইমাম আল গাযালী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করবো।

আল গাযালী তার গ্রন্থ আল মুনকিজ মিন আল-দালাল-এ ঘটনাক্রমে বিদ'আহ প্রচার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বাতেনিয়াদের ধর্ম বিশ্বাস (আকিদা) ও নীতি খণ্ডন করার জন্য নিজের লেখার কথা উল্লেখ করে আল গাযালী বলেন। 'একজন সুন্নী বাতেনিয়া মত সম্পর্কে আমার যুক্তি ও অতিরিক্ত বক্তব্য দান করার মধ্যে ত্রুটি দেখতে পান'[১] সমালোচনার মূল দিক এটি ছিলনা যে আল গাযলী বাতেনিয়া যুক্তিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে ও বিন্যস্ত করতে পারেননি বরং এজন্য যে তারা তাদের নিজস্ব নীতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ও সমর্থন করতে পারেন নি। ইমাম গাযালী এ সমালোচনা মেনে নেন অতপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি উদাহরণ উল্লেখ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মুতাযিলাদের মত খণ্ডন সংক্রান্ত হারিস আল মুহাসিবির লেখায় ত্রুটি দেখতে পান। জবাবে আল মুহাসিবি বলেন, উদ্ভাবনী বা বিদ'আত খণ্ডন করা অবশ্য করনীয় কাজ। এর জবাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, তবে আপনি প্রথমে সত্য বলে মনে হলেও বস্তুত সত্য নয় এমন সব যুক্তি আগে তুলে ধরেছেন এরপর তার জবাব দান করেছেন। কোন একজন হয়ত কেবলমাত্র একাংশ (প্রথম অংশ) পাঠ করলেন অথবা কেবলমাত্র ঐ অংশটুকুই তার অন্তরে গেঁথে গেল! আল গাযালী মন্তব্য করেন যে আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমতই সঠিক তবে তা এমন যুক্তি সম্পর্কিত যা ব্যাপক প্রচার পায়নি এবং তার দুর্নামও ছড়িয়ে পড়েনি। এধরনের অভিমতের জবাব দেয়া জরুরি এবং যুক্তিগুলো আগে পেশ করার মাধ্যমেই তা প্রদান করা সম্ভব।[৫৮]

www.pathagar.com

আক্ষরিক অর্থে হাওয়া বলতে খামখেয়ালীপনা, এক ধরনের প্রবণতা বা ইচ্ছা বোঝায় যা কখনও কোন অভিমত গঠন বা প্রকাশের পথ প্রশস্ত করে না। আলেমগণ আবেগ তাড়িত এসব খেয়ালীপনাকে কখনোই 'অভিমত' হিসেবে ব্যবহার করেননি। এ ব্যবহার মূলত রূপকার্থে হয়েছে এবং উদ্দেশ্য দেখে তাকে সনাক্ত করা হয়, সম্ভবত কুরআনে হাওয়া ও এর প্রতিশব্দ বারবার উল্লিখিত হওয়ার বিষয় থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি করা হয়। হাওয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হল মনের (নফস) খায়েস পূরণের প্রবণতা যা শরী'আত অনুমোদিত নয়। ইতিমধ্যে আভাস দেয়া হয়েছে যে কুরআনে হাওয়াকে সঠিক নির্দেশনা (হুদা, যিকর) এর বিপরিত অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একে কুরআন যে সত্য প্রকাশ করেছে তার থেকে বিচ্যুতি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এ অর্থে কুরআনের অন্তত ২৫টি স্থানে মুমিনদেরকে হাওয়ার বিপদ ও প্রলোভন সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যা লোকদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।[৬০] 'খেয়ালী মানুষ' (আহল আল হাওয়া) পরিভাষাটি এসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা সত্যের সীমালংঘন করে ক্ষতিকর ও বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করে থাকে, যা মুমিন ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মতাদর্শ যদি কোন ব্যক্তিকে খেয়াল খুশি ও মর্জিমাফিক চলার সুযোগ করে দেয়, তাহলে তা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে, এমনকি মিথ্যার দিকে ধাবিত করতে পারে।

যেকোন মূল্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করা চাই, এটি করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অথবা এতে অন্যদের কল্যাণের দিকটি রক্ষিত হবে কিনা-এক্ষেত্রে তা তোয়াক্কা না করা হলো হাওয়ার উদাহরণ। সবচেয়ে খারাপ ধরনের হাওয়া হল, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে ন্যায়বিচার, দয়া ও সত্যের নামে দৃশ্যত সত্য ও যথার্থ বলে যুক্তি পেশের ভান করা। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মানুষের মন ও জীবনের ওপর হাওয়ার প্রভাবের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

افرءيت من اتخذ الهه هونه واضله الله

> 'তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছো যে লোক স্বীয় নফসের খায়েশকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে গোমরাহিতে ফেলে রেখেছেন।' (৪৫:২৩)

কুরআনে হাওয়াকে শরী'আতের পরিপন্থি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নের আয়াতেঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ.

www.pathagar.com

তারপর এখন (হে নবি আমরা তোমাকে দীনের ব্যাপারে এক সুস্পষ্ট উজ্জ্বল রাজপথের (শারী'আহ) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; অতএব তুমি তার ওপরই চলতে থাক এবং সেই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করোনা; যাদের কোন বিষয়ে 'ইলম নেই। (৪৫:১৮)

মুফাসসিরে কুরআন আল জামাখশারি (মৃত্যু, ৫৩৮/১১৪০) এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন : শরী'আত অনুসরণ করুন, কারণ তা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞ লোকদের খেয়ালখুশি ও ক্ষতিকর উদ্ভাবনীর (হাওয়া ওয়া বিদ'আহ) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মত ও যুক্তির দ্বারা কখনও প্রভাবিত হবেন না।[৬১] উপরন্তু রাসূল (সা:)-এর হাদিস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর উম্মতদের উদ্দেশ করে বলেছেন :

لا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

'ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউই (সত্যিকার) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইচ্ছাকে (হাওয়া) আমার আনীত (হিদায়াত) এর অধীনে ন্যস্ত করতে না পারবে'।

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

,مَا عُبِدَ تَحْتَ السَّمَاءِ اِلٰهٌ اَبْغَضُ اِلَى اللهِ مِنَ الْهَوٰى.

'আসমানের নীচে যত ধরনের 'দেবতার' উপাসনা করা হয়; তার কোনটিই আল্লাহর কাছে হাওয়ার চেয়ে অধিক ঘৃণ্য নয়।'[৬২]

হাওয়া সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল কোন বিষয় বৈধ বা নিষিদ্ধ বলে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে; কিন্তু বিষয়টি যখন তার নিজের ওপর অথবা তার বন্ধুদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তখন তা সে উপেক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি অগ্রক্রয়কে (শুফ) বৈধ বলে বিশ্বাস করে এবং এটি করা তার অধিকার বলে দাবি করে; কিন্তু অপর কেউ একই দাবি করলে সে তা উপেক্ষা করে বলে যে, এর কোন প্রমাণ নেই এবং এব্যাপারে সে একটি নতুন অভিমত দাঁড় করায়।[৬৩] অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি গান শোনার মতো কোন নির্দিষ্ট কাজ করায় অপর কোন ব্যক্তির নিন্দা করলো কিন্তু যখন তার বন্ধুরা ঐ একই কাজ করলো, তখন সে বললো; এটি যে নিষিদ্ধ কাজএমন কোন প্রমাণ নেই-তাই বিষয়টি এখনও ইজতিহাদ এর জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।[৬৪]

ফকিহগণ হাওয়ার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলেননি। বিদ'আত পালনকারীদের জন্যও কেবল এক ধরনের সামাজিক বয়কট ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই। এ সামাজিক বয়কটের (আল হাজর, একে

www.pathagar.com

ইরবাদও বলা হয় থাকে) মধ্যে রয়েছে বিদ'আত পালনকারীকে সালাম দিতে অস্বীকার করা, তার সঙ্গে কথা না বলা এবং তার মতকে অনুমোদন না করা। বিশেষ করে বিদ'আত সামগ্রিক অর্থে সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা আল্লাহর অধিকার (হক আল্লাহ) লংঘন সম্পর্কিত বিষয়ে হলে আলেমগণ হাজর করাকে সামাজিক কর্তব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন, এক্ষেত্রে বিদ'আত পালনকারীরা আত্মীয়, প্রতিবেশী বা অপরিচিত কিনা-তা বিবেচ্য নয়।[৬৫] তবে বিদ'আত যদি ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত হয়; আর তা যদি অপরের কুৎসা রটনা অথবা মান হানিকর ধরনের হয়-তাহলে সালাম দেয়ার অনুমতি রয়েছে এবং হাজর করার দরকার হবে না। হাজরের মেয়াদের কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুতপ্ত হওয়া (তওবা) ও নিজেকে সংশোধন না করা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। বিদ'আতের নিন্দা করা সমাজের একটি নৈতিক দায়িত্ব এবং যারা বিদ'আত খণ্ডন করার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে সক্ষম, যাদের হাতে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি রয়েছে এবং যারা বিদ'আতর অবসান ঘটাতে সক্ষম-তাদের সকলকেই তাদের সাধ্যানুযায়ী তা অবশ্যই করতে হবে।[৬৬]

আলেমগণ মনে করেন যে, সরকারের মধ্যে বিদ'আত ও হাওয়া রোধ করার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপ্রধানের। প্রয়োজন দেখা দিলে অথবা সমাজের কল্যাণে (মাসলাহা) জরুরি হয়ে পড়লে জ্ঞান বিস্তার করা এবং জাতির নেতাদের যে সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে তারই অংশ হিসেবে এটি করা তার কর্তব্য। নিম্নে রাষ্ট্রপ্রধানের যেসব কর্তব্য রয়েছে তা উল্লেখ করা হল : সন্দেহ ও তা বিদ'আত থেকে দ্বীনকে সংরক্ষণ করা ও দ্বীনের প্রচার করা, বিদ'আত ও হাওয়া প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কাফের ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে হিদায়াত ও সত্যের দা'ওয়াত প্রদান, বিদ'আত ও হাওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধান ও তা সংকলিত করা এবং সর্বোত্তম মতামতকে অনুমোদন বা বৈধ বলে ঘোষণার মাধ্যমে এ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিরসন করা। কোন ইমাম যখন এ ধরনের ইজতিহাদ করেন অথবা তিনি সাধারণের পালনের উদ্দেশ্যে অন্যদের ইজতিহাদকে নির্বাচন করেন, এমন কি ঐ ইজতিহাদের বৈধতা সম্পর্কে বিতর্কও যদি থাকে, তাহলেও তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং তা পালন করা অবশ্য করণীয় বিষয়ে পরিণত হবে।[৬৭]

খ. সীমা লংঘন ও মতবিরোধ *(বাগি ও ইখতিলাফ)*

বাগির অর্থ হলো নিয়ম শৃঙ্খলাহীনতা, সত্য মেনে নিতে অস্বীকার করা এবং অশুভ উদ্দেশ্য, অসততা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ সীমালংঘনমূলক আচরণ।[৬৭] বাগি বলতে একটি বৈধ সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতাও বোঝায়। এ অর্থে বাগির সংজ্ঞা

হিসাব বলা যায় যে, এমন একজন বৈধ ইমামের আনুগত্য করতে অস্বীকার করা, যিনি কোন পাপ কাজে (মা'সিইয়াহ) লিপ্ত নন। কোন একটি ব্যাখ্যা বা নির্দিষ্ট মতের ভিত্তিতে অথবা তা ব্যতিরেকেই অমান্য করার এ কাজ সংঘটিত হোকনা কেন, এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যক্তি অবশ্য তাকে সঠিক বলেই মনে করে থাকে।[৬৯]

যখন কোন ব্যক্তি বা একদল লোক কোন বৈধ কাজ করার চেষ্টা করে অথচ তাদের বিরোধী পক্ষ এ কাজকে তখন অন্যায় কাজ বলে নিন্দা করে। এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। এটি হল বাগির একটি দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারিরা ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে যেমন, নামাযের আহ্বান জানিয়ে আযান দেয়া, নামাযে দাঁড়ানোর জন্য ইকামত দেয়া,' এমনকি নামাযের ভিতরেও কিছু নিয়ম কানুন পালন করে থাকেন যাতে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মৌলিকভাবে এ ধরনের ভিন্নতা অনুমোদনযোগ্য, কেননা সব ধরনেই ইবাদতের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এবং সামান্য পার্থক্যের কারণে একটির চেয়ে অপরটি শ্রেষ্ঠ বা অগ্রাধিকার প্রাপ্য বলে দাবি করার কোন যুক্তি নেই। তথাপি বাগির কারণে কয়েকটি মাযহাবের অনুসারিরা তাদের মতো করে ইবাদত বন্দেগি না করার কারণে তাদের প্রতিপক্ষ মাযহাবগুলোর অনুসারিদের নিন্দা ও অবমাননা করে থাকেন। তাদের এ আচরণ কেবল ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, আমরা জানি যে, সুফিগণ ধর্মের বাইরের দিক নিয়ে আলোচনা করতে বেশি আগ্রহের জন্য ফকিহদের প্রায়ই সমালোচনা করে থাকেন। অন্যদিকে ফকিহগণ শরীয়ার বিধিবিধান দুর্বোধ্যভাবে উপস্থাপন করার জন্য সুফিগণের সমালোচনা করেন। যখন এক পক্ষ অন্যপক্ষের অবস্থানের গুণ বিবেচনা না করেই পরস্পরের নিন্দা করেন তখন সুফি ও ফকিহ উভয় পক্ষ 'সীমালংঘনের' কাজে শরীক হন। কারণ তারা নিজেদের মতকে সঠিক এবং বিরোধীদের মতকে ঢালাওভাবে সঠিক নয় বলে দাবি করেন। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হল সীমালংঘন ও পূর্বধারণার উর্ধ্বে উঠে উভয় পক্ষকে পরস্পরের মতের ভাল ও মন্দ উভয় দিক মূল্যায়ন করা এবং এরপর সে অনুযায়ী তার স্বীকৃতি প্রদান করা। সত্যানুসন্ধান এবং অপরের অভিমতের মূল্যায়ন বা সমালোচনার ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের অজ্ঞতা তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ অথবা কোন পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মতো অপ্রাসঙ্গিক মনোভাব অবশ্যই বর্জন করতে হবে।[৭০]

•

আযান ও নামাযের কাতারবদ্ধ হবার আহ্বানের (আযান ও ইকামত) ভিন্নতাসহ আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগির খুটিনাটি ব্যাপারে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) রয়েছে :

www.pathagar.com

ঈদের নামায ও বিপদ থেকে আসানের নামায (সালাত আল খাউফ) এর মতো অন্যান্য নামাযে পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও মর্মকথা একই। ইবনে তাইমিইয়ার মতে, এ ধরনের মতপার্থক্য হচ্ছে ইখতিলাফ আল তানাব্বু অর্থ খুটিনাটি বা ছোটখাট মতপার্থক্য। এর বিপরীত হচ্ছে ইখতিলাফ আল তাদাদ (বড় ধরনের মতপার্থক্য, যা বিরোধের সমপর্যায় বলে গণ্য হয়)। ইখতিলাফ আল তানাব্বুতে বৈধ বলে গণ্য দুই বা ততোধিক মতের একটিকে অন্যগুলোর চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং তাকে সেভাবেই তুলে ধরা ও মূল্যায়ন করা উচিত। ইবনে তাইমিইয়ার মতে, এ অগ্রাধিকারের গুরুত্ব (তারজিহ) নির্ভর করবে, দুটি মতের মৌলিক বৈধতার স্বীকৃতির উপর, এর একটিকে পালনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে; অপরদিকে অন্যটিকে নিন্দা করা হয় না অথবা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানও করা হয় না।[৭১] পরে লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত এ সম্পর্কিত একটি হাদিস উল্লেখ করেন :

سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى يَقْرَأُ خِلَا فَهَا، فَاخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ : كِلَا كُمَا مُحْسِنٌ، وَلَا تَخْتَلِفُوْا، فَانَّ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلِفُوْا فَهَلَكُوْا.

'আমি এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি রাসূল সাঃ কে তা ভিন্নভাবে তেলাওয়াত করতে দেখেছি। তাই আমি লোকটিকে হাত ধরে রাসূল সাঃ এর দরবারে নিয়ে হাযির হই এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করি। তখন আমি রাসূল সাঃ এর চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ছায়া লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : তোমরা দুজনই সঠিক পথে আছ। (কিলাকুমা মুহসিন) তাই (এনিয়ে) মতপার্থক্য করো না। যারা (তুচ্ছ বিষয় নিয়ে) মতবিরোধের সৃষ্টি করে তোমার কাছে আসবে তারা, এর পরিণতিতে ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৭২]

ইবনে তাইমিইয়া আরও বলেন, 'রাসূল সাঃ জুহদ সমন্বয়ে গঠিত মতপার্থক্য করাকে নিষিদ্ধ করেছেন; কারণ তা সত্য এবং অপর পক্ষের অভিমত বা আচরণের সত্যনিষ্ঠতাকে অস্বীকার করে।' একথাই উপরের হাদিসে বলা হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়ে মতভেদই বস্তুত ধ্বংসাত্মক। বিরোধে লিপ্ত পক্ষগুলোর দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট করেছেন রাসূল সাঃ। দু'পক্ষই কুরআন তিলাওয়াত করেন; কিন্তু তাদের উচ্চারণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আর সে কারণেই রাসূল সাঃ

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন যে, তারা উভয়েই মুহসিন (ভাল ও সঠিক কাজে সংশ্লিষ্ট); তবে ভিন্নভাবে তিলাওয়াতের মত তুচ্ছ বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টির বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে তিনি তাঁদেরকে সংশোধন করে দেন।'[৭৩]

ইখতিলাফ আল তাদাদকে মতবিরোধ বলে গণ্য করা হয়, যা মৌলিক বা সহায়ক অথবা উভয় দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দুটি মত। এ ধরনের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত অনুযায়ী পরস্পর বিরোধী দু'টি মতের একটি মাত্র সঠিক হতে পারে এবং একটিই এরূপ বলে ঘোষিত হবে, উভয়টি নয়। এ ধরনের ইখতিলাফের উদাহরণ হিসাবে স্বাধীন ইচ্ছা বা পূর্বস্থিরবাদ সম্পর্কে সাহাবীগণের অভিমত এবং বিভিন্ন মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের (ফকিহ্) ও সুফিগণের (মুতাসাওইফাহ্) অভিমত ও বিশ্বাসের পার্থক্যের বিষয় তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞগণ। ইখতিলাফ আল তানাব্বু থেকে এটির পার্থক্য রয়েছে। এতে উভয় পক্ষই সন্দেহাতীভভাবে সঠিক; তবে সেক্ষেত্রে যে পক্ষটি সীমালংঘন করে এবং অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বাগির আশ্রয় নেয়; তাদের ওপর দোষ চাপান হয়।[৭৪] ইবনে তাইমিইয়ার মতে, এ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে বড় ধরনের মতপার্থক্যের ঘটনা ঘটেছে এ শ্রেণীর মতবিরোধকে কেন্দ্র করে। এ মতপার্থক্য সাধারণত তুচ্ছ ধরনের এবং সাধারণভাবে যে সত্যকে ধারণ করা হয়, তারই ভিন্ন প্রেক্ষিত ছাড়া আর কিছু নয় অথচ এ বিষয়টি এখনও সংঘাতের কারণ হয়ে রয়েছে। কারণ বিরোধে লিপ্ত কোন পক্ষই তাদের বিরোধীদের অভিমতের ভাল দিককে স্বীকার করতে চায়না এবং উভয়ে নিজেদের মতকে সঠিক ও অপর পক্ষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে।[৭৫]

একজন পর্যবেক্ষকের মতে, নিজস্ব অভিমতকেই কেবল নির্ভুল ও সঠিক বলে দাবি করা এমন এক ধরনের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত উগ্র অন্ধত্ব-যা সাহাবীগণের অনুসৃত বৈধ পন্থার থেকে বিচ্যুতি এবং বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারিদের মধ্যে এমনই এক ধরনের উগ্র অন্ধত্বের অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হানাফিদের মধ্যকার এধরনের সীমালংঘনের সমর্থকরা প্রায় নিজেদেরকে দয়ালু ও জ্ঞানসম্পন্ন বলে দাবি করে থাকেন; তথাপি তারা অ-হানাফি ইমামের পিছনে নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে না, এমন উগ্র অন্ধত্বের প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। এছাড়া তারা নামাযে রুকুর আগে হাত উত্তোলনেরও তীব্র নিন্দা করেন। শাফেঈ মাযহাবে নামাযের সময় এভাবে হাত উত্তোলন স্বাভাবিক নিয়ম। বস্তুত শাফেঈ, মালিকি ও হাম্বলিসহ প্রতিটি মাযহাবেই অনুসারীদের মধ্যে এধরনের অন্ধত্বের প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। তারা তাদের নিজস্ব মাযহাবকেই কেবলমাত্র সঠিক ও নির্ভুল বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগির বাইরেও উগ্র ব্যক্তিরা সক্রিয় থাকে: যেমন, বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়। এরা সীমা লংঘন ও বিদ'আহ্‌র আশ্রয় নিয়ে অন্য মাযহাবের অনুসারি মুসলমানদের বিয়ে করতে তাদের মেয়েদেরকে বাধা দেয়।[৭৬] তারা সকল ইমামের সর্বসম্মত অভিমত থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। ইমামগণ তাদের অনুসারিদের প্রতি কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুসরণ এবং এ সূত্রের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন যেকোন ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞের অভিমত বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আল শাহারিস্তানির মতে, ইস্তিবদাদ বি'ল রা'ই বা সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ছাড়া নিজের অভিমত জোর করে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হবে একটি সীমালংঘন, নতুন উদ্ভাবনী যে অতীতের আল্লাহভীরু ও হক্কানী আলেমদের অনুসৃত দৃষ্টান্তের পরিপন্থী। আল শাহারিস্তানি আরও বলেন, জ্ঞান ও সুযুক্তির ভিত্তিতে হলে ইস্তি 'আদাদ বি'ল রা'ই বিদ'আহ হবে না, কেবল সন্দেহজনক প্রামাণ্য ও বৈধ ধারণা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলেই তা বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে।[৭৭]

ইস্তিবদাদ বি'ল রা'ই এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এটি সীমালংঘন ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রায়ই গঠিত হয়, এতে কোন ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান, অভিমত ও বিশ্বাস অন্যরা সবদিক দিয়ে অনুসরণ করবে বলে ধরে নেয়া হয় এবং কেউ যদি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তার নিন্দা করা হয়। এ ধরনের মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তি বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা অন্যদের মতামতের ভাল দিক ও যুক্তি উপেক্ষা করতে চায়। এ ধরনের আচরণ কেবল বৈরিতা সৃষ্টি করে এবং এ কারণে এ থেকে কল্যাণ পাবার কোন আশা নেই।[৭৮]

ইবন কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ সর্বশেষে এ ক্যাটাগরিতে যোগ করেছেন, তিরস্কারযোগ্য অভিমত, ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারের বিষয়কে অধিকতর প্রশ্রয়দান (ইস্তিহসান) এবং আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ ও সন্দেহজনক যুক্তি উত্থাপন করা, যা হাওয়ার পর্যায় পর্যন্ত উপনীত হয়; এর লক্ষ্য হল শরীয়ার বিধিবিধান পালনে বাধার সৃষ্টি করা। তিনি বলেন, এ ধরনের রা'ই-এ শরীয়ার উৎস ও মূলনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে (আহকাম) মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়না এবং প্রায়ই তা এর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়। এধরনের রা'ই এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয়দান সুন্নাহর চর্চা বন্ধ করে এবং আল্লাহর কিতাবের সঠিক অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সংশয় সৃষ্টি এবং চূড়ান্তভাবে এর উপেক্ষার পথ প্রশস্ত করে।'[৭৯] লেখক ঐ ক্যাটাগরিতে আরও যোগ করেছেন, অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে এবং একান্তই তাত্ত্বিক বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ ও মতামত উত্থাপন যার সাথে বাস্তবতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার তেমন সম্পর্ক নেই। কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ আরও উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের

বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানকে কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিরুৎসাহিত করার প্রমাণ রয়েছে। এরপর তিনি প্রাসঙ্গিক প্রমাণ তুলে ধরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলাম এমন অভিমত ও প্রশ্নকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান না করতে বলেছে; যার উদ্ভব ঘটেছে কুরআনের বিধানের কর্তৃত্ব খর্ব করার অসৎ মানসিকতার ফল হিসেবে। ইবনে কাইয়িমের বক্তব্যে উসূল আল ফিকহর গৃহীত মূলনীতির সমর্থন রয়েছে। সব মাযহাবই এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, এমনকি দুর্বল হাদিসকেও রা'ই ও কিয়াসের উপরে স্থান দিতে হবে। এর পর ইবনে কাইয়িম এ প্রসঙ্গে দ্রুত এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে- 'এধরনের রা'ই ও কিয়াস সাধারণভাবে আলেমগণ নিরুৎসাহিত করেছেন; কারণ তা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে।' কুরআন সুন্নাহর সাথে যেসব রা'ই ও কিয়াস এর মিল বা পার্থক্য রয়েছে তা জানা নেই; সেগুলোকে কেবলমাত্র প্রয়োজন দেখা দিলে কাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।[৮০]

"বিদ'আহ এন্ড ফলস ডকট্রিন আন্ডার মালয়েশিয়ান ল' শীর্ষক সাংবিধানিক ধারার বিষয় পাঠকগণকে অবহিত করার মধ্য দিয়ে আমি এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করতে চাই। আমি সেলানগর, পেরাক, তেরেঙ্গানু ও কেদাক রাজ্যে প্রবর্তিত 'মিথ্যানীতি' শিক্ষা দান ও প্রচারণার ধারাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এ বইয়ের শেষে টীকা-২ এ এ সম্পর্কিত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

২. বিশেষ বিষয়সমূহ

শরীয়া কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে বাকস্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদিসে এ ধরনের তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো : আল্লাহর গুণাবলি, স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্ট বা তাকদীর এবং তিক্ত বাদানুবাদ (মিরা বা মুমারাত, যাকে জাদালও বলা হয়)। এ প্রসঙ্গে আমি ভান করার (তাকিয়া) বিষয়েও আলোচনা করেছি যে সুন্নি আলেমগণ প্রয়োজন ছাড়া এ বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, সাহাবীগণের যামানা এবং উমাইয়া শাসনামলের ফকিহগণের মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক ছিল এবং পরবর্তীকালেও তার অবসান ঘটেনি। খারেজি হল প্রথম গোষ্ঠীগত আন্দোলন; যার নীতি ও আদর্শ ইসলামের ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এরপর আরও কয়েকটি এ ধরনের ফেরকার সৃষ্টি হয়, যেমন: মু'তাযিলা, জাহামিয়া, কাদেরিয়া, ইত্যাদি। এসব ফেরকা বিতর্কের অতলে তলিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। তাদের ব্যর্থতার পিছনে অন্যতম

www.pathagar.com

কারণ হিসেব উল্লেখ হয় যে, রাসূল সাঃ এর সুন্নাহতে যেসব বিষয়ে সংযম প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে সেসব বিষয়ে তারা আগ বাড়িয়ে বিপুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল।

১. আল্লাহর সত্তা *(যাত আল্লাহ)*

আল্লাহর পরিচয় তাঁর সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ–আসমাউল হুসনার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে। আল্লাহ নিজেই তাঁর এসব নাম মানুষকে জানিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহর এসব নাম বর্ণিত হয়েছে। এসব নামের মাধ্যমে মুমিনরা অবশ্যই আল্লাহতা'আলার সত্তা, তার গুণাবলি ও সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করবে। আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর নামের অনন্য ও সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর ওপর নতুন কোন নাম ও গুণ আরোপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধের কারণ হলো আল্লাহতা'আলা সম্পর্কে মুমিনদের সরাসরি কোনই জ্ঞান নেই; ততটুকু ছাড়া যতটুকু তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাঁদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহতায়ালার নিরান্নবইটি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব নাম তাঁর গুণের পরিচয় বহন করে। নামসমূহে আল্লাহর গুণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে; যা মানুষের নিজের মধ্যে বিকশিত করা এবং এক অর্থে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এসব গুণের কোনটিকে অস্বীকার করা তো কোন ব্যক্তির মৌলিক ঈমান আকিদাকে ধ্বংস করেইতো দেবেই উপরন্তু তা ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করার সামিলও। আল্লাহতা'আলার গুণবাচক নামগুলো কুরআনের কোন নির্দিষ্ট অংশে বর্ণিত হয়নি, পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র এসব নাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।[৮২] পবিত্র কুরআন এ নামসমূহ সম্পর্কে মুমিনদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছে :

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ .

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তাই তাঁকে ওই নামে ডাকবে, যারা তাঁর নামসমূহের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তাদেরকে পরিহার করে চলো। (৭:১৮০)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

বল : তোমরা আল্লাহকে ডাক আল্লাহ বা আল রহমান বলে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ সুন্দর নামসমূহ (১৭:১১০)।

আল্লাহর গুণসমূহ উল্লেখ করে কুরআন আল্লাহর কোনরূপ কল্পনা অথবা তার সদৃশ কিছু মনে করা, যা তাকে খর্ব বা নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে সীমিত করতে পারে এমন যে কোনো চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছে :

www.pathagar.com

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

'কোন চোখ তাকে দেখতে পায় না, অথচ সবকিছুই তার দৃষ্টির আওতায়। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন (লতিফুল খবির)' (৬:১০৩)

এ আয়াতের সর্বশেষ দু'টি শব্দে আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে দেখা গেছে, কাউকেই, এমনকি রাসূল সাঃ কেও আল্লাহতা'আলাকে চর্মচোখে দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। কুরআন থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহ'র নবী মূসা আ: আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তিনি সত্যি সত্যিই মহান আল্লাহকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন, তখন মূসা আ:কে বলা হয়:

لَنْ تَرَىٰنِى وَلٰكِنِ انظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পর্বতের দিকে দৃষ্টি ফেরাও, তুমি যদি পর্বতকে তার স্থানে স্থিতিশীল দেখতে পাও, তা হলে আমাকে দেখতে পাবে ...।'

এ কাহিনীতে আরও বলা হয় যে, আল্লাহ যখন পর্বতের উপর এসে দেখা দেন তখন (ঐদিকে তাকিয়ে) মূসা আঃ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে; তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তওবা করেন এবং আল্লাহর প্রতি তার ঈমানের সাক্ষ্য ঘোষণা করেন (৭:১৪৩)।

এভাবে কুরআনের সাক্ষ্যপ্রমাণ আল্লাহর অলৌকিক সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে; তিনি সম্পূর্ণভাবে মানব চিন্তার অতীত এবং মানুষের পক্ষে তার কোন সংজ্ঞা দান অসম্ভব। এটি করার যে কোন চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই শরীয়া আল্লাহর অসীম সত্তার ব্যাপারে যে কোনো ত্রুটিপূর্ণ ধারণা রোধের লক্ষ্যে তার সত্তা সম্পর্কে কোন ধরনের আলোচনা করাকে নিরুৎসাহিত করেছে।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অর্থ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঠিক সেভাবেই তা গ্রহণ করতে হবে, এগুলো আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশ করেছে। অবশ্য কুরআনের কিছু আয়াতে মানবসত্তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায় (আল্লাহর চোখ, ১১:৩৭, তার মুখ, ৪:২৭, ইত্যাদি) যা ধর্ম শাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আশারিয়া, মু'তাযিলা ও মাতুরদিয়া গ্রুপ, এ বিতর্কের যে মূল বিষয় উত্থাপন করেছে, তা হলো এগুণের বাস্তবতা এবং আল্লাহর সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক।[৮৬]

এ বিষয়ে আলেমগণ যে বির্তকিত গোষ্ঠীকে তীব্র নিন্দা করেছেন, সেটি হলো : 'জাহমিয়া। এ গোষ্ঠীট হল মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একটি উপদল। উপদলটির

www.pathagar.com

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব জাহম ইবনে সাফওয়ানের নাম অনুসারে এদেরকে জাহমিয়া নামকরণ করা হয়েছে। মূলত তিনি ছিলেন খোরাসানের অধিবাসী, বাস করতেন কুফা নগরীতে। তিনি উমাইয়া গভর্নর আল হারিস ইবনে শুরাইয়ার প্রধান খতিব ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের উভয়কে বিদ্রোহ করার অপরাধে ১২৮ হিজরিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বিতর্কিত মত প্রকাশ করে জাহম খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত) থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং তার মতে কুরআনে বর্ণিত গুণাবলি আক্ষরিক অর্থের সাহায্যে বোঝা যাবে না, এগুলো প্রতীকী অর্থ (মু'য়াওয়াল) প্রকাশ করেছে। জাহম মনে করেন যে, যদি এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে মানব জীবসত্তা বোঝাবে আর এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে তার সদৃশ তৈরি হবে; তাই তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে প্রতীকী অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে জাহম আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে আল্লাহর অবশিষ্ট সৃষ্টির মতো কুরআনও সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে যেহেতু আল্লাহ্ কথা বলেন না; তাই স্বাভাবিক অর্থে কুরআন ও তাঁর বাণী নয়। আমরা প্রতীকী ব্যাখ্যা (তাবিল) দিয়ে বড় জোর একে বাণীর প্রতীক বলতে পারি।[৮৪]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'আলেমগণ' এ মতকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও খণ্ডন করে দিয়েছেন, তারা এ মত ব্যক্ত করেন যে, কুরআনে আল্লাহর যে গুণের বর্ণনা রয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থে উপলব্ধি করতে হবে এবং এসবের যেকোন দূরবর্তী বা প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রদান অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এ আলোকে আল গাযালী বলেন যে, অনুসরণযোগ্য সঠিক উপায় হচ্ছে আক্ষরিক অর্থের কোনরূপ পরিবর্তন করা থেকে নিবৃত্ত থাকা এবং সাহাবীগণ রাঃ অনুমোদন করেননি এমন যে কোন ব্যাখ্যা প্রবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। আল গাযালী কুরআনে দ্ব্যর্থবোধক বা রহস্যজনক (মুতাশাবিহাত) যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কেও এই একই অভিমত ব্যক্ত করেন।[৮৫]

এ ব্যাপারে ঈমানদাররা কি ধরনের মনোভাব গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে রাসূলের-সাঃ সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসের শিক্ষা অনুসারে ঈমানদারদেরকে বলা হয়েছেঃ

تَفَكَّرُوا فِىْ خَلَقِ اللهِ وَلاَتَتَفَكَّرُوْا فِىْ الله فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَه.

'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করবে, তবে আল্লাহ সম্পর্কে নয়। কারণ তোমরা কখনও তাঁর প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হবে না।'[৮৬]

www.pathagar.com

মানব সত্তাকে তার স্রষ্টার সংজ্ঞা দেয়ার মতো ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি; এ বিষয়টি ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতেই এ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত গুণাবলির বিষয়ে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা দিতে পারে কারণ এ বিষয় সে অবহিত অথবা তার পক্ষে জানা সম্ভব। এভাবে কুরআনে আভাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে সরাসরি তার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে (২:২১৯, ৭:১১৭, ইত্যাদি) আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহবান জানানো হয়েছে, যাতে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও সর্বব্যাপকতার নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে আমাদেরকে আমাদেও চতুস্পার্শ্বেও বিশ্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর গুণাবলি ও তার গুণবাচক নামসমূহের ব্যাপাওে আমাদেও উপলব্ধিকেও বৃদ্ধি করতে পারবো।

যেহেতু মহাজগত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; তাই মহাজগতের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে'অনুসন্ধান' এর প্রচেষ্টাকে অলস ও বিপজ্জনক এবং (আবাস ওয়া মুহলিকাহ) , অসীম পাথাওে তল খোঁজার চেষ্টা বলে উল্লেখ কওে আবদুহ বলেন যে, এটি করা মানব সাধ্যেও অতীত, এটি করা বিপজ্জনক কেননা এতে ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটির পথ প্রশস্ত হয়। আল্লহর সত্তাকে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে অসীমকে সীমার মার্ধমে বাঁধার প্রয়াস, যা মূলত মহান আল্লাহতা'আলার সত্তাকে খর্ব করার সামিল।[৮৭]

২. স্বাধীন ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারন *(আলকাদা ওয়া'লক্বাদার)*[৮৮]

প্রশ্ন হলো, মানুষ কি স্বাধীন, সে কি তার কাজের হেতু নির্ধারণ করতে পারে এবং এসব কাজের পরিণাম সংঘটন করতে পারে কি? অথবা এসব কিছু কি আল্লাহতা'আলার জ্ঞাতসারে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত? সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির বিষয়ে উপলব্ধির সঙ্গে এস ব সম্পর্কিত। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرً ' আল্লাহ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রতিটিকে সঠিকভাবে পরিমিত করেছেন' (২৫:২); এভাবে মহাবিশ্বের যেখানেই যখনই যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার সবই আল্লাহর জানা।'

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِى ظُلُمٰتِ الاَرْضِ
وَلاَرَطْبٍ وَّلاَيَابِسٍ اِلاَّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ .

www.pathagar.com

বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যা-সম্পর্কে তিনি; অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক জিনিস সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৬:৫৯)

এ থেকে জানা যায় যে উপরে বর্ণিত দুটি আয়াতের প্রথমটিতে বর্ণিত পূর্বনির্ধারণের (তাকদির) অর্থ হল, আল্লাহ সকল জিনিসের প্রকৃতি কি হবে এবং তার সৃষ্টির অন্যান্য অংশের মধ্যে তার স্থান এবং সম্পর্ক কি হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। বস্তুত এটিই তার সৃষ্টির নিয়ম। আল্লাহ সবকিছুই তাঁরই বেঁধে দেয়া নিয়ম ও উদ্দেশ্যের অধীনে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি জগতে কোনকিছুই একেবারেই নিরর্থক বা দুর্ঘটনাবশত সৃষ্টি হয়নি।[৮৯]

আল্লাহর গুণাবলি, মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া এবং জ্ঞান বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। মু'তাযিলারা স্বাধীন ইচ্ছার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের পক্ষপাতি, আশারিয়ারা তাকদিরের সমর্থক, অপরদিকে মাতুরিদিয়াহরা এ দু'য়ের মাঝামাঝি একটা আপোষমূলক অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করেছে।[৯০]

৩. কটুবাক্য, কলহ, বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন *(মিরা, জাদাল ও খুসুমাহ)*

মিরা বা 'মুমারাত' শব্দটি অনেক সময় বিতর্ক বা জাদাল শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো আত্মবিনাশী বির্তকে লিপ্ত হওয়া; যা কোনই কল্যাণ বয়ে আনে না এবং ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করে। মিরা প্রায়ই অন্য কোন ব্যক্তির বক্তব্যের ক্রটি-ইঙ্গিত বা নিহিতার্থের মাধ্যমে তুলে ধরে আপত্তি জানানোর চেষ্টার ফলে সৃষ্টি হয়। সচরাচর এর উদ্দেশ্য হলো: আত্মস্তুতি ও অন্যদের অজ্ঞতা তুলে ধরা। মিরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাধ্যমে একজনকে অবমাননা করা হয় এবং ফলে তিক্ততা ও বৈরিতার সৃষ্টি হয়।[৯১]

বক্তব্য, উচ্চারিত শব্দ ও অন্তর্নিহিত অর্থ বা উদ্দেশ্যের বিবেচনায় জাদালও অপরের দোষ ক্রটি তুলে ধরার চেষ্টার মাধ্যমে আপত্তি জানানোর ঘটনা থেকে সৃষ্টি হয়। এ অর্থে জাদাল ও মিরা অদলবদলযোগ্য; তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'মিরার' উদ্দেশ্য হলো অপর ব্যক্তির অজ্ঞতা তুলে ধরে তাকে অপদস্ত করা এবং তার উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অপরদিকে 'জাদালের' উদ্দেশ্য এর পশ্চাতের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল, এর ইতিবাচক দিকও থাকতে পারে, বৈধ উদ্দেশ্যে ভিন্ন মত অনুসন্ধানের চেষ্টার যুক্তিও এখানে প্রযোজ্য বলে

বিবেচিত হতে পারে।[৯২] যদি ভাল উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয় তাহলে তা জাদালের ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করবে, আর তা না হলে এটি হবে তিরস্কারযোগ্য জাদাল যা 'মিরার' সমার্থক।

যুক্তিতর্কের (খুসুমাহ) ক্ষেত্রে বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অপর কোন ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাপারে যথাযথ বা অন্যায়ভাবে আপত্তি উত্থাপন এবং তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। খুসুমাহ অপর কোন ব্যক্তির বক্তব্যের জবাবে সংঘটিত হতে পারে অথবা নিজ থেকেও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটানো হতে পারে। অপরদিকে মিরা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি জানানোর সাথে সংশ্লিষ্ট। খুসুমাহ'র প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অপর ব্যক্তির বক্তব্য খণ্ডন করতে মাত্রাতিরিক্ত কথাবার্তা বলা। নিম্নের যেকোন এক ধরনের ঘটনায় খুসুমাহ'র অবতারণা হতে পারে :

ক. বিদ্বেষ বা ক্ষতির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বিরোধী পক্ষ কর্তৃক অস্বীকার করা অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুক্তি প্রদর্শন হচ্ছে খুসুমাহ। এ ধরনের খুসুমাহ অনুমোদনযোগ্য, কারণ শরী'আত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব ধরনের শান্তিপূর্ণ পন্থায় তার অধিকার রক্ষা করার অধিকার প্রদান করেছে।

খ. অপরের অধিকার লংঘন এবং অশোভন ও বৈরি বক্তব্যের সমন্বয়ে যুক্তি প্রদর্শন হচ্ছে খুসুমাহ। এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন তিরস্কারযোগ্য এবং তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। হাদিসে এ ধরনের খুসুমাহকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

اَبْغَضُ الرِّجَالِ الى الله تَعالى الالَدُّ الخَصِمُ

'মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে অপছন্দের, যে খুসুমাহ বা যুক্তিতর্কের সময় চরম একগুঁয়েমীর পরিচয় দেয়।'[৯৩]

এ হাদিসটি প্রাথমিকভাবে ঐ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা মিথ্যা অথবা যে বিষয়ে তাদের তেমন জ্ঞান নেই; সেই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এর উদাহরণ হল, বিতর্ককারি একজন আইনজীবী হতে পারেন; যিনি হয় তার মকদ্দমার বিষয়ে পড়াশোনা করেননি অথবা তিনি জানেন যে তিনি মিথ্যার পক্ষ নিয়েছেন, তারপরও তা নিয়ে তিনি যুক্তি-তর্কের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথকেই বেছে নিয়েছেন। এছাড়া দুর্বলচেতা মানুষদেরকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে যারা সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করে, তারাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

কোন ভাল উদ্দেশ্যে বিতর্কে লিপ্ত কোন ব্যক্তি যদি বির্তকের শালীনতার সীমা লংঘন করে গালিগালাজপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে, তাও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে; যদিও মিথ্যার পক্ষে যারা যুক্তি দেখায় তাদের চেয়ে এটি কম দোষণীয় হবে।[১৪]

গ. কোন ব্যক্তির অধিকার লংঘন করে যুক্তি প্রদর্শন (খুসুমাহ) করা যাবে না, এমনকি খুসুমাহ ছাড়াই কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হলে; এটি অর্জনেও যুক্তির খাতিরে যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে না। এগুলোও তিরস্কারযোগ্য কাজ; তবে উপরিউক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর খুসুমাহর চেয়ে কম দোষনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারি (মৃত্যু, ৯৮/৬৯৭) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল (সা:) বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ، سَمْحًا اِذَا اِشْتَرىٰ سَمْحًا اِذَا اِقْتَضٰى.

'আল্লাহতা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন; যে কোন কিছু সদয় ও ধৈর্য্যের সাথে বিক্রি করে, কেনার সময়ও সে সদয় ও ধৈর্য্যশীল থাকে এবং যখন কোনকিছু দাবি করে, তখনও সে সদয় ও ধৈর্য্যের সাথে তা করে।'[১৫]

এখানে তিন শ্রেণীর যে কটুক্তিপূর্ণ বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে; তার মধ্যে সবচেয়ে তিরস্কারযোগ্য হল 'মিরা।' একে প্রায়ই উত্তম চরিত্রের আল খুলক এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ মিরা সম্পর্কে এতো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, এমনকি ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্কের পরিবেশ ক্ষুণ্ন করতে পাওে, এমন ধরনের প্রশ্ন করাকেও তারা নিরুৎসাহিত করেছেন।[১৬] 'মিরা'র ব্যাপারে আলেমদের এ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূল সা: এর সুন্নাহর যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। এতে 'মিরার' নৈতিক ব্যাপকতার ওপর এতোটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, একে বিশ্বাসী অপরাধকারীর বিশ্বাসের অখণ্ডতায় হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়েছে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

لَايُؤْمِنُ العَبْدُ الاِيْمَانَ كُلّه حَتّٰى يَتْرُكَ الكِذْبَ فِى المَزَاحِ وَيَتْرُكَ المِرَاءَ وَلَوْا كَانَ صَادِقًا .

কোন ঈমানদার ব্যক্তির বিশ্বাস (আল ঈমান) ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা অর্জন করবে না, যতক্ষণ না সে রসিকতার ক্ষেত্রে ও বিকৃতি বর্জন এবং

> কটুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা (আলমিরা) পরিত্যাগ করে। এমনকি তা যদি সত্যও হয়, তাহলেও।[৯৭]

নিম্নের হাদিসটিতে মিরার সাথে ব্যক্তির পরহেযগারির প্রসঙ্গ তুলে ধরে যারা এ দোষ পরিহার করবে তাদের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে :

مَنْ تَرَكَ المِرْاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ له البَيْتَ فِيْ اعْلَى الجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ المِرْاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنِيَ لَهُ البَيْتَ فِى رَبضِ الجنةِ.

> যে সঠিক পথে থাকার পরও 'মিরা' থেকে বিরত থেকেছে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চস্থানে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে; আর যে অন্যায় করেছে তবে মিরা থেকে বিরত থেকেছে, তার জন্য জান্নাতের বহিরাঙ্গনে একটি বাড়ি তৈরি করা হবে।[৯৮]

উভয় হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট, তা হল: সত্য কথা বলার জন্য তিক্ত বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই, সব সময়ই মিরা পরিহার করে চলতে হবে। কুরআন সুন্নাহতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত যুক্তিতর্কে লিপ্ত হবার সঠিক পদ্ধতি হল: মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বিনম্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে কথা বলা বলতে হবে অথচ 'মিরা' সরাসরি এ আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল গাযালীর মতে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'মিরা' পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব); যদি সে জানে যে সে অন্যায় করছে।'[৯৯] রাসূল সাঃ এর একটি হাদিসে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়, আলী ইবনে আবু তালিব বর্ণিত হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

مَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخِطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ .

> 'যে জ্ঞাতসারে অন্যায়ের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর তীব্র রোষানলে থাকবে।'[১০০]

একজন পর্যবেক্ষক এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ হাদিসটিতে সুস্পষ্ট ভাষায় সুপরিকল্পিতভাবে বিকৃতির কাজে লিপ্ত হওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে পরিচিত কোন অভিমতের সাহায্যে একটি সঠিক মতের বৈধতা ক্ষুণ্ন করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[১০১]

আল গাযালী আরেকটি হাদিসও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। এতে বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

عَنْ ابى أُمَامَةَ البَاهِلِى قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ الله صلى وَنَحْنُ نَتَمَارَى فغَضِبَ فقال : ذَرُو المِرَاءَ لِقِلَّةِ خَيْره، ذَرُوالمراءَ فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيْلُ وَاِنَّهُ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بين الاخوَان .

> 'আমরা যখন বিতর্কে (নাতামারা) লিপ্ত হই; তখন আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'য়ালা আমাদের কাছে চলে আসেন। তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, "তোমরা মিরা পরিত্যাগ কর, কারণ এতে কোনই উপকার নেই; মিরা পরিত্যাগ কর, কারণ এতে কোনই কল্যাণ নেই এবং যা ভাইদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।'[১০২]

এভাবে উল্লিখিত হাদিসের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, মিরা হচ্ছে নৈতিকতা ও ঈমানের ত্রুটি, আর এ কারণে ইসলামী বিধানেও বিষয়টিকে যথাযথ নিষ্পত্তি ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। সম্ভবত এ কারণেই শরিয়তে নৈতিক উপদেশ দান ও উদ্বুদ্ধকরণ ছাড়া মিরার জন্য কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। তবে এটি অকার্যকর প্রমাণিত হলে, সামাজিক বয়কটের (হাজর) মতো ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। নিম্নের শিক্ষামূলক হাদিসটিতে মিরার অপরাধের ব্যাপকতা যে অন্যদের উপহাস করা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো অন্যান্য দোষণীয় আচরণের সঙ্গে তুলনীয়, সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। হাদিসে উল্লিখিত মিরা সম্পর্কিত তিনটি দোষণীয় আচরণের প্রথমে রয়েছে :

لاتُمَارَ اَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتَخْلِفَهُ .

'তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করোনা (লা' তুমার), না তাকে উপহাস করবে। অথবা তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিবে না, যা তুমি রক্ষা করতে পারবে না।'[১০৩]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একথা বলেছেন বলে জানা গেছে যে, 'সুন্নাতের অনুসারীদের (আহল আল-সুন্নাহ) বৈশিষ্ট্য হল, তারা কটুক্তিমূলক কথাবার্তা পরিহার করে চলে। আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণকারী জনৈক আব্বাস ইবনে গালিব আল ওয়ারকা বলেন : 'আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কোনো সভায় উপস্থিত হয়ে বিদ'আহ সম্পর্কিত কিছু শুনতে পেলে এবং সেখানে আমি ছাড়া (উপস্থিত) সকলেই সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হলে এর খণ্ডন করা কি আমার জন্য উচিত হবে? ইমাম হাম্বল তাঁকে এ ধরনের বিতর্কে লিপ্ত না হবার পরামর্শ দিয়ে বলেন : তুমি সুন্নাহ সম্পর্কে যা জান তা বলবে এবং যেকোন ধরনের বৈরি বিতর্ক (মুখাসামাহ) এড়িয়ে চলবে, তুমি যদি তার বক্তব্য খণ্ডন করার চেষ্টা কর তা হলে তুমি

www.pathagar.com

মুখাসামাহয় জড়িয়ে পড়বে। সে যদি তোমার কথা মেনে না নেয় তাহলে তোমার নীরব থাকা উচিত।' আব্বাস এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিকের সঙ্গে তাঁর আলাপের বিষয় উল্লেখ করেন। ইমাম মালিকও তাঁকে একই ধরনের উপদেশ প্রদান করেন।[১০৪]

অনুরূপ এক মন্তব্যে আল-আওযাল নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন : 'মহান আল্লাহতা'আলা যখন লোকদের উপর দুর্যোগ নাযিল করতে চান; তখন তিনি তাদের জন্য বিবাদ-বিসম্বাদের (জিদাল) দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং নেক কাজের (আমল) দরজা বন্ধ করে দেন।' ইমাম মালিক বলেন, "মুখাসামাহ দ্বীনের অংশ নয়। ইমাম শাফেঈ তার অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন, এমনকি জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায়ও যদি মিরার পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা অন্তরকে কালো করে ফেলে এবং তাতে ঘৃণাবিদ্বেষের বীজ বপন করে।[১০৫]

৪. ভান করা *(তাকিয়্যাহ)*

তাকিয়ার শাব্দিক অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে প্রহরা বা নিরাপত্তা দান করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরোধী কোন বিশেষ বিশ্বাস বা মত পোষণের কারণে অনিষ্টের হাত থেকে কোন ব্যক্তিকে রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ধরনের তাকিয়া শিয়া আইনে বৈধ এবং একে শিয়া ধর্মীয় মূলনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।[১০৬] এ কারণেই শিয়া মতবাদে তার অনুসারিদেরকে সত্যিকার বিশ্বাস, অভিমত ও সমালোচনাকে গোপন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি তা স্বার্থের অনুকূল ও নিরাপদ হয়। তাই একইভাবে বৈরি পরিস্থিতি এবং আত্মরক্ষার্থে কোন ব্যক্তিকে তার সত্যিকার ধর্ম বিশ্বাস গোপন করা এবং তার সত্যিকার বিশ্বাসের পরিপন্থী বিবৃতি দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাতে হয়ত অন্যরা বিভ্রান্ত হবে অথবা তার কথাকে মেনে নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে, প্রকৃতপক্ষে সে ওই কথাকে অসত্য বলে বিশ্বাস করে।

সুন্নি 'আলেমগণ' নীতিগতভাবে তাকিয়া অবলম্বনকে জায়েয বলে মনে করেন না। তবে অতি জরুরী ক্ষেত্রে মৌলিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করা যেতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তির জান-মাল বা সন্তানের ওপর আপদ-বিপদ দূর এবং মানসিক শারীরিক আঘাত রোধ নিশ্চিত করতে এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করা যাবে। অবশ্য এ ধরনের আশংকা ছাড়া তাকিয়া অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।[১০৭]

এ মূলনীতির সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত তিনটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে:

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ

www.pathagar.com

فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ.

মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদারদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবেনা। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচবার জন্য বাহ্যত: এরূপ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলে, তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে (৩:২৮)।

যারা কুফরি শব্দ উচ্চারণ করে তাদেরকে নিন্দা জানিয়ে দ্বিতীয় আয়াতের সূচনা করা হয়েছে, 'তবে যারা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে এরূপ করে তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِه اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরি করে (সে যদি) বাধ্য হয়ে থাকে অথচ তার দিল ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও অবিচল থাকে (তার কোন দোষ সেই) কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষসহকারে কুফর কবুল করে নিলো; তার ওপর আল্লাহর গযব পড়বে, এমন সব লোকের জন্য বড় বড় আযাব রয়েছে। (১৬:১০৬)

তৃতীয় আয়াতটি একটি কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে; ফরা'আউন, হামান ও কোরা যখন মূসা (আ:) এর অনুসারিদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল; তখন ঈমানদার এক ব্যক্তি তার বিশ্বাসের বিষয় গোপন রেখে, ঐ হত্যা চেষ্টার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْجَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ . .....

'এ সময় ফেরাউনের লোকজনের মধ্য হতে এক মুমিন ব্যক্তি সে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল– বলে উঠলো : তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের রবের তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে।' (৪০:২৮)

www.pathagar.com

এভাবে এক ব্যক্তি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন কোন মুমিন ব্যক্তির সমর্থনে নিজে ঈমানদার নয় এমন অবস্থা দেখালো বা ভান করলো। শিয়াদের ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর আল সাদিক তাকিয়াকে ঈমানের আবশ্যকীয় উপাদন এবং ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সমর্থন করে বলেন : 'যার তাকিয়া নেই তার কোন ধর্ম নেই। তাকিয়া হল আমার ধর্মের (প্রতীক) এবং তা আমার পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসছে।'[১০৮]

হাম্বলি ফকিহ আল সারাখসি তাকিয়ার সংজ্ঞায় বলেন, তাকিয়াকে কোন ব্যক্তির ভান করা বুঝায়, যাতে ঐ ব্যক্তি বিপদ থেকে বাঁচতে যে কথা বলে, তা তার অন্তরের বিশ্বাসের পরিপন্থী।'[১০৯] তাকিয়ার মূল চেতনার ব্যাপারে সুন্নি 'আলেমগণও' তাদের শিয়া প্রতিপক্ষের উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করেন; তবে এসব আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, সুন্নিদের ধর্ম বিশ্বাস বা ঈমানের ক্ষেত্রে তাকিয়া কোন অংশ নয়। সুন্নিদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটি একান্তভাবে একটি সহায়ক বিষয় এবং এটি করা কার্যত নিষিদ্ধ। এছাড়া অত্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে তাকিয়া করা যাবে; তবে স্বার্থসিদ্ধি ও সুযোগসন্ধানীর কৌশল হিসেবে এটি ব্যবহার করা যাবে না। অপরদিকে শিয়া তাকিয়া হচ্ছে একটি অপরিহার্য্য বিষয় একারণে এর স্থানও অনেক উপরে। বস্তুত শিয়া ধর্মবিশ্বাস সাধারণভাবে তাকিয়াকে উৎসাহিত করে এবং কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এর ব্যবহার সীমিত করা হয়নি। অন্যদিকে সুন্নি আলেমগণ তাকিয়ার ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। তারা তাকিয়া ব্যবহারের বৈধতা প্রাপ্তির জন্য যে চারটি শর্তারোপ করেছেন, তাতেই এ বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে : প্রথমত; এমন মারাত্মক বিপদের আশংকা অবশ্যই থাকতে হবে, যাতে তাকিয়া অবলম্বন জরুরী হয়ে পড়বে। এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে তাকিয়া অবলম্বন করা হবে বেআইনি কাজ। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি কেবল অন্যদের তুষ্ট করতে মিথ্যা কথা বলে অথবা সে যদি কোন স্বৈরাচারের নির্যাতনের পক্ষ সমর্থন করে কথা বলে, অথচ কেবল নীরব থাকলেই তার পক্ষে বিপদ এড়ানো সম্ভব হতো, তাহলে সে সীমালংঘনের পাপ করলো। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি তাকিয়া অবলম্বন করলো এবং উদাহরণস্বরূপ কুফরির কথা উচ্চারণ করলো, এরূপ ভান করলে সে প্রকৃপক্ষে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে একথা জানা থাকলেই সে কেবল তা করতে পারবে। তৃতীয়ত: তাকিয়া অবলম্বন ছাড়া বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আর কোন পথ তার সামনে খোলা নেই। চতুর্থত: অসহনীয় ক্ষয়ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে, তা ব্যক্তির নিজের বা অন্য কারোর অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সম্মান ও মালের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তাকিয়া

www.pathagar.com

অবলম্বন করা যাবে। এভাবে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি বা কষ্ট যেমন, হাল্কা ক্ষুধার কষ্ট, গ্রেফতারি বা প্রহারের ঘটনার জন্য তাকিয়া অবলম্বন করার কোন যুক্তি নেই।[১১০]

তাকিয়ার সমালোচকগণ মনে করেন যে, এটি হিসবাহ ও নসিহার মূলনীতির এবং সর্বোপরি সত্য এ ন্যায়বিচারের মূল্যবোধের প্রতি ঈমানদারের প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী; যা তাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিয়া লেখক হামিদ এনায়েত এসব সমালোচনা দৃশ্যত মেনে নিয়েছেন এবং তিনি আরও একটু এগিয়ে বলেছেন, এটি শিয়া মতবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যেরও পরিপন্থী। এভাবে হামিদ এনায়েত বলেছেন, 'জঙ্গি চেতনার ধর্ম হিসেবে শিয়া মতবাদ যদি অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যে ফিরে যেতে চায়, তাহলে তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজের পরিপূর্ণ পুনর্জাগরণের আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে আমর বিল মারুফ বা সৎকাজের আদেশ দান।'[১১১]

সুন্নি আলেমগণ কর্তৃক শরী'আতে হিসবাহর মূলনীতির বিশ্লেষণ কিছু ক্ষেত্রে তাকিয়ার মৌলিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ইত:পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে, যাতে বলা হয়েছে: কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে কোন মুসলমান সুনির্দিষ্ট তিনটি পর্যায়ে তা রোধের উদ্যোগ নেবে। সে তার কাজের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করবে, অথবা কথার দ্বারা অথবা নীরবে নিন্দা করবে, সর্বশেষ ব্যবস্থাকে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এ মাত্র যে হাদিসটির উল্লেখ করলাম তাতে এটা নি:সন্দেহে বুঝা যায় যে, হিসবাহর দায়িত্ব পালনে কাজ ও কথার মাধ্যমে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ নিছক নীরব থাকার চেয়ে অনেক বেশী সওয়াবের কাজ। অন্য কথায়, হিসবাহর সুযোগের মধ্যে নীরবভাবে বিরোধিতার বিষয়কে অনুমোদন করে সীমিত আকারে তাকিয়া অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে, তবে স্পষ্টত এটি করার সুপারিশ করা হয়নি। সুন্নি আলেমগণ তাকিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর এই উপসংহারে পৌছেন যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতির মুখে প্রত্যেকে বিশেষ করে সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি নীরব থাকার পথকে বেছে নেন; তাহলে বিভ্রান্তিকর মত ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে এবং জনগণের দৃষ্টি থেকে সত্য অপসারিত হবে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তির (আলিম) মিথ্যা বলার বা মিথ্যা ভান করার কোন অনুমতি নেই। তিনি যেহেতু জানেন যে শরী'আত তাকিয়া অবলম্বন করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রাখেনি। তিনি আরও বলেন : 'জ্ঞানী ব্যক্তি এ ধরনের ভান করলে অজ্ঞ লোকেরা তাদের কথা থেকে কোন দিকনির্দেশনা পাবে

www.pathagar.com

না এবং যারা তাকিয়া অবলম্বন করে তাদের দেয়া বিবৃতির সত্যতার ব্যাপারে লোকদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।'[১১২]

মজার ব্যাপার হল, তাকিয়া একটি অন্যায়পরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে শিয়া ধর্মীয় জঙ্গি অবস্থান গ্রহণে হয়ত ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। যুক্তি দেখানো হয় যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে আল গাযালীর মতো অনেক বিশেষজ্ঞ একটি অন্যায়পরায়ণ সরকারের আনুগত্য করার দাবি জানিয়েছেন, যার অধীনে একটি সামরিক বাহিনী রয়েছে। অন্যদিকে শিয়া ফকিহগণ তাকিয়ার পন্থা অবলম্বন করে অন্যায়পরায়ণ কোন সরকারের অস্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ নীতিগতভাবে অস্বীকার করার পরও; বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সক্ষম হন। সুন্নি ও শিয়া-উভয় মতাদর্শের চর্চার ফলাফল হলো রাজনৈতিক নিরাসক্ততা। তবে সুন্নি আলেমগণ স্থিতিশীলতার স্বার্থে ক্ষমতার ব্যবহারকে প্রকাশ্যে অনুমোদন করেছেন আর শিয়া আলেমগণ অন্যায়পরায়ণ কোন সরকারকে অনুমোদনের কাজে অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন এবং তাকিয়ার পন্থাবলম্বনের মাধ্যমে তাদের এ নীতিতে তারা অটল থাকতে সমর্থ হয়েছেন।[১১৩]

টীকা

১. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ্ মুসলিম, কিতাব আল বির ওয়া'ল-সিলাহ, বাব আল নাহি আন আল গিবাহ, হাদিস নং ১৮০৬, আল নববী, রিয়াদুস সালেহীন। এ হাদিসটি হচ্ছে গিবত ও বুহতান বা অসাক্ষাতে দুর্নাম করা ও কুৎসা রটনার মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. আল গাযালি, কিতাব আদাব আল সুহবাহ, পৃষ্ঠা, ১২৯।

৩. আল নববী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা, ৪৮৯-৯০।

৪. আল-হুসাইন খিয্র, আল হুররিয়া ফি'ল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৫৫।

৫. আল মাকদিসি, আল আদাব আল শারাইয়াহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭ ও পৃষ্ঠা, ২৭৬-৭৭;

তুফফাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ১০৯-১১৩; আল হুসাইন, খিযর, আল-হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৫৫।

৬. আল মাকদিসি, একই গ্রন্থ।

৭. ইবনে হাম্বল ফিহরিস আহাদিস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪০, আল গাযালি, কিতাব আদাব আল-সুহবাহ, পৃষ্ঠা, ১২৮।

www.pathagar.com

৮. আল মাকদিসি, একই গ্রন্থ।

৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন, তুফলাহা, মাসাদির, পৃষ্ঠা, ১২৩।

১০. আল গাযালী, আল আদাব, পৃষ্ঠা, ১২৯।

১১. আল গাযালী, একই গ্রন্থ।

১২. আল গাযালী, একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১২৯-১৩১।

১৩. দেখুন সহিহ্ মুসলিম এর কিতাব আল আকদিয়াহতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে, এর শিরোনাম হলঃ 'অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত প্রশ্ন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা।'

১৪. আল নববী, রিয়াদুসসালেহীন, পৃষ্ঠা, ১৩৫, হাদিস নং ২৪৫ আল গাযালি, কিতাব আল আদাব, পৃষ্ঠা, ৩৪৪; মুসলিম এবং আবু দাউদও হাদিসটি বর্ণনা করেন,, তবে এতে শব্দের সামান্য পার্থক্য রয়েছে। 'যে (একজন মুসলমানের) দোষত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার দোষ গোপন রাখবেন।'

১৫. আল নববী, রিয়াদুসসালেহীন, পৃষ্ঠা, ৪৮৮, হাদিস নং-১৫৩০।

১৬. আল তিরমিযি, সুনান। মোহাম্মদ আসাদ-এর Principle of State and Government in Islam এ অনূদিত উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা, ৮৫।

১৭. আল গাযালী, এহইয়া উলুম আল-দ্বীন, ২য় সংস্করণ, কায়রো, দার আল ফিকর, ১৪০০/১৯৮০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬, একই লেখক, কিতাব আদাব আল সুহবাহ পৃষ্ঠা, ৩৬৯।

১৮. একই গ্রন্থ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫-১৬, আরও দেখুন, আল গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ৩৪৫-৪৬

১৯. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬৬।

২০. সহিহ্ মুসলিম, কিতাব আল বির ওয়াল সিলাহ, বাব আল নাহি আন আল-তাজাস্‌সাস।

২১. আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪০।

২২. আল-তাবরিযি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৫৫২।

২৩. তুফফাহা, মাসাদ্দির, পৃষ্ঠা, ৮৯-৯০।

২৪. আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১।

www.pathagar.com

২৫. আল গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২৪২-৪৩।

২৬. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ্ মুসলিম, হাদিস নং-৮৪৪, আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১।

২৭. আল তাবরিযি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮৩৯।

২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস: (মৃত্যু : ৬৮/৬৮৬-৮) বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এজন্য তাকে 'জ্ঞানের সাগর' (আল বাহার) বলা হয়। প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি না হলেও তিনি ছিলেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস ছিলেন রাসূল (সা:)-এর গোত্র হাশেমীর সদস্য।

২৯. আল-মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৩।

৩০. একই গ্রন্থ।

৩১. আল, নববী, রিয়াদুসসালেহীন, পৃষ্ঠা, ৪৮৩।

৩২. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, দ্য হলি কুরআন, আয়াত, অনুবাদ ও তাফসির ফুটনোট, ২২৩৮।

৩৩. একই গ্রন্থ, ফুটনোট, ৪৫০৪।

৩৪. তুলনীয়, গাযালী, আল হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৫৬-৫৭।

৩৫. আল নববী, রিয়াদুসসালেহীন, পৃষ্ঠা, ৪৮৩।

৩৬. তুলনীয়, Niexenhuijze The Life Styles of Islam, পৃষ্ঠা, ১৫৫।

৩৭. আল শাতিবি, আল-ই'তিসাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৯, আরবিতে বিদ'আহ্র নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে : আল বিদ'আহ তরিকা ফিল-দ্বীন মুখতারাহ তুদাহি আল শরীয়াহ ইয়ুকসাদ বিল সুলক আলাইহা মা ইয়ুকসাদ তরিকা আল শরীয়াহ।

৩৮. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫০।

৩৯. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৪।

৪০. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৮।

৪১. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৪।

৪২. খারেজিদের বিষয়ে জানতে দেখুন, পৃষ্ঠা, ১১৪ এবং পূর্বে অধ্যায়ের ১৩৯ পৃষ্ঠার টীকা।

www.pathagar.com

৪৩. আল শাতিবি, আল ই'তিসাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪০-৮০।

৪৪. 'কাদেরিয়া' 'মুতাযিলা'র নিছক আরেকটি নাম কিনা সে ব্যাপারে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে কাদেরিয়া হ্ল আল-হাসান আল-বসরির শিক্ষা থেকে ওয়াসিল ইবনে আতার পৃথক হয়ে যাবার পূর্বের প্রাচীণ মুতাযিলা মতবাদ। পরবর্তীতে মুতাযিলারা কাদেরিয়া হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আহমাদ ইবনে হাম্বল কাদেরিয়া ও জাহামিয়া উভয়কে মুতাযিলা বলে উল্লেখ করে একে একটি বাতিল মতবাদ বলে খণ্ডন করে দিয়ে একটি বই লিখেন। তার এ রচনা প্রকাশের পর মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিশর ইবনে আল-মু'তামির এর প্রতিবাদ করেন এবং এর কোনটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেন। (তুলনীয়, আহমদ আমিন, ফজর আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ২৮৭-৭৮; Hughes, Dictionary, টিকা, ২২, পৃষ্ঠা, ৪৭৮; এবং Goldziher, Introduction, পৃষ্ঠা, ৮২, এখানে তিনি মুতাযিলা ও কাদেরিয়াকে দুটি পৃথক আন্দোলন হিসেবে গণ্য করেছেন)। তৎসত্ত্বেও একথা স্পষ্ট যে কোন ব্যক্তির আচরণের ব্যাপারে জবাবদিহিতার বিষয়ে দুটি গোষ্ঠী একই মত পোষণ করেছে যা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

মুতাযিলা হচ্ছে আশারিয়া মতের উদ্ভব ঘটার পূর্বে ইসলামে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ধর্মতাত্ত্বিক ভিন্ন মত। মুতাযিলা মতের দু'প্রধান পাদপীঠ হলো বসরা ও বাগদাদ। সুন্নি বিশ্বে আশা'রিয়া মতের উদ্ভব ঘটার পর মুতাযিলা মতের মূলনীতিগুলো শেষাবধি শিয়া মতবাদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। অবশ্য একথা অতি সহজে বলা যায় যে, সুন্নি মতবাদের সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে মুতাযিলা মতবাদ অসঙ্গতিপূর্ণ। সর্বশেষ শীর্ষস্থানীয় মুতাযিলা ধর্ম বিশারদ কাজী আব্দুল জব্বার (মৃত্যু, ৪১৫/১০২৫) ছিলেন শিয়া ধর্মাবলম্বী সুন্নি বিচারক। মুতাযিলা মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- নেতিবাচক ধর্মবিশ্বাস (বাগদাদিরা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেন, অপরদিকে আবু হাশিম আল জুবাইএর বসরাপন্থীরা আল্লাহর গুণাবলিকে সাধন প্রণালী (আহওয়াল), কুরআনের সৃষ্টতা, স্বাধীন ইচ্ছা এবং চূড়ান্তভাবে কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিনে সন্দেহাতীত বলে বিশ্বাস করেন; তবে আল্লাহর সঙ্গে কোন দিদার হবে না বলে মনে করেন।

কাদেরিয়ারা স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থক, তাদের বিরোধীরাই কেবল এ

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রাথমিক যুগে, বিশেষ করে সিরিয়ায় কাদেরিয়ারা রাজনৈতিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং লোকেরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন, এ ধারণার ওপর অধিক জোর দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কাদেরিয়াদেরকে মুসলিম সমাজের 'ম্যাগিয়ান'. বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগে অত্যন্ত গোড়াপন্থী বলে পরিচিত অনেকেই স্বাধীন ইচ্ছাকে কুরআনের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে করতেন। উদাহরণ, প্রখ্যাত মনীষী হাসান আল বসরি (মৃত্যু, ১১০/৭২৮) তার গ্রন্থ রিসালা-তে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। অসাধারণ উমাইয়া খলিফা 'উমর ইবনে আব্দুল আজিজ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আবু নুয়াইম তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে এ ধরনের মধ্যপন্থী কাদেরিয়ারা আহল আল সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

হাসান বসরির রিসালাহ'র দু'দশক পর শাহিবিয়া নামে পরিচিত একটি উগ্রপন্থী কাদেরিয়া মতবাদের অভ্যুদয় ঘটে ইরাকে। তারা জোর দিয়ে বলে যে, মানুষের কাজের কথা এমনকি আল্লাহও পূর্ব থেকে জানেন না। তারা ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা আল্লাহর নির্দেশনা (হুদা) অস্বীকার এবং মানবীয় অভিজ্ঞতার পথ অনুসরণের মাধ্যমে (ইদলাল) বিপথে চালিত হয় যা আল-বসরির মধ্যপন্থী কাদেরিয়া মতবাদের থেকে অনেক দূরে সরে যায়। জাহমিয়া হলো জাহম ইবনে সাফওয়ান (মৃত্যু, ১২৮/৭৪৬) এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অস্পষ্ট গোষ্ঠী। জাহমীরা একদিকে অতি ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ অপরদিকে আবার অত্যন্ত উদারবাদে বিশ্বাস করে, যেমন 'মুর্জি ইজম।' এতে বলা হয়, কোন ঈমানদার ব্যক্তির মর্যাদা নিছক মৌখিক ঘোষণার দ্বারা অর্জিত হয় অপরদিকে অত্যন্ত চরম স্থিরতাবাদ 'জাবারিজম' এ তারা বিশ্বাস করে, যাতে বলা হয়, মানুষের "কাজের জন্য" দায়ী করা পুরোপুরিভাবে অভেদ কল্পনার মতো বিষয়, যেমনটি আমরা বলে থাকি যে সূর্য 'কাজ করছে' তার অবস্থান অনুযায়ী। এ ধরনের নীতি হচ্ছে কার্যত বিভ্রান্তিমূলক। জাহম মতবাদ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে উপরের বিশেষ বিষয়সমূহের আওতায় "আল্লাহর গুণাবলী" শীর্ষক অনুচ্ছেদ দেখুন (সম্পাদক)।

৪৫. ইবনে কাইয়িম, ই'লাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩০। লেখক জাহমিয়া, কাদেরিয়া, ইত্যাদির গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ এবং কুরআনের

www.pathagar.com

ব্যাপারে তাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, পৃষ্ঠা, ২২০-৩১।

৪৬. বাতিনিয়া সম্পর্কে দেখুন, পৃষ্ঠা ১১৩, টিকা, ১১০।

৪৭. আল বানা'লি, তাহজির আল মুসলিমিন আন আল-ইবতিদা ওয়াল বিদা ফি'ল দীন, পৃষ্ঠা, ৩৮-৯।

৪৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪১।

৪৯. ইবনে তাইমিইয়া, ইকতিদা আল-সিরাত আল মুস্তাকিম লি-মুখালাযাত আসহাব আল-জাহিম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৫।

৫০. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৬; এই লেখক, মাযমুয়াত আল-রাসাইল ওয়াল মাসাইল, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৭১।

৫১. আল-হুসাইন, খিযর, রাসাইল দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৯।

৫২. একই গ্রন্থ।

৫৩. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭১।

৫৪. আল শাতিবি, আল-ইতিসাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১১।

৫৫. আল-গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২০১-৪।

৫৬. আল-শাতিবি, আল-মুয়াফাকাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০৪।

৫৭. একই গ্রন্থ।

৫৮. আল-গাযালী, আল-মুনকিজ (Mac Carthy), অনূদিত : Freedom and Fulfilment, পৃষ্ঠা, ৮২।

৫৯. আল-মিসরি, আল-কুল্লিয়াত : মু'যাম ফিল-মুস্তালাহাত ওয়াল-ফুনিক আল-লুগাবিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৮।

৬০. আবু হাবিব, দারাসাহ, পৃষ্ঠা, ৪৫৪।

৬১. আল-জামাখশারি, আল-কাশশাফ আল-হাকাইক আল-তানয়িল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫১১।

৬২. কুরতুবি উভয় হাদিস উদ্ধৃত করেছেন তার তাফসির আল কুরতুবিতে, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৭।

৬৩. যায়েদান, মাজমুয়া'হ, পৃষ্ঠা, ২৯৮; আল-সিবাল, ইশতিরাকাইয়াহ, পৃষ্ঠা, ৫৪।

www.pathagar.com

৬৪. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৩।

৬৫. 'হাক আল্লাহ' 'আল্লাহর অধিকার', সাধারণতঃ জনগণ বা সমাজের অধিকার বুঝাতে উল্লেখ করা হয় যা 'হাক আল আদামি' বা মানুষের অধিকার অথবা ব্যক্তিগত অধিকার এর বিপরীত।

৬৬. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬৭, ২৬৯।

৬৭. ইসমাঈল, মানহাজ আল সুন্নাহ ফি'ল-'ইলাকাহ বাইন আল-হাকিম ওয়াল মাহকুম, পৃষ্ঠা, ৩৩০-৩২।

৬৮. যায়েদান, মাজমুয়াহ, পৃষ্ঠা, ২৯৫।

৬৯. বাগির হাম্বলী সংজ্ঞায় ন্যায়পরায়ণ নয় এমন শাসকের অবাধ্যতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হানাফী সংজ্ঞায় কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ণ শাসক বা বৈধ ইমামের অবাধ্যতাকে বাগির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখুন, ইবনে 'আবিদিন, হাশিয়া আল-রাদ্দ আল-মুখতার 'আলা আল দূর আল মুখতার (হাশিয়াত ইবনে আবিদিন বলে পরিচিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : মাতবা'য়াত আল-বাবি আল-হালাবি, ১৩৮৬/১৯৬৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪২৭; ইসমাইল, মানহায আল-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা, ১৪৭।

৭০. তুলনীয়, যায়েদান, মাযমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ২৭৭, ২৯৫।

৭১. ইবনে তাইমিইয়া, ইকতিদা, পৃষ্ঠা, ১৩০।

৭২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১২৩; আল তাবরিজি, মিশকাত, আলবানি সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৭৭, হাদিস নং ২২১২।

৭৩. ইবনে তাইমিইয়া, ইকতিদা, পৃষ্ঠা, ১২৪-৫।

৭৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৩০-১।

৭৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৩৪।

৭৬. আল বানা'লি, তাহযির, পৃষ্ঠা, ৬১।

৭৭. আল-শাহরিস্তানি, আল-মিলাল ওয়াল-নিহাল, পৃষ্ঠা, ১০৪৫; ইসমাঈল, ইয়াহিয়া, মানহাজ আল-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা, ১০৬।

৭৮. ইবনে তাইমিইয়া, ইকতিদা, পৃষ্ঠা ১২৭; যায়েদান, মাযমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ২৯৯।

৮০. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৪।

www.pathagar.com

৮১. ধর্মীয় এসব উপদলীয় আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, ইবনে কাইয়িম, 'ইলাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৮৭; আহমদ আমিন, ফজর আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ২৫২-৩০৭; ফযলুর রহমান, ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১৬৭ এবং Goldziher, Introduction of Islamic Theology and Law, পৃষ্ঠা, ১৬৭। আরও দেখুন, উপরের ৪২ টিকা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৯ নং টিকা।

৮২. শালতুত, আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৩৩০; সরদার, The Future of Muslim Civilization, পৃষ্ঠা, ২৪।

৮৩. আরও বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, Louis Gardet, 'God in Islam' The Encyclopedia of Religion, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৯।

৮৪. তুলনীয়, আহমদ আমিন, ফজর আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ২৮৭, আরো দেখুন, টীকা-৪৪।

৮৫. আল-গাযালী, আল-মুনকিয, পৃষ্ঠা, ১৫৮।

৮৬. আল-স্যুয়ুতি 'আল জামি আল-সগির, পৃষ্ঠা, ৫১।

৮৭. আবদুহু, রিসালাত আল তাওহীদ, পৃষ্ঠা, ৫১।

৮৮. আল কাদা ওয়াল কাদার, আক্ষরিক অর্থ, 'আল্লাহর আদেশ ও ভাগ্য/পরিণাম' স্বাধীন ইচ্ছা ও তকদির সম্পর্কিত বিতর্কের যথাযথ সমার্থক অর্থ হিসেবে আমরা এর আক্ষরিক অনুবাদ ব্যবহার না করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। (সম্পাদকের মন্তব্য)।

৮৯. তুলনীয়, আল-মা'হাদ আল-'আলামী লি'ল-ফিকর আল-ইসলামি, ইসলামিয়াত আল-মা'রিফা, পৃষ্ঠা, ৮৪।

৯০. সুন্নি ইসলামের মূল স্রোতধারার ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে আশ'আরি মতবাদের মিল রয়েছে। সঠিক অর্থে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ধর্ম তত্ত্বের মূলনীতি সম্পর্কে সচেতনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা হিসেবে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, আবুল হাসান আল-আশ'আরি (মৃত্যু ৩২৪/৯৩৫)। বসরার মুতাযিলা উস্তাদ আবু আলী জাবালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তার অসন্তোষ থেকে এ মতবাদের সূত্রপাত হয়। বলা হয়ে থাকে আল-আশ'আরি মৃত্যু (৩০০/৯১২) রমাযান মাসে স্বপ্নযোগে রাসূলের (স:) উপদেশ পেয়ে মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করে এ নতুন মতবাদের কথা ঘোষণা করেন। আশ'আরিরা কুরআনের

www.pathagar.com

জ্ঞানের নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন যাতে মুতাযিলাদের নীতি প্রত্যাখানের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। মুতাযিলারা এ নীতি বিশ্বাস করেন যে, অদৃষ্ট মূলনীতির সমর্থনে কুরআনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া আশ'আরিরা কুরআনের অনুমানভিত্তিক যেকোন ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন, বিশেষ করে আল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনরূপ কমতি না করে এবং কেন, এ প্রশ্ন ছাড়াই (বিলাক দিফ) মেনে নিয়েছেন। আশ'আরিরা অবশ্য আল্লাহর নরত্ব আরোপকে (তাযসিম, শরীরতত্ত্ব) পরিহার করেছেন, এমনটি করার ফল হলো-বর্ণনার কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থ মেনে নেয়া, এ ধরনের নেতিবাচক বিবরণের মাধ্যমে একই সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল্লাহ ও কুরআনের বর্ণনার অখণ্ডতার সৌন্দর্যকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ দেখছেন, কিন্তু আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে নয়' 'আল্লাহ শুনেন, কিন্তু সেভাবে নয় যেভাবে আমরা শুনি' ইত্যাদি। আশ'আরিয়া মতবাদ তাকদিরের (পূর্ব নির্ধারণবাদ) ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তারা একে চূড়ান্তভাবে গণ্য করে (আকস্মিকভাবে ঘটাকে) অস্বীকার করেন; আল্লাহ সবকিছুই পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং সব কাজই আল্লাহর এবং তিনি একমাত্র সংঘটক, তবে মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, সে যা অর্জন করেছে (ইকতিসাব) সে জন্য তাকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা হবে। এখানে অন্যায় অধিকারের বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতির জন্য আশ'আরিয়া মতবাদে রাসূলের সুপারিশের (শাফায়াত) ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ'র নির্দেশনা (নুসূস) সম্পর্কে মুতাযিলারাও তাদের মুলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। মাতুরিদ মতবাদের আদলে সমসাময়িক ইসলামি বিশ্বে যে বিশেষ ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আশ'আরিয়া মতবাদের জন্ম হয়েছিল বলে এর অনুসারিরা দাবি করেন। (সম্পাদকের মন্তব্য)।

৯১. আল গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা ১২৯; হাম্মাদ, হুররিয়া, পৃষ্ঠা ১২৪।

৯২. ফিকরি, আল মু'য়ামালাত আল-মাদ্দিয়াহ ওয়া'ল আদাবিয়া, পৃষ্ঠা, ৮৪।

৯৩. আল-তিরমিযি, সুনান, হাদিস নং ২৯৭৬।

৯৪. একই সূত্র, পৃষ্ঠা, ৯০।

৯৫. আল-আসকালানি, জাওয়াহির সহিহ আল বুখারি, হাদিস নং ২৭৫।

৯৬. আল-গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২৬১।

www.pathagar.com

৯৭. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১।

৯৮. আল-তিরমিযি, সুনান, হাদিস নং ১৯৯৩; আল-গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২৫৮; একই লেখক, এহইয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭৯।

৯৯. আল-গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২৫৪।

১০০. ইবনে হাম্বল, ফিহরিস আহাদিস, মুসনাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩।

১০১. হাম্মাদ, হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ১২৪।

১০২. আল-গাযালী, কিতাব আদাব, পৃষ্ঠা, ২৫৯; ইবনে কাদামাহ, আল-মুগনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬।

১০৩. আল তাবরিজি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮-৯২।

১০৪. আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৬, ৩২৩

১০৫. একই সূত্র, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৭।

১০৬. তুলনীয়, এনায়েত, Modern Islamic Political Thought, পৃষ্ঠা, ১৭৫।

১০৭. আল মাওসু'য়াহ আল-ফিকহিয়াহ (কুয়েত), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৯১।

১০৮. এনায়েতের গ্রন্থের উদ্ধৃতি, Political Thought, পৃষ্ঠা, ১৭৯।

১০৯. আল-সারাখসি, আল মাবসুত, ২৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৮।

১১০. আল মাওয়াসুয়াহ আল ফিকিয়াহ (কুয়েত), পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৯১।

১১১. এনায়েত, Political Thought, পৃষ্ঠা, ১৭৯।

১১২. আল মাওসু'য়াহ আল ফিকিয়াহ (কুয়েত), পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১১৩. তুলনীয়, Lambton, State and Government in Medieval Islam, পৃষ্ঠা, ২৬৩।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : বৈধ-সংযম

১. সূচনা বক্তব্য

ব্যাপকার্থে বলতে গেলে অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে ধরনের সাধারণ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়; মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ঐ একই ধরনের বিধিনিষেধ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল: অপরের যাতে কোন ধরনের ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোনভাবেই অন্যের জন্য আঘাতের কারণ হতে অথবা তার অধিকার বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে, নৈরাজ্য-বিশৃংখলা, সংঘাত-সহিংসতা বা সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা এর বৈধ চর্চার যে সুযোগ রয়েছে তার মধ্যে পড়বে না।[১] উপরন্তু অন্যান্য স্বাধীনতার মতো বাকস্বাধীনতাও অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ ('মাসালিহ যারুরিয়াত') ও মূল্যবোধের অধীন এবং স্থিতিশীলতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খলার জন্য এটি করা প্রয়োজন।[২] অতএব এ স্বাধীনতার চর্চা যেন কোনভাবেই জীবনের জন্য অপরিহার্য পাঁচটি মূল্যবোধ বিনষ্ট করতে না পারে, তা হলো: জীবন, ধর্মবিশ্বাস; বুদ্ধি ও চিন্তা, বংশানুক্রম ও সম্পত্তি। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোন কথার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্য এর বৈধতা নির্ণয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সত্য উদঘাটনের জন্য কি বাকস্বাধীনতার অধিকারের চর্চা করা হয়েছে? কোন কল্যাণ অর্জনের জন্য? নাকি কোন বৈধ প্রয়োজন পূরণে? অথবা অন্যদের আঘাত করার জন্য? এ স্বাধীনতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত বিরোধের সময় প্রায়ই এসব প্রশ্ন করা হয়। অবশ্য কথার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল, তা সঠিকভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে, যেখানে বাকস্বাধীনতা লংঘনে যে কথাগুলো উচ্চারণ করা হয়েছে; কেবল তাতেই তার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে উদ্দেশ্য কি ছিল, সে প্রশ্নের তেমন কোন গুরুত্ব নেই; যেমন কোন ব্যক্তিকে গালিগালাজ করা বা অপমান করার ঘটনা।

শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বাকস্বাধীনতার লংঘন সুনির্দিষ্ট অপরাধের আকারে অথবা ইসলামের গৃহীত নিয়ম-নীতির অবমাননা বা অস্বীকারের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। সুনির্দিষ্ট অপরাধের মধ্যে রয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দান (কাযফ) ধর্মের অবমাননা, বিদ্রোহ করা (ফিৎনা) অপমান করা (সাব), অভিশাপ দেয়া (লা'ন), মিথ্যারোপ (ইফতিরা) এবং অন্য মুসলমানকে বিধর্মী (তাকফির) বলে আখ্যায়িত করা। ইসলাম অবমাননা বা অস্বীকার করার প্রবণতামূলক বাকস্বাধীনতা লংঘনের মধ্যে রয়েছে, সাধারণভাবে অস্বীকার করা (কুফর) ও

www.pathagar.com

নতুন উদ্ভাবনী (বিদ'আহ)। এসব লংঘনের ঘটনার মধ্যে অনেকগুলো ফৌজদারি অপরাধ এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। অপরদিকে অন্যগুলো তেমন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি এবং সেগুলোর জন্য কেবল নৈতিক তিরস্কার করা হয়। এ অধ্যায়ে বৈধ সূত্র ও ফকিহগণের প্রণীত ফিকহ অনুযায়ী এর প্রতিটি বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. জনসমক্ষে কষ্টদায়ক কথা উচ্চারণ

এখানে যে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তার শিরোনাম সরাসরি কুরআনের আয়াতের অংশ আল জাহর বি'ল-সু' মিন আল-কাউল এর আক্ষরিক অনুবাদ। সম্ভবত এ বাক্যাংশটিতে কুরআনের অন্যতম সুদূরপ্রসারি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। যে আয়াতে একথাটি এসেছে নিম্নে সেটি তুলে ধরা হল :

لايُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلاَّ مَنْ ظَلِمَ وكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا.

> মানুষ খারাপ কথা বলুক আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেন না, কারোর ওপর যুলুম করা হলে আলাদা কথা। আল্লাহতা'আলা সবকিছুই জানেন ও শুনেন (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার আছে) কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল ভাল কাজই করে যাও; তা হলে আল্লাহর গুণপরিচয়ও এই যে তিনি বড় ক্ষমাশীল অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণক্ষমতা তিনি রাখেন। (৪:১৪৮-১৪৯)

আল জাহর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল: প্রচার বা প্রকাশ করা আর সু' অর্থ হল খারাপ, ক্ষতিকর বা পীড়াদায়ক; অতএব আল-জাহর আল সু'র অর্থ হয় 'খারাপ কথা প্রচার করা।'[৩] প্রকাশ্যে কোন কথা বলার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের গালমন্দ করা বা স্বদেশের নিন্দা করা, কোন ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা, শারীরিকভাবে তাকে আঘাত করা অথবা তার সম্পদের ক্ষতিসাধন করার বিষয় এ আয়াতের আওতায় পড়ে। এ আয়াতে কষ্টদায়ক বক্তব্য বলতে ব্যাপকার্থে কোন ব্যক্তি, একাধিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বলা বক্তব্যকে বোঝানো হয়েছে। উপরন্তু এ আয়াতের অর্থ এতোটাই ব্যাপক যে, প্রচার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আধুনিক যত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে সবই এর আওতায় পড়বে।[৪]

কুরআন বিশারদগণ (মুফাসসিরিন) এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসিরে আভাস দিয়েছেন যে, এ আয়াতে একান্তভাবে আক্রমণাত্মক বক্তব্যের নিন্দা করা হয়েছে, তা যে উদ্দেশ্যে বা যে পরিস্থিতিতেই দেয়া হোক না কেন। এ আয়াতে সত্য না

www.pathagar.com

মিথ্যা অথবা কোন কল্যাণ চিন্তায় তা বলা হয়েছে কিনা তার মধ্যেও কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ আয়াতে একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সব ধরনের ক্ষতিকর কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যুলুমের শিকার ব্যক্তি। এমনকি তার কথা পীড়াদায়ক হওয়া সত্ত্বেও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য তার আর্তি প্রকাশ অবশ্যই মঞ্জুর করা হবে। প্রকাশ্যে খারাপ কথা উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের কুৎসা রটনা ও তাদের চরিত্রের দোষত্রুটি উন্মোচন, অথবা কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের দুর্নাম করা। এছাড়া কোন ব্যক্তির খারাপ কাজ যেমন ব্যভিচার, মদ পান, জুয়া খেলা সম্পর্কিত অথবা মনে মনে এসব করার চিন্তাপ্রসূত স্বগতোক্তিও এর মধ্যে পড়বে। এছাড়া অশ্লীল সাহিত্য প্রকাশ ও প্রদর্শন এবং যেকোন ধরনের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন যা আল-সু'র আওতাভুক্ত হবার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বহন করে। কুরআনে একমাত্র ব্যতিক্রম অনুমোদন করা হয়েছে ন্যায়বিচার লাভের চেষ্টাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে। একে খারাপ কথা উচ্চারণ রোধের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অবশ্য তৎসত্ত্বেও অতি জরুরি বলে প্রতীয়মান পরিস্থিতিতেই আল-জাহর আল-সু'র প্রয়োগ সীমিত রাখতে হবে।[৫]

এভাবে কেবল নির্যাতন নিপীড়ন বা যুলুম এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে কটুকথা উচ্চারণ করার অনুমতি রয়েছে। যুলুমের ঘটনা ছাড়া আল-জাহর বিল সু' বৈধ নয়। কোন সমাজে খারাপ কথা বলার রেওয়াজ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচলিত থাকলে সেখানে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে এবং শেষাবধি ঐ সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা রয়েছে। আমরা আগেই যেমনটি আভাস দিয়েছি যে আলোচ্য আয়াতটি কার্যত প্রকাশ্যে অশ্রাব্য গালি দেয়া, অবমাননাকর কথা বলা, অভিসম্পাত দেয়া, ফিতনা সৃষ্টি করা। ইত্যাদির মতো সুনির্দিষ্টভাবে বাকস্বাধীনতা লংঘনের প্রায় সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করার মতো যথেষ্ট ও ব্যাপক অর্থবহ। একটি মাত্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কারণে এ সাধারণ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে যে, কুরআন খারাপ কথা উচ্চারণ রোধ করার চেয়ে ন্যায়বিচারকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। এ আয়াতটিতে সে আভাসই ফুটে উঠেছে। যুলুমের শিকার পক্ষকে অনিয়ন্ত্রিত বাকস্বাধীনতা মঞ্জুর করা সত্ত্বেও একই আয়াতের পরের অংশে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ বিশেষ করে যুলুমের শিকার ব্যক্তিকে মহান আল্লাহতা'আলার কাছ থেকে দয়া ও পুরস্কার লাভের আশায় গোপনে বা প্রকাশ্যে ক্ষমা ও ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এভাবে একদিকে ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রদান করার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যদিকে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে তার বেদনা প্রকাশের সুযোগ মঞ্জুর করা হয়েছে। এরপর কুরআন স্মরণ

www.pathagar.com

করিয়ে দিয়েছে. আরও দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যাতে শান্তিপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আর এ লক্ষ্যে উচিত শাস্তির জন্য জোর দাবি জানানোর চেয়ে ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয়া। নিম্নের দু'টি আয়াতে আভাস পাওয়া গেছে যে, কুরআন বারংবার ক্ষমাশীলতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে :

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ .

আর যারা তাদের রাগকে সংবরণ করতে পেরেছে এবং অন্যদেরকে ক্ষমা করেছে তারা আল্লাহভীরু (মুহসিন) ব্যক্তিদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।[১] অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে–এটি নি:সন্দেহে উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম"– (৩:১৩৪, ৪২:৪৩)।

যেসব লোক অন্যদের দুর্নাম করে বেড়ায়, যারা খারাপ কথা প্রচার করে এবং অন্যদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয় কুরআনের এ আয়াতে তাদেরকে এ আচরণের জন্য কঠিন পরিণতির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মাঝে নির্লজ্জতার বিস্তার ঘটুক, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহতা'আলা (সব কিছুই) জানেন তোমরা (কিছুই) জানো না। (২৪:১৯)

এখানে অবশ্য জোর দেয়া হয়েছে ক্ষমা নয় বরং শাস্তির ওপর, কারণ এ আয়াতে কেবলমাত্র আযাব (শাস্তি) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এরপরে সংক্ষেপে বলা হয়েছে : 'আল্লাহই জানেন এবং তোমরা অবহিত নও।' যখন নমনীয়তা ও ক্ষমার কোন পথ খোলা থাকেনা; তখনই কেবল কঠোর শাস্তির সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

সুন্নাহ'তে যে পথ নির্দেশনা (হিদায়াত) দেয়া হয়েছে, তাতে কেবল পীড়াদায়ক কথা বলা পরিহার করতেই বলা হয়েছে। উপরন্তু সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি

www.pathagar.com

উন্নয়নের ইতিবাচক অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। একথাই হল নিম্নে উদ্ধৃত হাদিসটির মর্মবাণী :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

'সেই হলো প্রকৃত মুসলিম যার জিহবা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ।'

হাদিসে মুসলমানদের কথা বলা হলেও এর মর্মবাণী কিন্তু কেবল ঈমানদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন পর্যবেক্ষক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, হাদিসটিতে সুনির্দিষ্ট করে মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে 'কারণ কোন ব্যক্তিকে প্রধানত তার নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। কিন্তু এর লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা যাতে; প্রত্যেকেই নিরাপদ বোধ করতে পারে। ৮ শরী'আত মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে; তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী করা।[৯]

কোন ব্যক্তি সত্য কথা বললে এবং কোন বিষয় বা ঘটনা যেমন ঠিক তেমনভাবেই তা জানালে, তার জন্য তাকে কোন শাস্তি প্রদান বা দোষারোপ করার কোন বিধান শরী'আতে রাখা হয়নি। এ কারণে কোন 'ব্যাভিচারীকে কেউ ব্যাভিচারী বললে এর জন্য কোন শাস্তির বিধান নেই কারণ তার এ বিবৃতি হচ্ছে একটি অপ্রমাণিত ঘটনা। এছাড়া সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (হিসবাহ) এর মূলনীতির আওতায় সরকারি কর্মচারি, সংসদ সদস্য, এবং সরকারি কাজে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির কুকীর্তি ও ভুলত্রুটি বা দুর্বলতা প্রকাশ করা সঠিক ও তার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হল, এসব অভিযোগের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে।

উপরন্তু শরী'আত বিবৃতি দানের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গ্রুপকে কোন বিশেষ সুবিধা প্রদান করেনি অথবা সংসদ সদস্য এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যও তার বক্তব্যের ব্যাপারে বিশেষ মর্যাদার কোন স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলাম ন্যায়বিচার ও সত্যের জন্য একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। শরী'আতের আইন আদালত সংগঠনের ক্ষেত্রেও ইসলাম ও এর তাওহীদের দর্শনের সেই একই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ইসলামে সরকারি কর্মকর্তা অথবা রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অনুমতি দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নাগরিককে একই বিচার আদালতে তার অধিকার লংঘনের বিচার চেয়ে আবেদন করতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একক মানের বিচার এবং শোভন বক্তব্য ও আচরণ প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

৩. মিথ্যা অপবাদ *(ক্বাদফ)*

কোন ভাল মানুষের সম্মান ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার ঘটনাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক বিষয় বলে গণ্য করেছে। পবিত্র কুরআনে কতিপয় অপরাধের সাথে মিথ্যা অপবাদের জন্যও বাধ্যতামূলক শাস্তির বিধান রয়েছে। এসব শাস্তি সামষ্টিকভাবে 'হুদুদ' বলে পরিচিত। উপরন্তু কোন মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীর অপরাধের জন্য যথারীতি বিচার ও শাস্তির বিধান ছাড়াও তার জন্য আরেকটি সম্পূরক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে; তা হল সে কখনও কোন বিচারালয়ে সাক্ষী হতে পারবে না। কেননা একজন অপবাদকারী একবার কোন নির্দোষ ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করলে, তার সম্মানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, তা আর কখনও উদ্ধার করা হয়ত সম্ভব হয় না।[১০]

আক্ষরিক অর্থে কাযফ মানে অন্যদের কাছে অবমাননাকর কথা 'রটানো।' এ সাধারণ অর্থে 'কাযফ' বলতে সব ধরনের অশ্রাব্য কথা বুঝায়, যার মধ্যে পড়ে মিথ্যা অপবাদ, মানহানিকর বিবৃতি, অবমাননা, অভিশাপ প্রদান, ইত্যাদি।[১১] কুরআনে অবশ্য কাযফ এর অপরাধের ব্যাপারে আরও সুনির্দিষ্ট ধারণা পেশ করা হয়েছে, তা হলো, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যাভিচার (যিনা) করা অথবা তার সন্তানের বৈধতা অস্বীকার করার অভিযোগ করা। প্রথমটির ক্ষেত্রে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী হাযির করতে পারে; তাহলে অভিযোগ প্রমাণিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি বিধান প্রযোজ্য হবে। অভিযোগকারী যদি সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করতে ব্যর্থ হয়; তাহলে তার ওপর কাযফের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ বা অন্যান্য অপরাধের অভিযোগের মতো সব ধরনের অভিযোগ তা'যির এর আওতায় শাস্তিযোগ্য।[১২]

অভিযোগকারী (ফরিয়াদি) মুসলমান অথবা অমুসলমান হতে পারে; তবে কাযফ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন মুহসান হতে হবে, যার অর্থ হলো সে একজন উন্নত চরিত্রের বিবাহিত মুসলমান; যে এ অভিযোগ আনার আগে ব্যভিচার (যিনা) করেনি অথবা স্বধর্ম ত্যাগ (রিদ্দাহ) করেনি। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য সব ধরনের অপরাধমূলক কাজ থেকে মুক্ত থাকা জরুরি নয়। মিথ্যা অপবাদের শিকার ব্যক্তি (মাকযূফ) শাস্তির দাবি জানালেই কেবল কাযফের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। মাকযূফ মৃত ব্যক্তি হলে এবং তার ওয়ারিশগণ যদি শাস্তির দাবি জানায় তাহলে অপবাদকারীর জন্য ঐ একই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে। মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনা স্বাভাবিক পন্থায় অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। এ পন্থার মধ্যে রয়েছে দু'জন সত্যবাদী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান এবং দোষ স্বীকার।[১৩]

www.pathagar.com

কাযফকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, তার একটি হলো : পূর্ণ কাযফ। ব্যাভিচারির সব অপরাধের মিথ্যা অপবাদ দানের মতো ঘটনা হলো পূর্ণ কাযফের উদাহরণ। উপরে এনিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের জন্য ৮০টি বেত্রাঘাত করার শাস্তির বিধান রয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের কাযফের মধ্যে রয়েছে, পূর্বে উল্লিখিত সবধরনের কটুক্তিপূর্ণ কথা, যেমন: অবমাননা ও মানহানিকর কথা বলা অথবা অপরাধমূলক কোন কাজ করার অভিযোগ করা। এ ধরনের অপবাদের শিকার কোন ব্যক্তির জন্য মুহসান বা চরিত্রবান বিবাহিত মুসলমান হওয়া জরুরি নয়। অভিযোগের বিষয় চুরি, খুন বা জালিয়াতির মতো দণ্ডনীয় অপরাধ অথবা সাধারণ অবমাননাকর কথা (সাব) হতে পারে। সাব পূর্ণ কাযফ থেকে ভিন্ন ধরনের, এর মাত্রা নিরূপণের জন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার হয় না, যে অবমাননার কথা উচ্চারণ করা হয়েছে; তা সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, তাই-ই তার অপরাধ অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গাধা বললে, স্বাভাবিকভাবে এটি প্রমাণ করার কোন দরকার নেই। অবশ্য পূর্ণ কাযফ এর স্বীকার বা অস্বীকার করার প্রয়োজন কারণ, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা সত্য না মিথ্যা সেটা সাধারণত প্রমাণ সম্ভব। তবে অবমাননার কথা অসত্য বলে মনে হলে, তা যে অর্থ প্রকাশ করছে সাধারণভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না।[১৪]

এছাড়া কাযফ থেকে সাব এর আরো পার্থক্য রয়েছে। অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আরোপ ছাড়া কাযফ সংঘটিত হয় না। অপরদিকে সাব হলো উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সাধারণ অবমাননার ঘটনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা মাতাল বললো, এগুলো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ যা আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃত অপরাধ এবং এর জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন হয়। অবশ্য অপর কোন ব্যক্তিকে 'নীতিহীন' বলা অবমাননার ধরন অনুযায়ী একটি সাধারণ অপবাদ। এবং তা পূর্ণ কাযফ পর্যায়ে উন্নীত হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে আদালত অপরাধের প্রকৃত ধরন কী-তা নিরূপণ করবে।[১৫] এটি নিরূপণের জন্য আদালত জনপ্রিয় প্রথার শরণাপন্ন হয়, এটি হলো যেসব কথা ও উচ্চারণের অর্থ বা গূঢ়ার্থ স্পষ্ট নয়, সেগুলোর অর্থ অনুধাবনে প্রধান সূচক। উচ্চারিত শব্দের সন্দেহাতীত অর্থ প্রকাশ করলেই কেবল কুরআনে বর্ণিত কাযফের অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ধরনের সন্দেহ দেখা দেয়, তা যতটা তুচ্ছই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; তবে বিচারক তা'যিরের নীতির অধীনে অপরাধের জন্য নতুন করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন।[১৬]

www.pathagar.com

সকল মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দানের আগে সে যদি অপর কোন ব্যক্তির উদ্দেশে মিথ্যা অপবাদ বারবার প্রদান করে; তবে একই সাথে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার একটিমাত্র শাস্তি হবে। এছাড়া একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনায়ও সমভাবে ৮০ ঘা বেত্রদণ্ডের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে অপরাধীকে একটি না একাধিক কাযফের অপরাধে শাস্তি দেয়া হবে, সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনে হাম্বল ও আল সাউরির মতে অপরাধীকে মাত্র একবার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে ইমাম আল শাফেঈর মতে একটি দলে যে কয়জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, অপরাধীকে ঠিক ততবার শাস্তি দেয়া উচিত। তৃতীয় মত অনুযায়ী, একদল লোককে যদি একই ঘটনায় ও একসাথে অপবাদ দেয়া হয় যেমন, তাদেরকে যদি বলা হয়, "হে ব্যাভিচারির দল," তাহলে তা একক অপরাধ হিসেবে শাস্তির যোগ্য হবে। তবে যদি দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্যকে আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করা হয়, তাহলে তা তাদের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথক অপরাধ করা বুঝাবে। কোন ব্যক্তির অধিকার লংঘনকে মিশ্রিত করা (তাদাখুল) যাবে না, এ নীতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপকে পৃথক পৃথক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাযফ হাদ অপরাধের থেকে আলাদা ধরনের। হাদ এ কেবল আল্লাহর অধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে আর সে কারণে একাধিকবার এ ধরনের অপরাধ করলেও মাত্র একবারই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হয়।[১৭]

অভিযোগকারী যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে মিথ্যা অপবাদ দানের (কাযফ) শাস্তি বাতিল করা যাবে কিনা-তা নিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফিদের মতে, অন্যান্য হাদ অপরাধের মত কাযফও আল্লাহর অধিকারের লংঘন; তাই ক্ষতিগ্রস্ত কর্তৃক ক্ষমার কারণে এ শাস্তির বিধান কার্যকরকরণ বিঘ্নিত হবে না। অপরদিকে শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাব মতে, হাদ হলো 'মানুষের অধিকার লংঘন' (হাক আল-'আবদ) অতএব ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষমা করে দিতে পারবে, এক্ষেত্রে শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। মালিকিরাও এ মতকে সমর্থন করেন; তবে ক্ষতিগ্রস্তকে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগেই ক্ষমা করতে হবে। শাফেঈ ও হাম্বলি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগে বা পরে যখনই ক্ষমা করা হোক না কেন, তা মঞ্জুর করা হবে এবং এটিকেই অধিকতর সঠিক মত বলে বিবেচনা করা হয়।[১৮]

কাযফ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে হবে, এটি জরুরি নয়, কারণ এটি জনসমাবেশ স্থলে অথবা এক ব্যক্তির বাড়িতে কিংবা উভয়স্থানে, অন্যদের উপস্থিতি অথবা

www.pathagar.com

লোক চক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হতে পারে। কোন ব্যক্তির মর্যাদার বিষয়টি হলো তার স্বাভাবিক গুণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তার কোন পরিবর্তন ঘটেনা, এ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[১৯]

উপরন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে (মুমিন) কুরআন বলেছে:

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الاِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'প্রকাশ্য ও গোপন উভয় ধরনের পাপ কাজ পরিত্যাগ কর।' (৪:১২০)

ইতোমধ্যে আলোচিত কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে; 'আল্লাহতা'আলা প্রকাশ্যে কষ্টদায়ক কথা উচ্চারণ করাকে পছন্দ করেন না, এর ব্যতিক্রম হল ঐ ব্যক্তি যার ওপর যুলুম করা হয়েছে।' (৪:১৪৮)। কোন নির্দিষ্ট কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ অপরাধমূলক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মানদণ্ড হতে পারে বলে এ আয়াতে পরামর্শ দেয়া হলেও; খোদ আয়াতে শর্ত হিসেবে এ বিষয়টি আরোপ করা হয়নি। এ আয়াতে কাযফ সংঘটিত হবার দুটি পন্থার খারাপটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তবে কথা উচ্চারণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অবশ্য তার মূল বক্তব্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণ আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হাদ) কেবলমাত্র অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেই কার্যকর করা হয়। কাযফের সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো: কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর সুস্পষ্ট ভাষায় যিনার অপবাদ আরোপ করা যার শাস্তি হবে ৮০ ঘা বেত্রদণ্ড। সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা অপবাদ আরোপের অন্যান্য সকল শ্রেণীর অপরাধের দণ্ড এ ধরনের গুরু শাস্তির পর্যায়ে পড়বে না। তবে এরপরও তা'যিরের আওতায় লঘু শাস্তির বিধান করা যেতে পারে। কতিপয় পরিস্থিতি পুরোপুরি সুস্পষ্ট নয়। যেমন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বললো, 'আমি ব্যাভিচার করিনি, না আমার বাবা-মা তা করেছে, তুমিও কি তোমার নিজের ব্যাপারে একথা বলতে পার?' এধরনের বিবৃতি প্রায় আল-তারিফ বিল-কাযফ (মিথ্যা বলার চেষ্টা) বলে উল্লেখ করা হয়; যা সন্দেহমুক্ত নয় এবং তা নিম্নোক্ত হাদিসের আওতায় পড়বে।[২০]

إِدْرَأُ وَالْحُدُوْدَ بِالشُّبهَاتِ

'সন্দেহের ক্ষেত্রে হাদ কার্যকর করবে না।,'

শেষ কথা হলো কাযফের ক্ষেত্রে শরী'অতের বিধান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও এমনকি কুরআনের আয়াতেও এর ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়। আলেমগণ অবশ্য অপরাধের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বের বিষয় প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন। এতে দেখা যায় যে, মহিলারাই

www.pathagar.com

কাযফের শিকার হয় বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআনের সূরা নূরের আয়াতটি (২৪:৪) শুরু হয়েছে 'ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূন আল মুহসানাত' 'এবং ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা সতী মহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, ...' ইত্যাদি। এখানে সর্বনাম ওয়াল্লাযীনা পুং লিঙ্গের আকারে রয়েছে, পুরুষদেরকে বুঝাচ্ছে। অনুরূপভাবে 'আল-মুহসানাত' শব্দটি স্ত্রীবাচক বহুবচন। তাই তাতে কেবলমাত্র মহিলাদের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সকল মাযহাবের আলেমগণের মতে কুরআনের এসব আয়াত নারী ও পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এভাবে এ আয়াতের আলোকে শাস্তির বিধান সংশ্লিষ্টদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয় না, নারী বা পুরুষ যেই সে অপরাধ করুক না কেন, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন। উভয় পক্ষ আবার একই বা ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এর কোনটিই আলোচ্য আয়াতের সাধারণ গুরুত্বের বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারবে না। কুরআনের অন্যান্য আইন সংক্রান্ত আয়াতেও পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা হয়েছে; যাতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে' তাই-এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কুরআন কাযফ এর অপরাধ সংঘটনকারীদেরকে বুঝাতে পুংলিঙ্গের বহুবচন ব্যবহার করেছে নিছক একারণে যে; এটি হল শব্দটির অধিকতর প্রচলিত সাধারণ রূপভেদ। এর অর্থ মহিলাদেরকে সম্ভাব্য অপরাধকারীদের শ্রেণীভুক্ত না করা নয়।[২১]

৪. মানহানি *(ইফতিরা)*

ইফতিরা শব্দের অর্থ অপর ব্যক্তির ওপর মিথ্যা দোষারোপ করা, ক্ষতি সাধনের মানসে কারোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ করা অথবা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কল্পিত মিথ্যা কথা বলা। কুরআনের ব্যবহার রীতি অনুযায়ী ইফতিরা হলো মিথ্যা কথা বলার (কিয্ব) সমার্থক।[২২] এবং ফিকহর আইনগত দিক (যাতে একে ফিরাইয়াহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুযায়ী একে কটূক্তিপূর্ণ অভিযোগের উপশ্রেণীভুক্ত কাযফ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কায্ফের ক্ষেত্রে যেসব বিধি রয়েছে ইফতিরার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

কাযফের জন্য যে ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে ইফতিরার জন্য ঐ একই শাস্তি'র বিধান, ৮০ ঘা বেত্রাঘাত। অন্যান্য ধরনের মিথ্যা অভিযোগ, তা ব্যাভিচার বা অন্য কোন অপরাধ, যাই হোক না কেন, যা 'কাযফ' এর পর্যায় বলে গণ্য হবে না, সেগুলো মানহানিকর অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নিরোধকমূলক শাস্তি তা'যির[২৩] প্রয়োগ করা হতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা তুলে ধরতে ইবনে তাইমিইয়া বলেন :

www.pathagar.com

মিথ্যা অপবাদ দেয়া বা কটূক্তি সাধারণত এমন ধরনের অভিযোগ, যার বদলা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই এ অপরাধের ক্ষেত্রে বদলা গ্রহণের (কিসাস) বিধান প্রয়োগ করা যায়না। একারণে কোন ব্যক্তি কোন সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তা প্রমাণ করতে যদি চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে; তাহলে তাকে ৮০ দোররা আঘাতের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচার বা সমকামিতার অভিযোগ করে, তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়; তাহলে তাকেও ঐ একই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে এ অভিযোগ যদি ব্যভিচার বহির্ভূত অন্য অপরাধ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তা'যির-এর আওতায় দোররার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। অধিকাংশ ফকিহর মতে, বদলা গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে এবং সম্পদ তসরুফের ঘটনায় বিবাদী ও মালিক-উভয়ের ব্যক্তিগত অধিকারকে আল্লাহর অধিকারের অগ্রে স্থান দিতে হবে।[২৪]

কোন মকদ্দমায় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে হলে অথবা তাতে যদি অধিকার লংঘিত হয় (সু'ইস্তিমাল আল-হক), তাহলে সেক্ষেত্রে বিচারক শুনানির দাবি মঞ্জুর করার অথবা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবেন। একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার সংক্রান্ত সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে, তবে তার দাবি যদি সবদিক থেকে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয় এবং তার উদ্দেশ্য যদি কোন ব্যক্তির সুনাম ও সুখ্যাতি বিনষ্ট করা হয়, তাহলে বিচারক তার মকদ্দমার শুনানি অনুষ্ঠানে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ (আল-কারা'ইন) যদি দাবিটি মিথ্যা হবার বিষয়কে সমর্থন করে; তাহলে দাবিদারকে শাস্তি দিতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে মালিকী মাযহাবের ফকিহগণের মতে কোন গরিব ও অভাবী ব্যক্তি যদি কোন সম্মানিত ব্যক্তির কেবলমাত্র সুনাম ক্ষুণ্ন করা ও তাকে আদালতে হাজির করানোর উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তাহলে আদালত এ ধরনের মকদ্দমার শুনানি অনুষ্ঠান অস্বীকার করতে পারবেন। এমনকি অভিযোগকারীকে শাস্তিও দিতে পারবেন। এধরনের পদক্ষেপ বিচার পাবার অধিকারের লংঘন।[২৫]

ইফতিরা ও সাধারণ মিথ্যার (কিযব) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইফতিরার সাথে জড়িত আছে অশুভ ইচ্ছা, যা হলো অপরের দুর্নাম রটনা করা, অথচ মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে সবসময় এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকে না।[২৬]

লেখা, সঙ্কেত বা প্রতীক অথবা ছবির আকারে পেশ করার বিষয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কিনা-তার মাধ্যমে নয় বরং তা কুরআনের পাপের কথার শ্রেণীভুক্ত

www.pathagar.com

কিনা-সে মানদণ্ডেই ইফতিরার যাচাই করা হয়।[২৭] যে কথা সংশ্লিষ্ট অপর কোন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে থাকে, তাই হলো 'পাপের ও কষ্টদায়ক কথা।' যে কথা এ শ্রেণীর মধ্যে পড়বে না-তা মানহানিকর বলে গণ্য হবে না এবং তা অবশ্যই সহ্য করতে হবে।

মানহানিকর বক্তব্য, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অভিযোগ হচ্ছে বাকস্বাধীনতার লংঘন, যা বদলা গ্রহণের (কিসাস) মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। যদি কিসাস প্রযোজ্য করা সম্ভব হয়; তাহলে নীতিগতভাবে তা প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এমনটি হয় না। তা'যিরের[২৮] নীতির অধীনে মানহানিকর বক্তব্যের জন্য শাস্তির বিধান করা হলে কোন বিচারক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কি হবে-তা নির্ধারণ করবেন। এর বিকল্প হিসেবে তা'যির বিল-মাল বা বাদীকে ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমেও শাস্তির বিধান করা যেতে পারে, তা অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণ, বাদীর সামাজিক মর্যাদা এবং সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত হতে হবে।[২৯]

মিথ্যা অপবাদদান বা মানহানিকর বক্তব্যের শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাদীকে অবশ্যই অনুরোধ জানাতে হবে, সে তা করতে ব্যর্থ হলে এ শাস্তি কার্যকর হবে না। 'কাযফ' বা 'ইফতিরা'র ঘটনার শিকার লোকটি যদি দুর্নীতি করার কারণে কুখ্যাতি অর্জন করে থাকে এবং সে যদি সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়, তাহলে অভিযোগকারী কোন শাস্তি পাবে না। উপরিউক্ত মানহানিকর বক্তব্য যদি সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয় এবং নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে; তাহলে "আল্লাহর অধিকারের" বিষয় অগ্রাধিকার পাবে। অন্যায়কারীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে এবং কেউই তার জন্য ক্ষমা মঞ্জুর করতে পারবে না।[৩০] বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান এমন ঘটনার ক্ষেত্রে অর্জিত শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণকালে সমাজের স্বার্থ (মাসলাহা), আচরণের ধরন ও অপরাধীর অবস্থা কেমন তা বিবেচনা করে থাকেন। মিথ্যা বক্তব্যের জন্য তা'যিরের মাধ্যমে শাস্তির যে বিধান রয়েছে, নীতিগতভাবে তা মিথ্যা অপবাদের (কাযফ) জন্য শাস্তি হাদ (নির্ধারিত শাস্তি) এর চেয়ে বেশি হবে না। অবশ্য এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেসব ফকিহ মনে করেন যে, তা'যিরের শাস্তি অপরাধের মাত্রা ও সমাজের স্বার্থের যথোপযুক্ত হতে হবে, তারাও শাস্তির পরিমাণ কাযফের হাদের অতিরিক্ত বা তার চেয়ে বেশি করার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেননি। তারা আরও মনে করেন যে, ইমাম বা বিচারক তার বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করে তাকে বেত্রাঘাতের মতো কঠিন শাস্তি অথবা অন্যকোন দণ্ড প্রদান করতে পারবেন।[৩১]

দায়ের করা অভিযোগ বা আচরণ সংক্রান্ত সকল ফৌজদারি অপরাধের ঘটনার তদন্ত ও প্রমাণ করা নীতিগতভাবে প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারোর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে চুরি বা খুনের মতো অপরাধ করার অভিযোগ আনা হল; কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি এধরনের অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হলনা, তবুও এ দাবির তদন্ত করতে হবে। অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ইফতারার অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। অবশ্য অভিযোগকারী স্পষ্টত: বাদির ক্ষতিসাধন অথবা তার ব্যক্তিগত সম্মান ও সুখ্যাতি ক্ষুণ্ন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৩২]

৫. অবমাননা *(সাব/শাতম)*

কোনো কথা, অভিব্যক্তি বা ভাবভঙ্গি যাকে উদ্দেশ করে করা হয়েছে তা যদি তার মর্যাদার ওপর আঘাত হানে এবং স্বদেশবাসীর কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাকে অবমাননা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন আইন বিষয়ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য সাব শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে এমন কোন শব্দ বা অভিব্যক্তির পুংখানুপুংখ তালিকা দেয়নি। এর পরিবর্তে আইনে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যাকে এ অপরাধের বিষয় মূল্যায়নের মূল লক্ষণ বা মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা হয়েছে। কতিপয় শব্দ ও অভিব্যক্তি সাধারণভাবে অবমাননাকর বলে পরিচিত হলেও অবমাননার শিকার ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা এবং শব্দ উচ্চারিত হবার প্রেক্ষিতসহ বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে ঘটনার সঠিক তাৎপর্য নিরূপণ করার প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত হয়ত থাকতে পারে। এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিইয়্যার অভিমত হল, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি শব্দ সাব বলে পরিগণিত হতে পারে; কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে তা হবে না, তাই পরিস্থিতির উল্লেখ ছাড়া ভাষা অথবা আইন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিতে পারবে বলে আশা করা যায় না।

অবমাননাকর শব্দসমূহ অবশ্যই পীড়াদায়ক হতে হবে; তবে সাব পর্যায়ে পড়ার জন্য তা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। অনুরূপভাবে উচ্চারিত কথার পিছনে কি কারণ রয়েছে, তাও বড় ধরনের তাৎপর্য বহন করে না; বিশেষ করে এসব শব্দ সাধারণ অবমাননার শব্দ যার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়।[৩৩]

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অবমাননার বিষয় অবশ্যই স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য এ অপরাধের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই; তবে তা'যিরের আওতায় প্রতিরোধমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই বিষয়টি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত, আদালত অপরাধের প্রকৃতি এবং কোন্ পরিস্থিতিতে তা সংঘটিত হয়েছিল; তা বিবেচনায় এনে শাস্তির ধরন ও মাত্রা

www.pathagar.com

নির্ধারণ করবেন। যখন কেবল আল্লাহতা'আলা ও তাঁর প্রেরীত নবী-রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে অবমাননাকর কথা বলা হয়; তখন তা ধর্ম অবমাননার মতো আরও বড় ধরনের অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে একে আলাদা একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন; যার শাস্তি সাধারণ অবমাননার চেয়ে কঠোর। আমি একটি পৃথক পরিচ্ছেদে ধর্ম অবমাননা সম্পর্কে আলোচনা করেছি বিধায়, এখানে সংক্ষেপে একথা বলতে চাই যে; অবমাননাকর কথা-তা মুসলিম বা অমুসলিম, নারী অথবা পুরুষ, যাকেই উদ্দেশ করে বলা হোক না কেন- তা'যিরের নীতির আওতায় তা শাস্তিযোগ্য। কৌতুহলের ব্যাপার হলো, কেবল কুরআনের (নিম্নলিখিত) আয়াতে সাব নিষিদ্ধের যে কথা বলা হয়েছে; তা অমুসলিমদের সঙ্গে অবমাননাকর কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে এর অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলমান-এর সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করা কোন অপরাধের বিষয় নয়।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .

> এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরই ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি দিও না। এমন যেন না হয় যে, এরা শিরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মূর্খতাবশত আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। (৬:১০৮)

কুরআনের মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে এমন সব ধরনের অবমাননাকর কথা বলতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যার প্রতিক্রিয়ায় বৈরিতার সৃষ্টি এবং কটুবাক্য উচ্চারণ করা হতে পারে। যার অবমাননা করা হলো তার ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার বিষয় এখানে গৌণ তথাপি আয়াতটিতে সুস্পষ্টভাবে কেবল অমুসলিমদের কথা বলা হয়েছে এবং ঈমানদারদের কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। তৎসত্ত্বেও যদি এ মন্তব্য করা হয় যে আসমানি কিতাবের অনুসারী বিশেষ করে ইহুদি ও খৃস্টান (আহলে কিতাব), মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক (যিম্মি) এবং প্রকৃতপক্ষে সকল অমুসলিমকে এভাবে ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হ্রাসের পদ্ধতি যা সাদৃশ্যের উচ্চক্রম (কিয়াস আল আউলা) বলে পরিচিত, তাতে একজন মুসলমানকে অবমাননা করা আরও অধিকমাত্রায় নিষিদ্ধ।[৩৪] অনুরূপভাবে কুরআন অমুসলিমদের ইসলামের দা'ওআত পেশের (আয়াত ২৬:১২৫ ও ২৯:৪৬) জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলেছে; উদ্বুদ্ধকরণ ও সুযুক্তি পেশের মাধ্যমেই এ দা'ওআত দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে অবমাননাকর ও অশ্রাব্য কথা বলার কোন অনুমতি নেই।

www.pathagar.com

একইভাবে বলা যায় যে, এমনকি খারাপ কাজ রোধের উপায় হিসেবেও অবমাননাকর ও কটু কথা বলা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি মুনকার এর পর্যায়ে পড়ে এমন কাজ রোধের চেষ্টা করে; তাহলে তাকে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে মিথ্যা, অবমাননাকর কথা ও গালিগালাজ মুক্ত কঠোর ভাষায় কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেবল এক্ষেত্রে তাকে অজ্ঞ (জাহেল) বোকা (আহম্মক) বা সীমালংঘনকারী (ফাসিক) এর মতো শব্দ প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৩৫] প্রশ্ন উঠতে পারে, দুস্কৃতি বা খারাপ আচরণের জন্য কুখ্যাত কোন ব্যক্তি, সে মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক না কেন, তাকে অভিশাপ দেয়া বা অবমাননা করা কি অনুমোদনযোগ্য? উপরন্তু দুর্নীতি বা অপকর্মের জন্য কোন পাপী ও দুষ্টলোকের ওপর যেমন, দুর্নীতিবাজের অভিযোগ আরোপ বা দুর্নাম করার অনুমতি কি নেই? উভয় প্রশ্নের উত্তর হল, না। এর প্রকৃত কারণ হল, এধরনের লোকদের অবমাননা করলে তারাও অন্যায়ভাবে পাল্টা আক্রমণ করতে পারে। বুখারী ও মুসলিম-উভয়েই হাদিসে একথাটি তুলে ধরেছেন:

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ
وَالِدَيْهِ، قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّه .

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য বড় গুনাহের কাজ হল পিতামাতার অবমাননা করা। (তার এ বক্তব্যে মনে প্রশ্নের উদ্রেক করলো) সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (স:) কোন ব্যক্তি কি কখনো তার পিতামাতাকে অবমাননা করতে পারে?' মহানবী সাঃ উত্তরে বললেন, '(হ্যাঁ) যখন সে অন্য কোন ব্যক্তির পিতা বা মাতাকে অবমাননা করে তখন সেও পাল্টা তাই করে।'[৩৬]

এ প্রতীকী গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক রীতিতে কুরআন মোমিনদের সম্বোধন করে নাযিলকৃত নিম্নের আয়াতে এ সম্পর্কিত মূলনীতি বিধৃত করেছে এভাবে:

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ .

'তোমরা পরস্পরের (আনফুসাকুম) দোষ তালাস করো না। অথবা একজন অপরজনকে অবমাননা করো না বা খারাপ নামে ডেকো না' (৪৯:১১)।

'দোষ ত্রুটি খোঁজা' ও 'খারাপ নামে ডাকা'র মাধ্যমে যে ব্যাপক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে; তা প্রায় সব ধরনের অপবাদ ও অবমাননার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। এ আয়াতের এক মন্তব্য প্রসঙ্গে আল মাকদিসি উল্লেখ করেন যে, কোন

www.pathagar.com

কোন অভিমত প্রকাশ অন্য ব্যক্তির দোষ প্রকাশ বলে মনে হলেও; তা এ আয়াতের আওতায় নাও পড়তে পারে। এভাবে কেউ যদি অবমাননা করার মানসিকতা ছাড়া শুধু চিহ্নিত করতে 'কানা' বা 'খোড়া' বলে; তাহলে তা অপবাদ দেয়া বা খারাপ নামে ডাকার মধ্যে পড়বে না।"[৩৭] একই আয়াতের পরবর্তী অংশে অন্যদেরকে উপহাস বা অপবাদ দিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-বাহি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলো আন্ত:সম্পর্কিত বিষয় এবং অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে উপহাস তার জন্য অবমাননাকর হতে পারে এবং কটুক্তি, মিথ্যা অপবাদ বা মানহানিকর ব্যাপারে পরিগণিত হতে পারে। এর কারণ অশোভনতা ও ঔদ্ধত্যপনা থেকে এধরনের সব উক্তির অবতারণা হয়।[৩৮] অতএব কুরআন সুন্নাহ'তে প্রদত্ত সাধারণ দিকনির্দেশনার আলোকে বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও আচরণের সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও মাত্রা নিরূপণ করবেন।

কুরআন অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সীমালংঘনমূলক আচরণ (তা'আদ্দি বা ই'তিদা) করাকে নিষিদ্ধ করেছে (২:১৯০); এবং কাউকে অসম্মান করা সুস্পষ্টভাবে এক ধরনের সীমা লংঘন। উপরন্তু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কোন মুসলমানকে অবমাননা করা হলো বড় ধরনের পাপ কাজ (ফুসূক) এবং তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া (কিতালুহু) অবিশ্বাসীর (কুফর) কাজ।'[৩৯]

وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰه لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ

স্পষ্টত এ হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অবমাননা সংঘাতের দিকে ধাবিত করে এবং সংঘর্ষ অবমাননার চেয়েও খারাপ। এখানে আচরণের গুরুত্বের বিষয়টি প্রমাণ করতে কুফর শব্দটি প্রতীকি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জীবিত ব্যক্তিদের অবমাননা করাকে নিষিদ্ধ করে যে বিধিবিধান রয়েছে; মৃত ব্যক্তিদের অবমাননা করার ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। রাসূল সাঃ জোরালো ভাষায় সুপারিশ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের ভাল গুণাবলিই স্মরণ করা উচিত; তাদের দোষত্রুটি নয়। এ ধরনের অবমাননা যে কতটা মারাত্মক তা সহজে বোধগম্য। কারণ; একজন মৃত ব্যক্তি তার চরিত্র ও সুনামের বিরুদ্ধে কোন অবমাননার বিষয় প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। তাই মহানবী সাঃ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন:

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وكفوا عن مساويهم .

'তোমরা তোমাদের মৃত স্বজনদের কেবল সৎ গুণের কথা উল্লেখ করবে এবং দোষত্রুটির বিষয় নিয়ে আলোচনা পরিহার করবে'।[৪০]

আরেকটি হাদিসে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

لاتَسُبُّوْا الامْوَاتَ فَتُؤْذُوْا بِهِ الاحْيَاءَ .

> 'মৃত ব্যক্তিদের গালি দেবে না; এরূপ করলে তোমরা তাদের জীবিত স্বজনদের মনে আঘাত দেবে।'[৪১]

এসব বিষয়কে মুমিন ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাসূল সাঃ অন্য এক হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, অন্যদেরকে অবমাননা করা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে কোন ব্যক্তির চরিত্র ও বিশ্বাসের বলিষ্ঠতার পরিচায়ক।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالسَّبَّابِ وَلا بِالطَّعَانِ وَلا بِاللَّعَّانِ .

> 'কোন মুমিন ব্যক্তি কাউকে গালি দেয় না, না কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয় বা অভিশাপ দেয়'।[৪২]

সাহাবীদের উদাহরণ উল্লেখ করে বলা যায় যে, রাসূল সাঃ তাঁদেরকে অত্যন্ত মহব্বত ও সম্মান করতেন। সাধারণভাবে হাদিস সাহিত্যের অর্থ ও মর্মের মাধ্যমে কেবল একথাটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়নি, আরও সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নের হাদিসে তা উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে সাহাবীদেরকে রাঃ গালি দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

لا تَسُبُّوْا اَصْحَابِى لاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ. فَوَ الَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ اَن اَحَدُكُمْ انفقا مِثْلَ اُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلا نِصنْفَهُ .

> আমার সাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না, আমার সাহাবীদেরকে অভিশাপ দিয়ো না। যাঁর মুষ্টিতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমাদের কারোর যদি ওহোদ পর্বত সমান স্বর্ণও থাকে, তারপরও সে আমার (আমার সাহাবীগণের) কারোর সমান, এমনকি অর্ধেক মর্যাদারও সমান হতে পারবে না।[৪৩]

সাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদার প্রতি রাসূল সাঃ যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তারই পারী প্রেক্ষিতে 'আলেমগণ' সাহাবীগণের অবমাননার (সাব আল-সাহাবি) বিষয়কে পৃথক অপবাদ হিসেবে গণ্য করেছেন; যার শাস্তির মাত্রার অবস্থান ধর্মাবমাননার কঠিন শাস্তির পরেই। তৎসত্ত্বেও, অধিকাংশ 'আলেম' এর মত অনুযায়ী; এ

www.pathagar.com

অপরাধের জন্য অনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক (তা'যির) শাস্তির বিধান রয়েছে। তাই কোন সাহাবীকে গালি দেয়ার মাত্রা বিবেচনা করে তদনুযায়ী শাস্তির বিধান করা হয়; যা সাব এর সাধারণ অপরাধের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক এর দৃষ্টিভঙ্গিতেই সাধারণ আলেমগণের অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে। ইমাম মালিক পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, যে শহরে রাসূল সাঃ এর সাহাবীগণকে বার বার গালি দেয়া হয়, কোন মুসলমানের সে শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত।[৪৪]

কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন লোককে সম্বোধন করে খারাপ কথা বলে পরিচিত কোন কথা একাধিকবার উচ্চারণ করে তাহলে তাকে একটি না একাধিক অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমনটি উপরে কাযফ এর শাস্তির ক্ষেত্রে উঠেছিল। ফকিহ্ ইবনে আবিদিন-এর মতে, তা'যিরের অধীনে অবমাননার প্রতিটি অপরাধের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তি হবে। কেননা অবমাননা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং এ ধরনের অধিকার লংঘনের শাস্তির মিশ্রণ (তাদাখুল) সম্ভব নয়। এ অপরাধের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি র (হাদ) বিধান নেই। হাদ আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট আর এ কারণে তা সংমিশ্রণ করা যেতে পারে। তবে মানুষের অধিকার লংঘনের কারণে প্রদত্ত তা'যিরের আওতায় প্রতিরোধমূলক শাস্তির মাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে, যেমনটি কাযফের নির্ধারিত শাস্তি (হাদ) কমিয়ে তা'যিরের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় যথাযথ প্রমাণের অভাবের কারণে। তা'যিরের আওতায় একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধসমূহ সংমিশ্রণের উপযুক্ত হলে এবং তা একটিমাত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৪৫]

অবমাননার বিষয় যদি কোন মুসলমানের ধর্ম সংক্রান্ত (দীন) হয়, তখন প্রশ্ন উঠে এধরনের অবমাননা অবিশ্বাসের (কুফুর) পর্যায়ে পড়ে কি-না। অধিকাংশের অভিমত হল, এটি তা হবে না, কেননা এর ব্যাখ্যায় সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। অবশ্য দূরবর্তী আরেকটি মতও রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, অবমাননার বিষয় হল ভিকটিমের ব্যক্তিগত চরিত্র সংশ্লিষ্ট, তার ধর্ম নয়।[৪৬]

৬. অভিসম্পাত *(লা'ন)*

অভিশাপ বা অভিসম্পাত (লা'ন বা লা'নাহ) হচ্ছে সাধারণত অননুমোদন বা অসন্তোষের প্রকাশ এবং অভিশাপের বস্তুর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধজনিত অমঙ্গল কামনা। প্রায়ই অভিশাপের কথা উচ্চারণ ও কোন ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রোষানল পতিত হোক, এমন আহ্বান জানিয়ে অভিসম্পাত দেয়া হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

অথবা কর্মবাচ্যেও এ অভিশাপ দেয়া হয়; যাতে সবসময় অভিশাপের বস্তু সুনির্দিষ্ট নয়। যেমন, 'তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।' 'সে অভিশাপের রোষানলে জ্বলে পুড়ে মরুক।'[৪৭] ইসলামের ইতিহাসে অভিসম্পাতের একটি ঘটনা জানা যায়। খাব্বাব রা. নামে রাসূল সাঃ এর এক সাহাবীকে নিয়ে এ ঘটনা। মক্কার কাফেররা খাব্বাবকে আটক করে ও তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয়। হত্যার ঠিক আগে তিনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো, "হে আল্লাহ তুমি এদের সংখ্যা গণনা করে রাখ, একে একে এদেরকে হত্যা কর। এদের কেউই যেন জীবিত থাকতে না পারে।"[৪৮]

কুরআন ও সুন্নাহতে অভিসম্পাত দানের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ হলো :

الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ الا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

------- আল্লাহতা'আলা সম্বন্ধে যারা মিথ্যা রচনা করে তাদের চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে;... যালেমদের উপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত' ।[১১:১৮];

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ

وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

'যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেন, (কিয়ামতের দিন) তিনি তাদের জন্য অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছেন।' (৩৩:৫৭)

وَيُفْسِدُوْنَ فِيْ الاَرْضِ اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

এবং (যারা) যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়; তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহ তা'আলার) অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে (আখেরাতের) নিকৃষ্ট আযাব'। [১৩:২৫)

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'আলেমগণ' যে সাধারণ নীতি গ্রহণ করেছেন, তাহলো পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনসহ কোন ব্যক্তিকেই, সে হোক জীবিত বা মৃত, অভিশাপ দিয়ে অবমাননা করা যাবে না। কুরআন-সুন্নাহতে যে সব লোককে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তাদেরকে অভিশাপ দেয়া অনুমোদনযোগ্য বলে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে; তবে তা করা থেকে বিরত থাকা কোন গুনাহের কাজ নয়।'[৫৯]

www.pathagar.com

একথা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মাকদিসি উল্লেখ করেন যে, মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়, কোন এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ কে পৌত্তলিকদের (মুশরিকূন) ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করার জন্য অনুরোধ জানান। জবাবে রাসূল সাঃ বলেন :

إنى لم ابعث لعانا إنما بعثت رحمة.

> 'অভিশাপ দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়নি। আমি কেবল রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৫০]

অত:পর আবুল হুসাইন আল বসরির (আল মু'তামাদ ফি উসূল আল ফিকহ্ গ্রন্থের রচয়িতা) উদ্ধৃতি দিয়ে আল মাকদিসি এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গ্রুপ হোক না কেন, অভিসম্পাত করা নিষিদ্ধ। আরও জানা গেছে যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মিথ্যা অপবাদদানকারী, চোর ও মদ্যপের মতো সীমালংঘনকারীদের অভিসম্পাত করা যাবে কি-না, জবাবে তিনি নীরব থাকার পরামর্শ দেন।[৫১]

কুরআন-সুন্নাহতে অভিশাপের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়ঃ কতিপয় সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়া কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তার 'মর্যাদার মারাত্মক লংঘন।' এর ব্যতিক্রম উদাহরণ হলোঃ ফেরাউন ও আবু জাহাল। এরা আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[৫২] এধরনের ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে নাম ধরে অভিশাপ দেয়া অবৈধ; যার আংশিক কারণ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন অমুসলমানও হতে পারেন, অমুসলিম ব্যক্তি হয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন, অনুরূপভাবে পাপী লোকটিও তওবা বা অনুশোচনা করতে পারে। একজন অবিশ্বাসীকে অভিশাপ দেয়া যদি অবৈধ হয়; তাহলে কোন সীমালংঘনকারী (ফাসিক) ও ধর্মের মধ্যে নতুন বিষয় উদ্ভাবনকারীর (মুবতাদি) ক্ষেত্রে তা আরও অধিক মাত্রায় অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।"[৫৩] তাই উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, এমনকি একজন অবিশ্বাসীকেও অভিশাপ দেয়া অবৈধ। অতএব অভিশাপ দান অবশ্যই পরিহার করতে হবে। ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে 'আলেমদের' মধ্যে অবশ্য মতপার্থক্য রয়েছে। কারবালার প্রান্তরে রাসূল সাঃ এর দৌহিত্র হুসাইন রাঃ ও তার সঙ্গীদের হত্যার হৃদয়বিদারক ট্রাজেডির মূল অপরাধী হলেন ইয়াযীদ। অনেক আলেম ইয়াযীদকে অভিসম্পাত করা অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করলেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তাঁর শিষ্য ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ ও অন্যরা ইয়াযীদকে অভিশাপ দানের ব্যাপারে নীরব থাকার উপদেশ দিয়েছেন।[৫৪]

www.pathagar.com

রাসূল সাঃ এর জীবদ্দশায় একজন মুসলমান ছিলেন যাকে নূয়াইমান বলে ডাকা হতো। (তার প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ছিল বলে জানা গেছে)। নূয়াইমান মদ খেতেন এবং হাস্যরসাত্মক স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি মদ পানের জন্য একাধিকবার শাস্তি পেয়েছিলেন। একথা জানতে পেরে একজন সাহাবী নূয়াইমানের আচরণের নিন্দা করেন এবং তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, 'বার বার পদস্খলনের জন্য তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ পড়ে।' এ ঘটনায় রাসূল সাঃ নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি নূয়াইমানের অন্যান্য গুণেরই বিবেচনা করেছেন এবং এ ত্রুটিকে বড় করে দেখেননি:

لاتَكُنْ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى اَخِيْكَ لاتَقُلْ هذَا فَاِنَّهُ يَحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ .

> তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের মিত্রে পরিণত হয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তার ভালবাসার কথা ভেবে একথা বলবে না। (নূইয়ামানকে অভিশাপ দিয়ো না)[৫৫]

অপর এক বর্ণনায় হাদিসটির শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আমি কেবল একথাই জানি যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।' উভয় হাদিসে এ নীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে এমনকি কোন অপরাধীকেও অভিশাপ দেয়া বা অবমাননা করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খারাপ আচরণের জন্য দণ্ডিত হয়েছিল কিনা-সেটাও এক্ষেত্রে কোন বিবেচ্য বিষয় হবে না।[৫৬] আলেমগণ সাধারণভাবে এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন যে, কোন অপরাধীর অশোভন বা পাপ কাজের জন্য নিন্দা জানাতে হবে তার দোষের কথা উল্লেখ করে, সুনির্দিষ্টভাবে নাম ধরে নয়।[৫৭]

এমনকি কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে অভিশাপ দেয়াকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল সাঃ এর সামনে এক ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিল। রাসূল সাঃ তাকে বললেন :

لاتَلْعَنِ الرِّيْحَ فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَاِنَّه مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

> বাতাসকে অভিশাপ দিয়ো না-এর কর্মতো নির্ধারিত (সে তার পথে চলছে)। যখন কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন কিছুকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশাপ তার ওপরই ফিরে আসে।[৫৮]

সর্বশেষ কথা হল, কোন সময় গালি, অবমাননা বা অভিশাপ দেয়ার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়ে পড়লে; তা অবশ্যই সংযমের সীমার মধ্যেই হতে হবে। একদল ইহুদি প্রসঙ্গে আল-বুখারি ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে এ বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একদল ইহুদি রাসূল সাঃ এর সঙ্গে দেখা করতে এলো, তারা তাঁকে সালাম দিল বিকৃত বাক্যে, যার অর্থ দাড়ায় 'আপনার যেন মরণ হয়, (আল-সাম 'আলাইকুম)' তারা ইসলামে সুপরিচিত সালামের বাক্য 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (আল-সালাম 'আলাইকুম') এর পরিবর্তে এ কথা বলে। রাসূলের সাঃ পত্নী আয়েশা রাঃ এর জবাবে বললেন, 'তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিশাপ বর্ষিত হোক। (আল সাম আলাইকুম ওয়াললানাহ)'। একথা শুনে রাসূল সাঃ তার পত্নীকে বললেন, 'হে আয়েশা! মহান আল্লাহতা'আলা বিনয় ও নম্রতা পছন্দ করেন।' এর জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, 'ওরা কি বলেছে, আপনি কি তা শুনতে পাননি?' তখন রাসূল সাঃ বললেন, 'হ্যাঁ, তবে তুমি শুধু এতটুকুই বলতে পার এবং তোমার উপরও (ওয়া আলাইকুম)।'[৫৯]

ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হচ্ছে ভদ্রতা (আল রিফ্ক) ও সংযমশীলতা; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ বার বার যার সুপারিশ করেছেন। এগুলো হচ্ছে অবমাননা ও অভিশাপের যথার্থ প্রতিরোধক। তারা (মুসলমানরা) যাই করুক না কেন তা প্রতিবারই অত্যন্ত সুশোভন ও সুন্দরভাবে করে থাকে। ইসলাম ভদ্রতা-সৌজন্য ও সংযমশীলতার কোন সীমারেখা টেনে দেয়নি।

৭. কোন মুসলমানকে অবিশ্বাসী বলা *(তাকফির আল-মুসলিম)*

শরিয়ত কোন মুসলমানকে ওপর অবিশ্বাসী বা কাফের, ধর্মের প্রতি কটাক্ষকারী অথবা বিভ্রান্ত ব্যক্তি, ইত্যাদি দোষারোপ করতে নিষিদ্ধ করেছে। এটি হচ্ছে সাধারণ নীতি। এমনকি একজন অপরজনকে অবিশ্বাসী (কাফের) বলে সন্দেহ করার ক্ষেত্রেও; এ বিধান প্রযোজ্য হবে। একইভাবে কোন মুমিন ব্যক্তি যদি দেখতে পান যে, তার মতই একজন মুসলমান এমন কথা উচ্চারণ বা কাজ করেছে যাতে মনে হবে যে সে হয়ত কাফের হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই সন্দেহের সুবিধা দিতে হবে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই তাকে কাফের বলা যাবে না। লোকদের অবিশ্বাসী বা পৌত্তলিক বলা পরিহার করার প্রতি দৃঢ় সমর্থন পাওয়া গেছে উপরোক্ত ঘটনায়। এ কারণেই আমি এখানে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ধরনের দোষারোপ দৃঢ় ভাষায় নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক হাদিস থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি এতই

www.pathagar.com

স্পর্শকাতর ও জটিল যে, কেবল ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী কোন বিচারক অথবা ফিকহ্ বিশারদই (মুফতি) কোন্ জিনিসটি সঠিকার্থে অবিশ্বাস করা বুঝায় তা নিরূপণ করার কর্তৃত্বের অধিকারী।

যদি কোনো মুসলমান এমন কথা বলে বা এমন কাজ করে, যার কুফরির পর্যায়ে পড়ার কেবল একটা সম্ভাবনা থাকে তা হলেও তাকে ধর্মত্যাগী বা অবিশ্বাসী বলা যাবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন কথার যদি শতকরা নিরানব্বই ভাগই অবিশ্বাসের বোঝায় এবং মাত্র একভাগ বিশ্বাস (ঈমান) অবশিষ্ট থাকে-তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। একই দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ উল্লেখ করে আবু জাহরাহ আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এমন এক পরিস্থিতিতে কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে; তা অবিশ্বাসের বলে মনে হতে পারে। যেমন যে প্রেক্ষাপটে কথাটি বলা হয়েছে অথবা যে উৎস থেকে দৃষ্টিভঙ্গিটির উৎপত্তি হয়েছে, তাতে যদি সন্দেহজনক ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে; তাহলে তার কুফরির পর্যায়ে পড়ার বিষয় বাতিল হয়ে যাবে। এধরনের সব ঘটনাকে সন্দেহের সুবিধা প্রদান করা উচিত। এধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব এর শাসনামলে খারিজিরা বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং রাসূল সাঃ এর নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত 'কুফরির' অভিযোগ করে। খারেজিদেরকে সীমালংঘনকারী হিসেবে গণ্য করা সত্ত্বেও, কোন সময়ই খলিফা তাদেরকে অবিশ্বাসী (কাফের) বলে ঘোষণা করেননি, এর পরিবর্তে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধান করে কিন্তু ভুল করে, সে আর যে ব্যক্তি মিথ্যার সন্ধান করে এবং এরপর তা কার্যকর করতে অগ্রসর হয়, তারা কখনো এক রকম নয়।[৬০]

ইবনে হাযম নিম্নে আরও পরিষ্কারভাবে এ মূল নীতির উল্লেখ করেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের (কালিমা আল-শাহাদা) সাক্ষ্য দেবে; এবং নবী মুহাম্মদ সাঃ এর নীতি ও আদর্শের প্রতি তার বিশ্বাসের ঘোষণা দেবে; সে একজন মুসলমান এবং অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা তাকে অবিশ্বাসী বলে গণ্য না করা পর্যন্ত কোন ধরনের অভিযোগ আরোপ করে ইসলামের সঙ্গে তার এ সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না।[৬১]

একটি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে পরিচিত হলে; সে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ মর্যাদার অধিকারী হবে বলে মনে করতে হবে। কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে মুসলমান অথবা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান বলে পরিচিত হয়, এতে তার, এ মর্যাদার সৃষ্টি হয়, আইনের বিধি অনুযায়ী সন্দেহবশত তার এ মর্যাদা বাতিল করা যাবে না বরং তা স্থায়ীভাবে বজায় থাকবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে: সন্দেহ, সংশয় পোষণ বা অভিযোগের

www.pathagar.com

কারণে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় মর্যাদার বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা বা তা বাতিল করা যাবে না।[৬২]

'আলেমগণ' ও চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে: নিছক মতপার্থক্যের কারণে কাউকে অবিশ্বাসী বা কাফের বলা জায়েয বা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করে কাফের ঘোষণা করা যাবে না। আল বাহনাসাবি এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, 'কারণ এ বিষয়টি নির্ধারণ করা একান্তভাবে একজন উপযুক্ত বিচারকের কাজ; তাই কাউকে অবিশ্বাসী ঘোষণা করার কোন অনুমতি কোন অবিজ্ঞ ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি।' এ মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয় : দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ইবনে খাত্তাবের শাসনামলে ইবনে মাজ'উন নামে পরিচিত এক ব্যক্তি ইসলামে মদ্যপানের অনুমতি রয়েছে বলে একটি বিবৃতি প্রদান করে। খলিফা অবশ্য এজন্য তাকে কাফের ঘোষণা না করে বললেন যে, এ ব্যাপারে কোন রায় ঘোষণার আগে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণসহ যাচাই করা প্রয়োজন।[৬৩]

সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তির বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকৃতিগতভাবে দ্ব্যর্থহীন, সুস্পষ্ট ও পরিস্কার প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে, কোন গোপন চিন্তা বা অনুভূতির উল্লে-খের কারণে নয়, কারণ তা কেবল আল্লাহই জানেন। এটি হলো কুরআনের আয়াতের মর্মবাণী, যাতে মুমিনদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে :

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا .

> "তোমাদেরকে যারা শান্তির (আল সালাম) সম্ভাষণ জানায়, তাদেরকে একথা বলো না : তোমরা তো মুমিন নও।"

কেবল সালাম শব্দটি উচ্চারণ যদি কোন ব্যক্তির মুমিন হওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে; তাহলে এটি স্পষ্ট যে, কুরআন কোন ব্যক্তির ইসলামি মর্যাদা নিরূপণের জন্য কোন ধরনের প্রমাণপঞ্জি সংগ্রহের অনুমতি দেয়নি। কুরআনের এ মূলনীতির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নের এ হাদিসে :

مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَالَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا.

> 'যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামায পড়বে, আমাদের কিবলা যে দিকে তার কিবলাও সেদিকে, অথবা আমরা যা যবাহ করি সে তা খায়, তা হলে সে

একজন মুসলমান। আমাদের যেসব অধিকার ও দায়দায়িত্ব রয়েছে তারও তা থাকবে।'[৬৪]

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মূলভিত্তি হলো ঈমানের ঐক্য, এ কারণে রাসূল সাঃ মুমিনদেরকে পরস্পরকে কাফের বলে অভিযুক্ত না করতে সতর্ক করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

إذا قَالَ الرَّجل لاخِيْهِ يَا كَافِرُ فقدْ بَاءَبِهِ احَدُهُمَا فَإنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجعَتْ عَلَيْهِ

'যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে 'কাফের' বলে অভিহিত করে, তখন তাদের যেকোন একজনের ওপর এ অভিযোগ বর্তাবে। হয় বিষয়টি যেভাবে বলেছে সে রকমই হবে অথবা (অভিযোগ যদি সত্য না হয় তাহলে) উচ্চারণকারীর ওপরই তা বর্তাবে।'[৬৫]

আবুযার গিফারি রাঃ থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে :

مَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ او قَالَ : عَدُوُّ الله ولَيْسَ كَذٰلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيه (اىْ رَجَعَ عَلَيْه).

'কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফের বা আল্লাহর "দুশমন" বলে অভিযুক্ত করলো, অথচ এটি সত্য নয়, তাহলে ঐ অভিযোগ তার ওপরই বর্তাবে।'[৬৬]

উপরোক্ত হাদিসসমূহের বার্তা কেবল কোন ব্যক্তিকে তাকফির বলা নিষিদ্ধের মধ্যেই সীমিত থাকেনি; উপরন্ত তা সীমালংঘন বা গোনাহ (ফিস্ক) এবং অপরের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপরাধ ও গোনাহের অভিযোগ আরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তাই কোন মুসলমান কর্তৃক অপর কাউকে ফিস্ক এর অভিযোগ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরেকটি হাদিসে ব্যাপকার্থে একথা ঘোষণা করা হয়েছে :

لا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلا بِالفِسْقِ اَو الكُفر اِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ .

'কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে সীমালংঘনকারী (ফিস্ক) বা অবিশ্বাসী (কাফের) বলে অভিযুক্ত করবে না এবং তার অভিযোগের দাবি অনুযায়ী সে যদি অনুরূপ না হয়, তাহলে, তার দায় তাকেই বহন করতে হবে।'[৬৭]

হাদিস বিশারদ আবু জাহরাহ এ প্রসঙ্গে এক মন্তব্যে বলেন, কোন ব্যক্তি সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিকে ধর্ম অবমাননাকারী, মুরতাদ, কাফের ও ফাসিক

www.pathagar.com

বলে অভিযুক্ত করতে পারবে না এবং কেউ এরূপ করলে তাকেই অভিযোগের দায়ভার বহন করতে হবে। এর সুস্পষ্ট অর্থ যা আবু জাহরাহ উল্লেখ করেছেন, তা হলো 'অভিযোগকারী মিথ্যা বললে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।'[৬৮]

ইসলামে কাউকে কাফের বা তাকাফির বলা হলো মারাত্মক গুনাহের কাজ এবং অপরাধ। তাই কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট ভাষায় কাফের বলে অভিযুক্ত করলে অথবা এমন অভিযোগ করলো যার অর্থ কাফের বলা বোঝায়: তাহলে তাকে তা'যিরের অধীনে প্রতিরোধমূলক দণ্ড ভোগ করতে হবে এবং একজন উপযুক্ত বিচারক সে শাস্তি নির্ধারণ করবেন।[৬৯]

মিশরীয় দৈনিক আল আহরামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে (৮-১২-১৯৮১, পৃষ্ঠা,

৩. মিশরের মুফতি একজন মুসলমানকে কাফের বলার ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন :

ক. কোন মুসলমান যদি একটি গোনাহের কাজ করে এমনকি, তা যদি বড় গুনাহের কাজও হয়, তা হলেও তাকে কাফের বলা হবে অবৈধ।

খ. কোন বিজ্ঞ আলেম যিনি ধর্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞান (উলূম আল-দীন) সম্পর্কে পারদর্শী তিনিই কেবল কোন ব্যক্তি কাফের বা ফাসেক হবে কিনা-তা ঘোষণার চেষ্টা করার অধিকারী হবেন।[৭০]

বিষয়টি জটিলতা হবার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে ফকিহ ও ধর্মতাত্ত্বিকগণ অস্বাভাবিক ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত ও বিবৃতি দিয়েছেন। আবু জাহরাহ বিষয়টি সুরাহার জন্য নিয়মিত বিচার ব্যবস্থার অধীনে একটি পৃথক বিচার সংক্রান্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছেন এবং যিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হবেন তিনি ধর্মত্যাগ, ধর্মের অবমাননা ও অবিশ্বাসের মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনায় বিশেষ কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন। কি ধরনের কথা উচ্চারণ ও কাজ করলে তা অবিশ্বাস, ধর্মের অবমাননা বা ধর্মত্যাগ করা বুঝাবে; তা নিরূপণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে এ ধরনের সৃষ্ট আদালতের ওপর। তাই তড়িঘড়ি করে অপর ব্যক্তিকে অবিশ্বাসীর দোষারোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই পরিহার করা উচিত।[৭১]

কোন ব্যক্তি যদি কাউকে অবিশ্বাসী, ধর্মের ক্ষেত্রে নবোদ্ভাবনকারী বা ধর্মত্যাগকারী- ইত্যাদি বলে সন্দেহ করে তাহলে তার জন্য প্রধান করণীয় হবে কুরআনের হিসবাহ'র নীতির সত্যিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে সদুপদেশ প্রদান করা। কোন ব্যক্তি নবোদ্ভাবন বা অবিশ্বাসের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে দেখতে পেলে তার; কর্তব্য হবে সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ

www.pathagar.com

করে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা। আল বাহনাসাবি এব্যাপারে উপসংহারে লিখেছেন, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিচার ছাড়া অবিশ্বাস, ধর্মের অবমাননা বা ধর্মত্যাগের ব্যাপারে নিছক সন্দেহ অথবা অভিযোগের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন বা তাকে দুর্দশার শিকারে পরিণত করা যাবে না।[৭২]

৮. বিদ্রোহ *(ফিৎনা)*

ক. অর্থ ও সংজ্ঞা

অভিধানে ফিৎনা'র বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, যেমন : প্রলুব্ধকরণ, চরম জ্বালাতন, উত্তেজনাকর আন্দোলন, প্ররোচণাদান, বিদ্রোহ, উৎপীড়ন, নির্যাতন ও ঝগড়া-বিবাদ।[৭৩] এ ধরনের নানা অর্থবোধক হওয়ার কারণে কিছুটা অস্পষ্টতার অবকাশ রয়েছে, যা শব্দটির বিচার সংক্রান্ত অর্থের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। ফিৎনা ও এর বহু অর্থবোধক বৈশিষ্ট্যের বিষয় কুরআনের অন্ত:ত ৬০ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর কিতাব আল ফিতান শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে ৮৬টি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে কুরআন ও হাদিস উভয় ক্ষেত্রে ফিৎনার প্রসঙ্গ নানা প্রেক্ষাপটে এসেছে এবং নানা অর্থ প্রকাশ করেছে, যা একই ধরনের বা সমর্থক। ফিৎনার বিচার সংক্রান্ত অর্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্রোহাত্মক বক্তব্য দান। মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাতে; কোন বৈধ সরকারের বৈধতাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ফিৎনার অনুরূপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল, কোন ব্যক্তির ধর্ম পালনের অধিকারকে অস্বীকার করা- ফিৎনার এ অর্থ কুরআনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।[৭৪] আমি পরবর্তী সময়ে ফিৎনার এ দুটি অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি এখন ফিৎনার অন্য কয়েকটি অর্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাই। গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ধারণার প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনে প্ররোচনাদান বা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রসঙ্গে ফিৎনার বিষয় এসেছে। এর উদাহরণ নিম্নের আয়াত দু'টিতে দেখা যায় :

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

> 'মনে রেখ, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হল একটি পরীক্ষার (ফিৎনা) বস্তু এবং আল্লাহর হাতেই রয়েছে অসীম পুরস্কার।' (৮:২৮,৬৪:১৫)

www.pathagar.com

এখানে মানবজাতিকে ধন সম্পদ ও সন্তানদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যা কোন ব্যক্তিকে পাপের কাজে জড়িত হতে প্ররোচিত করতে পারে।[৭৫]

কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু গ্রহণ বা অস্বীকার করা কঠিন, এমন পরীক্ষা করা বুঝাতেও; কুরআনে ফিৎনা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফিৎনার অর্থ হলো কোন ব্যক্তির কোন কাজ, বিবৃতি বা বিশ্বাস গ্রহণ বা বর্জনে বাধ্য করার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট দুরবস্থা প্রকাশের অধিকার প্রদান করা। এর একটি উদাহরণ হল, মহান আল্লাহতা'আলা পরীক্ষার (ফিৎনা) অনুপাতে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কে পরীক্ষা করে থাকেন : আমরা তাদের (ঈমানদারদের) পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি, আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক' (২৯:৩)। (আরও দেখুন, ৯:৪৯ ও ৪৪:১৭)

কুরআনে ফিৎনার আরেকটি অর্থ হল: শিরক বা আল্লাহর সঙ্গে অংশিদারিত্ব বা শরিক করা। মুফাসসিরগণ নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নের আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ .

তাদের (অবিশ্বাসীদের) বিরুদ্ধে লড়াই কর; যতক্ষণ ফিৎনার অবসান না ঘটে এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (৮:৩৯)।

ইবনে আব্বাসের রাঃ উদ্ধৃতি দিয়ে এক তাফসিরে বলা হয়, এ আয়াতে ফিৎনার অর্থ হল 'অবিশ্বাস' (শিরক)। ইবনে কাসির ও শীর্ষস্থানীয় মুফাসসিরে কুরআন এর অধিকাংশ এ অর্থকে সমুন্নত করেছেন। এ অর্থে আয়াতটির অর্থ হবে : 'শিরক' ও সকল মিথ্যা ধর্মের অবসান না ঘটা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' আল আলুসি অবশ্য এর থেকে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এ আয়াতে ফিৎনার সঠিক অর্থ হবে আগ্রাসন, যার লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা নস্যাৎ করা।'[৭৭] একই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কায়িম আল জাওযিয়াহ উল্লেখ করেন যে, এ আয়াতে ফিৎনা শব্দটিতে ধর্মের সমগ্র দিকের (দীন কুল্লুহ) বৈপরীত্য বুঝানো হয়েছে, এ আয়াতের শেষাংশে এ পরিভাষা প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে ফিৎনা যে ধর্মের ধ্বংস সাধন করে; সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মুফাসসিরগণ ফিৎনাকে কেন 'কুফরি' বলেছেন, তার ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যেতে পারে।[৭৮]

www.pathagar.com

কুরআনে ফিৎনার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক দিকটি হল ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন : তা মৌখিক বা বাস্তব-উভয় ধরনের হতে পারে. এতে ঈমানদারের ধর্ম অনুসরণ ও পালনের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এর উদাহরণ রয়েছে :

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

'এবং তোমরা তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার কর, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। আগ্রাসন (ফিৎনা) হত্যার চেয়েও মারাত্মক।' (২:১৯১)

এ আয়াতের আলোচ্য বিষয় হল ধর্মের ক্ষেত্রে ফিৎনা। (ফিৎনা ফিল দীন), এ ফিৎনা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ধবংস করে দেয়। ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে কাফেররা নানা ধরনের বৈরি আচরণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্ম পালনে বাধা দান করতো. এ বৈরি আচরণের মধ্যে ছিল মুসলামানদের ওপর যুলুম নির্যাতন চালান, বাড়ি ঘর থেকে বহিষ্কার করা এবং সম্পদ জবর দখল করা। [৭৯] আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ফিৎনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে সেসময় লোকদের হাতে নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি, এমন মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে। তারা হয় তাকে হত্যা করেছে অথবা তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, ইসলাম শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত (এটাই রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।)'[৮০]

রশিদ রিযা সামান্য ভিন্নভাবে এ কথাই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রতারকচক্র (মুনাফিকুন) ওহুদ ও তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে জিহাদে অংশ নিতে নিষেধ করার মাধ্যমে ফিৎনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। ওহুদ যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুসলিম বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে পিছনে অবস্থান করতে রাযি করাতে সমর্থ হয়েছিল। আধুনিক যুগে এ ধরনের ফিৎনার ঘটনা প্রসঙ্গে রশিদ রিযা বলেন, মুসলমানদের মধ্যে অমুসলমানদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও অনুরূপ ফিৎনা, এক্ষেত্রে অমুসলমানরা মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে দুর্বলচেতা ও অজ্ঞ লোকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে ও কুফরির পথে চালিত করতে প্রলুব্ধ করে।[৮১] হাদিস শাস্ত্রে 'ফিৎনা' (বহুবচন, ফিতান) শব্দটি যুদ্ধ ও সাধারণ সামাজিক আন্দোলন বুঝাতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; তবে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রবল আন্দোলন বুঝাতেও এ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে আমরা আল ফিতান শিরোনামে প্রধান প্রধান হাদিস গ্রন্থের একটি অধ্যায় থাকবে বলে প্রত্যাশা করতে

পারি। এ অর্থে ফিতান হলো বিভ্রান্ত শাসকদের যুলুমের থেকে উদ্ভূত অবস্থা যা মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা ও সংশয়ের পথ প্রশস্ত করে। হাদিস সাহিত্যে ফিৎনার অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, বৈধ সরকারের কর্তৃত্বকে খেয়ালের বশে চ্যালেঞ্জ করা এবং ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সমাজে সৃষ্ট চরম দুর্ভোগ কর পরিস্থিতি। মুসলমানেরা যদি পূর্ণ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদেরকে সর্বোত্তম যে পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা হল, বিশৃঙ্খলার উৎস থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা।[৮২]

মত প্রকাশের স্বাধীনতা মুসলমানদেরকে ইসলামের নীতির লংঘন করে দুর্নীতির বিস্তারকারী কোন অশুভ প্রভাবে বশীভূত হয়ে থাকার অনুমতি দেয়নি। আক্রমণাত্মক বক্তৃতা বা আচরণ-শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে চার খলিফার দৃষ্টান্তের আলোকে তা যদি সুস্পষ্ট অবিশ্বাসের (কুফর সারিহ) পর্যায়ে না পড়ে তাহলে এ শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হবে না। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য জোর জবরদস্তির মাধ্যমে ধর্ম গ্রহণ করানোকে যেমন নিষিদ্ধ করেছে; তেমনি তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা অস্বীকারকারীদের আগ্রাসনের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এ অর্থে ফিৎনা হচ্ছে, ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং তা কোন বৈধ ধারণা ও স্বাধীনতার কোন ক্যাটাগরির অধীনেই কোনরূপ বৈধতা পাবার দাবি করতে পারে না।[৮৩]

বিদ্রোহাত্মক ফিৎনা হলো রাজনৈতিক অর্থবোধক ফিৎনা, যা মত প্রকাশের স্বাধীনতার লংঘন। এতে বৈধ সরকারের বৈধতা হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সমাজের স্বাভাবিক শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার পথ প্রশস্ত হতে পারে। ফিৎনার দৃশ্যত অবিতর্কিত তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বাস্তব পরিণাম সমস্যাসংকুল হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ফিৎনার সংজ্ঞা প্রদান ও বিরোধপূর্ণ মূল্যবোধের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন ফিৎনা বৈধ সরকারের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে; কিন্তু কোন সরকারের বৈধতা সবসময়ই স্বত:সিদ্ধ নয়। অনেক স্বঘোষিত নেতা ও সরকারের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন আফগানিস্তানে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর সাবেক সরকার।[৮৬] এ সরকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (ফিৎনা) ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে বহু লোককে কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড দেয়। উপরন্তু কোন কথা বা কাজ স্বাভাবিক শান্তি -শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে অথবা পারার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেই কেবল তা বিদ্রোহ (ফিৎনা) সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা হবে। কোন বিচ্ছিন্ন

কাজ বা অভিমতের যদি কোন কার্যকরিতা না থাকে এবং তা বৈধ সরকারের প্রতি কোন ধরনের বিরোধিতায় ইন্ধন যোগাতে না পারে, তা হলে তা ফিৎনার পর্যায়ে পড়বে না।

মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহের আইনের একটি অভিন্ন দিক হলো: বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আইনি বিধিনিষেধ। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিষয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্ত করে এমন বিদ্রোহের ঘটনা গণতন্ত্র চর্চার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক বেশি ও ঘন ঘন ঘটে থাকে। অপরদিকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের পঙ্কিলতার যে সমস্যার সম্মুখীন; তা সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

যেসব কথা ও কাজ জনগণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করতে পারে: তাও বিদ্রোহাত্মক ফিৎনা। সত্যিকার অর্থে তা সঠিক কি অন্যায়; তা পরস্পর থেকে পৃথক করে দেখানো যায় না। এতে অনুধাবনের অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয় এবং জনগণের মনকে এতোটা আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, তা আর সত্যের পক্ষাবলম্বনে সক্ষম হয় না।[৮৫]

সুন্নাহতে সমাজের সত্যপন্থীদের (আহল আল-আদল) মধ্যে ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে বৈধভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা। শাসন ক্ষমতার পালাবদলের ঘটনার সঙ্গে বিশেষ করে বিদ্রোহাত্মক ফিৎনার একটি স্পর্শকাতর সম্পর্ক রয়েছে। যথাযথ নিয়মে কোন নেতা নির্বাচিত হলে এবং জনগণ তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার (বা'ইআত) প্রকাশ করার মাধ্যমে তার নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত অথবা তার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টাকারীকে হাদিসে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে।[৮৬] অবশ্য এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করলে আমরা আমাদের মূল বিষয় বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফিৎনার প্রসঙ্গ থেকে সরে যাব।

খ. ঐতিহাসিক উদাহরণ

ইসলামি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ফিৎনার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিককে পুরোপুরি আলাদা করা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্র ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত এবং এসম্পর্ক তাৎপর্যের দিক থেকে বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান ও সংস্কৃতির বিবেচনায় অনেক বেশি গভীর। তাই যখন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নীতিকে হামলা ও নাশকতার টার্গেটে পরিণত করা হয়; তখন স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির ওপর হুমকি দেখা দেয়।[৮৭]

আবু জাহরাহ খারিজিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেন, 'তারা ইসলাম সম্পর্কে ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি প্রচার করেছিল, সত্য বা জ্ঞানান্বেষণের লক্ষ্যে মত প্রকাশের বৈধ স্বাধীনতার চর্চা করেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ধ্বংস সাধন ও অবমাননা করা এবং তাদের এ তৎপরতা সমাজে অনৈক্যের হুমকি সৃষ্টি করেছিল। খারিজিরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল এবং নবীন ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের ছিল।[৮৯] আমি পরে খারিজিদের বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো; তবে এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ফিৎনা সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই। একটি চুরির ঘটনার বিচার করছিলেন.খলিফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব রাঃ। তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন এ অপরাধ করলে?' চোর উত্তরে বললে। 'আল্লাহ ইচ্ছে করেছিলেন, তাই।' খলিফা বিভ্রান্তিকর জবাব দানের কারণে তাকে চুরির জন্য নির্ধারিত শাস্তির অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। আবু জাহরাহ একে কু ধারণার ব্যাখ্যা (সু আল তাবিল) বলে বর্ণনা করেন। অনুরূপ আর একটি বর্ণনায় বলা হয়, 'উমার রাঃ একদল মদ্যপকে সু আল তাবিলের শাস্তি হিসেবে চাবুক মারেন। ঐ ব্যক্তিদের অপরাধ তদন্তকালে তিনি এ দণ্ড দেন। অভিযুক্তরা কেন মদ পান করেছে, সে প্রশ্নের মোকাবেলা করার চেষ্টা করে এবং তারা কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছিল, যা সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভাষাশৈলী এমন যে তাকে বাধাহীন পানাহার বৈধ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (৫:৯৩)। আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহভীরু বা মুত্তাকীদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যতদিন সঠিক পথের উপর অটল থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাদের খুশি মতো পানাহার করতে পারবে। অপরাধীরা কুরআনের এ আয়াতের সাধারণ শব্দকে তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট নিষিদ্ধের বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেবার চেষ্টা করেছিল অথচ কুরআনের অন্যত্র মদ পান যে নিষিদ্ধ, সে কথা বর্ণিত হয়েছে (৫:৯০)। খলিফা সংক্ষেপে জবাব দেন, 'তোমরা যদি ধর্মভীরু লোক হতে; তাহলে মদ পান পরিহার করতে।' এ বিবরণ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, খলিফা ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের কেবল হাল্কা শাস্তি দিয়েছিলেন; কারণ ঘটনাক্রমে এ অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং তারা কৃত অপরাধের পক্ষে সাফাইয়ের চেষ্টা করেছিল। তবে কুরআনের এ সম্মত অর্থ চ্যালেঞ্জ করে লোকদের কাছে বক্তব্য পেশের কোন চেষ্টা করেনি।[৯০]

ফিৎনা প্রসঙ্গে আলোচনার সময় লেখকগণ প্রখ্যাত সাহাবী আবুযার গিফারী রাঃ সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আবুযার রাঃ লোকদের সোনা-রূপা মজুদ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা প্রচার করেন এবং তা অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি খলিফা উসমান রাঃ এর শাসনামলের সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণের সমালোচনা করেন এবং নিয়ম ও দৃষ্টান্তের পরিপন্থী অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিদ'আহর আশ্রয় নিয়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে নিজেদের বিত্তবৈভবের প্রদর্শনীর জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করেন। আবুযার গিফারীর মতে, 'কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করলে তার হৃদয়ে ঈমানের আলো নিভে যায় এবং তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।' সিরিয়ার তৎকালীন গভর্নর মু'আবিয়া রাঃ 'ফিৎনা' রোধের লক্ষ্যে প্রথমে তাকে মদিনায় নির্বাসনে পাঠান। পরে তিনি তাকে মদিনা থেকে নগরীর উপকণ্ঠের একস্থানে প্রেরণ করেন।[৯১]

আমার মতে, এ ঘটনার মধ্যে দাবী অনুযায়ী ফিৎনা বা এমনকি সম্ভাব্য ফিৎনা সৃষ্টির মতো কিছুই ছিলনা। এতে উসমান রাঃ এর খেলাফতের সময়ে অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, যাতে আবুযার গিফারির দৃষ্টিভঙ্গিকে বিদ্রোহাত্মক বিষয় বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়, তবে তার দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্যকে খণ্ডন করা সম্ভব ছিলনা বলেই তাকে হয়ত কেবল ফিৎনা বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়। আবুযার তার মতের সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করেন :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'যারা সোনারূপা মজুদ করে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না; তাদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও।' (৯:৩৪)।

খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ এর শাসনামলে আরেক ধরনের ফিৎনার উদ্ভব ঘটেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার অনুসারীরা আলী রাঃ এর ওপর "দেবত্ব" আরোপ করে দাবি করে যে, তিনি আল্লাহর গুণাবলি অর্জন করেছেন।' আল সিবাই লিখেছেন 'ইবনে সাবার উদ্দেশ্য ছিল: ইসলামের ধবংস সাধন এবং মুসলমানদের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার করা।' খোদ আলী রাঃ ইবনে সাবার দাবিকে ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানানোর সমার্থক বলে

www.pathagar.com

উল্লেখ করেন।[৯২] অপরদিকে খলিফা নিম্নোক্ত কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কারণে কাউকেই শাস্তি দেননি। এর মধ্যে ছিল, অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছা (আল-জাবর ওয়া'ল ইখতিয়ার) অথবা মানুষ স্বাধীন ও নিজস্ব কাজের পরিণতির জন্য দায়ী কিনা, সে কি তার নিজস্ব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, না নিশ্চল মূর্তির মতো পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে এবং কৃতকর্মের জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারেনা। এ সম্পর্কিত বিবরণে আরও আভাস পাওয়া গেছে যে, কোন ব্যক্তি এ ধরনের বড় গুনাহর কাজ করলে স্বাভাবিকভাবে ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাবে বলে খারেজিরা ধারণা পোষণের জন্য কারোর সমালোচনা বা তিরস্কার করেননি।[৯৩] খলিফা বিষয়টিকে কুরআনের মূলনীতির আওতাধীন বলে বিবেচনা করেছিলেন যাতে বলা হয়েছে, ভদ্রতা ও সহনশীলতার সাথে যুক্তিতর্ক পেশ করা উচিত (১৬:১২৫)। এ ধরণের অভিমতের প্রণেতা ও প্রচারকারীদেরকে আন্তরিক সদুপদেশ (নসিহা) ও সঠিক দিক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।[৯৪]

ঐতিহাসিকভাবে ফিৎনার বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল আব্বাসী খলিফা আল মামুনের (মৃত্যু, ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) শাসনামলে। পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান (মিহনাহ) বলে উল্লিখিত এ ঘটনাটি ছিল কুরআন নাযিলের প্রকৃতি সম্পর্কিত। কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি অথবা তা অসৃষ্ট বক্তব্য। আল মামুন এ বিষয়ে মুতাযিলাদের বিতর্কিত মতটি গ্রহণ করেন : কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট ভাষণ, কেননা তিনি মানুষের মতো কথা বলেন না, অন্যান্য বস্তু যেমনভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন, কুরআনও সেভাবে সৃষ্টি করেন। অপর দিকে অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কিত যে মতকে গ্রহণ করেন, তাহল : কুরআন হল আল্লাহতা'আলার অদৃষ্ট ভাষণ, যা চিরন্তন, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য: রাসূল (সাঃ)কে জানানো হয়। আব্বাসী খলিফা এবিষয়ে অনুসন্ধান চালান এবং এমন বাড়াবাড়ি করেন যে, সরকারিভাবে গৃহীত এ মতের বিরোধিতাকারী অনেক আলেমকে তিনি কারাদণ্ড প্রদান এবং নির্যাতন করেন। আল-মামুন অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে যারা বিশ্বাসপ্রবন ও কুরআন যে সৃষ্ট-এ নীতিতে বিশ্বাসী কেবল তাদেরকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে।[৯৫] এটি অবশ্য ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষা সংক্রান্ত স্বাধীনতার সহনশীল চিত্রের অনেকটা বিচ্ছিন্ন কিন্তু অবাক হবার মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে ইসলামের ফকিহ ও মুজতাহিদদের তুলনা প্রসঙ্গে জর্জ মাকদিসি (George Makdisi) মন্তব্য করেন, 'ইসলামে অধ্যাপকগণ যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন; তাদের খ্রীস্টান সহকর্মীরা তা অর্জন করতে পারেননি।'[৯৬]

খলিফা উসমান রাঃ কে হত্যা, খলিফা আলী রাঃ ও আমীর মুয়াবিয়া রাঃ এর মধ্যে বিরোধ এবং খারেজিদের উদ্ভবের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক আলোচিত ফিৎনার দৃষ্টান্ত। খারেজি (শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লোকজন) বলা হয় একারণে যে, তারা নিজেরাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আলী রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর মধ্যে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৯৭] আলী রাঃ এর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তারা এ ঘটনায় বিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এ মত পোষণ করে যে, সালিশির প্রস্তাব কখনো করা উচিত নয় এবং আগ্রাসনের (মুয়াবিয়া রাঃ প্রসঙ্গে) মুখে মধ্যস্থতার চেষ্টা কুরআনের নির্দেশনার পরিপন্থী। খারেজিদের অনেকে আবার এ মতও পোষণ করে যে, একজন ইমামের উপস্থিতি জরুরি নয় এবং এব্যাপারে কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাও নেই। তারা আরও মনে করে যে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজ তার নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে; তবে সমাজ প্রয়োজন মনে করলে একজন ইমাম নির্বাচন করতে পারবে। খারেজিরা আরও বিশ্বাস করে যে, কোন বড় গুনাহের কাজ করলে সে কাফিরে পরিণত হবে, তারা এ মতের ভিত্তিতেই সালিশির প্রস্তাব অনুমোদনকারী অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবিকেও কাফির বলে অভিযুক্ত করেছিল। তাদের সর্বশেষ অভিমতটি হলো, নেতৃত্বের বিষয়টি কেবল কুরাইশ গোত্রের জন্য বিশেষ অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত নয়। আরব অথবা অনারব যে কোন যোগ্য মুসলমানকে ইমাম নির্বাচন করা যাবে।[৯৮]

খারেজিরা আলী রাঃ এর নেতৃত্বের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে; কারণ তিনি সালিশির বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। সালিশি পরিচালনা পদ্ধতির ধরণ ও তার ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তৎসত্ত্বেও খারেজিরা মনে করে যে সত্যনীতির ভিত্তিতে বিষয়টি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এ মতের সমর্থনে খারেজিরা কুরআন হতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত বিদ্রোহী ও পাপীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট আয়াত উদ্ধৃত করে (৬৯:৯)। খারেজিরা কুরআনের অন্য একটি আয়াতও উদ্ধৃত করে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

'হুকুম দেয়ার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ' (৪:৫৭)।

খলিফা অবশ্য মনে করেন যে, সত্য কথা বলে এ সর্বশেষ উক্তির যে অর্থ করা হয়েছে তা ভুল'। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদিও বিচার ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহতা'আলা কিন্তু সমাজের বিষয় পরিচালনায় কোন নেতার প্রয়োজন

www.pathagar.com

নেই বুঝানোতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দান পুরোপুরি ভুল এ পর্যবসিত হয়েছে।[৯৯] এক বর্ণনায় আরও আভাস দেয়া হয়েছে যে, সালিশির ব্যাপারে আলী রাঃএর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে আট হাজার খারেজী সমবেত হয়; কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন শক্তি প্রয়োগ করেননি; এর পরিবর্তে তিনি তাদের মতপার্থক্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস রাঃকে পাঠান। প্রায় চার হাজার খারেজী ফিরে যেতে সম্মত হয়। এরপর খলিফা অবশিষ্ট খারেজিদেরকেও ফিরে যাবার অনুরোধ জানান; কিন্তু তারা তাতে রাযি হয়নি। অত:পর খলিফা তাদের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠান : 'আপনারা যতদিন চান অবস্থান করতে পারেন এবং যতদিন আপনারা রক্তপাত, মহাসড়কে ডাকাতি-রাহাজানি, অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতি পরিহার করবেন; ততদিন পর্যন্ত আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তবে আপনারা যদি এর কোন একটি করেন; তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।'[১০০]

এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে অন্যান্যের মতো আবু জাহরাহ বলেন, 'আলী রাযিয়াল্লাহ্ আনহুকে বিদ্রোহ ও হামলা মোকাবেলা করতে হয়েছিল; কিন্তু খারেজিরা (তার একজন গভর্নর) খাব্বাব ইবন আল-আরতকে হত্যা করার মাধ্যমে সহিংসতা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হননি।' আবু জাহরাহ যথার্থই মন্তব্য করেন যে, বিদ্রোহীরা (আহল আল-বাগি) শান্তি ভঙ্গ করে সহিংসতায় লিপ্ত না হলে কেবল মতপার্থক্যের কারণে তাদের সঙ্গে ইমামের যুদ্ধ করা বৈধ হবে না।[১০১] আরেকটি বিবরণে আরও বলা হয়, খলিফা আলী রাঃ জুমা'র খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন খারেজি তার বক্তব্যে বাধা দিল এবং তার সমালোচনা করলো। খলিফা তার সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বললেন, আমরা আপনাদেরকে আল্লাহর নামোচ্চারণের জন্য আমাদের মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেব না এবং যতদিন আমাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করবেন; ততদিন আমরা আপনাদেরকে গনিমতের মালের অংশ (ফাই) দিতে অস্বীকার করবো না এবং আপনারা আমাদের ওপর হামলা না করা পর্যন্ত; আমরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো না।' এরপর তিনি পুনরায় জুমু'আর খুতবা প্রদান শুরু করেন।'[১০২]

উপরন্তু কাসির ইবনে তামার আল হাদরামির এক বর্ণনায় জানা যায়, তিনি লিখেছেন, 'আমি কুফার এক মসজিদে প্রবেশ করি সেখানে পাঁচজন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তারা খলিফা আলী রাঃকে অভিশাপ দিচ্ছিলো। তাদের একজনের পরনে বারনুস ছিল। সে বললো, "আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাঁকে হত্যা করবো।" এরপর আমি লোকটিকে আলীর কাছে

www.pathagar.com

নিয়ে যাই এবং আমি যা শুনেছিলাম তাকে তা অবহিত করি। আলী বললেন, "তাকে আমার আরও কাছে নিয়ে আসুন" : অতপর আলী লোকটাকে বললেন, "আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে। কে আপনি?।" "আমি সাওয়ার আল-মানকুরি।" লোকটি উত্তরে বললো। খলিফা বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও।" এর জবাবে আল হাদরামি আলীকে বলেন, "আপনাকে হত্যা করার জন্য যে লোকটি আল্লাহর কাছে শপথ করলো, এরপরও তাকে ছেড়ে দেয়া কি আমার জন্য উচিত হবে?" উত্তরে আলি বললেন, "লোকটি আমাকে হত্যা না করা সত্ত্বেও কি আমি তাকে হত্যা করবো?" আমি বললাম, "সে তো আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে।" আলী বললেন, "তাহলে তোমার উচিত হবে তাকে অভিশাপ দেয়া অথবা ছেড়ে দেয়া।"[১০৩]

খারেজিরা উসমান, আলী, তালহা ও জুবায়ের রাঃ এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণকে কাফির ঘোষণা করে এবং যেসব মুসলমান তাঁদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করেন তাঁদের জানমালের বিরুদ্ধে হামলা চালানোকে বৈধ বলে ঘোষণা করে।[১০৪]

ফকিহদের অধিকাংশই খারেজিদেরকে একটি বিদ্রোহী উপদল (বুগাত) বলে ঘোষণা করেন এবং বিদ্রোহীদের জন্য নির্ধারিত বিধি-তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। যার অর্থ হলো: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এমত হলো আবু হানিফা, আল শাফেঈ, ইবনে হাম্বল, অধিকাংশ শরীয়ত বিশারদ (ফুকাহা) ও হাদিসের অনুসারীদের (আহল আল-হাদিস)। ইমাম মালিক অবশ্য মনে করেন যে, তাদেরকে তওবা করার আহ্বান জানানো উচিত এবং তারা যদি তা করতে অস্বীকার করে; তাহলে তাদেরকে অবিশ্বাসের (কুফর) জন্য নয় বরং যমিনে অশান্তি সৃষ্টির (ফাসাদ ফিল আর্দ) কারণে হত্যা করা উচিত। অপরদিকে আহল আল-হাদিসের একটি গ্রুপ মনে করে যে, খারেজিদের মতো বিদ্রোহীদের সঙ্গে ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদিন) অনুরূপ আচরণ করা উচিত।[১০৫]

ইমাম আবু হানিফার শিষ্য আল-শাইবানীর মতে, যারা সত্য ন্যায়পথ অথবা সাধারণভাবে গৃহীত সুন্নাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে এবং আলাদা ধরনের ধর্ম পালন করবে, তাদেরকে বিদ্রোহী ও ভিন্নমতাবলম্বী বলে গণ্য করা হবে। যদি তারা নেতা বা ইমামের কর্তৃত্বের আনুগত্য পরিত্যাগ না করে, তাহলে ইসলামি ভূখণ্ডে তাদের থাকার অধিকার অস্বীকার করা হবেনা; কিন্তু তারা যদি ইমামের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে; এবং তাদেরকে হত্যাও করা যেতে পারে। তাঁর এ সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আল শাইবানী খারেজিদের বিরুদ্ধে

খলিফা আলী রাঃ এর অস্ত্রধারণ, পরিবর্তী পর্বে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করার কথা উল্লেখ করেন।[১০৬]

আব্দুল কাদির আওদা বিদ্রোহীদের (আল-বুগাগাত) সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারী বলে অভিহিত করেছেন, যাদের অনুসারি এবং হাতে ক্ষমতা রয়েছে,[১০৭] তারা ইমামের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে ও তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এ সময় তারা অনুমোদনযোগ্য ব্যাখ্যার (তা'বিল সা'ইগ) ভিত্তিতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যা তাদেরকে সাধারণ অপরাধীদের থেকে পৃথক করে। এছাড়া বিদ্রোহীদের অবশ্যই একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে; যা সমাজে সাধারণভাবে গৃহীত বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাদের এ ভিন্ন মত পোষণের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইমামের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করলেই কেবল তা বিদ্রোহতে পরিণত হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, ফিৎনা ও বাগির (বিদ্রোহ) মধ্যে মিল রয়েছে এবং উভয়ের উৎপত্তি অভিন্ন হতে পারে। দুইয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, ক্ষমতা অর্জন এবং ইমামের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে তার প্রয়োগ: যা ফিৎনাকে বাগিতে উন্নীত করেছে। এ ধরনের কারণ থাকায় আল মাওয়ারিদি ফিৎনা ও বিদ্রোহের (বাগি) মধ্যে তুলনা করতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি তুলে ধরেন :

> মুসলমানদের মধ্যকার কোন একটি দল যখন সমাজের মতের (রা'ই আলউম্মাহ) বিরোধিতা করে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি বা মত অথবা মাযহাব এর অনুসরণ করে এবং তারা সকলে একত্রে সমবেত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ করা যাবে না। তারা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করলে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে থাকলে; তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করা যাবেনা এবং সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত আইনের শাসন (আহকাম আল-আদল) তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। বিদ্রোহী উপদল যদি একটি নির্ধারিত এলাকায় সমবেত হয়, নাগালের বাইরে থাকে এবং কোন বিকৃত মতের প্রচার চালাতে না পারে; তাহলে মনে করা হবে যে তারা ন্যায় বিচার লাভে বাধা সৃষ্টি করছে না এবং তারা যদি সক্রিয় শত্রুতায়ও লিপ্ত না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তখন সমাজের অন্য লোকদের মতো তারাও আইনের শাসনাধীন থাকবে। বিদ্রোহীরা যদি সমাজের আইন মান্যকারীদের (আহল আল-আদল) সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিকৃতি ছড়াতে থাকে ও অন্যায় কাজ করে; তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তা'জিরের আওতায় প্রতিরোধমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ইমামের থাকবে। এ শাস্তির মাত্রা অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড বা হুদুদে নির্ধারিত শাস্তির মতো কঠোর হবে না।[১০৮]

আবদুল কাদির আওদাহ, বিশেষ করে সমাজ ও বৈধ সরকারের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে বিবরণ দানের সময় এ অভিমতের

www.pathagar.com

সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি একমত পোষণ করেন। এ বিরোধীরা যেমনি শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের মত প্রচার করার অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; ঠিক তেমনি আইন মান্যকারী ব্যক্তিদেরও এ ধরনের মত খণ্ডন করা এবং তাদের দোষত্রুটি ও বিকৃতি প্রকাশ করার অধিকার থাকবে। দু'পক্ষের কেউ যদি এর লংঘন করে, সে ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। যেমন, বক্তব্য বা অন্য কাজের মাধ্যমে ধর্মের অবমাননা করলে বা মিথ্যা অপবাদ দিলে; অপরাধীকে সাধারণ আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে এবং এ অপরাধকে সাধারণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

বিরোধীরা সভা-সমবেশও করতে পারবে। তারা যদি ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ না করে এবং অপরের অধিকারে বাধাদান অথবা তা লংঘন না করে; তাহলে তাদের সভা-সমাবেশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কোন ক্ষমতা কারোর থাকবে না। খারেজিদের সাথে আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ এর আচরণ-এ অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। খারেজিরা সমাজের সকলের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নাহরাওয়ানে এসে সমবেত হয়। তারপরও তারা খলিফার নিযুক্ত আঞ্চলিক গভর্নরের আনুগত্য করছিল। খারেজিরা যখন গভর্নর খাব্বাব ইবনে আল-আরতকে হত্যা করল; তারপরই কেবল খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হত্যাকাণ্ডের পর খলিফা বিচারের জন্য হত্যাকারীকে সমপর্ণ করতে খারেজিদের নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। জবাবে তারা আরও বলে যে, এটি ছিল একটি সম্মিলিত কাজ এবং তাদের সকলে মিলে তা করেছে। তারা এভাবে খলিফার নির্দেশ অমান্য এবং প্রকাশ্যে তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করলে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[১০৯]

ইমাম মালিক, আল শাফেঈ ও ইবনে হাম্বল এর মতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বশর্ত হলো: তারা আইন মান্যকারী সমাজের বিরুদ্ধে প্রথমে হামলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তাহলেই কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমোদন রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তাদের জীবনের নিরাপত্তার আর গ্যারান্টি থাকবে না। কেবল ইমাম আবু হানিফা বিদ্রোহীরা সত্যিকার সহিংসতা শুরু করার আগেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বৈধ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, বিদ্রোহীরা তাদের সমর্থকদের এমনভাবে সমাবেশ ঘটাবে, যাতে সমাজের স্বাভাবিক জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়; তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের সত্যিকার সহিংসতা শুরুর আগেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অবৈধ হবে না।[১১০]

গ. ফিত্নার নানারূপ

ফিৎনাকে প্রধানত: দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তা হল: সন্দেহমূলক ফিৎনা (ফিত্নাত আল-শুবুহাত) ও ভোগাসক্তমূলক ফিৎনা (ফিত্নাত আল-

www.pathagar.com

শাহাওয়াত)। প্রথমটির পরিধি ও তাৎপর্য দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাথমিক যুগের 'আলেমদের' রচনায় অন্তত এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। ফিত্না আল শাহাওয়াত হচ্ছে: প্রধানত: অশ্লীলতা ও বিকৃতি: যা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং তা মোটেই কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় এবং আমাদের যুগে তা আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। তবে 'আলেমগণ' প্রথম ফিৎনাটির প্রতি যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন: দ্বিতীয়টির প্রতি সে ধরনের গুরুত্ব দেননি। শরী'আতে অবৈধ যৌন সংসর্গের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান থাকায় অংশত: এটি করা হতে পারে। অবৈধ যৌন কাজের প্রতি প্রকাশ্যে প্রশ্রয়দান রোধের লক্ষ্যে এ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

দু'ধরনের ফিৎনা পৃথক বা এক সঙ্গে সংঘটিত হতে পারে এবং এতে এক বা একাধিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। ইবনে কাইয়িমের মতে, সন্দেহমূলক ফিৎনা অজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দুবর্লতা থেকে সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে অসৎ উদ্দেশ্য ও মনের খায়েস পূরণের ইচ্ছা (হাওয়া) যুক্ত হলে অপরাধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।[১১১] সন্দেহ সত্যকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত করে এবং বৈধ (হালাল) জিনিসকে নিষিদ্ধ জিনিসে (হারাম) পরিণত করে এমনভাবে; যার কোনটি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন লক্ষণ এ শুবহা বা সংশয় সৃষ্টি করে থাকে; যা অমিমাংসিত থাকে এবং ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় সন্দেহ। ইবনে কাইয়িম এ প্রসঙ্গে দুটো হাদিস উদ্ধৃত করেন :

دَعْ مَايُرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ .

مَنْ تَرَكَ الشُّبهَاتَ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ.

'রাসূল সাঃ মুমিনদেরকে সন্দেহাতীত বিষয়ের অনুকূলে সন্দেহ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে-ই শুবুহাত (বহু বচন : শুবুহা) বর্জন করলো; সে তার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করলো এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করলো।'[১১২]

ইবনে কাইয়িম অশুভ ইচ্ছার (ফাসাদ আল-কাসদ) ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ এর সাথে অজ্ঞতার সংমিশ্রণে মারাত্মক অন্যায় বা অপরাধ সংঘটনের পথ প্রশস্ত হয়; যার ফল হচ্ছে অবিশ্বাস ও প্রতারণা (কুফর ওয়া'ল নিফাক)। এ ধরনের ফিৎনার ঘটনার জন্য দায়ী হল প্রতারক চক্র (মুনাফিকুন) ও নতুন উদ্ভাবক চক্র (আহল আল-বিদ'আহ)। 'ফিৎনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই সৃষ্টি হয় সন্দেহ থেকে; যা তাদের সত্যের দৃষ্টিকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলে এবং এর সাথে মিথ্যা ও বিভ্রান্তির (যলালা) সংমিশ্রণ ঘটায়।' 'ফিৎনার মধ্যে আরও রয়েছে

ভুল ধারণা (ফাহম ফাসিদ), মিথ্যা বিবরণ (নাকল কাযিব) এবং পূর্ব ধারণা বা খায়েশ পূরণ, আর এসবের সাথে সংযুক্ত থাকে সত্যের ব্যাপারে অন্ধত্ব ও অশুভ ইচ্ছে।'[১১৩]

ফিৎনার যে ধারণা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে 'ফিত্নাত আল শুবুহাত' তার থেকে স্পষ্টত ধর্মীয় বিষয়ে নবোদ্ভাবন (বিদ'আহ) ও কুফরির মধ্যকার একটা সীমা রেখা নির্ণয় করা বেশ কঠিন, তবে ফিৎনার যেসব বিষয়ের সাথে ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকেনা; সে ক্ষেত্রে ফিৎনা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে তেমন কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।[১১৪] আমি পরবর্তীকালে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এ মুহূর্তে আমি সন্দেহজনক ফিৎনা সম্পর্কে ইবনে কাইয়িমের পেশ করা একটি উদাহরণ কেবল তুলে ধরতে চাই। তা কুরআনের অর্থের বিকৃতি সম্পর্কে। তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ বিকৃতি সাধন করা হয়, যা কুরআনের অন্যসব শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআনের একাধিক স্থানে বৈধভাবে বিবাহিত স্ত্রী ও যার সঙ্গে যৌন মিলন বৈধ, এর পাশাপাশি আরেকটি শব্দগুচ্ছের বর্ণনা এসেছে। এভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবনকে বৈধতা দেয়ার পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয় 'এবং যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধীন' 'ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম' (২৩:৬, ৭০:৩০)। এ শেষ বাক্যাংশটুকুর অর্থের মাধ্যমে অনেকে পুরুষ দাসের সঙ্গে সমকামিতা বৈধ করে থাকে বলে ইবনে কাইয়িম উল্লেখ করেছেন। এরপরই তিনি একথা লিখেছেন যে, 'কেউ এ মতকে গ্রহণ করলে সমগ্র উম্মাহর সর্বসম্মত মত (বি ইত্তেফাক আল উম্মাহ) অনুযায়ী সে কাফেরে পরিণত হবে'[১১৫]

সম্ভবত এটি হচ্ছে অন্তরের ফিৎনার (ফিত্নাত আল শুবুহাত) একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত। কুরআনে বর্ণিত নবী লুত আঃ এর কাহিনীতে সমকামিতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। বিকৃত যৌনাচারী সমকামিতার জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকার কারণে সমকামী ও বিভ্রান্ত লোকদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের পাঠান। তাই উপরের ব্যাখ্যার মতো অপব্যাখ্যার পিছনে সুস্পষ্ট অশুভ উদ্দেশ্য রয়েছে; কেননা এ ব্যাখ্যা কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[১১৬] ইবনে কাইয়িম অশুভ উদ্দেশ্যের (ফাসদ আল-কাসাদ) এ উপাদানের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে সন্দেহজনক ফিৎনা ও নবোদ্ভাবন বা বিদ'আহর কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্টত প্রকাশ পেয়েছে। আমি অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে, কোন লেখক বৈধ বা ধর্মীয় কোন বিষয়ের উন্নয়নে অবদান রাখার সদুদ্দেশ্যে যে বিভ্রান্তিকর প্রচেষ্টা চালায়; তাই হলো বিদ'আত। কিন্তু ফিত্নাত

www.pathagar.com

আল-শুবুহাত-এর ক্ষেত্রে সুস্পষ্টত এরূপ করা হয় না। উপরন্তু বিদ'আহ্ হল ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্তিগত অভিমত (রা'ই) এর সঙ্গে সম্পর্কিত; যদিও তা বিভ্রান্তিকর এবং এতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকার একটা প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে ফিৎনা বেশ সহজ, কেবল কোন কথা উচ্চারণ অথবা কোনো কাজে তা প্রকাশ পায়, কোন বুদ্ধিবৃত্তিক দিক ছাড়াই। তৎসত্ত্বেও বিদ্রোহাত্মক ফিৎনাকে তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের ভিত্তিতে বিদাহ্ ও কুফর উভয় থেকে পৃথক করা যায়। বিদ্রোহাত্মক ফিৎনা হচ্ছে: প্রধানত রাজনৈতিক ধারণা; অপরদিকে বিদ'আহ্ ও কুফর হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মীয় বিষয়। সরকারের বিরোধিতা করা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা প্রায় ফিৎনার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; অন্যদিকে এ বিষয়টি বিদ'আহ্ বা কুফরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতেও পাওে; আবার নাও পারে। অবশ্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ'আহ্ ও কুফরিকে ফিৎনায় রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যা পরে পূর্ণ বিদ্রোহে (বাগি) রূপ নেয়।

এখানে দ্বিতীয় ধরনের যে ফিৎনা নিয়ে আলোচনা করবো, তা হলো: বক্তব্য বা মত প্রকাশের আকারে অশ্লীলতা, কামুকতা ও কামাসক্তির প্রকাশ করা। ফিৎনার এ সংজ্ঞায় ফিত্নাত আল-শাহাওয়াত বাক্যাংশ ব্যবহার করাই উপযুক্ত হবে। এ ধরনের ফিৎনায় বিভিন্ন পাপ কাজ (ফিস্‌ক আল 'আমল) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর উদাহরণ হলো: যৌনতার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল উদ্রেক করা যা তাদেরকে, বিশেষ করে অজ্ঞ বা দুর্বলচেতা লোকদের চিন্তা ও আচরণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ ধরনের ফিৎনা চরিতার্থকারী ও তার শিকার উভয়ের চিন্তা বিশ্বাস ও চরিত্রে কামাসক্তি ও অপরাধের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে থাকে। সক্রিয়ভাবে মিথ্যার অনুসরণ করা বা অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকা অথবা উভয় ধরনের অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার পরিণতি হচ্ছে এ ফিৎনা।[১১৭]

অশ্লীলতা ব্যাপক গুরুত্ববহ এবং এর অর্থও ব্যাপক, তাই এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। এ ফিৎনার সংজ্ঞা দানের কঠিন অবস্থার জন্য অংশত: দায়ী গ্রহণযোগ্য ও সুন্দর এবং কামাসক্ততা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে মানুষের ধারণার ক্রম পরিবর্তনশীল প্রবণতা। ফিত্নাত আল শাহাওয়াত এর সংজ্ঞা দান ও অনুধাবন কঠিন হওয়া সত্ত্বেও, জনগণের মধ্যে সৌন্দর্য ও সুরুচির বিকাশ এবং কদর্যপূর্ণ ও লালসার আবেদন সম্বলিত উস্কানীমূলক প্রকাশ থেকে সমাজের স্পর্শকাতর শ্রেণীর সদস্যদের রক্ষার স্বার্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ অযৌক্তিক হবেনা।

www.pathagar.com

ইবনে কাইয়িমের মতে, সব ধরনের ফিৎনার মূল ও উৎপত্তি-তার আচরণ থেকে চিহ্নিত করা যায়, যাতে দেখা যায় যেঃ আইনের বিধির (শার) চেয়ে ব্যক্তিগত অভিমতকে (রা'ই) এবং বিবেক ও যুক্তির (আক্ল) চেয়ে খেয়ালখুশিকে (হাওয়া) অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ থেকে আভাস পাওয়া গেছে যে; ফিৎনা বা বিদ্রোহ সব ধরনের বা যে কোন ধরনের খেয়ালখুশি (হাওয়া), ধর্মের ব্যাপারে নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আহ), বিকৃত ব্যাখ্যাদান (সু আল তা'ওয়াবিল), অনিষ্টকর সন্দেহ (শুবাহ)- এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এসব ধারণা যখন এমনভাবে প্রকাশ বা প্রচার করা হয়, যা বৈধ সরকারের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে অথবা তা যদি সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে অথবা অজ্ঞ ও স্পর্শকাতর ব্যক্তিবর্গের অন্তরকে কলুষিত ও পাপাচ্ছন্ন করে তোলে, তাহলে তা ফিৎনাতে পরিণত হবে।[১১৮]

ইবনে কাইয়িমের মতে, বিশ্বাস দৃঢ় করার (আল-ইয়াকিন) মাধ্যমে সন্দেহজনক ফিৎনা রোধ করা যায় এবং সংযমের (আল ছবর) মাধ্যমে যৌন লিপ্সা সংক্রান্ত ফিৎনা প্রতিরোধ করা যায়।[১১৯] কুরআনে এ থেকে মুমিনদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় হিদায়াত রয়েছে। মুমিনদেরকে সত্যকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যা তাদেরকে সন্দেহ থেকে রক্ষা করবে এবং সংযমের চর্চা হচ্ছে বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রধান সুরক্ষা।' (১০১:৩)। ইবনে তাইমিইয়া এ সূরার ব্যাপারে তাঁর নিজের অভিমতের সমর্থনে আল শাফেঈর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেই যদি সূরা আল আসর (১০১:৩) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন; তাহলে তারা দেখতে পাবেন যে হিদায়াতের জন্য এ সূরাটিই যথেষ্ট।' তিনি আরও বলেন, আল্লাহতা'আলা এ সূরার মাধ্যমে আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সকল মানুষই লোকসানির মধ্যে রয়েছে; কেবল সেসব লোক ছাড়া, যাঁরা সত্যের ওপর অটল রয়েছে (সৎকাজ করছে) এবং পরস্পরকে তা করতে ও ধৈর্য্যধারণ করতে পরামর্শ দিচ্ছে। এরপর ইবনে তাইমিয়া বলেন, এখানে ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কষ্ট সহ্যের জন্য ধৈর্য্য ধারণ এবং দুঃখ দুর্দশায় ধৈর্যধারণ ও লোভ লালসা থেকে ধৈর্য্য ধারণ। এরপর তিনি আরও বলেন, আশ্বস্ত ও আনন্দদান করার মতো কোন আশার বিষয় না থাকলে; কারোর পক্ষে এধরনের ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সুদৃঢ় ঈমানের মাধ্যমেই কেবল কেউ তা অর্জন করতে পারে। আবুবকর সিদ্দিক রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল সাঃ বললেন, 'আল্লাহর কাছে সুদৃঢ় ঈমান ও সুস্বাস্থ্য কামনা কর। সুদৃঢ় ঈমানের পর সুস্বাস্থ্যের চেয়ে আর কোন উপঢৌকন হতে পারে না, তাই আল্লাহর কাছে এ'দুটি চাও'।[১২০]

www.pathagar.com

শরী'আতে বিদ্রোহ বা ফিৎনার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই। খোলাফায়ে রাশেদীনের উদাহরণ থেকে আভাস পাওয়া গেছে যে, সন্দেহজনক ফিৎনার জন্য তাঁরা হাল্কা ধরনের প্রতিরোধমূলক শাস্তি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যাতে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাধীনতার ওপর অসঙ্গত কোন শাস্তি আরোপিত হতে না পারে। এর পরিবর্তে খলিফাগণ ছোটখাট ফিৎনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঠিক উপদেশ দেয়ার মতো ব্যাপকভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। অবশ্য এ গঠনমূলক সহনশীলতা ও সংযমের পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। গোষ্ঠীগত আন্দোলন সৃষ্টি ও তার বিস্তৃতি এবং সন্দেহপূর্ণ ধর্মাচারে লোকজনের জড়িয়ে পড়ার পর-এ পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তখন বিরোধপূর্ণ মতাদর্শ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। এছাড়া ব্যক্তি ও গ্রুপের ষড়যন্ত্রও আইন প্রণেতা বা ফকিহদেরকে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান অনুমোদন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও হাম্বলি আলেমদের অনেকে এতোদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন যে, তাঁরা মুনাফেকির (জানাদিকা) প্রচারণা এবং ফিৎনায় ইন্ধনদাতাদের মৃত্যুদণ্ড দানকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন। ফকিহগণ ইসলামি ভূখণ্ডে অন্যায়ের বিস্তার রোধের লক্ষ্যে এটি করেছিলেন, কঠিন শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে নয়। ইবনে তাইমিইয়া অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে বলেন, ফিৎনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সবসময় জরুরি নয়, আগেও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ইবনে তাইমিইয়া আরও মনে করেন যে, অপরাধীরা যখন শক্তি অর্জন করে এবং তার দ্বারা তাদের ভিন্নমত প্রচারের চেষ্টা করে; তাহলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে এবং এক্ষেত্রে ফিৎনার ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, যেমনটি খারেজি ও জানাদিকাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল।[১২১]

অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা অবশ্য নবোদ্ভাবন ও বিদ্রোহের ইন্ধন দাতাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি তা'জিরের অধীনে দণ্ডনীয় শাস্তি দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন; যা মৃত্যুদণ্ড নয় অথচ অসৎ কাজ রোধের জন্য যথেষ্ট কঠোর। তিনি আরও বলেন, অপরাধীরা যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়; তাহলেই কেবল তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অনুমতি রয়েছে, এক্ষেত্রে তারা বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীতে (বাঘাত মুহারিবূন) পরিণত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।

খারেজিদের সঙ্গে খলিফা আলী রাঃ এর আচরণের বিষয় উল্লেখ করে হানাফী ফকিহ আল সারাখসি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে ভিন্নমত

www.pathagar.com

পোষণ ও তাদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেছে; তাদেরকে ইমাম মৃত্যুদণ্ড বা জেল দেননি। তার মতে, বিদ্রোহীরা যখন জোরপূর্বক তাদের মত চাপানোর চেষ্টা করবে এবং ন্যায় পন্থীদের (আহিল আল-আদল) বিরুদ্ধে সহিংস হামলা শুরু করবে; তখন তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বৈধ হবে।[১২২] এব্যাপারে বিভিন্ন মাজহাবের অভিমত বিশ্লেষণ করে আবু জাহরাহ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন : 'এ ব্যাপারে আমরা আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের অভিমতকে যথার্থ বলে মনে করছি। মৃত্যুদণ্ড প্রদান হলো চূড়ান্ত শাস্তি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিকল্প শাস্তি কার্যকর করার সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দান অবশ্যই পরিহার করতে হবে।'[১২৩]

সন্তান জন্মদান ও চিত্তবিনোদন উভয় ক্ষেত্রে যৌনমিলন ও বিবাহের বৈধ ভূমিকার কথা সমর্থনের পাশাপাশি আল গাযালী একথাও বলেন যে, যৌনতা হচ্ছে ফিৎনারও একটি বড় ইন্ধনদাতা; তাই এর তীব্র সহজাত আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমান ও দৃঢ় সংকল্প। নিম্নের কুরআনের দু'টি আয়াতে 'অন্ধকারে বিরাজমান পাপ পঙ্কিলতা থেকে আত্মরক্ষা' এবং 'যে বোঝা বহনের ক্ষমতা নেই'-তা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার জন্য মুমিনদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে (১১৩:৩, ২:২৮৬):

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ .

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ .

এ উভয় ক্ষেত্রে বস্তুত যৌন আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যার উপস্থিতি বিবেককে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় এবং ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অকার্যকর করে ফেলে।[১২৪] এ ধরনের ফিৎনা রোধের লক্ষ্যে কুরআন–সুন্নাহতে নারী-পুরুষের পরস্পরের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যদি তারা স্বামী-স্ত্রী না হয় (২৪:৩০)। একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْس .

'এ দৃষ্টি হল বিষাক্ত তীরের মতো, যা শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থাকে...'

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে:

لَكَ الأولى وَالأخْرى عَلَيْكَ .

'কোন মহিলার প্রতি (অনিচ্ছাকৃত) প্রথম দৃষ্টি মার্জনীয়; তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি নয়'।[১২৫]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আল সারাখসি বলেন, এখানে দৃষ্টিপাতের পুনরাবৃত্তি বলতে এমন দৃষ্টি বুঝানো হয়েছে, যার পিছনে কামাসক্তির (শাহওয়াহ) ইন্ধন রয়েছে।[১২৬] অবশ্য বৈধ উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োজনের খাতিরে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিদান নিষিদ্ধ নয়। হাদিসে নারীপুরুষের অবৈধ মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা বা একান্তে দেখা-সাক্ষাৎ (আল-খালওয়াহ) করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কামাসক্তির ফিৎনার উদ্ভব ঘটে থাকে। নারী ও পুরুষের মধ্যে সব ধরনের সাক্ষাতের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম বোধের চর্চা করা উচিত। আল গাযালী লিখেছেন, চোখের যিনা ছোট পাপ বা ছগিরা গুনাহর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ; কারণ তা যিনার দিকে ধাবিত করে এবং যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; তার পক্ষে তার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।[১২৭] যেখানে ফিৎনার আশংকা নেই, সে ক্ষেত্রে এ বিধান সাধারণভাবে শিথিল করা হয়েছে, যেমন বয়স্ক লোকদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ অথবা এমন অন্য পরিস্থিতি, যার প্রকৃতিই ফিৎনার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়।[১২৮] কোন অবিবাহিত ব্যক্তি যদি তীব্র যৌনাকর্ষণ বোধ করে; তা হলে তাকে বিয়ে করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, আর তা করার সামর্থ্য যদি তার না থাকে; তাহলে তাকে প্রবৃত্তি দমনের জন্য রোযা রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আল গাযালী তাই অবিবাহিত ব্যক্তির জন্য করণীয় তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা হল : রোযা রাখা; নিজের দৃষ্টিকে নীচু রাখা এবং কোন কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা যাতে সে তার মনকে কামাসক্তির আকর্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। এসব যদি অকার্যকর মনে হয়, তাহলে তার জন্য একমাত্র সম্ভাব্য নিরাময়ের ব্যবস্থা হল বিয়ে।[১২৯]

একটি ইতিবাচক দিক হলো, কোন ব্যক্তির অবৈধভাবে যৌন লালসা পূরণ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে যদি তা পরিহার কওে; তাহলে সেজন্যে সে পুরস্কৃত হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভকারী ৭ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সেও অন্তর্ভুক্ত থাকবে...।' আরেকটি হাদিসে 'কামাসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত' অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুকে শহীদের মৃত্যুতে উন্নীত মৃত্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৩০] অবশ্য কামভাব থেকে মুক্ত থাকার প্রতি এ ধরনের প্রশংসাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংযত আচরণের মান নির্ণায়ক ছাড়া অন্য কোন অর্থ করা উচিত হবে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাঃ বলেছেন:

إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الاسلامِ فِيْ شَيْءٍ وَاِنَّ اَحْسَنَ النَّاسِ

اِسْلامًا اَحَاسِنُهُمْ اَخْلاقًا .

'অশ্লীলতা ও তার প্রশ্রয় দানের (আল ফাহশা ওয়াততাফাহ্হাশা) সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের মধ্যে তাঁরাই সর্বোত্তম যাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।'

আরেকটি হাদিসে এ বিষয়টির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে:

إِيَّاكُمْ وَالفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَيُحِبُّ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ .

'অশ্লীলতা (আল ফাহশ) পরিহার করতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহতায়ালা অশ্লীলতা ও নীতিহীনতা পছন্দ করেন না।'

আল গাযালী উপরোক্ত উভয় হাদিসে বর্ণিত ফাহশ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, এখানে অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথা ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে; যার অধিকাংশই যৌন বিকৃতি সম্পর্কিত এবং নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা (আহল আল-ফাসদ) এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয়। এভাবে নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট লোকেরা অপছন্দনীয় ও অশ্রাব্য ভাষায় প্রকাশ্যে যৌন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে; যা লোকদের ভাষার প্রয়োগ ও বিরাজমান স্থানীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে হয় তিরস্কারযোগ্য (মাকরুহ) নতুবা নিষিদ্ধ (মাহযূর) কাজ।[১৩১]

পদ্যে অথবা গদ্যে নারীর দৌহিক ও নৈতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দান বা তাশবিব নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ নয়, বিশেষ করে যদি তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত না হয়, অবশ্য নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট রমনীর সৌন্দর্য তুলে ধরা হলে তাশবিব গুনাহের (মা'সিয়াহ) বিষয়ে পরিণত হয়।[১৩২] সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে যোগদান করার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আল গাযালী এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও বলেছেন যে, নারী পুরুষের জন্য এটি করা অনুমোদনযোগ্য; তবে শর্ত হলো যে, তা উত্তেজনা ও ফিৎনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।[১৩৩] তাই নৃত্য ও সঙ্গীত যদি শিল্পকর্মের আকারে সাধারণ আনন্দ-উৎসব ও চিত্তবিনোদনের জন্য হয়; তা হলে তা অনুমোদনযোগ্য, তবে যৌন বিকৃতি সৃষ্টির জন্য প্রলুব্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা অনুমোদনযোগ্য হবে না।

এসব ক্ষেত্রে যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন তাহলো: শরী'আত অপরাধ ও পাপাচারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়াকে (সাদ আল-জারা'ই) অনুমোদন করেছে, সে কারণেই শরিয়ত অতি নগন্য পরিমাণ মদ পানও নিষিদ্ধ করেছে, কেননা তা অধিক পরিমাণে পানের পথ প্রশস্ত করতে পারে; যা দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে খালওয়াহ নিষিদ্ধ, কারণ তা যিনার

www.pathagar.com

পথ প্রশস্ত করতে পারে। এখানে নিয়ম অনুযায়ী নিষিদ্ধ কাজের (হারাম) উপায় উপকরণ ও প্রেরাণাদানও নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৩৪]

অনৈতিকতা বিস্তারে প্ররোচণাদাতার ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের শাস্তির বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞ বা ফকিহগণ সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করেননি। তবে তারা বলেছেন যে, 'শরীয়াতের নীতি সংক্রান্ত বিষয়' বা আল সিয়াসাহ আল শরীয়া বলে পরিচিত ইমাম ও বিচারকগণ তাদের দূরদর্শী বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবেন। অনৈতিকতা রোধের লক্ষ্যে বিচারকগণ তা'জিরের আওতায় নিবৃত্তিমূলক শাস্তির নির্দেশ দিতে পারবেন; যা দণ্ডদানের ক্ষেত্রে সিয়াসাহ শরীয়া এর একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এতে অবশ্য প্রতিটি ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শাস্তিদানের ক্ষেত্রে নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে।[১৩৫] সিয়াসাহ'র মূলনীতিতে দুর্নীতি ও বিকৃতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের কর্তৃত্ব শাসক ও বিচারককে প্রদান করা হয়েছে। ইবনে কাইয়িম এ ব্যাপারে তাঁর নিজের মতের সমর্থনে ইমাম মালিকের অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'সরকার এবং সমাজের দায়িত্বশীলদেরকে (উলুল আমর) বাজার এলাকা, বিনোদন অঞ্চল এবং অন্য যেসব স্থানে পুরুষ লোকেরা ঘন ঘন যাতায়াত করে থাকে; সে সব স্থানে নারী পুরুষের মেলামেশা রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কারুশিল্পী ও নির্মাতার দোকানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করার জন্য মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। তবে বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে এসব বিধিনিষেধ শিথিল করা যেতে পারে।[১৩৬]

অনৈতিকতা ও ফিৎনা'র ব্যাপারে সিয়াসাহ ও তা'জির সম্পর্কে আলোচনাকালে হানাফি ফকিহ ইবনে আবিদিন খলিফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব রাঃ এর আমলের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যাতে ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হলে অনৈতিক কাজে জড়িত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্বাসন দান (তাগরিব) এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম ধবংস করাকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। বসবাসের গৃহের জন্য শরিয়তে সাধারণভাবে তল্লাশী করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; তবে অন্যায় বা পাপ কাজ যে বাড়িতে সংঘটিত হয় এবং পাপ কাজে লিপ্ত বলে পরিচিত ব্যক্তির বাড়িঘর এর আওতায় পড়বে না বলে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে। অতএব অসৎকাজ রোধ এবং সমাজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় সহায়ক হলে এ ধরনের স্থানে অভিযান চালানো এবং সেখানে মদ পাওয়া গেলে তা এবং তা সংরক্ষণের পাত্রসমূহ, জুয়ার সরঞ্জাম, ইত্যাদি ধবংস করবার অনুমতি রয়েছে। তবে কেবল কর্তৃপক্ষই এটি করবে, সাধারণ মানুষ নয়। কোন ব্যক্তির বাড়ি যদি মদ পান ও পাপ কাজের আস্তানায় পরিণত হয় তাহলে সে পাপীর কি ধরনের

www.pathagar.com

শাস্তি দেয়া উচিত হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম মালিক বলেন, লোকটিকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং বাড়িটি ভেঙ্গে দিতে হবে। তিনি বলেন, বাড়িটি বিক্রি করা উচিত হবে না; কারণ মালিকের অনুতপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, আর সেটি করলে সে বাড়িটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। ইমাম মালিক আরও বলেন, লোকটিকে বাড়ি থেকে বহিষ্কারের আগে দুই বা তিনবার হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।[১৩৭] অন্যদিকে ইবনে আবিদিন রাবিয়া বিন উমাইয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। খলিফা উমর রাঃ মদ পানের অপরাধে তাকে মদিনায় নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং খায়বরে নির্বাসন দেন। উমাইয়া খায়বর থেকে পালিয়ে গিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। হযরত উমর রাঃ এ খবর শোনার পর ঘোষণা করেন 'আমি কোন মুসলমানকে আর কখনোই নির্বাসন দানের শাস্তি দেবনা।' তাই মনে করা হয় যে, নির্বাসন দানের চেয়ে কারাদণ্ড প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ধরনের ঘটনার শাস্তির উদ্দেশ্য হলো: পাপকাজ রোধ করা, অন্যদিকে নির্বাসন দান লোকটিকে পুনরায় তা করার সুযোগ অবারিত করে দেয়। উপরন্তু কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নির্বাসন দেয়া হলে, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাসের সময় সে যে ধরনের সামাজিক চাপের মধ্যে থাকতো তা আর থাকে না। সম্ভবত এ কারণেই হয়ত ইবনে আবিদিন এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'নির্বাসন দান পাপ ও দুর্নীতি করার দ্বার উন্মোচন করে দেয়।'[১৩৮]

পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীল সাহিত্য ও বইপত্র সত্যকে বিকৃত করে অথবা ক্ষতিকারক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির প্রচার করে থাকে, তাই এগুলো ধ্বংস করা যেতে পারে। 'এগুলো দ্বারা সম্পাদিত ক্ষতির পরিমাণ মদ পাত্র বা বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি এবং এগুলো ধ্বংসের ফলে আর্থিক ক্ষতির কোন দায়দায়িত্ব নেই'। বিবদমান দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতির বিরোধিতা করে অথবা কোন নির্দিষ্ট অভিমতকে চ্যালেঞ্জ ও খণ্ডন করে কোন বই প্রকাশের ব্যাপারে মৌলিকভাবে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। উৎকর্ষের আলোকে এগুলোর বিচার ও মূল্যায়ন করতে হবে এবং এরই ভিত্তিতে তা ধ্বংস করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।[১৩৯] এ সিদ্ধান্ত অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কিনা-সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আলমদের সংখ্যালঘু একটি গ্রুপ মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে এ ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা যাবে না। অবশ্য ফকিহদের অধিকাংশ মনে করেন যে, অমুসলিমরা ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য হবে, যদি ইমাম ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন।

ব্যাপকার্থে বলতে গেলে, সব ধরনের ফিৎনাই হিসবাহ'র সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ এর আওতায় পড়বে, কুরআন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটি করাকে অধিকার ও কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে। নির্ধারিত শাস্তি, (হুদুদ),

www.pathagar.com

প্রতিশোধ গ্রহণ (কিসাস) এবং তা'জিরের অধীনে অধিকাংশ শাস্তির মতো হিসবাহর বিষয় সরকারি কর্তৃপক্ষের আগাম সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল নয়, উপরের শাস্তিসমূহের জন্য বিচারকের রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই কোন ব্যক্তি কোন পাপ বা অন্যায় কাজ হতে দেখলে, তাকে পরিস্থিতির আলোকে নিজস্ব ক্ষমতা বা সাধ্য অনুযায়ী তাতে হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এরপর ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং তা বিবেচনা করাও হতে পারে। হিসবাহ যদি তার নির্ধারিত সীমার মধ্য থেকে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়, তা হলে যে ব্যক্তি এর উদ্যোগ নিয়েছিল, তাকে অথবা রাষ্ট্র কাউকেই কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১৪০] বিশেষ সরকারি সংস্থা যেমন বাজার পরিদর্শক (মুহতাসিব) বা পুলিশ, সংসদীয় আইন এবং উলু'ল আমরের ওপর হিসবাহর দায়িত্ব ন্যাস্ত করার কর্তৃত্ব ইমামের রয়েছে, যেমনটি অধিকাংশ মুসলিম দেশে করা হয়ে থাকে। ইমাম যদি মনে করেন যে, কাজটি করলে সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে এবং তা যদি সিয়াসাহ শারীইয়াহ'র নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়; তা হলে তিনি তা করতে পারবেন। তবে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতের আলোকে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধের সাথে নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট হবার অধিকারকে পুরোপুরি বাতিল করার কোন কর্তৃত্ব সরকারের থাকবে না।

অনুরূপভাবে তা'জিরের অধীনে মর্জিমাফিক শাস্তি প্রদানের মূলনীতিও অবাধ নয়: বিচারক ও ইমাম কেবল কোন অপরাধ সংঘটন এবং অপরাধ বা মা'সিয়াহ করার সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তির নির্দেশ দিতে পারেন। শরিয়তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি অথবা নিরুৎসাহিত করা হয়নি এমন কোন কাজের জন্য শাস্তি বিধানের একচ্ছত্র কোন ক্ষমতা মুসলিম বিচারকের নেই।[১৪১] আইনের শাসনাধীনে সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করা প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র তা'জিরের ক্ষেত্রে কাযির ক্ষমতার কতিপয় সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করেছি।[১৪২] তা'জির প্রয়োগে নমনীয়তা অবলম্বনের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে: মুসলিম সমাজের নৈতিক মান সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করা। কোন বিচারক মাসিয়াহর মাধ্যমে সত্যিকার কোন লংঘন ছাড়াই তা'জিরের অধীনে কোন শাস্তির বিধান করতে পারেন কিনা প্রশ্নের জবাবে ইবনে আবিদিন অভিমত ব্যক্ত করেন যে; তা'জির প্রয়োগের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো: সঠিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা (হাসর আসবাব আল-তা'জির)। তৎসত্ত্বেও আলেমগণ নারী পুরুষের একান্তে অবৈধ মেলামেশার (খালওয়াহ) ক্ষেত্রে তা'জিরের প্রয়োগ অনুমোদন করেছেন; কারণ তাতে যিনার পংকিল পথে পতিত হবার আশংকা রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে যিনার আশংকা আগেই রোধ করার লক্ষ্যে খালওয়াহর শাস্তি প্রদানের অনুমোদন রয়েছে। সকল মাযহাবের অনেক ফকিহ বিশেষ করে মালিকি

মাযহাবের ফকিহগণ অপরাধ করেছে বলে সন্দেহভাজনদের তা'জিরের অধীনে বিচার করে রায় দান বা প্রমাণিত হবার আগেই আটক করাকে বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৪৩] অনৈতিক কাজে জড়িত বলে সন্দেহভাজনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; যদি তাদেরকে সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সর্বশেষ কথা হলো, পরিস্থিতি দাবি করলে তা'জিরের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট শাস্তির সমন্বয় সাধন করার এখতিয়ার বিচারক বা ইমামের থাকবে। এর উদাহরণ হল, পবিত্র রমযান মাসে দিনের বেলায় নাজাশি নামে এক কবিকে মাতাল অবস্থায় খলিফা আলী রাঃ এর সামনে হাযির করা হলো। খলিফা তাকে মদপানের জন্য আট ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান করেন এবং এরপর রমযানের দিনে মদ পান করায় আরও ২০ ঘা বেত্রদণ্ড দেন। তিনি তাকে বলেন, 'পবিত্র রমযান মাসকে অসম্মান করার জন্য আপনাকে এই ২০ ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান করা হলো'।[১৪৪]

ঘ. উপসংহার

মুসলিম সমাজে জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকেই ফিৎনা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য অসংখ্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে মুসলিম সমাজের জাতি-রাষ্ট্রগুলো সাধারণভাবে নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের ব্যাপক গুরুত্বদান এবং নিজ নিজ জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আনুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়নি। জাতীয় সরকারের টিকে থাকা ও সাফল্যের জন্য এ দু'টিই জরুরি এবং এর কোন একটির জন্য অন্যটিকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এটা অনেকটা নিশ্চিত যে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার সাফল্য জাতীয় নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করে। তাই এ দুটি দিকের লক্ষ্য পরস্পরের সম্পূরক এবং সেভাবেই একে গণ্য করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করা। জাতি-রাষ্ট্রের বৈধ কর্তৃপক্ষের বৈধতা ও স্বীকৃতির প্রশ্নের মূলে রয়েছে, বর্তমান ও বিগত শতাব্দীর অন্যতম বড় বিপজ্জনক ফিৎনা, যার নাম সামরিক অভ্যুত্থান। যে সরকার শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং দমন নিপীড়ন পদ্ধতিতে তা টিকিয়ে রাখে; সে সরকারের প্রতি কোন জনসমর্থন থাকে না, থাকে না সত্যিকার আনুগত্য। একটি বৈধ সরকারের জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্ব এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার অবশ্যই থাকতে হবে।

মুসলিম সমাজে সরকারের জনপ্রিয়তা জোরদার ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হচ্ছে নিজেদের ঐতিহ্য তথা ইসলামী শরী'আতের সঙ্গে পরিচিতিকে ঘনিষ্ঠ করে গড়ে তোলা। শরী'আতে মানবমর্যাদা সংরক্ষণ ও ব্যক্তির

www.pathagar.com

অধিকার সুরক্ষার নির্দেশনা রয়েছে; যা ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করে ও স্বাধীন মত প্রকাশে অনুপ্রেরণা দান করে। সংবিধিবদ্ধ আইনে ইসলামি বিষয় বাড়াতে ফিৎনা এবং হিসবাহ্ ও শুরার মতো অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাপকার্থে নিম্নে বর্ণিত সকল ধরনের ফিৎনাই সিয়াসা শরীয়াহ'র আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে : বিদ্রোহে ইন্ধন ও প্ররোচনা দান, ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘন, বিকৃত ব্যাখ্যা দান এবং অনৈতিকতা ও দুর্নীতির প্রশ্রয়দান। তবে নিজের সততার ও নাগরিকদের আনুগত্যের ব্যাপারে দৃঢ় আস্থাশীল একটি সরকারই কেবল সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ নীতি প্রয়োগ করতে পারে বলে প্রত্যাশা করা যায়। কোন সরকারের শক্তিমত্তা ও শুদ্ধতা, সমাজের নৈতিক মানের ব্যাপারে তার উদ্বেগ এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবার, তরুণ ও স্পর্শকাতর ব্যক্তিদেরকে রক্ষায় তার আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আমাদের এ যুগের বিদ্রোহাত্মক ফিৎনা সরকারের আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারার মাত্রা এবং তাদেরকে যত বেশি সম্ভব অনুপ্রাণিত করতে পারা ও জনগণের নৈতিক নেতৃত্বদানের ওপর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমাদের এ কালের নির্যাতনমূলক ফিৎনার ফলশ্রুতিতে বিশ্বাসীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, এটি অমুসলিম সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য একটি বড় সমস্যা। তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার অধিকাংশই অবশ্য এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। আপোষমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা সরাসরি দুর্নীতির মনোভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিকৃতি সংক্রান্ত ফিৎনা পরিবার, শিক্ষা পদ্ধতি ও সরকারি বিভাগসমূহে উন্নত নৈতিক মানকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সর্বোপরি যারা বস্তুগত স্বার্থে কোন গর্হিত কাজ ও অবৈধ পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে বিবেকের সাথে কোন ধরনের আপোষ করতে প্রস্তুত নয়-এমন সুষম ও দৃঢ় চরিত্রের লোকদের প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রতি যত্ন নেয়ার মাধ্যমে সহজে দূর করা যেতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, কোন সমাজই পুরোপুরি ফিৎনা মুক্ত নয়। তবে ফিৎনা যখন সমাজের নেতাদেরকে গ্রাস করে, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হলো, মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা জাতির যে সচেতন অংশের ফিৎনা মোকাবেলা করার কথা; তারাও যদি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে, তাহলে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে সমাজের তরি কাণ্ডারিবিহীন অবস্থায় অথৈ সাগরে দিশাহীনভাবে ভাসতে থাকে।

www.pathagar.com

৯. ধর্ম অবমাননা *(সাব আল্লাহ ওয়া সাব আলরাসূল)*

ক. ভূমিকা

আমি একটি সাধারণ বিবৃতির মাধ্যমে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই, তা হলো : প্রচলিত ইসলামি আইনে ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগ উভয়ের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। সকল মাযহাবের ফিকহ্ এর বিচার সংক্রান্ত বিবরণ পাঠ করলে কারোর এব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না যে, এটিই হল আইনগত অবস্থান। তথাপি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পূর্বাপর মিল কেউ দেখতে পেলেও; ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে নয় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকার কথা জানা গেছে। এ বিষয়ে দৃঢ় যুক্তির ভিত্তিতে আমার নিজস্ব মত হলো, ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী ও বিধি বহির্ভূত। আমি মনে করি যে, এ বিরোধ নিরসনের একটি উপায় হলো: প্রথমে ধর্ম অবমাননা থেকে ধর্ম ত্যাগের পার্থক্য নিরূপণ করা। এরপর ধর্মত্যাগ থেকে রাজনৈতিক বিষয়গুলো পৃথক করা। প্রাথমিক যুগে প্রধানত: রাজনৈতিক চরিত্রের কারণেই ধর্মত্যাগের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু হয়, যদিও ধর্মীয় দিক থেকে এটি ছিল একান্তভাবে ব্যক্তির বিবেকের বিষয়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখন কতিপয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ধর্ম অবমাননার বিষয়ে প্রথম যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হলো: এর সংজ্ঞা ও অপরাধের পরিধি সম্পর্কিত। ধর্ম অবমাননার বিষয়টি সবসময় অনেকটা খোলা মেলা মনে হলেও, এর সংজ্ঞা দান বেশ কঠিন। এটি ব্যাপকার্থে কেবল ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, বরং খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্মের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োজ্য। ফিকহ'র গ্রন্থে ধর্ম অবমাননার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকা সম্ভবত এ সংকটের একটি কারণ। বস্তুত এ ধরনের গ্রন্থে ধর্ম অবমাননার বিষয়কে সাধারণভাবে ধর্মত্যাগের শ্রেণীভুক্ত করে, তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ধর্ম অবমাননার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও বৈরি আক্রমণ করা যা এর অনুসারীদের সংবেদনশীল অনুভূতিতে আঘাত করে। এরই ভিত্তিতে ধর্মত্যাগ থেকে ধর্ম আবমাননাকে পৃথক করা যেতে পারে। ধর্মত্যাগের বিষয়টি কোন বিদ্বেষপূর্ণ বা ঘৃণ্য আঘাত হানা অথবা অধর্মাচার করা ছাড়াই ঘটতে পারে। আলেমগণ সাধারণভাবে ধর্ম অবমাননার বিষয়কে ধর্মত্যাগের শ্রেণীভুক্ত করেছেন এ দৃষ্টিতে যে; কোন ব্যক্তি ধর্মে মৌলিক বিশ্বাসের অবমাননা করলে তার পক্ষে আর ধর্ম ত্যাগ করা ছাড়া কোন পথ খোলা

www.pathagar.com

থাকে না। একথা সত্য, তথাপি একটি পৃথক সংজ্ঞা দানের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষকরে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, কারণ তারা কেবল এর একটি করতে পারে, অপরটি নয়। অধ্যায়ের শুরুর প্রথম অনুচ্ছেদে আমি ধর্ম অবমাননার সংজ্ঞা ও তার পরিসর সম্পর্কিত বিষয়ের প্রকৃতি এবং ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ), অবিশ্বাস (কুফর) ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনী (যানদাকা) এর থেকে এর পার্থক্য অথবা এগুলোর সাথে একে গুলিয়ে ফেলার বিষয় ব্যাখ্যা করেছি। এরপর প্রধান প্রধান মাযহাবের আলমদের রচনা থেকে কোণ কোণ বিষয় ধর্মত্যাগের আওতায় পড়বে এবং কোণ গুলি পড়বে না তার উদ্ধৃতি দান, ধর্ম অবমাননার মধ্যে প্রাথমিকভাবে আল্লাহর অধিকার অথবা মানুষের অধিকার লংঘিত হয় কিনা, এ ধরনের কোন গুরুত্ব থেকে থাকলে সেসব বৈশিষ্ট্য কি, তা নিরূপনের মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। ধর্মত্যাগের গ্রহণযোগ্যতা অথবা অপর পক্ষে এর জন্য অনুশোচনা এবং অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ধর্মত্যাগের বিষয়ে মাযহাবসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্ণনার মধ্যদিয়ে এ অধ্যায়ের আলোচনা অব্যাহত থাকে। তাই পাঠকবর্গ স্বাভাবিকভাবে এটি প্রত্যাশা করতে পারেন যে, এ অধ্যায়ের দুটো প্রধান বিষয় হবে ধর্মের অবমাননা সম্পর্কে প্রধান প্রধান মাযহাবের বিভিন্ন নিয়ম ও মতবাদের ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং সুষ্ঠু বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ নিয়মগুলো সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্মূল্যায়ন করা। ব্যাপকার্থে ধর্মত্যাগ, নব উদ্ভাবন ও অবিশ্বাস-এর থেকে ধর্ম অবমাননার বিষয়কে পৃথক করা। আমার প্রচেষ্টার লক্ষ্যও তাই।

এ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত পরিশিষ্ট ৪-এ আমি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও মিশরে ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। পরিশিষ্ট-৫ এর একটি অনুচ্ছেদে আমি সালমান রুশদির উপন্যাস 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে সমসাময়কি ফকিহ্ বা আইনজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের দেয়া অভিমত ও তার জবাবের বিষয় পর্যালোচনা করেছি।

এ অনুসন্ধানমূলক আলোচনার লক্ষ্য, ধর্মের অবমাননার সব বিষয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা করা নয়, যেমন এ অপরাধের বিচার সংক্রান্ত অধিকাংশ বিবরণ, যা পুরোপুরি ফৌজদারি আইনের আওতায় পড়ে ইত্যাদি। অতএব আমি প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত আমার মূল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

খ. সংজ্ঞা ও পরিধি

Blasphemy (ধর্মের অবমাননা) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক 'blapto' (to harm, ক্ষতিসাধন করা) ও 'pheme' (speech, বক্তব্য) শব্দের সমন্বয়ে; যার

www.pathagar.com

সরল অর্থ হল দুর্নাম করা বা অবমাননা করা। Encyclopedia of Religion and Ethics (২য় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৬৭২) অনুসারে ইসলামে ধর্মের অবমাননা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক একটি ধারণা, যার মধ্যে পড়ে আল্লাহ, তার নামসমূহ, গুণাবলি, আইন কানুন, আদেশ ও নিষেধসমূহের ব্যাপারে সব ধরনের অবমাননাকর কথা উচ্চারণ ও প্রকাশ। এর উদাহরণ, কোন মুসলমান যদি ঘোষণা করে যে সবকিছুই দেখা ও শোনা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়, অথবা আল্লাহ চিরন্তন ও চিরঞ্জীব নন অথবা তিনি এক ও একক নন...। হজরত মুহাম্মদ সাঃ অথবা আল্লাহর অন্য কোন রাসূলের প্রতি যেকোন ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন বা উপহাস করাও ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা বলে গণ্য করা হয়।'

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ অনুচ্ছেদে ধর্ম অবমাননার বিষয়কে এতোটা ব্যাপকার্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে,'যাতে তা ব্যাপক বিস্তৃত ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ধর্ম অবমাননা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) নবোদ্ভাবন (যানদাকা) ও ইসলামকে অস্বীকার করা (কুফর)-এর মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়নি। মজার ব্যাপার হল, সম্ভবত ইহুদি ধর্মে ধর্ম অবমাননার বিষয়কে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছিল আর সে কারণেই নিছক ধর্মত্যাগ করার বিষয়কে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে সমসাময়িক পশ্চিমা আইনে ধর্ম অবমাননাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাতেও নিছক ধর্মত্যাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইসলামি আইনেও ইবনে তাইমিইয়া ও অন্যান্য বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ধর্মত্যাগ থেকে ধর্ম অবমাননাকে পৃথকভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তবে ফকিহগণের অধিকাংশ ধর্ম অবমাননাকে ধর্মত্যাগের শ্রেণীভুক্ত করে দেখিয়েছেন, সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। অন্য কথায়, ধর্ম অবমাননা, ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অস্বীকারের মতো বিষয়গুলো অনেকটা একই ধরণের এবং আন্ত :পরিবর্তনযোগ্য। একথা সম্ভবত সত্য যে, মহানবী মুহাম্মদ সাঃ এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সকল ধর্মত্যাগের ঘটনায় রাসূলের সাঃ এর প্রতি বৈরিতা ও অবমাননার বিষয় জড়িত ছিল, আর এ কারণে ধর্মত্যাগের থেকে ধর্ম অবমাননাকে পৃথক করা কঠিন ছিল। সে যুগে 'ইসলাম ত্যাগ নয়' বরঞ্চ 'রাসূল সাঃ কে অবমাননা' করার কারণেই ধর্মভ্রষ্ট ও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠোর অভিযোগ দায়ের উপযুক্ত বলে মনে করা হতো।

নিম্নের পৃষ্ঠাসমূহে আমি ইসলামে ধর্মের অবমাননার প্রধান অপরাধ হিসেবে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি তা হল, আল্লাহ ও রাসূল সাঃ কে গালি দেয়া এবং তাঁদের আদেশ নিষেধকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করা। সকল মাযহাবের

আলেমগণ ধর্মত্যাগের বিষয় বুঝায় এমন কথা, কাজ ও প্রকাশের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহতা'আলা ও রাসূল সাঃ এর অবমাননা এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করতে পারে, এমন অবমাননাকর বিবৃতিদান ও কাজ, যেমন কুরআন শরীফ আবর্জনাস্তূপের ওপর ছুঁড়ে ফেলা, মৌলিক আইন কানুন ও ধর্মের ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করা, ইত্যাদি। কথা ও কাজকে পৃথক বা একই সাথে ধর্মত্যাগ, ধর্ম অস্বীকার, নব উদ্ভাবন ও ধর্ম অবমাননা হিসেবেও সনাক্ত করা হয়েছে।[১৪৫]

আল-সামারা'ই ধর্মত্যাগের (রিদ্দাহ) কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে কোন ব্যক্তির মুসলমান হবার পর ইসলাম পরিত্যাগ বা বর্জন করার ঘটনাকে রিদ্দাহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেবল কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয়ে অবশ্য এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; এসব সংজ্ঞার কয়েকটিতে কথা ও কাজের মাধ্যমে ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটে বলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যগুলোতে বলা হয়েছে, কেবল সুচিন্তিত বক্তব্যের মাধ্যমেই নয়, বরং উপহাসের মাধ্যমে ধর্মত্যাগের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। অবশ্য এসব সংজ্ঞার অধিকাংশেই ধর্মত্যাগকে ধর্ম অবমাননার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে কিনা-সে ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে। তবে আল-সামারা'ই সবচেয়ে ব্যাপক ভিত্তিক হিসেবে একটি সংজ্ঞাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেন। শাফেঈ ফকিহ আল-কালাইউবির দেয়া সংজ্ঞায় (ইসলাম) ধর্মের নীতি পরিত্যাগ করা বুঝায়-এমন সবধরনের মৌখিক ও বাহ্যিক রিদ্দাহ এবং সব ধরনের আচরণকে ধর্ম অবমাননার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সংজ্ঞায় অবমাননাকর ও বৈরিতাপূর্ণ আচরণের প্রকাশ এবং সরলভাবে ধর্মত্যাগের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল-কালাইউবির সংজ্ঞায় বলা হয় : 'অবিশ্বাসের (কুফর) পথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির কুফরির আভাসপূর্ণ কথা বা কাজের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো রিদ্দাহ। তার সে কথা ও কাজ ধর্মের অবমাননা, বৈরিতা অথবা নিছক কুফরি থেকে উৎসারিত হয়েছে কিনা-তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না।'[১৪৬]

এভাবে পরিস্কার জানা গেছে যে, আল-কালাইউবি অথবা আল-সামারা'ইর কেউই নিজ থেকে কুফরি করা অথবা বৈরিতা কিংবা অবমাননাকর কাজ বা বক্তব্যের মাধ্যমে কুফরি করার মধ্যে কোন পার্থক্য করার চেষ্টা করেননি। রিদ্দাহ সম্পর্কে আল-কালাইউবির সংজ্ঞাকে সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক ও সুস্পষ্ট বলে গণ্য করা হয়েছে; কারণ এতে সব ধরনের কুফরির বিষয় সমভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। আমি অবশ্য এ বিষয়টিকে এ সংজ্ঞার দুর্বলতা বলে মনে করেছি। কেননা এতে

www.pathagar.com

মৌলিকভাবে পার্থক্য রয়েছে এমন ধারনাকে সমন্বিত করা হয়েছে। সাধারণ-কুফরি এবং ইসলামের বিশ্বাস কাঠামো ও অনুসারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি অবমাননাকর ও বৈরিতাপূর্ণ কুফরি এক নয়। উপরন্তু ধর্মত্যাগ ও কুফরির সঙ্গে ধর্ম অবমাননাকে সমন্বিত করার চেষ্টাও- এ সংজ্ঞার দুর্বলতার আরেকটি কারণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননাকে যদি একই বলে ধারণা করা হয়; তাহলে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত এ মূলনীতির বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে। যাতে বলা হয়েছে

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর যবরদস্তি নেই" (২:২৫৬)।

তাই আমি ধর্ম অবমাননাকে ধর্মত্যাগ ও কুফরি থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেছি এবং কেবল ধর্ম অবমাননার বিষয়ের মধ্যে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। এ আলোচনার মূল বিষয় বর্ণনার সহায়ক বিষয় হিসেবেই কেবল ধর্মত্যাগ, নব উদ্ভাবনী ও কুফরির প্রসঙ্গ এখানে আলোচনায় এসেছে।

বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াই সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, কুফরির বিষয়ে কুরআনের আয়াতে ব্যাপক ও সাধারণ অর্থ জ্ঞাপন করা হয়েছে, এ থেকে সম্ভাব্য দুটো বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। একটি 'জেনেরিক' অর্থবোধক যাতে কুফরি সম্পর্কিত ব্যাপক ধারণা প্রযোজ্য হয়েছে, ঈমান ও এর মূল নীতি অস্বীকার করা বুঝায় এমন সকল কাজ ও কথা উচ্চারণ এর আওতায় পড়বে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য হলো: ধর্মত্যাগ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধারণার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট তুলে ধরার চেষ্টা করা। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং এ গ্রন্থের অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এর বিকল্প একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে; যাতে ধর্ম অবমাননা ও কুফরির অন্যান্য ধারণার মধ্যে পার্থক্যের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। আমরা কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত থেকে ধর্ম অবমাননার তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, তা হলো, বৈরিতাপূর্ণ বিরোধিতা (মুহাদাদাহ), সূরা আল-তাওবা (৯:৬৩), জঙ্গি পন্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (মুশাকাকাহ) সূরা আল-আনফাল (৮:১৩) এবং বিরক্তি প্রকাশ (আযহা) সুরা আল আহযাব, (৩৩:৫৭)। এর প্রতিটিতে মহান আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূলের সাঃ প্রতি আঘাত দান অথবা জঙ্গি পন্থায় বৈরিতা প্রকাশ পেয়েছে।[১৪৭] আমরা এখন কেবল বৈরি ও অবমাননাকর কুফরি সংক্রান্ত বিষয়কেই ধর্ম অবমাননা বলবো এবং যেসব কুফরির ক্ষেত্রে এ উপাদান নেই-তা থেকে আমরা ধর্ম অবমাননার বিষয়কে কার্যকরভাবে পৃথক করবো।

www.pathagar.com

ধর্ম অবমাননাকে একটি সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা যে যুক্তিসঙ্গত আমরা ইত:মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি। প্রথমত এতে অবমাননা ও অপবাদ দানের বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে, যা সম্ভবত অন্যান্য কুফরির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, দ্বিতীয়ত: এটি সমাজের ঈমানদার লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে থাকে। ধর্ম অবমাননার সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যত ধর্মত্যাগের বিষয় সম্পর্কিত থাকে কিন্তু ধর্মত্যাগ বলতে ধর্ম অবমাননা বুঝাবে না, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে ধর্মত্যাগ নিছক ধর্ম বিশ্বাসকে বর্জন করা বুঝায় এবং তার সাথে কোন অধর্মাচারের বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে না। কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন অমুসলিমের ক্ষেত্রে ধর্মত্যাগের অপরাধ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ধর্ম অবমাননার ঘটনা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ধর্ম অবমাননার অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তাতে কথা ও কাজের মাধ্যমে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে ঈমানদারদের ধর্মানুভূতির প্রতি বৈরিতা ও অবমাননার প্রকাশ থাকতে হবে। একজন অমুসলমান ইসলামের বিশ্বাসের কাঠামোর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নিজ ধর্মের কোন বিধিবিধান কেবল গ্রহণ করার মাধ্যমে ধর্মের অবমাননা করতে পারেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু খ্রীস্ট হলেন খোদার পুত্র, যা ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের জন্য অবমাননাকর বলে মনে হতে পারে, কারণ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "মহান আল্লাহর কোন সন্তান নেই" (১১২:৩) কিন্তু খ্রীস্টানরা সাধারণভাবে এটি বিশ্বাস করে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য নয়। এটি তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হওয়ায়, তারা কোন ধর্ম অবমাননা করছে না। অন্যদিকে কোন মুসলমান ধর্মের অবমাননাকর কিছু করলে সে স্বাভাবিকভাবেই, ইসলাম ত্যাগ করবে। ইবনে তাইমিইয়া এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ধর্ম অবমাননাকারী (আল-সাব্বাব) আল্লাহতা'আলা, ও তাঁর নবী রাসূলদের সাঃ অবমাননা, উপহাস ও কলংক লেপন করে থাকে, যা যে কোন ধরনের অবিশ্বাসের চেয়েও গুরুতর অপরাধ।[১৪৮] অধিকাংশ 'আলেম' এ মত পোষণ করেন, এমনকি এর সপক্ষে একটি মতৈক্য (ইজমা) হয়েছে বলেও অনেকে দাবি করে থাকেন।[১৪৯] তবে এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু একটি মতও রয়েছে। ইরাকের কতিপয় আলেম এ মত পোষণ করেন। তাদের মতে, ধর্ম অবমাননা করতে বুঝায় এমন অমর্যাদাকর ও গালিগালাজপূর্ণ কথা, উচ্চারণকারী যদি মনে করে যে, সে যা বলেছে নীতিগতভাবে তা অনুমোদনযোগ্য (ইনাকানা মুস্তাহিল্লাহ), কিন্তু সে যদি এরূপ দাবি না করে, তাহলে সে খেয়ালখুশি অনুযায়ী অপরাধ করার (ফিস্ক) জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবে, কুফরির জন্য নয়।[১৫০] এ অভিমত ধর্ম অবমাননার আওতায়

পড়া রোধকারী এমন সব কথা, যা লঘু কোন পরিবেশে উচ্চারিত হতে পারে এবং তাতে ভারসাম্যপূর্ণ বিচার বিবেচনা অথবা তার মনের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে না।

আমি আইন বিশেষজ্ঞদের ধর্মত্যাগ বিষয়ক অধ্যায়ের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি যে, তাঁদের আলোচনার মূল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, চারটি প্রধান মাযহাবের 'আলেমদের' ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত বিচারিক ব্যাখ্যায় মাত্র গুটিকয়েক দিকের ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মত্যাগী বা ধর্ম অবমাননাকারীকে তাওবা বা অনুশোচনা করার সুযোগ দেয়া উচিৎ কিনা, তার এ তাওবা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা, অথবা আপনা আপনি তার কিছু অধিকার বাতিল হয়ে যাবে কিনা, যেমন ধর্ম ত্যাগের সাথে তার মালিকানাধীন সম্পত্তির অধিকার এবং এমনকি তাওবা করার সময়ও ধর্মত্যাগের আগের মতো সে তার ইবাদত-বন্দেগি পালন, যেমন নামায আদায় ও রোযা পালন পূর্বের মতোই করতে পারবে কিনা-তা নিয়ে আলোচনাকালে তাদের এ মতপার্থক্যের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞগণ নমুনা হিসেবে আর যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে: ধর্ম অবমাননার ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের (যিম্মি) সাথে মুসলিমদের মতোই আচরণ করা হবে কিনা, নারী ধর্মত্যাগীর শাস্তির মাত্রা পুরুষের সমপরিমাণ হবে কিনা এবং রাসূল সাঃ এর স্ত্রীগণ ও সাহাবিদের রাঃ প্রতি অবমাননাকে খোদ রাসূল সাঃ এর প্রতি অবমাননার অনুরূপ বিবেচনা করা হবে কিনা। আইন বিষেশজ্ঞগণ-আল্লাহর অবমাননা করা (সাব আল্লাহ্) ও রাসূল সাঃ এর অবমাননার জন্য কোন পার্থক্য করা হবে কিনা এবং অন্যান্য স্বীকৃত নবী-রাসূল ও ফিরিশতাদের অবমাননা করাও ধর্ম অবমাননার মধ্যে পড়বে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। আইন বিশেষজ্ঞগণের বিবরণীতে এসব বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সুসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব বিষয়ের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে 'আলেমগণ' কি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তা এমনকি কোন সংজ্ঞা ছাড়াই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম পাথর্ক্যের ক্ষেত্রে 'আলেমগণের' আলোচনায় উচ্চ পর্যায়ের স্পর্শকাতরতা ও সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টি পাঠকদের মুগ্ধ করেছে। তৎসত্ত্বেও কতিপয় বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং এর মধ্যে অন্যতম বিতর্কিত বিষয়টি হল: অবিশ্বাস (কুফর) সম্পর্কিত সঠিক সংজ্ঞা, আর এ কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

গ. অবিশ্বাস *(কুফর)*

কুফর সম্পর্কিত আইন বিশেষজ্ঞদের সাহিত্যে প্রাথমিকভাবে যেসব প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে, তাহলো কোনটি কুফর এবং কোনটি তা নয়, এর অর্থ কি। এটি ব্যাপক ভিত্তিক অর্থবোধক যার মধ্যে পড়ে সব ধরনের অবিশ্বাস, বহুদেববাদ (শির্ক), ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগ। কুরআন-সুন্নাহ এবং 'আলেমদের আইন সংক্রান্ত রচনায় কুফরির ঘটনার দু'টি ভিন্ন অর্থ রয়েছে, তা হলো, বৃহৎ কুফর (তথা আল-কুফর আল-আকবর)। এতে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সত্যকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। ছোট কুফর (আল-কুফর দুন আল-কুফর), কুফর-পূর্বের কুফরের চেয়ে নিম্ন মাত্রার, এতে সরাসরি অবিশ্বাসের বিষয় প্রমাণ পায়না, রূপকার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যাতে আচরণের মাত্রার প্রকাশ নিরোধ করে, প্রকৃত পক্ষে তাতে খামখেয়ালি (ফিস্ক) বুঝায়।[১৫৪] মজার ব্যাপার হলো, এখানে কুফর শব্দটি একটি জেনেরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা কোনক্রমেই 'অবিশ্বাস' বুঝায় না। যেসব পাঠক ইসলামের বিভিন্ন ফিরকা বা উপদলীয় সাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত; তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন যে: বিভিন্ন ফিরকা ও উপদল পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরির অভিযোগ যেরূপ ঢালাওভাবে করেছে, তাতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কুফরির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে সবসময় অবিশ্বাসী (কাফির) এর থেকে বড় ধরনের গুনাহগার (ফাসিক) ও প্রতারককে (মুনাফিক) আলাদা করা সহজ হয় না।

ইবনে হাযম তার গ্রন্থ আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল আহওয়া ওয়া'ল নিহাল-এর মধ্যে কে কাফির এবং কে কাফির নয় শীর্ষক একটি অধ্যায় রেখেছেন। এতে তিনি এবিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

> "কোণটি কুফর বা অবিশ্বাস বুঝায় এবং বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য কি তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এমন উপদল, ফিরকা বা গোষ্ঠী রয়েছে, যারা মনে করে যে: কেউ তার নিজ নিজ মত ও নীতি প্রত্যাখ্যান করলে, সে কাফের হয়ে যাবে।... অপরদিকে অন্যরা মনে করে যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাদের নিজস্ব নীতি প্রত্যাখ্যানের বিষয় যদি আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত হয়; তা হলে তা কুফর বুঝাবে তবে তা যদি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হয়, তা হলে তা খামখেয়ালি (ফিস্ক) বুঝাবে। অন্য এক মত অনুযায়ী যুক্তিহীন অথবা বিচার বিষয়ে (ই'তিকাদ আউ ফতোয়া) মত প্রকাশের কারণে কোন মুসলমানকে কুফর ও ফিস্ক এর তোহমত দেয়া যাবে না এবং এ ধরনের মতামত (বস্তুতপক্ষে) একধরনের ইজতিহাদের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়েছে বুঝালে, তা পুরস্কারযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[১৫৭]

www.pathagar.com

একই পৃষ্ঠায় ইবনে হাযম লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি ফরয ইবাদতসমূহ যেমন নামায (আল সালাত), সঞ্চিত অর্থের একাংশ দান (যাকাত), রমযানে রোযা পালন (সিয়াম) এবং হজ্জ আদায় করা পরিত্যাগ করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে কিনা সে ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এরপর তিনি, খারিজি, কাদেরিয়া, বাতিনিয়া ও মুতাযিলা মত ও নীতি এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ তুলে ধরেন এবং তা খামখেয়ালি কিংবা সরাসরি অবিশ্বাস বা কুফরির পর্যায়ে পড়ে কিনা সে সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করেন।

এ ধরনের বিস্তারিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়া আমার উদ্দেশ্য নয়, এমনকি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কর্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরির অভিযোগ নিরূপণ, মূল্যায়ন বা খণ্ডন করাও আমার কাজ নয়। আমি এখানে কেবল এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, এসব অভিযোগের অনেকগুলো কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা-চেতনার পরিপন্থী। এছাড়া কুফর সম্পর্কে সর্বসম্মত সংজ্ঞারও অভাব এজন্য আংশিক দায়ী। এ কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদল পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরির অভিযোগ করার সুযোগ পেয়েছে। উপরন্তু কুফর সম্পর্কিত ধারণা ও সংজ্ঞা সুবিধামতো ব্যবহারের এতোটা বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে যে, তাতে কোন ধরনের পদস্খলন; এমনকি নিছক মতপার্থক্যের কারণে 'কুফর' আখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। এটা নিশ্চিত যে, কুফর সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি নিহিত রয়েছে এর বিপরীত দিকে; কুফরের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করার পরিবর্তে একে ছোট আকারে ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধারণা থেকে একে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের কুফরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ এবং যেসব আনুষঙ্গিক বিষয় পৃথক করার যোগ্য বলে বিবেচিত; সেগুলোকে পৃথক করার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাসূল সাঃ-এর সুন্নাহর সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

বিভিন্ন হাদিসে কিছু মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (যার কয়েকটি আমি ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি)। আবু জাহরাহ তার সারসংক্ষেপ তুলে এনেছন: সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কেউ কারো বিরুদ্ধে কুফরি, ধর্ম অবমাননা অথবা ধর্ম ত্যাগের অভিযোগ করতে পারবে না এবং কেউ যদি এরূপ করে তাহলে তার নিজের উপরই এ অভিযোগ বর্তাবে।[১৫৩] আল গাযালি এ মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি কয়েকটি উপদলের পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরস্পরের বিরোধীদেরকে কাফের ও নাস্তিকের অভিযোগে অভিযুক্ত করার বাধ্যতামূলক পালনীয় নির্দেশেরও সমালোচনা করেছেন। গাযালি তাঁর গ্রন্থ আল মুনকিয মিনআল দালাল-এ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন:

'মহান আল্লাহতা'আলা তাঁর সিংহাসনে দৃঢ়তার সঙ্গে সমাসীন রয়েছেন- একথা সত্য বলে ঘোষণা করার কারণে হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীরা আশ'আরীদেরকে কাফের বলে মনে করে...। আশ'আরিরা মুতাযিলাদের এ কারণে কাফের বলে থাকে যে, তারা 'মহান আল্লাহতা'আলার চাক্ষুষ দর্শনের সম্ভাবনার ব্যাপারে' সাহাবীদের কথাকে সত্য বলে মনে করে না।'[১৫৪]

পরবর্তী অধ্যায়ে আল গাযালি এ ধরনের অভিযোগ আরোপ করাকে অনুমোদন করেননি:

'সন্দেহজনক বিষয় দু'ধরনের, এর একটি ঈমানের মূল স্পর্শ করে এবং অপরটি এর শাখা প্রশাখাকে। ঈমানের মূল হচ্ছে তিনটি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল (স:) ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর সব হলো এর শাখা-প্রশাখা। জেনে রাখুন, কোন শাখার ব্যাপারে কারোর কুফরির অভিযোগ আরোপ বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।'[১৫৫]

এভাবে কুরআন-সুন্নাহতে উল্লিখিত আল্লাহতা'আলাকে মানুষরূপে কল্পনা করা এবং আল্লাহতা'আলা "আরশের ওপর সমাসীন রয়েছেন"-এর যথার্থ অর্থ অজ্ঞাত (উদাহরণ হিসেবে দেখুন, ৫৭:৪)। এসব বিষয়ের অর্থ স্পষ্টত অনুমানমূলক এবং এর ভিত্তিতে অভিযোগের কারণে কাউকে অবিশ্বাসী বলা হবে সম্পূর্ণ অনৈতিক কাজ। এ ধরনের পরিভাষা কুরআনের অংশ হলেও এর অর্থ 'রূপক' (মুতাশাবিহাত) বলে পরিচিত এবং কেবল মহান আল্লাহতা'আলাই এসবের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহ সম্পর্কে এ ধরনের বিষয় নিয়ে সন্দেহমূলক আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় অনুৎসাহিত করা হয়েছে। এর পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রামাণ রয়েছে। এ সম্পর্কিত সুনিশ্চিত কিছু দাবি করা এবং তার ভিত্তিতে কাউকে অবিশ্বাসী বা কাফের বলে অভিযুক্ত করা হলো বাড়াবাড়ি।

আল-গাযালি ছাড়াও ইবন আবেদিন অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, মাযহাবসমূহের অনুসারীদের অনেক রচনায় অবিশ্বাসী বলে প্রমাণহীন অনেক অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, প্রখ্যাত মুজতাহিদদের কেউই এ ধরনের অভিযোগ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। যাদের লেখায় এসব অভিযোগ পাওয়া গেছে, তারা নিম্নমানের লেখক এবং এসব রচনার তেমন কোনো দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

ঘ. বিভ্রান্তি *(যানদাকা)*

কুফর বিষয়ক সাহিত্যে প্রায়ই একই ধরণের ধারণা চোখে পড়ে। রাসূল সাঃ এর জীবদ্দশায় যেসব লোক নিজেদেরকে বাহ্যত নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী

www.pathagar.com

বলে বেড়াতো; কিন্তু 'বকধার্মিকদের (মুনাফিকুন) পছন্দ করতো; তাদের ক্ষেত্রে 'বিপথগামী বা বিভ্রান্ত ব্যক্তির' (যানদিকা) পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। এ ব্যক্তিরা তাদের অন্তরের অবিশ্বাসকে (কুফর) গোপন রেখে বিশ্বাসীর (ঈমানদার) ভান করতো এবং ঈমানদারদের মধ্যে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াতো।[১৫৭] যানদাকা'র সুনির্দিষ্ট অর্থ ও সংজ্ঞা অনেকটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের উপলক্ষসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে, আলেমগণ যানদাকা'র শাস্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কঠোর নীতি গ্রহণ করেছেন।

'যানদাকা' ও 'যানাদিকা'র বিভিন্ন অর্থ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কেউ কেউ ইসলামের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি ধৃষ্টতা, ঘৃণা ও বৈরিতা (আল-তাহাত্তুক ওয়া'ল-ইস্তি হতার) প্রকাশ করতো অথবা মাযদাক ও মানির মতবাদ এবং অজ্ঞেয়বাদের অনুসরণ করতো। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে, যেসব লোক গোপনে মানি এবং মাযদাক-এর প্রতি বিশ্বাসী বলে স্বীকার করে; কিন্তু প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রায় এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটি ছিল 'যানদাকা' শব্দের প্রাথমিক প্রয়োগ। এর অন্যান্য অর্থ ক্রমান্বয়ে হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে সংযোজন করা হয়। যেসব লোক তাদের পূর্বেকার ধর্মে বিশ্বাস করতো কিন্তু ক্ষমতা বা মর্যাদা বৃদ্ধি ও বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকাশ্যে ইসলামের অনুসারি বলে জাহির করতো, তাদেরকে বুঝাতে ঢিলাঢালাভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করা হতো।[১৫৮] যেসব লোক প্রতিটি ধর্মের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ এবং সকল ক্ষেত্রে যুক্তির প্রাধান্য প্রদান করতো, তাদেরকে বুঝাতেও তা প্রয়োগ করা হতো। এছাড়া যারা কুফরি মতবাদ প্রচার এবং মদ পান করত, অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকত এবং ধর্মবিশ্বাসের সকল দিকের উপহাস করতো; তাদেরকে যানাদিকা'র অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। উপরন্তু যারা এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর (দাওয়াম আল-দাহর) অস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে তাদেরকে যানাদিকা বলা হয়। মূলত তারা হলো দিসান, মানি ও মাযদাকের অনুসারী। তারা বিশ্বাস করে যে, এ সৃষ্টির মূল হচ্ছে আলো ও আঁধার এবং তার থেকে এই মহাজগতের সৃষ্টি হয়েছে। মাযদাক আরো এমত প্রচার করতেন যে, নারী ও জমি হচ্ছে সকলের সাধারণ সম্পত্তি।[১৫৯]

যানদাকা, কুফর, সাব আল্লাহ ওয়া'ল রাসূল সাঃ ও রিদ্দা'র সংজ্ঞা দানের এ অস্পষ্টতা এবং এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের অভাবের বিষয়টি দ্য ইনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে:

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম ত্যাগের (রিদ্দা) সন্দেহ উদ্রেক করার মতো কোন কারণ থাকতে পারে; এমন যে কোন মৌখিক উচ্চারণকে ধর্ম অবমাননার সংজ্ঞা

হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষা হিসেবে ধর্মাবমাননাকে প্রায়ই অস্বীকৃতির (কুফর) সমার্থক গণ্য করা হয়- যাতে সুচিন্তিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে প্রত্যাখান করা হয়। এ দৃষ্টিতে ইসলামের স্বীকৃত মতাদর্শের পরিপন্থি ধর্মীয় অভিমত প্রকাশ করাকে সহজে ধর্মাবমাননা বলে গণ্য করা যেতে পারে। ধর্মাবমাননাকে বিভ্রান্তি বা বিপথগামিতার (যানদাকা) সমার্থক বলেও গণ্য করা যেতে পারে...। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামে ধর্মাবমাননার ধারণা বর্ণনা কেবল আল্লাহ, রাসূল (সঃ) ও আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে অবমাননাকর বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; উপরন্তু সন্দেহজনক ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান, এমন কি রহস্যজনক প্রবচনও এর আওতার মধ্যে পড়বে।[১৬০]

কতিপয় ফকিহ যানদাকা'র ব্যাপারে বিশেষ কঠোর নীতি গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে ইরাকের হানাফিরা এমন কি ধর্মত্যাগীর চেয়েও বিভ্রান্ত ব্যক্তির (যিনদিক) বিরুদ্ধে অধিকতর কঠোর আচরণ করেন। উভয় অপরাধের জন্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও ধর্মত্যাগীকে অনুশোচনা বা তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়-এর পরিপ্রেক্ষিতে সে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু কেবল হানাফিগণ নন, ইমাম মালিকও রায় দিয়েছেন যে, যিনদিকের ক্ষেত্রে তাওবার কোন সুযোগ নেই এবং কোন কিছুর বদলেই মৃত্যুদণ্ড থেকে সে অব্যাহতি পাবে না। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈসহ অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন যে, বিভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মত্যাগীর অনুরূপ আচরণ করতে হবে এবং তাকেও তাওবা করার সুযোগ দিতে হবে।[১৬১]

ঙ. ধর্মাবমাননার কথা উচ্চারণ ও উদ্দেশ্য'র প্রশ্ন

এখানে প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবেঃ তা হলো ধর্মাবমাননাকারীর মনের অবস্থা এবং সে যে কথা উচ্চারণ করেছে তা নিয়ে তার প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য কি ছিল। ধর্মাবমাননা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাই দেখতে হবে এটি কতখানি সঠিক। উচ্চারিত বক্তব্যে অপরাধীর মনের প্রকৃত অবস্থার অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছিল কিনা আইনে তা প্রমাণ করা কি জরুরি? দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা যার সাহায্যে শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে ধর্মাবমাননাকর বলে বিবেচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে 'আলেমগণ' কর্তৃক বিশেষভাবে সনাক্ত কতিপয় শব্দ ও উচ্চারণ সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেবে, কেবল তার উচ্চারিত কথার ভিত্তিতেই সে-কি কাফেরে পরিণত হবে, এ প্রশ্নের জবাবে ইবনে হাযম লিখেছেন যে, জাহমিয়া ও

www.pathagar.com

আশ'আরিয়া ছাড়া বিশ্বের আর কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না যে, সাব আল্লাহ হলো কুফরি। এ দু'গোষ্ঠী মনে করে যে, কেউ আল্লাহ তা'আলাকে অবমাননা করার পর তাকে কাফের ঘোষণা করলে সে কাফের হয়ে যাবে-তা নয়, বরং এতে কেবল এ কথার আভাস দেয়া হয়েছে যে, অপরাধী ব্যক্তি আল্লাহতেও অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছে। ইবনে হাযম এ সম্পর্কে আরো বলেন যে, এমতটি একটি অসৎ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামের অনুসারীদের সর্বসম্মত মত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এর কারণ তারা (জাহামিয়া ও আশ'আরিয়া) বিশ্বাস করে যে, ধর্ম বিশ্বাস (ঈমান) অন্তরের সত্যতার সমন্বয়ে (তাসদিক বিল কাল্‌ব) গড়ে ওঠে। তাই এর তুলনায় কথা উচ্চারণ বা বিবৃতি তেমন কোন গুরুত্ব পেতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি কুফরির কথা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীতে পরিণত হবে না। ইবনে হাযম আবারও এ ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি একে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস (কুফর মুজাররাদ) বলে গণ্য করেন। কারণ, এমত মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা) এবং মহান আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর নির্দেশের পরিপন্থী। ইবনে হাযম আরো বলেন, যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী যা রাসূল সাঃ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা ঈমান ও কুফরির বিষয়টি অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে বলে আমাদের যুক্তির সাথে একমত পোষণ করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য পবিত্র কুরআনে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। এখানে ইবনে হাযম তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দুটি আয়াত উদ্ধৃত করেন :

لَقَدْ كَفَرَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ .

ক.যারা বলে মাসীহ ইবন মারইয়াম হচ্ছেন আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র,তারা অবিশ্বাসী (৫:১৭)।

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ.

খ. এবং তারা নিশ্চয়ই সেই কুফুরি কথা বলেছে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি অবলম্বন করেছে। (৯:৭৪)।

এভাবে উল্লিখিত আয়াতে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয়টি নির্ধারিত হয়: তাদের কথার ভিত্তিতে, যদি কোন ভয়ভীতির কারণে তা বলা হয়েছে বলে জানা না যায়। অনুরূপভাবে, ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় নিশ্চিত হবার জন্য তার আচরণের ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণই যথেষ্ট। উদাহরণ হল,

www.pathagar.com

মহান আল্লাহতা'আলা শয়তানকে তখনই অবিশ্বাসী বা কাফের বলে ঘোষণা করলেন; যখন আল্লাহ তাকে আদম আঃ কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করলো (২:৩৪)। একথা থেকে এটি মনে করা হয় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও শয়তানের আচরণের ফলে এ ঘোষণা দেয়া হয়। শয়তানের কথাতে প্রকাশ পায়, তাকে আগুন থেকে আর আদমকে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ইবনে হাযম আরও বলেন, ঈমান হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্তলের গোপন বিষয়, যা কেবল মহান আল্লাহই জানেন; তবে লোকদের কথা ও আচরণের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়টি স্থির করে থাকি। ইবনে হাযম উপসংহারে বলেন, আল্লাহ ও রাসূলকে সাঃ গালাগাল করা হবে কুফরি। এক্ষেত্রে গালিদাতা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে, এমনটি না বুঝানোর সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না।[১৬২]

কোন মুসলমানকে ধর্ম অবমাননা বা ধর্মত্যাগের কারণে কাফের (তাকফির আল মুসলিম) ঘোষণার ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে। যে সুনিশ্চিত ঘটনার ভিত্তিতে বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে, তা হলো, কথা ও কাজ, যার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণের সমর্থন থাকবে। কুফরির কথা সুস্পষ্ট হতে পারে, যেমন প্রকাশ্যে আল্লাহ ও রাসূলকে সাঃ গালাগাল করা, সাধারণভাবে যা কটুকাটব্য বলে পরিচিত, যাতে উপহাস, বৈরিতা বা অবমাননা প্রকাশ পায়। এ ধরনের শব্দের পিছনে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কি ছিল-সে প্রশ্ন গুরুত্বহীন। শর্ত হলো, অপরাধী ব্যক্তিকে মানসিকভাবে পূর্ণ সুস্থ থাকতে হবে। ঈমান যে পুরোপুরি অন্তরের বিষয়-এ কথা অস্বীকার করা হয়নি এবং জুরিরা (ফকিহগণ) একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার কুফরিকে গোপন রাখে, সে আল্লাহর চোখে একজন অবিশ্বাসী হলেও শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা-কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। ভয়ভীতিকর অবস্থার মধ্যে কেউ এ ধরনের কথা উচ্চারণ করলে, সে ঈমানদার থাকবে অথবা অনুমোদনযোগ্য উন্মত্ত অবস্থায় এসব কথা বলা হলে; তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না। অবশ্য যা নিষিদ্ধ-উন্মত্ত অবস্থায় সে ধরনের কথা উচ্চারণকে মালিকি, হাম্বলি ও শাফেঈ মাযহাবের আলেমগণ ক্ষমারযোগ্য বলে মনে করেননি এবং কেউ এ ধরনের অবস্থায় ধর্ম অবমাননা বা ধর্মত্যাগের ঘটনা সংঘটিত করলে সে অবশ্যই দায়ী হবে। কেবল হানাফী আলেমগণ মনে করেন যে, কোন উন্মত্ত ব্যক্তিকে তার উন্মত্ত অবস্থার ধরনের ভিত্তিতে কাফের ঘোষণা করা যেতে পারে না। তার উন্নত্ততার ধরন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে।[১৬৩]

www.pathagar.com

ধর্ম অবমাননায় পারিপার্শ্বিক একটা দিক রয়েছে-বিষয়বস্তু, প্রচলিত রীতিনীতি ও জনমতের আলোকে যার পরিবর্তন যার ঘটতে পারে। কোন শব্দের অর্থ প্রায়শই বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে উচ্চারিত এবং প্রথাগত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে শব্দ ও প্রচলিত রীতিনীতির ব্যবহারে সবসময়ই যে তা সুস্পষ্ট হয় তা নয়, এছাড়া পরোক্ষ ও ইঙ্গিতপূর্ণ অবমাননাকর শব্দে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকেই। উপরন্তু কোন শব্দের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী তা অবমাননাকর বুঝালেও কিন্তু আভিধানিক অর্থে তা দোষণীয় নাও হতে পারে, এমন ক্ষেত্রেও সাধারণত পূর্বের অর্থ গ্রহণ করা হয়; কারণ তা অধিকতর গুরুত্বহ। যেহেতু সময় ও স্থানের পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এতে দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন অবমাননাকর শব্দে অবমাননা বুঝায়; কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে তা বুঝায় না, এ কারণেই হয়ত ইবনে তাইমিইয়া বলেছেন যে, কেবল ভাষাগত বা বিচারিক কারণে অবমাননার বা সাব বিষয় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তাই এ বিষয়টি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই মৌলিক মানদণ্ড হতে হবে: প্রাসঙ্গিক জনপ্রিয় রীতিনীতি। গালিগালাজপূর্ণ শব্দের গুরুত্ব এরই ভিত্তিতে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন এবং লোকেরা যা কিছু অবমাননাকর বলে মনে করে, তাকে সে দৃষ্টিতেই বিবেচনা করতে হবে।[১৬৪] ইবনে তাইমিইয়া এর বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন যে, মৌখিক অবমাননা দুই প্রকারে ঘটে থাকে, তাহল অভিশাপ অবমাননা। অভিশাপের ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণ করা হয়, যেমন 'আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন, 'তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক', 'তোমার মরণ হোক', ইত্যাদি। উচ্চারিত কোন কথার অর্থ যদি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়, তাহলে তা অবমাননা বুঝাবে। কিন্তু কিছু লোকের কাছে যদি অর্থ সুস্পষ্ট এবং অন্যদের কাছে অস্পষ্ট থাকে; তাহলে তা অবমাননা বুঝাবে না। যেমন, একাধিক সময়ে ইহুদিরা রাসূল সাঃ কে আপনার মরণ হোক (আস সাম আলাইকুম) বলে সম্ভাষণ জানিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একথা ও এধরনের অন্যান্য কথা উচ্চারণ কি ধর্মাবমাননা বুঝাবে? এখানে দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি অনুযায়ী এসব কথা উচ্চারণ ধর্মাবমাননা বুঝাবে; তবে দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে যে, কোন কথার অর্থ যদি সুস্পষ্ট ও তথ্যহীন না হয়, তাহলে তা ধর্মাবমাননা বুঝাবে না। অন্য কথায় ধর্মাবমানার বিষয় কোন সম্ভাষণের আড়ালে লুকায়িত থাকলে তার সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পাবে না। এসব হাদিসে আভাস পাওয়া গেছে, রাসূল সাঃ এ ধরনের অপরাধের জন্য কাউকে কোন দণ্ড প্রদান করেননি। উপরন্তু রাসূল সাঃ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন:

www.pathagar.com

قَالَ النَّبِىُّ صلى : اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا اَسْلَمُوْا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

> 'যখন ইহুদিরা তোমাদের মরণ হোক' (আল-সাম আলাইকুম)' বলে তোমাদেরকে সালাম দেবে, তখন তোমাদের শুধু এ কথাই বলা উচিত হবে, এবং (ওয়া-আলাইকুম) তোমাদেরও।[১৬৫]

এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি মত রয়েছে, তা হলো, নীতিগত দিক থেকে এ অবমাননার ঘটনা ইহুদিদের মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য যথেষ্ট এবং প্রকৃত ঘটনা হলো যে, রাসূল সা: অপরাধীদের ক্ষমা করে দেন; কারণ সে সময়ে ইসলাম ততোটা শক্তিশালী ছিল না। এ অভিমত উল্লেখ করার পরও ইবনে তাইমিইয়া অভিমত ব্যক্ত করেন যে: 'এটি অযৌক্তিক ও অনুমানভিত্তিক কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়, কারণ এতে যদি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অবমাননাকর ঘটনা ঘটতো, তাহলে রাসূল সা: তার নির্দেশ দিতেন, অথবা তা যদি কিছুটা শাস্তিযোগ্য, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডযোগ্য না হতো; তাহলে রাসূল সা: অপেক্ষাকৃত কম শাস্তির নির্দেশ দিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাসূল সা: এ ধরনের কোন নির্দেশ দেননি, যা থেকে এ আভাস পাওয়া যায় যে, এ ঘটনা দণ্ডযোগ্য ছিল না।'[১৬৬] এ ব্যাপারে ইবনে হাযম একটি অনুসিদ্ধান্তমূলক অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, উল্লিখিত ইহুদি যদি একজন মুসলমান হতো, তাহলে রাসূল সা:কে আল সাম আলাইকুম বলার জন্য অবিশ্বাসী বা কাফেরে পরিণত হতো।[১৬৭]

আরবিতে আরেক ধরনের অবমাননা তা'রিদ বিল আজা বা বিরক্ত করার চেষ্টা বলে পরিচিত এবং এতে অশুভ কামনা বা অভিসম্পাত দানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে; যা প্রকৃতপক্ষে সত্য। যখন কেউ বলে, 'অমুকের মরণ হোক', তখন প্রশ্ন উঠতে পারে-এ ধরনের অভিসম্পাত দানের ঘটনা কি সত্যিকার অর্থে অবমাননা বুঝায়? একটি মত অনুযায়ী: 'এ ধরনের কথা উচ্চারণ অবমাননা বুঝাবে, যদি তা বিশ্লেষণ করে এমন কিছু জানা যায় যা অবশ্যই সত্য।' তবে ইবনে তাইমিইয়া এ মতকে অত্যন্ত দুর্বল বলে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূল সা: এর মৃত্যু কামনা করা অবমাননা বুঝাবে এবং কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন আচরণও অবমাননা বুঝাবে।[১৬৮]

আলোচ্য দ্বিতীয় ধরনের অবমাননাকর কথা হলো 'গাধা', 'কুকুর', 'ধোঁকাবাজ' এবং অনুরূপ নাম বা বস্তুর সমার্থক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যা জনগণের প্রচলিত প্রয়োগ রীতি অনুযায়ী সরাসরি অবমাননাকর। এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ আরবদের

প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী অবমাননাকর। ইবনে তাইমিইয়ার মতে, এ ধরনের অবমাননাকর কথা গদ্যে না পদ্যে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি আরও বলেন যে, উপহাসমূলক কবিতা অধিকতর আক্রমণাত্মক কারণ: তা গদ্যের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরভাবে আবেগের সঞ্চার করে। অত:পর ইবনে তাইমিইয়া গালিগালাজ ও অবমাননাকর কথার একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন, যা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ভাষায় এ ধরনের সীমাহীন শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে। এ ধরনের কথা, যে পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছে: তা এবং সমাজের প্রচলিত আচার-আচরণ ও রীতিনীতির কথা এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।[১৬৯]

এছাড়া মানহানি ও কটূক্তির বিপরীতে অবমাননা করার কথায় সাধারণত: ত্রুটি ('আইয়িব) এমনভাবে প্রকাশ পায়; যা অন্যদের চোখে তাদের ব্যক্তিগত সম্মানকে সংশয়পূর্ণ করে তোলে। সত্য ঘটনার ক্ষেত্রে এ ধরনের কারণ অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। আমি অন্যত্রও এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেছি যে, এটি হচ্ছে অবমাননা ও মানহানির মধ্যকার একটি পার্থক্যের দিক, মানহানি সাধারণত অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে করা হয়।[১৭০]

কোন কথা উচ্চারণ অথবা অন্য কোন আচরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তার মনোভাব প্রকাশ করলে; তাতে যদি ঐ ব্যক্তির অবমাননা করার কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে সাধারণত তা অবমাননা বুঝাবে না। এভাবে "আমি অমুককে বিশ্বাস করি না', অথবা 'আমি অমুকের অনুসরণ করি না,' বা 'আমি অমুককে পছন্দ করি না'-এমন কথা কেউ বললে তা অবমাননা অথবা সুস্পষ্ট অভিযোগ ও অস্বীকৃতি (তাকযিব সারীহ) কোনটিই বুঝাবে না। অজ্ঞতা, ঈর্ষা ও ঔদ্ধত্যসহ বিভিন্ন কারণে কারোর মধ্যে স্নেহ-মমতা ও বিশ্বাসের কমতি দেখা যায়। সে যদি রাসূল সা: এর কথা উল্লেখ করে বলে, 'তিনি নবীও নন রাসূলও নন', 'তার ওপর কোন ওহি নাযিল হয়নি।'-এরূপ কথা উচ্চারণের মতো সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি (তাকযিব সারীহ) জ্ঞাপন কেবল অবিশ্বাস (কুফর) বুঝাবে, অবমাননা (সাব) নয়।

'সে একজন মিথ্যুক'-বলার সমার্থক কথাগুলো অবশ্য সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি বুঝায়। তৎসত্ত্বেও সহজ অস্বীকৃতি জানানো এবং কাউকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রায় বিভিন্ন শব্দ একই ধরনের অর্থ বুঝিয়ে থাকে, তার কিছু কিছু হয়ত সাব বুঝাতে পারে, তবে সব নয়। তৎসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এ মত পোষণ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একাই বলে মনে হয়। কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তি যদি কোন মুয়ায্যিনকে তার আযান সম্পর্কে বলে যে 'তুমি মিথ্যা বলেছো (কাযবতা)', -তাহলে সে ধর্ম অবমাননাকারী, তার এ বিবৃতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাঃ এর নবুওতের প্রতি মুসলমানদের ঈমান পোষণের ব্যাপারে সত্যতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপক (আযানে একথাই সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে) এবং তা মুমিনদের প্রতি অবমাননাও।[১৭১]

কোন ব্যক্তিকে অবমাননা করা (সাব) এবং তাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করা (তাকযিব)-অবশ্য দুটি ভিন্ন ধারণা এবং নিম্নের হাদিসে কুদসিতে যার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। [১৭২] এতে মহান আল্লাহতা'আলা রাসূলের (সাঃ) ভাষায় বলেছেনঃ

شَتَمَنِى اِبْنُ ادَمَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ ذٰلِكَ وَكَذَّ بَنِى اِبْنُ ادَمَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ذٰلِكَ فَامَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فقولُهُ : اِنِّى اِتَّخَذْتُ وَلَدًا وَامَّا تَكْذِيْبَهُ اِيَّاىَ فقوْلُهُ لن يَعِيْدُنِىْ كَمَا بَدَأنِى.

আদম সন্তান আমাকে অবমাননা করেছে, (শাতামানি ইবন আদাম) তার জন্য এটি করা ঠিক হয়নি। এছাড়া সে আমার ওপর মিথ্যাও আরাপ করেছে (কায্যাবানি), এটি করা তার জন্য সঠিক হয়নি। আমার একটি ছেলে আছে একথা বলে, সে আমাকে অবমাননা করেছে এবং আমি তাকে প্রথম যেমনটি সৃষ্টি করেছিলাম; সেভাবে সে আমার কাছে আর প্রত্যাবর্তন করবে না বলে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে।

এ হাদিসের উদ্ধৃতি দানকালে ইবনে তাইমিইয়া স্বীকার করেন যে, অবমাননা ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে তিনি বলেন যেঃ কখনও কখনও কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা হয়ত অবমাননা বুঝাতে পারে এবং ঘটনার প্রেক্ষাপট, ভাষাগত তারতম্য ও প্রচলিত ব্যবহারের আলোকে এ বিষয়টি নিরূপণ করতে হবে।[১৭৩]

অনুরূপভাবে রাসূল সাঃ এর ওপর সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা আরোপকে রাসূল সাঃ এর প্রতি অবমাননা বুঝাবে (সাব আল-রাসূল)। হাদিসে এর উদাহরণ রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে :

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

'যে পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে; সে দোযখের আগুনের মধ্যে নিজের আসন করে নেবে।'[১৭৪]

এ হাদিসে পার্থিব জীবনে এ বিষয়ে কি শাস্তি হবে, সে ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে; তবে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সুচিন্তিতভাবে রাসূল সাঃ এর

www.pathagar.com

ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ সত্যের সবচেয়ে মারাত্মক বিকৃতি এবং যে এমন কথা বলবে, সে মহান আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে। রাসূল সা:কে মিথ্যা বলা অবশ্যই মহান আল্লাহতা'আলাকেও মিথ্যা বলা বুঝাবে।[১৭৫] 'আলেমদের' অধিকাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. কে অবমাননার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানের ব্যাপারে একমত হলেও; তারা রাসূল সা: এর প্রতি মিথ্যা আরোপের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলেননি। সুপরিকল্পিতভাবে হাদিস বিকৃতি ও জালিয়াতি, এক্ষেত্রে হাদিস তৈরি করে তা রাসূলের কথা বলে তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি জঘন্য অপরাধ; তবে তার জন্য কেবল তা'জিরের অধীনে দণ্ডের বিধান রয়েছে। এভাবে কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলে জানার পরও তা হাদিস বলে উল্লেখ করলে; সে বড় ধরনের গুনাহর কাজ করবে, তবে তার এ বিবরণীতে অবিশ্বাস বলে বুঝানোর মতো কোন আভাস না থাকলে, সে কাফেরে পরিণত হবে না। কিন্তু সে যা বলেছে, তা যদি কুফরি বুঝায়: তাহলে তাকে সেভাবেই গণ্য করা হবে এবং তার এ বিবৃতি রাসূল সা: এর ওপর আরোপ করা হয়েছে বা অন্যরকম বুঝালো কি-না, তা ধর্তব্যের বিষয় হবে না। হাদিস বিশারদগণ বিপুল সংখ্যক জাল হাদিসকে আল-মাওযুয়াত শীর্ষক সাধারণ শিরোনামে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করেছেন। [১৭৬] অবশ্য ভুয়া হাদিস ও মুহাম্মদ সা: এর নবুওত-এর সত্যতা অস্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইত:মধ্যে আভাস দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কুফরি বুঝাবে যদি তাতে গালিগালাজ ও অবমাননা না থাকে, তবে অস্বীকৃতির সাথে সাথে এ বিষয় দুটিও যদি থাকে তাহলে সাব বুঝাবে। অতএব অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতি (কুফর) থেকে ধর্ম অবমাননাকে পৃথক করা যাবে, যেমনটি ইবনে তাইমিইয়া বলেছেন যে, ব্যক্তি তার অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করবে; সে একজন ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) বলে বিবেচিত হবে, তবে যে তা গোপন রাখবে, সে হবে একজন নবউদ্ভাবক (যিনদিক)। ইবনে তাইমিইয়া আরও বলেন, ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগের মধ্যে পার্থক্য সবসময় স্পষ্ট নয়। কারণ এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে যার ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদ প্রয়োজন। ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার বিষয়ে পার্থক্য করা যাবে কিনা এবং কীভাবে, সে ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্যেও এ বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। [১৭৭] এ বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হতে জানা যায় যে, অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন যে; ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার বিষয় একটি অপরটির মধ্যে মিশে গেছে এবং উভয়ের জন্য একই ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অবশ্য ফকিহদের সংখ্যালঘু একদল স্বীকার করেছেন যে, এ দু'য়ের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে; তবে তাদের এ মতামতে বৃহত্তম অংশের মতের প্রতিফলন ঘটেনি।

www.pathagar.com

মহানবী সাঃ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দান অথবা অসততার অভিযোগ আরোপ, তার নবুওতের বৈধতা অস্বীকার করা, অথবা রাসূল সাঃ এর মায়ের ক্ষেত্রে এর যে কোন একটি অপবাদ আরোপ-নবীর (সঃ) প্রতি অবমাননা (সাব আল নবী) বুঝাবে এবং আরোপকারী আপনাআপনি ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। অপবাদ দান অথবা অন্য যে কোনভাবেই সাব আল-নবী এর ঘটনা ঘটুক না কেন, মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের দ্বারা তা সংঘটিত হতে পারে এবং এ অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[১৭৮] অপরদিকে ধর্মত্যাগ কেবল মুসলমান-এর পক্ষেই করা সম্ভব।

রাসূল সাঃ এর প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননা হিসেবে বিশেষজ্ঞ বা ফকিহগণ সাধারণত অন্য যেসব কথা উচ্চারণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন; তার মধ্যে রাসূলের (সঃ) ব্যক্তিগত শুদ্ধতার সমালোচনা করে বিবৃতিদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন, 'তিনি লোভী, অজ্ঞ, নির্বোধ অথবা তিনি জামা'আতে নামায আদায় পরিত্যাগ করেছেন।'[১৭৯] যে অবমাননা সুস্পষ্ট নয় এবং এমনকি উপহাস ও অসম্মান বুঝালেও; তা তা'জিরের আওতায় মর্জিমাফিক শাস্তিযোগ্য হবে, যেমন কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বললো, 'এমনকি তুমি তোমার কাঁধে করে রাসূল (সঃ) কে আমার কাছে হাযির করলেও আমি... করবো না।' এ ধরনের কথা উচ্চারণের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, কারণ অবমাননার উপাদান এবং রাসূল সাঃ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা উভয়ই অস্পষ্ট ও পরোক্ষ।[১৮০] আল্লাহতা'আলা অথবা রাসূল সাঃ এর প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড রয়েছে। অবশ্য কোন কথা উচ্চারণে সন্দেহের অবকাশ থাকলে এবং তা প্রত্যক্ষভাবে অবমাননা না বুঝালে, তা'জিরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে এবং শাস্তির প্রকৃতি ও মাত্রা কি হবে; তা বিচারক নির্ধারণ করতে পারবেন।[১৮১]

ফকিহগণ একমত হয়েছেন যে, রাসূল সাঃ এর পত্নী উম্মুল মুমিনীন আয়শা রাঃকে অবমাননা ও অসতী (কাযফ) বলা ধর্মাবমাননা ও কুফরি বুঝাবে, কুরআনের আয়াতে তার সতীত্বের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে (২৪:১৬)। এ ধরনের অভিযোগ কেবল রাসূল সাঃ -এর প্রতি অমর্যাদা করাই বুঝাবে না; উপরন্তু তাতে কুরআনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হবে। এ কারণে ইবনে তাইমিইয়া বলেছেন যে, এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে এবং সকল নেতৃস্থানীয় ইমাম মনে করেন যে, আয়শা রাঃকে অবমাননা করা হবে খোদ রাসূল সাঃকে অবমাননা করা। এ বিষয়ে ইমাম মালিকের অভিমত অন্যরা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো, আয়শার প্রতি অপবাদের শাস্তি রাসূল সাঃ এর অবমাননার শাস্তির অনুরূপ হবে। এ বিষয়ে ইমাম মালিকের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে ইবনে

www.pathagar.com

হাযম জোর দিয়ে বলেন, 'আয়শাকে অবমাননা হচ্ছে পুরো মাত্রায় ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ তাম্মাহ); কেননা এতে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে'। রাসূল সাঃ এর অন্যান্য পত্নীকে অবমাননা, গালিগালাজ করার ব্যাপারে আলেমদের দুটি ভিন্ন মত পাওয়া গেছে। প্রথমত: এটি সাহাবীদের গালিগালাজ করার সমতুল্য, এবং তা কেবল তা'জিরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো, রাসূল সাঃ এর কোন পত্নীকে অমর্যাদা করা অথবা কলংকের অপবাদ দানকে আয়শা'র অবমাননার অনুরূপ অপরাধ বলে গণ্য করা হবে, এ মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এ মতের সমর্থকরা প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস রাঃ এর একটি বিবরণীর উল্লেখ করেন, যাতে তিনি রাসূল সাঃ এর পত্নীদের অমর্যাদা করাকে খোদ রাসূল সাঃকে অবমাননা ও অমর্যাদা করার সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮২] ফকিহগণ আরো মনে করেন যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে উল্লিখিত অন্য নবীগণের কাউকে অথবা কোন একজনের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ ছাড়াই সকল নবীকে অবমাননা করলে; তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃকে অবমাননা করার সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হচ্ছেঃ মুসলমানদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁদেরকে অবমাননা করলে কোন মুসলমান 'ধর্মত্যাগী ও কাফেরে' পরিণত হবে এবং কোন যিম্মি এরূপ করলে তা মুহরাবা (প্রকাশ্যে বৈরিতা ও যুদ্ধ ঘোষণা) বুঝাবে।'[১৮৩] পরের অর্থ হলো, অবমাননকারী বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি যিম্মি বা মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হয়, তা হলে সে তার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার মর্যাদা হারাবে এবং অবমাননার দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধীতে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে ফকিহগণ একমত হয়েছেন যে, সাধারণভাবে ফিরিশতাদের অথবা বিশেষভাবে তাদের কাউকে অবমাননা ও গালিগালাজ করার ঘটনাও রাসূলদের অবমাননা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানের অনুরূপ হবে, এক্ষেত্রে ফিরিশতাদের পরিচিতি ও মর্যাদার বিষয়ে কোন মতপার্থক্য করা হয়নি।[১৮৪] পবিত্র কুরআনে ফিরিশতাদের সকলকে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদেরকে অবমাননা, উপহাস ও অমর্যাদা করার ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ সাঃকে অবমাননা করার অপরাধের অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।[১৮৫]

চ. আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার

শুরুতেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলেমগণ বিস্ময়করভাবে মহান আল্লাহতা'আলাকে গালিগালাজ করার তুলনায় রাসূল সাঃ কে অবমাননার ঘটনাকে অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। একথা বলা নিস্প্রয়োজন

www.pathagar.com

যে, এর যে কোনটির অপরাধ ধর্মাবমাননার চেয়ে লঘু। তৎসত্ত্বেও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একথা বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির নির্বোধ আচরণ বাস্তবিকপক্ষে মহান আল্লাহর মর্যাদাকে স্পর্শ করতে পারে না। এক্ষেত্রে অবমাননাকারী নিজেকেই অপমানিত করে; কারণ সে কোনভাবে মুমিনদের চোখে আল্লাহর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না, তবে মানুষ হিসেবে রাসূল সাঃ কে অবমাননা করা যেতে পারে; অতএব এর থেকে রক্ষার অধিকার অবশ্যই তার থাকবে। তৎসত্ত্বেও, ফকিহদের অধিকাংশই অবশ্য মনে করেন যে, আল্লাহতা'আলাকে অবমাননা ও উপহাস করা হবে ধর্মাবমাননা এবং এ ধরনের অপরাধকারী আপনা আপনি কাফেরে পরিণত হবে এ কারণে যেঃ 'অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ এ ধরনের কাজ করতে পারে না'- একথা বলেছেন আল-বুহুতি।[১৮৬]

আল্লাহতা'আলার অমর্যাদা করা (সাব আল্লাহ্) এবং রাসূল সাঃ এর অবমাননা করার (সাব আল-রাসূল) মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ প্রত্যেকটি বিষয়ের একদিকে স্বীকার্য অথবা অন্যদিকে অনুতাপের দিকটি নিরূপণ করা। এ পার্থক্য আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকারের দ্বিধাবিভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই অধিকাংশের মত অনুযায়ী সাব আল্লাহ্ হচ্ছে আল্লাহর অধিকার লংঘন (হক আল্লাহ), নীতিগতভাবে অপরাধী অনুতপ্ত হলে এবং কৃতকর্মের জন্য তওবা করলে, তা মাফ হয়ে যায়। অপরদিকে রাসূল সাঃ এর অবমাননা হচ্ছে মানুষের অধিকার বা হক আল আব্দ্-এর (একে আল-হাক আল-আদামি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে) লংঘন, তা হচ্ছে, রাসূল সাঃ এর ব্যক্তিগত অধিকার ও মর্যাদা লংঘন। রাসূল সাঃ এর অবমাননাকারীর অনুতাপ বা তাওবা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এবং তাওবার কারণে অপরাধীর শাস্তি মাফ হয়ে যাবে কিনা, সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১৮৭] অধিকাংশের মত অনুযায়ী গ্রেফতারির আগেই তাওবা করলে আল্লাহর অবমাননা করার শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে মহানবী মুহাম্মদ সাঃ এর অবমাননার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। এটি মিথ্যা অপবাদ দানের (কাযফ) অপরাধের মতো অপরাধ; কারণ উভয়টি মানুষের অধিকার লংঘনের ফলে সংঘটিত হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে তাওবা করলে তেমন কোন ফল পাওয়া যাবে না। কেবল ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষই ক্ষমা করতে পারেন, অনুতপ্ত হওয়ার কারণে তা মাফ হয়ে যাবে না, কেননা এ ধরনের অপরাধের শাস্তি মাফ বা বাতিল করার একটি বৈধ পদ্ধতি রয়েছে। মাফ করার এখতিয়ার যার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, কেবল তারই হাতে। তাই একথা বলা যায় যে, রাসূল সাঃ এর অবমাননা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত অধিকার লংঘন এবং তিনি এ ধরনের আচরণের শাস্তি মাফ করে দিতে পারেন। ফলে এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

অপরাধী অনুতপ্ত হলো কিনা-তা বিবেচ্য বিষয় নয়, তাকে শাস্তি দিতে হবে। এটি হলো হাম্বলি ও মালেকি মাযহাবের মত। তবে উভয় মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে অবশ্য ভিন্ন মত রয়েছে। রাসূল সাঃ-এর অবমাননার ক্ষেত্রে ক্ষমার অধিকার সংক্রান্ত হাম্বলি/মালিকি সিদ্ধান্ত কেবল সে সময়ের জন্য যখন রাসূল সাঃ জীবিত ছিলেন এবং তিনি ক্ষমা মঞ্জুর করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তো আর বেঁচে নেই, তাই সাব আল-রাসূল সম্পর্কে হাম্বলি/মালিকি মাযহাবের অনুতপ্ত হবার বিষয় গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত অনেকটা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমার মতে, এ ব্যাপারে সঠিক মতটি হল, রাসূল সাঃএর ওফাতের পর সাব আল-রাসূল এর অপরাধ সাব আল্লাহর অপরাধের অনুরূপ হয়ে গেছে, তাই উভয়টির লংঘন আল্লাহর অধিকার লংঘন বুঝাবে। হানাফি ও শাফেঈ ফকিহগণ সর্বতোভাবে এ মত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা ভিন্ন পথে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা সাব আল্লাহ বা সাব রাসূল যে আকারেই হোক না কেন; তাকে এমন ধরনের ধর্মাবমাননা বলে মনে করেন-যা হচ্ছে ধর্মত্যাগের একটি উপশ্রেণী। যাকে আল্লাহর অধিকার লংঘনের মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব অভিমত রয়েছে, যা নিয়ে আমি এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা হলো, ধর্মাবমাননাকে ধর্মত্যাগের উপশ্রেণী বলে মনে করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ দুটি হচ্ছে ভিন্ন বিষয় এবং প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রয়োজন। তবে আমি এখনো একথা স্বীকার করি যে, আলোচ্য উভয় ধরনের অপরাধে জনগণের অধিকার লংঘিত হয়। তাই কেবল যুক্তিযুক্ত বলেই নয়, উপরন্তু ধারাবাহিকতার স্বার্থেও সত্যের ধারক ও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপযুক্ত বিচার কর্তৃপক্ষকে কেবল সাব আল্লাহ নয়, সাব আল রাসূল সাঃ এর ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভূমিকা পালন করা উচিত।

উপরন্তু আল্লাহ ও মানুষের অধিকারের পার্থক্যের বিষয়টি প্রায়ই ব্যক্তি ও সমাজের স্ব-স্ব স্বার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। এ শ্রেণীর কোন একটি বা অন্যটির নির্দিষ্ট স্বার্থ বা অধিকারের দিকটি অনেকখানি ফকিহগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে, কারণ মৌলিকভাবে ইসলামে সব অধিকারই প্রাথমিকভাবে আল্লাহর অধিকার, যা মুমিনদের সমাজ ও তাদের বৈধ সরকার চর্চা ও প্রতিনিধিত্ব করে, মালিকি ফকিহ আল-কারাফি এ অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৮৮]

এছাড়া ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমত মহানবী, মুহাম্মদ সাঃ এর কেন্দ্রীয় ভূমিকার সঙ্গে এতটাই পুরোপুরি যৌক্তিক ও সঙ্গতিপূর্ণ যে, তাঁর অবমাননাকে আল্লাহতা'আলাকে গালিদানের অনুরূপ বলে বিবেচনা করতে হবে এবং এ উভয় অবমাননার ঘটনাকে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও মুমিন সমাজের অধিকারের

মারাত্মক লংঘন বলে বিবেচনা করা হবে। এ দু'ধরনের অবমাননা যে কোন এক ধরনের হয়ে থাকুক না কেন এবং তা হবে আল্লাহর অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন।

ছ. অনুতপ্ত হওয়া বা তাওবার প্রশ্ন

ধর্মাবমাননাকারীকে অনুতপ্ত হতে বা তওবা করতে বলা উচিত কিনা এবং সে তাওবা করলে তার সে তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা-তা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে তাওবা গ্রহণের বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে, কারণ এতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুরোপুরি ও নিঃশর্ত ক্ষমা লাভের পথ প্রশস্ত হতে পারে। অনেক সময় একই মাযহাবের ফকিহ্গণের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়, আর এ বিষয়টি কোন মাযহাবের প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণা নিরূপণের ক্ষেত্রে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।

হানাফিরা মনে করেন যে, ধর্মাবমাননাকারীকে অনুতপ্ত (ইস্তিতাবা) হতে ও ইসলামের পথে ফিরে আসার কথা বলা যাবে। ইমাম মালিক এটি করাকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন। শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদের প্রত্যেকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, তার একটি হানাফিদের অনুরূপ এবং অপরটি ইমাম মালিকের অনুরূপ। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হচ্ছে, শাস্তি কার্যকর করার আগে অনুতপ্ত হবার অনুরোধ জানানোর ইস্তিতাবা হচ্ছে, একটি পূর্ব শর্ত। তিনদিন আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলতে হবে যে, সে অনুতপ্ত হতে বা তাওবা করতে চায় কি-না। মালিকিগণ নিম্নোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে তাওবা করার বিষয় নাকচ করে দিয়েছেন : 'যে-ই ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা কর।' এখানে তাওবার ব্যাপারে নীরবতার কারণে শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবের কিছু সংখ্যক লোক এ মত মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে অধিকাংশই পরের মতটি গ্রহণ করেন, যা আয়েশা রাঃ বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয় ঃ 'ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মহিলা ইসলাম ত্যাগ করে এবং রাসূল সাঃ বলেন যে, সে তাওবা করতে চায় কিনা তাকে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত।'[১৮৯]

'ধর্মত্যাগ বিষয়ক অধ্যায়ে' আল শাওকানি উভয় মতকে সমন্বিত করেছেন। তাঁর মতে, ধর্মত্যাগী যদি অজ্ঞতাবশত ধর্মত্যাগ করে বসে, তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা সঠিক হবে। আর সে যদি জেনেশুনে ও সঠিক মনে করে তা করে থাকে; তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা বৈধ হবে না।[১৯০]

সামান্য ভিন্ন ধরনের বিষয় হলো, কেউ আল্লাহতা'আলা অথবা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃকে গালিগালাজ করলে, তার তাওবার আবেদন অথবা অন্য কোন আরযি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, গ্রহণযোগ্য হবে। হাম্বলি

www.pathagar.com

ও মালিকি মাযহাবের অনুসারীরা ২টি ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। উভয় মাযহাবের প্রধান মত হচ্ছে, কেবল তাওবা করলে ধর্মাবমাননাকারীর পার্থিব শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে না, অবশ্য সে যদি আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে, তাহলে সে হয়ত পরকালে কল্যাণ লাভ করতে পারবে।[১৯১] এক্ষেত্রে হাম্বলি ও মালিকিগণ আল্লাহতা'আলাকে গালিদান ও রাসূল সাঃ এর অবমাননা করার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তারা উভয়টিকে একই ধরনের অপরাধের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন, তাই উভয়টির ব্যাপারে সমান আচরণ করা উচিত বলে মনে করেন। দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব রাঃ এর দৃষ্টান্তের আলোকে এ মত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহকে গালিগালাজ করা ও রাসূল সাঃ এর অবমাননা করাকে একই ধরনের অপরাধ বলে গণ্য করেন এবং কোনটির ক্ষেত্রে তিনি অবমাননাকারীকে তাওবা করতে বলেছেন বলে জানা যায়নি। অতএব এ কথা বলা যায় যে, ধর্মাবমাননা ও ধর্মত্যাগের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলোঃ ধর্মত্যাগের বিষয়টি অনুতপ্ত হবার বা তাওবা করার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু ধর্মাবমাননার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে তেমন নয়।[১৯২] অবশ্য হাম্বলি ও মালিকি মাযহাবের দ্বিতীয় মতটি হলো, দণ্ডিত ধর্মাবমাননাকারীকে তাওবা করা ও ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে, এটি করা বাধ্যতামূলক।[১৯৩]

অপরদিকে হানাফি এবং শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ ধর্মাবমাননাকে ধর্মত্যাগের সমশ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করেন, উভয় ক্ষেত্রেই তাওবা গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই ধর্মত্যাগীদের মতো ধর্মাবমাননাকারীদেরকে পর পর তিনদিন ধরে তাওবা করার কথা বলতে হবে এবং দণ্ডদানের সময় থেকে তা গণনা করতে হবে, এ সময়ে দণ্ডিত ব্যক্তির খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাবার অধিকার থাকবে। ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির তাওবার মধ্যে থাকবে, তার বিশ্বাসের সাক্ষ্যদানের (কালেমা আল-শাহাদাত) কথা ঘোষণা দানের মাধ্যমে ইসলামের পথে পুনরায় ফিরে আসা। যিম্মির ক্ষেত্রে তাওবায় কেবল কৃতকর্মের জন্য গভীর অনুশোচনা প্রকাশ এবং তা পুনরায় না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার অনুশোচনা বা তাওবা গ্রহণ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বধর্মের অনুগত থাকতে অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে।[১৯৪] অন্য এক মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর সাথে তাওবার শর্তাবলী সম্পর্কিত করার কথা বলা হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম সে যা করেছে বা বলেছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিত্যাগের ঘোষণা দিতে হবে। এ মতটি অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে করা হয়।

উপরন্তু কোন ধর্মত্যাগীর তাওবা করা ও ইসলামে পুনরায় দাখিল হবার বিষয়টি

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য। হানাফি ও শাফেঈ মাযহাবের মতে. সর্বোচ্চ চার বার এটি করা যাবে। এ ধর্মত্যাগী যদি পঞ্চমবার অনুশোচনা করে ইসলামে ফিরে আসে তবে তার পরের এ কাজটি তুচ্ছ বলে গণ্য হবে; তবে পূর্ববর্তী প্রতিটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দণ্ডদান তিনদিন মূলতবী রাখার বিষয় মঞ্জুর করতে হবে। জনৈক নাবহানের প্রতি রাসূল সাঃ এর আহ্বান সংক্রান্ত এক বর্ণনার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূল সাঃ তাকে বলেন, "চার অথবা পাঁচ বার তাওবা কর।" কাজী আইয়াদ আল-ইয়াহসাবি এ হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ইমাম মালিকের থেকে ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, ধর্মত্যাগী যতবার অপরাধ করবে ততবারই অর্থাৎ স্থায়ীভাবে তাকে তাওবা করার আহ্বান জানানো উচিত। ইমাম শাফেঈ ও ইবনে হাম্বলেরও এ মত।[১৯৫]

আলী ইবনে আবি তালিব রাঃ এমত পোষণ করতেন বলে জানা গেছে যে, ধর্মত্যাগীকে দু মাসের সময়ের মধ্যে তাওবা বা অনুশোচনা করার আহ্বান জানানো উচিত। অবশ্য ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ইবরাহীম আল-নাখাল এবং সুফিয়ান আল সাওরি মনে করেন যে, কোন ধর্মত্যাগী জীবিত থাকা পর্যন্ত তার জন্যে তাওবার দরজা সবসময় খোলা রাখতে হবে।[১৯৬]

জ. অমুসলিম কর্তৃক ধর্মাবমাননা

সম্ভাব্য তিনটি পরিস্থিতিতে কোন অমুসলমান ইসলাম ধর্মের অবমাননার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে :

ক. কোন অমুসলমান তার নিবন্ধে এমন নিজস্ব বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে, যা ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী, যেমন একজন খৃস্টান বললো যে, যিশুখ্রীস্ট (ঈসা আঃ) খোদার পুত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্য এটি প্রকৃত ধর্মাবমাননা নয়, বরং সাধারণ শ্রেণীর অবিশ্বাস বা কুফরি।

খ. যখন কোন অমুসলিম একজন মুসলমানকে এমন কথা বললো, যা তার ধর্মবিশ্বাসেরও অঙ্গ, কিন্তু সে তা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করলো। এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ হলো, আযান দেয়ার পর একজন ইহুদি মুয়ায্যিনকে বললো, 'আপনি মিথ্যা বলেছেন', এ ঘটনা হলো ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস বা কুরআনে আল্লাহর কোন নির্দেশকে চরম অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে কোন অমুসলিম কর্তৃক কোন নিবন্ধ রচনার অনুরূপ। এ ধরনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি কোন অমুসলিম যিম্মি হলে সে তার নিরাপত্তা লাভের মর্যাদা হারাবে এবং শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

গ. কোন অবমাননার বিষয় যদি অপরাধী ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের অংশ না হয় এবং এমন কিছুর সমন্বয়ে তা গঠিত হয়, যা তার নিজ ধর্মেও সমভাবে নিষিদ্ধ। এ ধরনের ধর্মাবমাননার ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না; কারণ যে ব্যক্তিই আল্লাহতা'আলাকে গালিগালাজ করবে সে ধর্মাবমাননার অপরাধ করবে, তার ধর্মবিশ্বাস কি সেটা কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়।

আগেই বলেছি যে, ফকিহগণ তাওবা গ্রহণ করা হবে কি-না-সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁদের অধিকাংশ অনুশোচনা গ্রহণ করার পক্ষে এবং মনে করেন যে, কোন অমুসলিমের অনুশোচনা বা তাওবা হবে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা। মদিনার কিছু আলেম মনে করেন যে, মুসলমানদের মতো একইভাবে যিম্মির অনুশোচনা বা তাওবাও গ্রহণযোগ্য হবে, তাই অমুসলমান তার নিরাপত্তা লাভের মর্যাদা হারাবে না। দুটি বর্ণনার একটির আলোকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মনে করেন যে, যিম্মিকে অনুশোচনা করতে বলা যাবে না; তবে সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে আর কোন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। একটি পৃথক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল মনে করেন যে, যিম্মির বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তবে মালিকি মাযহাবের কেউ কেউ মনে করেন যে, কোন অমুসলমান যদি রাসূল সাঃ এর ওপর মিথ্যা আরোপ করে (তাকযিব আল রাসূল); তাহলে সে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য হবে না।[১৯৭] এরপরও আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী জানা গেছে, ইমাম আল শাফেঈ মনে করতেন যে কোন যিম্মি ধর্মাবমাননা করলে, তার নিরাপত্তা প্রাপ্তির মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এর পরিণতিতে সে শত্রুতে (হার্বি) পরিণত হবে এবং তাকে কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে-তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের। ইমাম শাফেঈ আরো বলেন, যুদ্ধাপরাধীর মতো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার রাষ্ট্রপ্রধানের বিচক্ষণতার ওপর ন্যস্ত করা হবে। তিনি তার মৃত্যুদণ্ড দান অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে কি-না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।[১৯৮]

অপরদিকে, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ মনে করেন যে, সাব আল্লাহ বা সাব আল রাসূল সাঃ এর মতো ধর্মাবমাননার কারণে যিম্মির সঙ্গে চুক্তি (আহাদ আল-যিম্মাহ) বাতিল হয়ে যাবে না এবং সে মৃত্যুদণ্ড যোগ্যও হবে না, তবে সে তার জন্য নিষিদ্ধ অন্যান্য অপরাধ (মুনকারাত)

www.pathagar.com

করলে প্রতিরোধমূলক শাস্তির (তা'জির) আওতায়, সে যে ধরনের দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হয়, এক্ষেত্রেও সে অনুরূপ শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ মতের সমর্থনে হানাফিগণ প্রধানত যে হাদিসটির কথা উল্লেখ করে থাকেন, তা ইত:পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ হাদিসে ইহুদিরা রাসূল সা:কে যে পরিভাষা ব্যবহার করে সালাম দিয়েছিল তার অর্থ হলো, "আপনার মরণ হোক (আল-সাম আলাইকুম), কিন্তু কোন বর্ণনায় জানা যায়নি যে, রাসূল সা: তাদের কাউকে শাস্তি দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা।[১৯৯]

ঝ. কুরআন-সুন্নাহর সাক্ষ্য প্রমাণ

ধর্মাবমাননা সম্পর্কিত 'আলেমদের' প্রাপ্ত রচনার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তাকি আল দীন ইবনে তাইমিইয়ার (মৃত্যু, ৭২৮/১৩২৮), আল-সারিম আল-মাসলূল 'আলা শাতিম আল-রাসূল-এ। এ মহান লেখক অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধর্মত্যাগের শাস্তি ও এ সম্পর্কিত কুরআনের বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের 'অভিমতের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে ইবনে তাইমিইয়া নিজে অব্যাহতভাবে মনে করতেন যে, ধর্মাবমাননার অপরাধে শাস্তি বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব ঘটনার প্রমাণ সাপেক্ষে এ দণ্ড কার্যকর করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই অপরাধীকে অনুশোচনা বা তাওবা করাতে বলার কোন দরকার নেই। পরের পৃষ্ঠাগুলোতে ধর্মাবমাননার ব্যাপারে ইবনে তাইমিইয়া কুরআনের সাক্ষ্য-প্রমাণের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা নয়, বরং এ মহাজ্ঞানী ব্যক্তির কতিপয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ধর্ম বিজ্ঞানে ইবনে তাইমিইয়ার অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। খোলাফায়ে রাশেদা পরবর্তী যুগে ইসলামি আদর্শের জ্ঞান-গরিমার উচ্চ শিখরে আরোহনকারী মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনি নিজস্ব মাযহাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কারণে যে, আমাদেরকে কুরআনের চেতনার আলোকে অতীতের সবচেয়ে বিখ্যাত 'আলেমদের' বিচার সংক্রান্ত অভিমতকে প্রাথমিক আইনগত সূত্রের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপন ও পুন:পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে আলেমগণ স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতীতের পবিত্র বলে গণ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানসহ তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আমরা প্রায় সকল প্রধান ধর্মের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা

www.pathagar.com

দেখতে পেয়েছি, ধর্মাবমাননা ও ধর্মত্যাগের সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে; যার ফলে ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত অনেক ধর্মীয় বিশেষজ্ঞও স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত কঠোর শাস্তির বিধান গ্রহণে রাযি হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিইয়া একা নন। বরং মালেকি ফকিহ কাযি আইয়ায ইবনে ইয়াহসাবি (মৃত্যু : ৫৪৪/১১৪৯) ইবনে তাইমিইয়ার অনেক আগে একই বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। কাযি আইয়াযও উপসংহারে ইবনে তাইমিইয়ার চেয়ে অধিক না হলেও; অনুরূপ গুরুত্ব দিয়েছেন বিষয়টির ওপর। কাযি আইয়াযের গ্রন্থের নাম আল-শিফা বি তারিফ হুকুক আল-মুস্তাফা। এর বড় অংশ জুড়ে তিনি ধর্মাবমাননার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাসূল সা: ও মুমিনদের অধিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর একটি অধ্যায়ে রাসূল সা: এর অবমাননা বা গালিগালাজ করার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াতসমূহ স্থান পেয়েছে এবং উভয় লেখক এক্ষেত্রে একই ধরনের মন্তব্য করেছেন।[২০০]

এখানে আমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই তাহলো, ইবনে তাইমিইয়া ও তার পূর্বসুরী কাযি আইয়ায ধর্মাবমাননার বিষয়ে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন কিনা? এ দু'জন বিশিষ্ট লেখকের উভয়ে প্রাথমিকভাবে তাঁদের গ্রন্থের যে শিরোনাম নির্ধারণ করেন, তা সাব আল-রাসূল সা: সম্পর্কিত; যা হলো কথা ও আচরণের মাধ্যমের মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা: এর বর্ণাঢ্য সুমহান নাম ও চরিত্রের অবমাননা করা। এখানে আলোচ্য বিষয় কোন বিশেষ লেখক বা ব্যক্তির সম্পর্কে নয়। আমি ইবনে তাইমিইয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করছি: কারণ তার ব্যাখ্যা অন্যান্য সুপরিচিত বিশ্লেষণের থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও; তিনিও ধর্মাবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা যে কুরআনের বিধান; তা প্রতিষ্ঠা করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন।

ধর্মাবমাননা, সে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সা:, যাকেই অবমাননা করা হোক না কেন, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ইবনে তাইমিইয়া এ সম্পর্কিত কুরআনের সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরার মধ্যদিয়ে তার আলোচনার সূত্রপাত করেন। এর পক্ষে কুরআনের সমর্থন রয়েছে এবং এটি হলো নির্ধারিত শাস্তি (হাদ)। কোন বিচারকের পক্ষে এ রায় বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কিছু করার কোন এখতিয়ার নেই। সুবিজ্ঞ লেখক ইবনে তাইমিইয়া এ সম্পর্কিত কুরআনের সাতটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। আমি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছি এবং এর সঙ্গে আরো দুটি আয়াত সংযোজন করেছি। ইবনে তাইমিইয়া সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সম্ভবত পাঁচ নম্বর

www.pathagar.com

আয়াতের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। লেখক কুরআনের একটি আয়াত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেন। এ আয়াতের মূল কথা হল, আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূল সা:এর বিরোধিতা করা এবং তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা। নিম্নে আয়াতটি উদ্ধৃত হল :

أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيْهَا ذَلِكَ الخِزْىُ العَظِيْمُ .

> ১. তারা কি জানে না যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মোকাবিলা করে তার জন্য দোযখের আগুন রয়েছে, যাতে তারা চিরদিন থাকবে? আর তা বড়ই লাঞ্ছনার ব্যাপার (৯:৬৩)।

ইবনে তাইমিইয়া এ আয়াত থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হলো, রাসূল সা: এর বিরোধিতা করা বা তাঁতে বিরক্ত করা মহান আল্লাহতা'আলাকে বিরক্ত করার সমতুল্য। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে, লেখক এরপর যে আয়াতটি তুলে ধরেন, তাতে বলা হয়, 'এবং তাদের মধ্যে যারা রাসূলকে বিরক্ত/অবমাননা করে (ইউ'দহূনা) এবং বলে যে তিনি শ্রবণশক্তিহীন নন (তিনি যা শোনেন তা বিশ্বাস করেন)'।[২০১] (৯:৬১)। মহানবী সা: সম্পর্কে তাদের বৈরি উক্তির কারণে সুনির্দিষ্টভাবে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইবনে তাইমিইয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ বিরোধিরা (মুহাদ্দিন) দোযখের আগুনে জ্বলবে।'[২০২] তিনি এ দুটি আয়াতের আলোকে মন্তব্য করেন যে, আদহা হলো বিরক্ত বা অবমাননা করা এবং মুহাদাদাহ হলো শত্রুতামূলক বিরোধিতা করা। উভয় শব্দ কুরআনে সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২০৩] একই বিষয়ে কুরআনের আরো দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর এ আলোচনা এগিয়ে চলে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ فِىْ الأَذَلِّيْنَ كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِى إِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

> ২. নি:সন্দেহে লাঞ্ছিততম লোক হলো তারা: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিরোধিতা করে। আল্লাহতা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রাসূলই বিজয়ী থাকবো। বস্তুত আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজয়ী (৫৮ : ২০-২১)।

এখানে আদহাল বা সবচেয়ে অবমাননাকর শব্দের ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে লেখক এর উচ্চতম মাত্রা দলিল প্রয়োগ করে প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কোন ব্যক্তির জানমাল যখন আর অলংঘনীয় (মা'সূম) থাকে না;

www.pathagar.com

কেবল তখনই এ ধরনের শব্দের মাধ্যমে তার বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। আর এ জন্যই কুরআনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা:-এর অবমাননাকারীকে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ তারা কোন অব্যাহতি বা নিরাপত্তা ভোগ করে না।[২০৪] এ মন্তব্যকে আরও শক্তিশালী করতে এর সমর্থনে ইবনে তাইমিইয়া কুরআনের আরেকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ আয়াতের মধ্যে কুরআন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: এর অবমাননা ও বিরোধিতাকারীদের অত্যন্ত হীন মর্যাদার বলে নিশ্চিত করা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

> ৩. যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে; যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে করা হয়েছিল (৫৮:৫)।

এখানে লেখক কুবিতু শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তার মূল অর্থ হচ্ছে চরম পথভ্রষ্টতা ও অবমাননা। লেখক মনে করেন যে, এ আয়াতে কুরআন অতীত কালের পাপী ও মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছে; যারা তাদের নবীদের অবমাননা ও ক্ষতি করেছে। ইবনে তাইমিইয়া জোর দিয়ে বলেন, 'এটি স্পষ্ট যে মুনাফিকরা আল্লাহর দুশমন এবং তাদেরকে মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে অপমানিত করা হয়েছে। অতএব বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক দুশমনের (মুহাদাদা) একই ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হবে'।[২০৫] প্রধানত তুলনামূলক শব্দ থাকায় এ আলোচনায় ভাষাতাত্ত্বিক প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে ইবনে তাইমিইয়া মুহাদাদা ও মুশকাকা শব্দের তুলনা করেন। মুহাদাদার অর্থ দুশমনিপূর্ণ বিরোধিতা করা-যার ফলে বিরক্তির সৃষ্টি হয় এবং মুশকাকার অর্থ বিচ্ছিন্নতা, কলহ বা বিরোধিতা। যে আয়াতে মুশাকাকা শব্দটি রয়েছে তা হলো: অধিকতর শাস্তিমূলক আয়াত। তবে ধর্মাবমাননার ক্ষেত্রে এর তেমন একটা ভূমিকা নেই, এটি যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের সঙ্গে লড়াইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ধর্মাবমাননার বিষয়ের সঙ্গেঁ নয়।

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ- ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ
اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

> ৪. অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও। এটি এজন্য কর যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের

www.pathagar.com

মোকাবিলা করলো আর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মোকাবিলা করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বড়ই কঠোর (৮:১২-১৩)।

এ আয়াত ওহুদ যুদ্ধের সময়ে নাযিল হবার কথা সুবিদিত, তাই এতে যে কথা বলা হয়েছে প্রাথমিকভাবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শত্রু সৈন্য সম্পর্কিত। ইবনে তাইমিইয়ার বক্তব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এ আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দের কেবল তুলনা করার জন্য আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়। এবং তা থেকে নিম্নের উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব: 'একথা জানা গেছে যে, মুহাদাদা শব্দটির (ক্রিয়ামূল) হাদ এবং মুশকাকা'র (শব্দমূল) শাক থেকে গঠিত হয়েছে, উভয়ের অর্থ ঝগড়া বিবাদ, বিরোধিতা ও বৈরিতা এবং পূর্বোক্ত শব্দটি (মুহাদাদা) পরের অর্থের সমন্বয়ে গঠিত।[২০৬]

কুরআনের পরের যে আয়াতটি নিয়ে ইবনে তাইমিইয়া আলোচনা করেছেন, তারই আলোকে তিনি তার প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তা হলো, ধর্মাবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড হলো কুরআনের একটি বিধান এবং এটি হচ্ছে একটি নির্ধারিত শাস্তি। তিনি এর সমর্থনে কুরআনের সূরা আল আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا.

৫. যেসব লোক আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট (ইউজুনা) দেয়, তাদের উপর আল্লাহতা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর যেসব লোক মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা বড় মিথ্যা দোষ (বুহতানান) ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা (ইসমান মুবিনা) নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে (৩৩: ৫৭-৫৮)।

অতপর লেখক মন্তব্য করেন : এ আয়াত আল্লাহতা'আলা ও রাসূল সা: এর অবমাননাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দান করাকে বাধ্যতামূলক বিধানে পরিণত করেছে।[২০৭] এছাড়া এখানে ইবনে তাইমিইয়া আল্লাহতা'আলার ও তাঁর রাসূল সা:এর অবমাননাকে একই শ্রেণীর বলে গণ্য করেছেন। তারও প্রমাণ হচ্ছে এ আয়াতটি। অতএব যে কেউ রাসূল সা: কে বিরক্ত করবে বা কষ্ট দেবে; সে মহান আল্লাহতা'আলার ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের অপরাধ করলো। আর 'যে আল্লাহকে

www.pathagar.com

অবমাননা করবে, সে অবিশ্বাসী (কাফের) হয়ে যাবে এবং আইনগতভাবে সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য (হালাল আল-দাম)'। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহলো, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে তাইমিইয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: এর অবমাননা এবং মুমিন ব্যক্তিদের অবমাননার মধ্যে পার্থক্য করেছেন : প্রথমোক্ত অবমাননার জন্য কঠোর ভাষায় অভিসম্পাত করা হয়েছে এবং কঠিন ও অবমাননাকর আযাবের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে মু'মিন নারী ও পুরুষের অবমাননার জন্য কেবল নিজ স্কন্ধে বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা চাপানোর কথা বলা হয়েছে। এখানে লেখক একথা বলতে চেয়েছেন যে, খোদ আল্লাহতা'আলা ধর্মাবমাননাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। অভিশাপ (লা'নাহ) হচ্ছে দয়া ও করুণার (রাহমাহ) বিপরীত। আল্লাহতা'আলা কাউকে অভিশাপ দিলে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার দয়া থেকে বঞ্চিত করলে, সে নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাসীতে (কাফের) পরিণত হবে। এ মতকে আরও সংহত করতে এবং লা'নাহ'র ব্যাপারে যে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ করতে ইবনে তাইমিইয়া নিম্নের হাদিসটি উদ্ধৃত করেন, এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ 'কোন মুমিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য'।

এ হাদিসের ভাষার আক্ষরিক অর্থের দিকে কিছুটা উপেক্ষা করে ইবনে তাইমিইয়া মন্তব্য করেন যে, আল্লাহতা'আলা যাকে অভিশাপ দেন; সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। 'একথা জানা গেছে যে, তার হত্যা অনুমোদনযোগ্য (ফা 'উলিমা আন্না কাতলুহু মুবাহ) [২০৮]। দুপৃষ্ঠা পর এ বিশ্লেষণকে পুনরায় সমর্থন করে তিনি এ মত ব্যক্ত করেন যে, কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অবমাননার জন্য দুনিয়া অথবা পরকালে আল্লাহতা'আলার অভিশাপ দেয়ার আহ্বান জানানো হবে না এবং এর জন্য কোন কঠোর শাস্তি হবে না। এরই আলোকে ইবনে তাইমিইয়া বলেছেন যে, কুরআন আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূল সা: এর অবমাননা করাকে একভাবে দেখেছে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে অবমাননা করাকে অন্যভাবে গণ্য করেছে। এর থেকে দু'য়ের মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি জানা গেছে। মু'মিনদের অবমাননার অপরাধের শাস্তি হলো: সুস্পষ্ট গুনাহ (ইসমান মুবিনান) এবং মিথ্যা অপবাদ দান (কাযফ)। এটিও একটি অপরাধ কিন্তু এর মাত্রা আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূল সা:কে অবমাননা করার মতো অতোটা মারাত্মক নয়। কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: কে অবমাননা করলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে অভিশাপ দেন।[২০৯]

এরপর লেখক অপর দুটি আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেন। উভয় আয়াত সূরা আল-নূর এর এবং তার একটি রাসূল সা: এর স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এবং অপরটি

সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ইবনে তাইমিইয়া এখানে যে কথাটি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন তা হলো, রাসূল সা: এর স্ত্রীগণকে যারা অবমাননা করেছে মহান আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বার বার অভিশাপ দিয়েছেন। তবে এ আয়াতে উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদ দানের (কাযফ) মতো সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। আয়াত দুটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوْا فِيْ الدُّنْيَا
وَالاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

৬. যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদাসিধা ও মু'মিন স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে; তাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করা হয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব (২৪:২৩)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَٰدَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفَٰسِقُوْنَ إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَإِنَّ
اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৭. আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে; তারপর চারজন সাক্ষী হাযির করতে পারবে না, তাদের আশিটি কোড়া মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। সেই লোকেরা নয়, যারা এরপর তাওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ অবশ্যই (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান (২৪:৪-৫)।

এসব আয়াতের প্রথমটিতে বর্ণিত অভিসম্পাত সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইবনে তাইমিইয়া বলেন, এ সুনির্দিষ্ট আয়াতটি রাসূল সাঃ এর পত্নীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে অবমাননা করা জঘন্য অপরাধ; যা আল্লাহর অভিসম্পাতের কারণ হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও এ অপবাদ দানকারী 'ঈমানদারের' মর্যাদা হারাবে না এবং এরপরও তার জীবনের নিরাপত্তা বহাল থাকবে। প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস রাঃ এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতটি আয়েশা ও রাসূলের সাঃ অন্যান্য স্ত্রী সম্পর্কে নাযিল হয়। যদি ও এতে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন কিছুর উল্লেখ নেই। এরই আলোকে ইবনে তাইমিইয়া বলেন যে, দ্বিতীয় আয়াতে তাওবা'র যে বিধান রাখা হয়েছে;

প্রথমটিতে তা নেই। রাসূলের সাঃ স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আয়াতটিতে তাওবা গ্রহণের ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে। তাই উপসংহারে একথা বলা যায় যে, রাসূলের সাঃ পত্নীগণ ছাড়া অন্য মহিলাদের অবমাননা করলে বা অপবাদ দান এমন অপরাধ যাতে আল্লাহর অভিসম্পাতের শিকার হতে হবে না এবং এ জন্য তাওবা করার দরজা খোলা রয়েছে। [২১০] এ বিষয়ে ইবনে তাইমিইয়া এসব আয়াতের অন্যান্য মুফাসসিরের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। এখানে যে বিধানটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে তা হলো: ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ফকিহ নীতিগতভাবে প্রথম আয়াতটিকে একান্তভাবেই রাসূল সাঃ-এর পত্নীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার যে কথা বলেছেন, তার বৈধতার প্রশ্ন। আয়াতটিতেই যদি বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতো; তাহলে এ ব্যাপারে সংশয়ের কোনই অবকাশ থাকতো না। কিন্তু এ ধরনের উল্লেখ না থাকায় ব্যাখ্যার (তফসির) সাধারণ নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পটভূমি (আসবাব আল নুযূল) প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হবে। ইবনে তাইমিইয়া এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন যে, এমনকি সুনির্দিষ্ট ঘটনার কথা যদি উল্লেখ থাকেও; তাহলে সে ক্ষেত্রেও কুরআনের সাধারণ বিধিমালা সাধারণ ক্ষমতার আওতায় প্রয়োগ করতে হবে। এমনকি আয়াতটি রাসূল সাঃ-এর স্ত্রীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে স্বীকার করে নেয়ার পরও ইবনে তাইমিইয়া অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু আয়াতের শব্দ প্রয়োগ সাধারণ; তাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ অবশ্যই সকল মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। [২১১] এ বক্তব্যের মাধ্যমে দৃশ্যত ইবনে তাইমিইয়ার পূর্বে প্রদত্ত যুক্তির গুরুত্ব লোপ পেয়েছে, যাতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর অবমাননা বা কুৎসা রটনাকারীদের জন্যই একান্তভাবে আল্লাহর অভিসম্পাত সংরক্ষিত বলে মনে করেন। উল্লিখিত (পাঁচটি আয়াতের) প্রথম দুটি আয়াতে সাধারণ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়েছে 'তাদের ওপর যারা পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদাসিধা ও মুমিন স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে।' তাই যারা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর অবমাননা করে তাদের ক্ষেত্রেই অভিসম্পাত আর সীমাবদ্ধ থাকলো না, যেমনটি প্রথম দিকে এ ধর্মাবমাননাকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ইবনে তাইমিইয়া জোর দিয়ে বলেছিলেন। এভাবে ইবনে তাইমিইয়া নাযিলকালীন সুনির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ সত্ত্বেও, কুরআনের সাধারণ বিধির সাধারণ নিয়ম বহাল থাকার কথা স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে তার প্রাথমিক যুক্তি (যেমন, কেবল একজন ধর্মাবমাননাকারীর ওপরই আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়) থেকে সরে যান। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আর বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকুই বলা যায় যে মহান আল্লাহ তা'আলা কেবল জঘন্যতম অন্যায়কারীকে

www.pathagar.com

অভিসম্পাত করে থাকেন এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য। সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, এ বিষয়ে আমরা ইবনে তাইমিইয়ার যুক্তি যদি মেনেও নেই, তাহলেও যে মাত্রায় ধর্মাবমাননা করা হোক না কেন, কুরআনের বিধান অনুযায়ী তার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড, তার প্রাথমিক এ যুক্তি প্রমাণ করা সম্ভব হবে না।

ধর্মাবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত ইবনে তাইমিয়ার কুরআনের সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের বিষয়কে আমি এভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করে একথা বলতে চেয়েছি যে, তিনি এ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা টেকেনি। ধর্মাবমাননাকারীর মৃত্যুদণ্ড দান কুরআনের নির্দেশনা বলে ইবনে তাইমিইয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে কুরআনের কয়েকটি আয়াতে পাওয়া যায়, যাতে মহান আল্লাহতা'আলা তাঁকে ও তাঁর রাসূল সাঃ কে অবমাননাকারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এ থেকে ইবনে তাইমিইয়া মন্তব্য করেন যে, যারা ইসলাম পরিত্যাগ করে আল্লাহ কেবল তাদেরকেই অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জীবন আর নিরাপদ নয়, তাই ধর্মাবমাননাকারীরা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, আর এ কারণে তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিশ্লেষণের মূল সুর হলো: প্রধানত অনুমানমূলক এবং ইবনে তাইমিয়ার প্রশ্নাতীত অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরহেজগারির প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রেখেই একথা বলা যায় যে; সাধারণভাবে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ (মুফাসসিরুন) যে ধরনের শুদ্ধতার মানদণ্ড মেনে চলে থাকেন, সে পরীক্ষায় তার এ বিষয়টি উত্তীর্ণ হতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে ধর্মাবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির কোন উল্লেখ নেই। কুরআনের আয়াতে একে কুরআনের বাধ্যতামূলক বিধি বা সুনির্দিষ্ট শাস্তি অথবা নির্দেশ বলে সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত হয়নি। অন্যদিকে আমরা একথা বলতে পারি যে কুরআনের সাধারণ ভাষার প্রয়োগ কেবল ব্যাপকভিত্তিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য হবে। তাহলো-ধর্মাবমাননাকারী নিজেকে অবমানিত করে এবং নিজে আল্লাহর অভিসম্পাতের বস্তুতে পরিণত হয়। এটি একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ-এর জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বা বাধ্যতামূলক শাস্তির বিধান নেই; ফলে স্বাভাবিকভাবে তা তা'জিরের আওতায় দণ্ডযোগ্য অপরাধের মধ্যে পড়বে এবং এজন্য কি শাস্তি হবে-তা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপ্রধান বা সুযোগ্য বিচারিক কর্তৃপক্ষ।

. আরব বেদুইন, মুশরিক ও মুনাফিকদের হা... বিভিন্ন সময়ে মহানবী সা: এর অবমাননার অনেক প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আবু লাহাবের কথা বলা যায়, সে প্রায়ই রাসূল সা:কে অবমাননা করতো। (১১১:১) আরও অনেকে এরূপ আচরণ করতো। তারা তাঁকে লক্ষ্য করে 'পাগল' (মাযনূন)

www.pathagar.com

এর মতো বিভিন্ন কথা উল্লেখ করে তার অবমাননা করতো (৩৬:৩৫)। কুরআনে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা প্রায় রাসূল সা:কে 'গণক' (কাহিন) ও যাদুকর (সাহির) বলে উল্লেখ করতো। ইসলাম বিরোধীরা ইসলামকে আক্রমণের আরেকটি পথ বেছে নিয়েছিল, তারা বলতো, কুরআন হলো হযরত মুহাম্মদ সা: এর নিজের রচনা। এ বিরোধিতাও এক ধরনের মৌখিক অবমাননা। এর দ্বারা অবিশ্বাসীদের নেতারা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা ও আখিরাতের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান ও উপহাস করে।[২১২] কুরআন সাধারণত এসব অভিযোগকে সরাসরি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে এবং অসংখ্য ঘটনায় রাসূল সা:কে ধৈর্য ধারণ, সঠিক যুক্তি পেশ এবং দা'ওআত দানের উপদেশ দেয়।

কুরআনের প্রমাণপঞ্জির ব্যাপারে আমার পর্যালোচনার উপসংহারে আমি আরো দুটি প্রাসঙ্গিক আয়াতের উল্লেখ করতে চাই। নিম্নের উদ্ধৃত এর একটিতে রাসূল সা: এবং তার সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

৮. এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এসব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করে খোদার ভয় রক্ষা করে চলতে পার; তাহলে এটি হবে নিশ্চয় অত্যন্ত উঁচু দরের সাহসিকতার ব্যাপার। (৩:১৮৬)।

এ আয়াতটি মদিনায় নাযিল হয়। সে সময়ে রাসূল সা: ও সাহাবীগণকে যে প্রায়ই অবমাননা ও বিরক্তিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হতো; সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল সা: এর নবুওতি মিশন ও আন্দোলনের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এর বিরোধী অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে অবমাননা ও গালিগালাজ করার ঘটনা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিচার ও শাস্তি দেয়ার কথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত বা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। বস্তুত কুরআনে এমনই সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাসূল সা:ও সেটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। তবে পরবর্তী সময়ে গঠিত বিচার সংক্রান্ত মূলনীতিতে ভিন্ন পন্থা অনুসৃত হয়। এর একটিতে ধৈর্য ও সংযমশীলতার পরিবর্তে অধিকতর শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতের সমর্থন কুরআনের অন্যত্রও পাওয়া যায়। তাতে রাসূল সা: ও তাঁর সাহাবীগণের বৈরি পরিবেশের সম্মুখীন হবার বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

www.pathagar.com

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ.

৯. আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেক লোক তোমাদেরকে কোন উপায়ে ঈমানের পথ থেকে কুফরির দিকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, তথাপি শুধু নিজেদের হিংসামূলক মনোবৃত্তির কারণেই তোমাদের জন্য তাদের এ মনোবাসনা। এর উত্তরে ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন কর। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন (২:১০৯)।

এ আয়াতও মদিনায় নাযিল হয়। এতে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তির বিকাশ সাধনের জন্য রাসূল সাঃ ও প্রাথমিক যুগের মুমিন সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের সাফল্য স্বাভাবিকভাবে কাফেরদেরকে নিরাপত্তাহীন ও হিংসুকে পরিণত করেছে এবং এমন পরিস্থিতিতে শান্তিমূলক পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে না।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবনে তাইমিইয়া এ ধরনের অবমাননার কয়েকটি ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় মহানবী সাঃ তাকে বিরক্ত ও অবমাননা করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে ক্ষমা মঞ্জুর করেন। এসব লোকের মধ্যে ইহুদি থেকে ইসলাম গ্রহণকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহও ছিল। আবি সারহ রাসূল সাঃ এর নকলনবিশ হিসেবে কাজ করতো। এরপর সে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে গুজব ছড়ায় যে, রাসূল সাঃ তাকে কুরআন এর ডিকটেশন দিতেন কিন্তু প্রায় সে নিজে বাক্য পূরণ করতো এবং রাসূল সাঃ তাতে কোন আপত্তি জানাতেন না। অন্য কথায় সে বলতে চেয়েছে যে, মুহাম্মদ সাঃ ছিলেন একজন স্বঘোষিত নবী। ইবনে তাইমিইয়া ইহুদি কবি আনাস ইবনে যুনায়িম আল দাইলামির কাহিনীও বর্ণনা করেন। এ কবি রাসূল সাঃ ও তাঁর সাহাবীদের উপহাস ও অবমাননা করতো। দু'জনই ক্ষমা চাইলে তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ইবনে তাইমিইয়া ক্ষমার গুণ সম্পর্কিত উল্লিখিত কুরআনের দুটি আয়াত উদ্ধৃত করে জানান যে, মদিনায় হিজরত করার পর রাসূল সাঃ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে দীনের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে মনোযোগ দেন। সে সময়ে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো, কিন্তু তার পিতা ও আত্মীয়স্বজন অবিশ্বাসী থেকে যেতো, তৎকালে এটি কোন অসাধারণ ঘটনা ছিল না। এমন পরিস্থিতি অমুসলিম আত্মীয়দের মধ্যে

www.pathagar.com

তিক্ততা ও অসন্তোষ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। সে সময় মদিনার ইহুদি ও মূর্তিপুজক (আল মুশরিকুন) রাসূল সাঃ ও তাঁর সাহাবীদের অবমাননা ও বিরক্ত করতো। তবে মহান আল্লাহতা'আলা রাসূল সাঃ ও মুমিনদেরকে ধৈর্য ধারণ ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। উপরের আয়াত দুটি নাযিলের সময় এমনই পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো।[২১৩]

সাব আল রাসূল সাঃ এর জন্য দণ্ডদানের যেসব উদাহরণ পাওয়া গেছে, তার সব ক'টি ঘটেছে মদিনায়। সে সময়ে রাসূল সাঃ একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও নবুওতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। মক্কা শরীফে ইসলাম প্রচারকালে বার বার রাসূল সাঃ এর অবমাননা ও উপহাস করার ঘটনা ঘটলেও; তিনি কখনও এ ধরনের অপরাধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জানা যায়নি। এ থেকে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, অবমাননা একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ যা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যকর হয়ে থাকে। মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ধর্মাবমাননার জন্য কোন শাস্তি কার্যকর করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, এ ধরনের আচরণকে কঠিন ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, যারা এ ধরনের অপরাধ করবে তারা মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে এবং পরকালে শাস্তি পাবে। নবুওতি সুন্নতের উল্লেখ করার মতো আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, মক্কী যুগে ধর্মাবমাননাকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরে মদিনায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে একে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমি এখানে সুন্নাহর বিভিন্ন প্রমাণাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রস্তাব করছি না বরং কেবল কতিপয় সাধারণ অভিমত প্রকাশের চেষ্টা করছি। এরূপ করার কারণ হলো, আমি রাসূল সাঃ এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পরপরই খোলাফায়ে রাশেদার যুগে তাঁর প্রতি অবমাননা সংক্রান্ত কতিপয় দৃষ্টান্তের বিস্তারিত দিকের যথার্থতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া বেশ কঠিন, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে কেউ এসব তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখলে তাকে এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল সাঃ এর জীবদ্দশায় ধর্মাবমাননার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয়; কিন্তু তার অনেকগুলো কখনো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যেসব ঘটনা রাসূল সাঃ এর দৃষ্টিগোচর করা হয়, তিনি তার অধিকাংশকেই মাফ করে দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয় এবং শুধু মারাত্মক ঘটনাবলিরই বিচার করা হয়েছিল। একথা নিশ্চিত জানা গেছে

www.pathagar.com

যে, রাসূল সা: এ ধরনের প্রায় এক ডজন ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছিলেন, ঘটনা সংঘটিত হবার পর তিনি হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা মৌনভাবে এর অনুমোদন দেন। বিভিন্ন বর্ণনায় আভাস পাওয়া গেছে যে, এ সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহলো বিশ্বাসঘাতকতা, ইসলামের প্রতি বৈরিতা এবং রাসূল সা: এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। এসব করা হয়েছিল ব্যাঙ্গাত্মক গদ্যে ও পদ্যে ব্যক্তিগত গালিগালাজের আকারে। এতে ইসলামকে হীন ও অবমাননাকরভাবে তুলে ধরা হয় এবং রাসূল সা: এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আরোপ করা হয়। আমি যেসব বিবরণের বিষয় বিশ্লেষণ করেছি, তাতে ধর্মাবমাননা ও অবমাননার জন্য শাস্তি দানের ঘটনার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফকিহ্গণ ধর্মাবমাননা থেকে ধর্মত্যাগকে পৃথক করেননি এবং তাঁরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহও দেখাননি। সে সময়ে দণ্ডদানের কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আল সামারাই যে মন্তব্য করেছেন, নিম্নে উদাহরণ হিসেবে তা তুলে ধরা হলো :

> চার ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করার পর রাসূল সা: তাদের রক্তপাত বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তারা রাসূল সা: এর মর্যাদার ওপর চতুর্মুখী (ফাকাদ যামা'উ) আক্রমণ করেছিল। অবমাননা ও গালিগালাজ এবং ধর্মত্যাগ করে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে তারা এ আক্রমণ চালায়। তৎসত্ত্বেও রাসূল সা: তাদের সকলকে হত্যার নির্দেশ দেননি। বরং তাদের কয়েকজনের অনুতাপ প্রকাশকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।[২১৪]

যেসব লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, তারা কি কেবল ধর্মত্যাগের দায়ে এ দণ্ড পেয়েছিল, না কি তারা এর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধও করেছিল, অথবা রাসূল সা:কে কি ব্যক্তিগতভাবে অবমাননা ও গালিগালাজ করার মতো অপরাধের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট ছিল, এসব প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা কঠিন। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মদিনায় কোন মুসলমানকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চরম বিশ্বাসঘাতকতার মতো অপরাধের অভিযোগে দণ্ড দেয়া হয়নি। ধর্মাবমাননা ও ধর্মত্যাগ হচ্ছে উল্লিখিত শ্রেণীর অপরাধের সমমাত্রার একমাত্র অপরাধ। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চরম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত কোন পৃথক পরিভাষা কুরআন বা হাদিসে পাওয়া যায়নি। এ থেকে এ বিষয়টি বুঝা যায় যে, কেবল ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ধর্মাবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়নি বরং প্রাথমিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে এ দণ্ড প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

কুরআনের দৃষ্টিতে ধর্মাবমাননা হলো আল্লাহতা'আলা ও রাসূল সাঃ-এর বিরোধিতা করা। (মুহাদাদা, মুশাককাকা) এবং তাঁদেরকে অবমাননা করা (আদহা)। এবিষয়টি নিয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, যা চরম বিশ্বাসঘাতকতার খুবই কাছাকাছি। ইসলামের প্রাথমিক যুগের এসব অপরাধের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যের বিষয়টি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। নতুন ধর্মের প্রতি বৈরি আচরণের বিষয়টি স্মরণে রেখে, তা করতে হবে। বস্তুত এ কারণে মদিনায় হিজরত করার পর রাসূল সাঃকে রাষ্ট্রপ্রধান ও নবুওয়াতি মিশনের যৌথ দায়িত্ব পালনকালে ৮৫টি যুদ্ধে অংশ নিতে অথবা অনুমতি দিতে হয়েছিল।

ধর্মাবমাননার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন, কারণ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ অপরাধের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু আমাদের যুগে এ অপরাধ বিশেষভাবে আর কোন রাজনৈতিক অপরাধ নয়। নতুন ধর্ম ইসলাম ও নবীন ইসলামি রাষ্ট্র উভয়ই যখন অবিরাম বৈরিতা ও ধর্মত্যাগের মুখে নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে ছিল; সেসময়ে ইসলামের অস্তিত্ব ও অব্যাহত বিস্তারের পথে তা বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও এ পরিস্থিতির তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রাথমিক যুগে ধর্মত্যাগের বিষয়ে আলোচনাকালে ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়া এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এটি ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক বিষয় এবং ধর্মত্যাগের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সাথে বিবেকের স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক ছিল না। ধর্মত্যাগের ঘটনা ইসলাম ও এর রাজনৈতিক সংস্থার মূলভিত্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করায় এ দণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, ধর্মত্যাগ তখনই একটি বিশেষ মারাত্মক সংকট হিসেবে দেখা দেয়; যখন কেবল কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এটি করেনি বরং বিপুল সংখ্যক লোক নাশকতামূলক কাজ হিসেবে প্রকাশ্যে ইসলাম বর্জন করেছিল। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিতাবের অনুসারী একদল লোক (আহল আল-কিতাব) একদিন ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে এবং সেদিনই তা ত্যাগের ঘোষণা দেয়, অনুসারীদের কাছে ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করেছিল (৩:৭২)। মুতাওয়াল্লিসহ অনেক মুফাসসির লিখেছেন যে, মহানবী সা: এর জীবদ্দশায় এবং প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা: এর সময়ে ধর্মত্যাগের ঘটনাবলি প্রধানত বিভিন্ন গ্রুপ ঘটিয়েছিল, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এ কাজটি করেছিল। এ সময়ে ইহুদি ও খৃস্টানদের নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য দুর্বল

www.pathagar.com

করার অপচেষ্টা হিসেবে এমনটি করেছিল। তাদের একটি গ্রুপ এসে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা দিতো এবং পরে আবার তা পরিত্যাগ করতো।[২১৬]

এ ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইবনে কাইয়িম লিখেছেন, ধর্মত্যাগ ছিল রাজনৈতিক অপরাধ। আল-ইলি এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করে এ উপসংহারে উপনীত হন যে, রাসূল সাঃ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ধর্মত্যাগের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান অনুমোদন দেন এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি তার অবাধ ক্ষমতাকে ভিন্নভাবেও প্রয়োগ করেন, যেমন নবী হিসেবে তিনি ধর্মত্যাগকে তা'জিরের অপরাধ বলে গণ্য করেন। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা জানি যে, রাসূল সাঃ ইসলাম পরিত্যাগকারী এবং তাঁর দুর্নাম রটনা ও তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদদানকারী কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেন। এদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ, ইকরামা ইবনে আবি জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। আল ইলি আরো বলেন যে, রাসূল সাঃ এসব ঘটনায় মধ্যস্থতার বিষয় অনুমোদন দিয়েছিলেন ও তা মেনে নিয়েছিলেন। ধর্মত্যাগ যে তা'জির এর অপরাধ, এ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন আরো শক্তিশালী হয়েছে।[২১৭] এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া জরুরি তা হলো, 'ধর্মত্যাগ' ও 'ধর্ম অবমাননা' প্রায় সমার্থক শব্দ; তাই অধিকাংশ ধর্মত্যাগের ঘটনার সঙ্গে রাসূল সাঃ এর অবমাননা ও ইসলামের অবমাননার বিষয়ও সংশ্লিষ্ট রয়েছে, এভাবে দুটি অপরাধই অবিভাজ্য হয়ে পড়েছে।

এ সময়ে ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগ একটি প্রধান রাজনৈতিক অপরাধ ছিল; যার সঙ্গে যুক্ত ছিল ধর্মীয় দ্যোতনা। আমাদের যুগে এ অপরাধের সবচেয়ে সমতুল্য অপরাধ হচ্ছেঃ চরম বিদ্রোহ বা দেশদ্রোহিতা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবশ্য ধর্ম ও রাজনীতি অথবা ধর্মীয় ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না এবং নীতিগতভাবে বর্তমানেও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তাত্ত্বিকভাবে ইসলাম এ ধরনের কোন বিভাজনকে বৈধ বলে মনে করে না। তবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অন্যান্য কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার একটি হলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অপরাধের মধ্যে পার্থক্যঃ এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়েছে। চরম দেশদ্রোহিতার মতো রাজনৈতিক অপরাধকে এখন ধর্ম অবমাননার মতো অপরাধ থেকে ভিন্নভাবে দেখা হয়। এক্ষেত্রে দেশদ্রোহিতাকে ধর্ম অবমাননার চেয়ে অধিকতর গুরুতর বলে গণ্য করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে অংশত এ ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। রাসূল সাঃ ও খোলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বে মদিনা-রাষ্ট্র ইসলামের আদর্শ ও ধর্মীয় আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল ছিল এবং এর ভিত্তিতেই

www.pathagar.com

তা গঠিত হয়। আর এ মানদণ্ডেই রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয় পরিমাপ করা হতো, কিন্তু বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ফলশ্রুতিতে ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার মূল ধারণার প্রকৃতি ও কাঠামোয় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, উভয়ের রাজনৈতিক উপাদান অনেকখানি বর্জিত হয়েছে। তাই এ অপরাধের মাত্রার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করা হবে যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু ধর্ম অবমাননা এখন আর চরম দেশদ্রোহিতার মতো রাজনৈতিক অপরাধ নয় সেহেতু মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রে এক সময় একে যেভাবে বিবেচনা করা হতো; এখন সেভাবে বিবেচনা করা সম্ভবত সঠিক হবে না। তৎসত্ত্বেও, ধর্ম অবমাননাকে এখনও মারাত্মক অপরাধ হিসেবে দেখা হয়; যা হিংসা হানাহানিতে ইন্ধন যোগায়, প্রাণহানি ঘটায় এবং সমাজে আইনশৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। আমরা সালমান রুশদির গ্রন্থ 'স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশের পর তেমনটি ঘটতে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এমনটি হওয়া সত্ত্বেও, ধর্ম অবমাননা বর্তমানে সুমহান ধর্ম, এর আইনি ব্যবস্থা ও অন্যতম প্রধান সভ্যতা ইসলামের অস্তিত্ব ও এর বিস্তারের ক্ষেত্রে কোন হুমকি সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হয় না।

তাই আমি উপসংহারে এ মন্তব্য করতে পারি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মত্যাগ মদিনার নতুন সমাজের ধর্ম ও রাজনৈতিক ভিত্তি-উভয়ের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করায় তাকে চরম দেশদ্রোহিতার অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। আর সে কারণেই প্রাথমিকভাবে তখন এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান অনুমোদন করা হয়েছিল। ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার বৈশিষ্ট্য প্রায় একই ধরনের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা বেশ কঠিন। তবে ধর্মত্যাগের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাসূলের সা: প্রতি বৈরিতা ও অবমাননার দিকটি সংশ্লিষ্ট থাকে।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে এবং উমাইয়া শাসনের প্রাথমিক বছরগুলোতে এই পরিস্থিতি অনেকটা অপরিবর্তিত ছিল। বিজয়ী শক্তি হিসাবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ এবং উমাইয়া সাম্রাজ্য আরো শক্তিশালী হওয়ায়, ধর্মত্যাগ ইসলাম ও রাষ্ট্র-কারোর প্রতিই কোন হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারেনি। আইন পরিবর্তনের বড় ধরনের কোন চেষ্টাও অবশ্য করা হয়নি। যে পরিস্থিতিতে একসময় ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছিল; তা আর বজায় ছিল না: তৎসত্ত্বেও এ জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে আইনি বিধান করা হয়েছিল, তা অপরিবর্তিত থেকে যায়। অবশ্য ধর্মত্যাগের প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং তা প্রধানত রাজনৈতিক অপরাধ থেকে একান্তভাবে ধর্মীয় বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ অথবা সতর্কতার কারণে কিনা জানি না, 'আলেমগণ' ধর্মত্যাগের বিষয়টিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের আলোকেই

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে বিবেচনা করা হবে কিনা, সে বিষয়টির সুরাহা করেননি।

মাযহাবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতিমালায় ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননা করাকে একই মাপকাঠিতে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ধর্ম অবমাননাকে ধর্মত্যাগেরই একটি সংযোজিত অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। এ মতকে এখন আর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় না। উপরন্তু জাতিরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটার কারণে, একে এখন আর এক নম্বর রাজনৈতিক অপরাধ বলা যায় না এবং তা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতিও মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে না। অতএব ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননা-উভয় সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তনের বিষয়টির যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

এ অনুসন্ধান থেকে আমি এ উপসংহারে পৌঁছেছি যে, ধর্ম অবমাননা তা'জির-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ; যা অবমাননার মাত্রা ও পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের প্রভাবের ভিত্তিতে পরিমাপ করা উচিত।

> আধুনিক যুগের রাষ্ট্রের বৈধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও আইন সংস্থা এ বিবরণের ভিত্তিতে ধর্মাবমাননার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দান করবে, এ ধরনের অপরাধ বুঝার এমন কথা ও কাজ নিরূপণ এবং এসব ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা কি হবে-তা নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্টকরণ, অথবা সংশোধন ও সংস্কার করবে।[১১৮]

টীকা :

১. তুলনীয়, আবু হাবিব, দিরাসাহ, পৃষ্ঠা, ৭৪।

২. অত্যাবশ্যকীয় কল্যাণসমূহ হলো সেসব জিনিস: যার ওপর সমাজজীবন নির্ভর করে এবং এসবের প্রতি অবহেলা করা হলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। শরী'আতে পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় কল্যাণকর দিক (মাসালিহ) সনাক্ত করা হয়েছে, তা হলো, ঈমান, জীবন, মাল-সম্পত্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বংশধারা।

৩. তুলনীয়, যায়েদান, মাজমু'য়াহ, পৃষ্ঠা, ১২৯।

৪. শালতুত, মিন তাওজিহাত আল-কুরআন আল-করিম, পৃষ্ঠা, ৩৩০।

৫. একই গ্রন্থ পৃষ্ঠা, ৩৩১।

৬. মুনাইমিনা, মুশকিলাত আল-হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ৮।

৭. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, বাব আল-মুসলিম মান সালিমা, পৃষ্ঠা ২৩, হাদিস নং ৬৯।

৮. আলী, A Manual of Hadith, পৃষ্ঠা, ২৭।

৯. তুলনীয়, 'আওদা, আল-তাশরিহ আল জিনা'ল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৫৯

১০. তুলনীয়, The Holy Qur'an, ২৪:১-৫।

১১. উদাহরণ হিসেবে মিশরীয় দণ্ডবিধি (কানুন আল উকুবাত আল মিসরি), ধারা- ৩০২ এর উল্লেখ করা যায়। এতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর মিথ্যা আরোপ করলে তাকে কাযফ বলা হবে, বিষয়টি যদি সত্যও হয়, তাহলেও যার ওপর এটি আরোপ করা হয় তার ক্ষতি হয়। এই আইনের আওতায় এটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং যার ওপর এটি আরোপ করা হয় স্বদেশবাসীর কাছে তার সম্মানহানি ঘটায়।

১২. ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াত আল-মুজতাহিদ ওয়া-নিহায়াত আল মুকতাসিদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪০।

১৩. বাহনাসি, আল-জারাইম ফি'ল-ফিকহ আল-ইসলামি : দিরাসাহ ফিকিয়াহ মুকারানাহ, পৃষ্ঠা, ১৪৯।

১৪. 'আওদা, আল-তাশরি আল-জিনা'ল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৫৫।

১৫. হাম্মাদ, হুররিইয়া, পৃষ্ঠা, ২৭৯।

www.pathagar.com

১৬. ইবনে রুশদ আল কুরতুবি, বিদায়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪১।

১৭. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪২; আল জাযিরা, কিতাব আল-ফিকহ, আলা আল মাযাহিব আল-আরবা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২২-২৩ ও ২৩৬।

১৮. একই গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪৩; আল-জাযিরী, কিতাব আল-ফিকহ ২৩০ খণ্ড।

১৯. তুলনীয়, 'আওদা, আল তাশরি আল জিনা'ল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৭৮।

২০. আল তাবরিজি, মিশকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০৬১, হাদিস নং ৩৫৭০; আল জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৫।

২১. একই গ্রন্থ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩২।

২২. টীকা, সূরা ইউনুস, ১০:৩৮ ও ৬৯, আরও দেখুন, সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০:১২, এখানে 'ইফতিরা' ও এর ব্যুৎপন্ন শব্দ সমার্থক শব্দ 'মিথ্যা' (কিযব) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩. আল মাওসুয়াহ আল ফিকিয়াহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭৬।

২৪. ইবনে তাইমিইয়া, আল সিয়াসাহ; পৃষ্ঠা, ১৬৪।

২৫. আবু সিন্‌ন, 'নাজারিয়াত আল হক', মুহাম্মদ তাওফিক উবায়দা (সম্পাদিত), ফিকহ আল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২০৯।

২৬. আল-মাওসু'য়াহ, আল ফিকিয়াহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭৬।

২৭. তুলনীয়, আল ইলি, আল হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৪২৩।

২৮. ইবনে তাইমিইয়া, আল সিয়াসাহ, পৃষ্ঠা, ১৬৪।

২৯. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ৪২৭। এটি প্রাথমিকভাবে শাফেঈ মাযহাবের একটি আইন ছিল যাতে বাদীকে তা'জির বিল মাল বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে হানাফী ও অন্যান্য মাযহাবের অনুসারিরা তা'জির বিল মাল এর বৈধতার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন।

৩০. শালতুত, তাওজিহাত, পৃষ্ঠা, ৩৩৩।

৩১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ, আল-তুরুক আল হুকমিইয়া ফি'ল সিয়াসাহ আল-শরীয়া, পৃষ্ঠা, ১১৮।

৩২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১১১।

৩৩. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সারিম আল-মাসলুল 'আলা শাতিম আল-রাসূল, পৃষ্ঠা, ৫৪১।

www.pathagar.com

৩৪. আল-শারাবাসি, মিন আল আদাব আল-নাবাবিয়াহ, পৃষ্ঠা, ২৩৭।

৩৫. 'আওদা, আল-তাশরি আল-জিনা'ল, পৃষ্ঠা, ৫০৬।

৩৬. আল তাবরিজি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৯১৬।

৩৭. আল মাকদিসি, আল আদাব আল শারিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০।

৩৮. আল-বাহি, আল দ্বীন ওয়া'ল দৌলাহ, পৃষ্ঠা, ২৪৪-৪৫।

৩৯. আল-তাবরিজি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮১৪।

৪০. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ১৬৭৮। আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার ভাল গুণগুলো স্মরণ করবে।'

৪১. আল তাবরিজি, মিশকাত, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ১৬৬৪।

৪২. আল তাবরিজি, মিশকাত, প্রথম খণ্ড, হাদিস সং ৪৮৪৭।

৪৩. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাব ফাযায়েল আল সাহাবা, বাব তাহরিম সাব আল সাহাবা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭।

৪৪. ইসমা'ইল, মানহায আল-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা, ১৩৫।

৪৫. ইবনে আবিদিন, হাশিয়াত আল-রাদ আল-মুখতার আলা আল-দুর আল-মুখতার ('হাশিয়াত-ইবনে আবিদিন' নামে পরিচিত), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭৪

৪৬. একই গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩০।

৪৭. তুলনীয়, Lester K. Little 'Cursing,' The Encyclopedia of Religion, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৪।

৪৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৮২।

৪৯. আল-মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৪।

৫০. মুসলিম, মুখতাসার সহিহ মুসলিম, কিতাব আল-বির ওয়াল সিলাহ, বাব কারাহিয়াত আল লা'নাহ, পৃষ্ঠা, ৪৮১, হাদিস নং ১৮২২; আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৪।

৫১. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৬।

৫২. আবু জাহল, রাসূল সাঃ এর সমসাময়িক মক্কার কাফেরদের নেতা। সে ছিল রাসূলের চরম দুশমন। হাশেমী গোত্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একঘরে করার পিছনে আবু জাহলের হাত ছিল এবং সে রাসূল সাঃ কে হত্যার চেষ্টা করেছিল। তুলনীয়, ১৭:৬২; ৪৪:৪৩; ৯৬:৬।

www.pathagar.com

৫৩. আল শারাবাসি, মিনাল আদাব আল নাবাবিয়াহ, পৃষ্ঠা, ২৩৭।

৫৪. আল-মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৩।

৫৫. একই গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১২; আল-শারাবাসি, মিন আদাব, পৃষ্ঠা, ২৩৮; আল-বাহনাসাবি, আল-হুকম ওয়া কাদিয়াত তাকফির আল-মুসলিম, পৃষ্ঠা, ৬৫।

৫৬. আল-শারাবাসি, মিন আদাব, পৃষ্ঠা, ২৩৮।

৫৭. আল বাহনাসাবি, আল হুকুম, পৃষ্ঠা, ১৫১।

৫৮. আল তিরমিযি, সুনান, হাদিস নং ১৯৭৮; আল মাকদিসি, আল-আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১; হাদিসটি বিচ্ছিন্ন (গরিব) হাদিস বলে জানা গেছে তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতা থাকায় একে নির্ভরযোগ্য হাদিস বলে গণ্য করা হয়।

৫৯. আল মাকদিসি, আল আদাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১১-১২।

৬০. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৮২।

৬১. ইবনে হাযম, আল ফিসাল ফি'ল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়া'ল নিহাল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৮।

৬২. ইবনে আবিদিন, হাশিয়াহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৮৯।

৬৩. আল বাহানাসাবি, আল-হুকম, পৃষ্ঠা, ১২৮।

৬৪. আল-তাবরিজি, মিশকাত, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ১৩।

৬৫. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ৭৯।

৬৬. আল তাবরিজি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮১৭। যে কথা উচ্চারণে সুস্পষ্ট কুফরি বুঝায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এ বইয়ের ধর্মাবমাননা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬৭. আল তাবরিজি, মিশকাত, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮১৬; আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৮২; আল-বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৫০।

৬৮. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৮২।

৬৯. ইবনে আবিদিন, হাশিয়াহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৮২; আল বুহুতি, কাশশাফ আল কিন্না আন মাতন আল ইকনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭৭; আল মাওয়াহ আল ফিকিয়াহ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩৪-৩৫।

৭০. আল বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৩৭৬।

৭১. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৭৬।

www.pathagar.com

৭২. আল বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ১৪৮।

৭৩. মাজমা আল লুগাহ, আল মু'জাম আল ওয়াসি্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৯৮; আল যাবি, তারিব আল কামুস আল মুহিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪৬; ওয়াজদি, দাইরাত আল মা'রিফ কাম আল ইশরিন, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৪; Cowan সম্পাদিত, The Hans Wehr, Dictionary of Arabic, পৃষ্ঠা, ৬৯৬; Hughes, A Dictionary of Islam, পৃষ্ঠা, ১২৯; মুহসিন খান, The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩।

৭৪. Hughes, Dictionary, পৃষ্ঠা, ১২৯।

৭৫. তুলনীয়, ইবনে কাইয়িম, ইগাসাত আল লাহফান মিন মাকাইয়িদ আল শয়তান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৫।

৭৬. তুলনীয়, রিদা, তাফসির আল-মানার, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৪৪।

৭৭. একই গ্রন্থ, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৬৬।

৭৮. ইবনে কাইয়িম, ইগাসাহ, পৃষ্ঠা, ১২৩।

৭৯. রিদা, তাফসির আল মানার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০৯। ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেররা মুসলমানদের ওপর প্রায়ই যুলুম-নির্যাতন করতো। যুলুমের শিকার ব্যক্তিদের উদাহরণ হলেন, আম্মার ইবন ইয়াসির ও তার পরিবার, বিলাল ও শোয়াইব (রা:) । বিস্তারিত জানতে দেখুন, তাফসির আল মানার, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১৬।

৮০. মুহসিন খান, The Translation of al-Bukhari, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬৭, হাদিস নং ২১৫।

৮১. রিদা, তাফসির আল মানার, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১২।

৮২. তুলনীয়, Hughes, Dictionary, পৃষ্ঠা, ১২৯; The Translation of al-Bukhari, কিতাব আল-ফিতান, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৩।

৮৩. তুলনীয়, আল গাযাবী, আল হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৪৩।

৮৪. এটি নজিবুল্লাহর পূর্বসুরী কারমাল ও আমিনের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে। এরা ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক দখলদারিত্বের সময় কাবুলে অপ্রতিনিধিত্বশীল কমিউনিস্ট সরকারের প্রধান ছিলেন। তুলনীয়, কামালী, Law in Afganistan, পৃষ্ঠা, ৫৮।

www.pathagar.com

৮৫. ইসমা'ইল, মানহাজ, পৃষ্ঠা, ১৪১।

৮৬. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, ইবনে কাইয়িম উদ্ধৃত হাদিস, ইগাসাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৩ এবং তাবরিজি, মিশকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৩৬৭৮। হাদিসটিতে বলা হয়, 'তোমরা সকলে যখন একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হও, তখন কেউ যদি তোমাদের ঐক্যে ভাঙন ধরানোর এবং তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট ও ধ্বংসের চেষ্টা করে, তাহলে তাকে তোমরা হত্যা কর।'

৮৭. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৬২।

৮৮. উপরের ১১৪ পৃষ্ঠার ১৩৯ নং টীকা দেখুন।

৮৯. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৬২-৬৩।

৯০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৫-০৫৬; আল গাযাবী, হুররিয়া পৃষ্ঠা, ৫৮।

৯১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৬, El-Awa, On the Political System of the Islamic State, পৃষ্ঠা, ৪৩।

৯২. আল সিবাই, ইশতিরাকাইয়াহ, পৃষ্ঠা, ৪৯।

৯৩. বড় ধরনের পাপ কাজ (কবিরা গুনাহ) হলো, একটি সংজ্ঞানুযায়ী, মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ। আরেকটি সংজ্ঞায় সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, কবিরা গুনাহর শাস্তি হলো সুনির্দিষ্ট দণ্ডের (হুদুদ) অনুরূপ শাস্তি।

৯৪. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৫৫; গাযাবী, হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৫৮।

৯৫. তুলনীয়, Hughes, Dictionary, পৃষ্ঠা, ৪৮৪; আল কিন্দি, The Governors and Judges of Egypt, পৃষ্ঠা, ৪৪৫-৪৬; জানা গেছে, কুরআন সৃষ্ট না সৃষ্টি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ইমাম আবু হানিফা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করার উপদেশ দেন। তুলনীয়, আবু যাহরাহ, আবু হানিফা: হায়াতুহ ওয়া আসরুহ আরাউহ ওয়া ফিকহু, পৃষ্ঠা, ১৮১।

৯৬. আল-মাকদিসি, Nacholas Heer সম্পাদিত- Islamic Law and Jurisprudance, এ 'Magesterium and Academic Freedom in Classical Islam and Medieal Christianity, পৃষ্ঠা, ১৩১।

৯৭. এখানে সালিশির বিষয়টি আলী রা: ও মুয়াবিয়া (রা:) এর মধ্যকার বিরোধের ব্যাপারে কুরআনের ফায়সালা গ্রহণের মুয়াবিয়া রা: এর প্রস্তাব আলী রা: এর মেনে নেয়া সম্পর্কিত। ওসমান রা: এর হত্যাকারীদের

www.pathagar.com

খুঁজে বের করে বিচারের সম্মুখীন করার আলীর প্রচেষ্টা মুয়াবিয়ার অসন্তুষ্টির ফলশ্রুতি হিসেবে এ বিরোধের সৃষ্টি হয়। মুয়াবিয়া উমাইয়াদের পক্ষে খেলাফত লাভের চেষ্টা করছিলেন। আরো দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা, ১৩৯।

৯৮. আল শাহরিস্তানী, আল মিলাল ওয়া'ল নিহাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৮। আল জুন্দি, মা'য়ালিম আল-নিজাম আল সিয়াসি ফি'ল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ২০৩; Chejne, Succession to the Rule in Islam, পৃষ্ঠা, ৩৮।

৯৯. খাদ্দুরি, এম, The Islamic Law of Nations: আল শায়াবানির, সিয়ার, পৃষ্ঠা, ২৩১।

১০০. আল শাওকানি, নায়িল আল আওতার শারহ্ মুনতাকা'ল আখবার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৭; আরো দেখুন আল-ইলি, আল হুররিয়া আল আম্মাহ, পৃষ্ঠা, ৩৮৪; মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ২৮৪; হাম্মাদ, হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ১২৪।

১০১. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৭২।

১০২. খাদ্দুরি এম, The Islamic Law of Nations : আল-শায়াবানি সিয়ার, পৃষ্ঠা, ২৩১।

১০৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২৩০, আল সারাখসি, আল মাবসূত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৪।

১০৪. আল শাওকানি, নায়িল আল আওতার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৯০; El-Awa, Politcial System, পৃষ্ঠা, ৫৬; ইসমাইল, মানহায, পৃষ্ঠা, ৩১৯।

১০৫. ইসমাইল, মানহায পৃষ্ঠা, ৩০৯; আবু যাহরাহ, আল-জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৬৫; গাযাবি, আল হুররিয়া, পৃষ্ঠা, ৫৯।

১০৬. খাদ্দুরি এম, The Islamic Law of Nations : আল-শাযাবানি, সিয়ার, পৃষ্ঠা,২৩০

১০৭. দেখুন 'আওদা, আল তাশরি আল জিনা'ল আল ইসলামি মুকারানান বিল কানুন আল ওয়াদি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০১।

১০৮. আল মাওয়ারদি, কিতাব আল আহকাম আল সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা, ৬৭।

১০৯. 'আওদা, আল তাশরি আল জিনা'ল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০৪-৫।

১১০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১০৫।

১১১. ইবনে কাইয়িম, ইগাসাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৯।

১১২. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৪।

১১৩. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৯।

www.pathagar.com

১১৪. একই গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১৪।

১১৫. কামালি, 'Varieties of Ra'y, American Journal of Islamic Social Sciences, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ৩৯-৬৪।

১১৬. দেখুন, কুরআন, ২৬ : ১৬০-১৭৩; ২৭ : ৫৪-৫৮; ২৯ : ২৮-৩৫; ৫৬ : ৩৩-৩৯।

১১৭. ইবনে কাইয়িম, ইগাসাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩০।

১১৮. একই গ্রন্থ।

১১৯. একই গ্রন্থ।

১২০. ইবনে তাইমিইয়া, Public Duties in Islam : The Institution of Hisbah, মুখতার হল্যান্ড অনুদিত, পৃষ্ঠা, ৮৮।

১২১. ইবনে তাইমিইয়া, আল সিয়াসা পৃষ্ঠা, ১২৩; আরো দেখুন, আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৫৭, তিনি এ বিষয়ে ইবনে তাইমিইয়ার রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১২২. আল-সারাখসি, আল-মাবসুত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৫।

১২৩. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৫৯।

১২৪. আল গাযালি, ইহ্ইয়া, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮।

১২৫. একই গ্রন্থ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৫ এবং আল মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫২-৫,তে উভয় হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে।

১২৬. আল সারাখসি, আল মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫৩।

১২৭. আল গাযালী, ইহইয়া, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫ এবং আরও বিস্তারিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫৯।

১২৮. তুলনীয়, আল সারাখসি, আল মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫৪।

১২৯. আল গাযালী, ইহইয়া, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৮।

১৩০. আলি-গাযালী উভয় হাদিস তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, ইহইয়া অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৯০।

১৩১. একই গ্রন্থ, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২-১৪।

১৩২. একই গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৩।

১৩৩. একই গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫০-৬০, এখানে গাযালী বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৩৪. তুলনীয়, একই গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪৩।

www.pathagar.com

১৩৫. সিয়াসা শরীয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার নিবন্ধ 'সিয়াসা শরীয়া বা Policies of Islamic government ইসলামি সরকারের নীতি' Journal of Islamic Social Sciences ষষ্ঠ খণ্ড, (১৯৮৯)।

১৩৬. ইবনে কাইয়িম, আল তুরুক, পৃষ্ঠা, ২৫৮-৯ (বৈরুত সংস্করণ, দার আল মা'রিফা)।

১৩৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২৫৮, (বৈরুত সংস্করণ, দার আল মারুফা)।

১৩৮. ইবনে 'আবিদিন, হাশিয়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৫।

১৩৯. ইবনে কাইয়িম, আল তুরুক, পৃষ্ঠা, ২৫৬।

১৪০. তুলনীয়, আবু আবিদিন, হাশিয়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৫।

১৪১. তুলনীয়, 'আওদা, আল তাশরি আল জিনা'ল, পৃষ্ঠা, ১৩৮।

১৪২. কামালি, 'The Limits of Power in an Islamic State,' Islamic Studies, ২৮ (১৯৮৯) পৃষ্ঠা, ৩২৩-৫৩।

১৪৩. আল-শাতিবি, আল ই'তিসাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৯৩।

১৪৪. ইবনে আবিদিন, হাশিয়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৬-৬৭।

১৪৫. তুলনীয়, আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ, পৃষ্ঠা, ১১৬।

১৪৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪৩-৪৬।

১৪৭. নিম্নে কুরআন-সুন্নাহর সাক্ষ্য প্রমাণ শীর্ষক পৃথক অনুচ্ছেদে এসব পূর্ণাঙ্গ আয়াত এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪৮. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৬১।

১৪৯. আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ, পৃষ্ঠা, ৯৯।

১৫০. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫১৯: এ মত সম্পর্কে লেখার সময় ইবনে তাইমিইয়া একই পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, কাযী আবু ইয়ালা আল দাররা ও ইবনে হাযম আল-আন্দালুসিও একই অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। ইরাকের কতিপয় ফকিহ খলিফা হারুন অর রশিদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, রাসূল সা: এর অবমাননাকারী কোন ব্যক্তিকে চাবুক মারা উচিত কারণ এ অবমাননার ঘটনার সঙ্গে বৈধতার বিষয়ে কোন দাবি সংযুক্ত করা হয়নি। একথা বলার পর ইবনে তাইমিইয়া বলেন, ইমাম মালিককে এ ফতোয়া সম্পর্কে অবহিত করার পর তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে তাইমিইয়া ইমাম মালিকের সঙ্গে একমত

www.pathagar.com

পোষণ করেন, তিনি বলেন, ইরাকের যেসব ফকিহ্ এ অভিমত ব্যক্ত করেন তারা ছিলেন অনেকটা অপরিচিত এবং সম্ভবত আবু ইয়ালা কতিপয় 'মুতাকাল্লিমুল' (মুতাযিলা) এর রচনা থেকে এমত গ্রহণ করতে পারেন।

১৫১. তুলনীয়, আল বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৬২।

১৫২. ইবনে হাযম, আল ফিসাল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৭-৩৮।

১৫৩. আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ৮২, আরো দেখুন আল বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৫০।

১৫৪. আল গাযালি, আল মুনকিয (Mac Carthy অনূদিত), পৃষ্ঠা, ১৫০।

১৫৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৬২।

১৫৬. ইবনে আবিদিন, হাশিয়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩৭।

১৫৭. তুলনীয়, আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ, পৃষ্ঠা, ১৯৬; আল যুহাইল, আল ফিকহ আল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৮৪; আল-জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪২৮।

১৫৮. আহমদ আমিন, ফজর আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১৫৪-৫৭।

১৫৯. আল বাহনাসাবি, আল হুকম, পৃষ্ঠা, ৩৭৩।

১৬০. Carl Ernst, 'Blasphemy : 'The Islamic Concept,' The Encyclopedia of Religion, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪২-৪৩।

১৬১. আহমদ আমিন, দুহা, পৃষ্ঠা, ১৫৮; আল-বাহনাসাবি, আল-হুকম, পৃষ্ঠা, ৩৭৩; আল-জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮; আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ, পৃষ্ঠা, ২০৬।

১৬২. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১১-১২।

১৬৩. আল মাওসু'য়াহ আল ফিকিয়াহ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩০-৩১; আল-জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৩৬।

১৬৪. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৩৯।

১৬৫. একই গ্রন্থ, ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১৬।

১৬৬. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৩৯।

১৬৭. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১৬।

১৬৮. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৩৯।

১৬৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৫৪১, ৫৪৩।

১৭০. বাহনাসি, আল-জারায়িম ফি'ল ফিকহ আল ইসলামী : দিরাসাহ ফিকহিইয়াহ মুকাররানাহ, পৃষ্ঠা, ১৪৭।

www.pathagar.com

১৭১. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৪১।

১৭২. হাদিসে কুদসির শাব্দিক অর্থ হল, 'পবিত্র উচ্চারণ'। 'রাসূলের সা: সাধারণ হাদিস থেকে এর পার্থক্য রয়েছে, 'হাদিসে কুদসি' হচ্ছে মূলত আল্লাহতা'আলারই কথা কিন্তু তা রাসূল সা: এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। হাদিসে কুদসি আল্লাহতা'আলার কথা হলেও তা কুরআনের অংশ নয়। এ গ্রন্থের সর্বত্র রাসূল সা:এর কথা হিসেবে হাদিস শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৫৪৩।

১৭৪. আবু দাউদ, সুনান, (হাসান অনূদিত), তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৩৬৪৩।

১৭৫. আল শারাবাসি, মিন আল আদাব আল নাবাবিয়া, পৃষ্ঠা, ১৯৭।

১৭৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২০২; ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ১৭২-১৭৪

১৭৭. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৩১।

১৭৮. ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩২; আল দুসুকি, হাশিয়াত আল দুসুকি আলাল শার আল কাবির লি-আবিল বারাকাত সিদি আহমদ আল দারদির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৯; আল জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪২৯০।

১৭৯. আল দুসুকি, হাশিয়াত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯; আল শারবিনি, মুগনি আল মুহতাজ ইলা মারিফাত মা'নি আলফায আলা মিনহাজ; চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৫।

১৮০. একই গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১১।

১৮১. একই গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১২।

১৮২. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৬৬-৬৭; ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৫; আল মারুফাহ আল ফিকহিয়াহ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩৯।

১৮৩. ইবনে তাইমিইয়া, আল-সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৬৫; আরো দেখুন, আল বুহুতি, কাশশাফ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭৭; আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়াহ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩১; আল জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪২৩।

১৮৪. আল-খিযির ও লোকমান নবী এবং হারুত ও মারুত ফিরিশতা ছিলেন কিনা-সে ব্যাপারে কিছুটা সংশয় রয়েছে। তুলনীয়, আল মাওসুয়াহ আল

www.pathagar.com

ফিকহিয়া, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩১; আল দুসুকি, হাশিয়াত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১২।

১৮৫. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২; ইবনে আবিদিন, হাশিয়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩৫।

১৮৬. আল বুহুতি, কাশশাফ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮; আল ইয়াহসাবি, কাযী 'আইয়াদ, আল শিফা বিল তা'রিফ হুকুক আল মুস্তাফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭০।

১৮৭. তুলনীয়, ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা ৫৪৭-৪৮; আল-ইয়াহসাবি, আল শিফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭১; আল সামারাই, আহকাম, পৃষ্ঠা, ৯৪।

১৮৮. আল কারাফি, আল ফুরূক, পৃষ্ঠা, ১৪১।

১৮৯. তুলনীয়, আল ইয়াহসাবি, আল শিফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪; ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭৪; আল শাওকানি, নায়েল আল আওতার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২১; রহমান, Apostasy, পৃষ্ঠা, ১১৬

১৯০. আল শাওকানি, নায়েল আল আওতার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২১।

১৯১. আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়াহ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩১; আল বুহুতি, কাশশাফ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৮; ইবনে হাযম; আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১১।

১৯২. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৩০২।

১৯৩. আল জাযিরি, কিতাব আল ফিকহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪২৫৭; আল সামারাই, আহকাম, পৃষ্ঠা, ১৯৪। ইবনে তাইমিয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৩০২

১৯৫. একই গ্রন্থ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৩৭-৩৮, আল ইয়াহসাবি, আল শিফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬০।

১৯৬. আল ইয়াহসাবি, আল শিফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৬০; ইবনে কুদামাহ আল মুগনি, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৫; আল শাওকানি, নায়েল আল আওতার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২১।

১৯৭. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৫৫৯-৬১; ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১৩; আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়া, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩১।

১৯৮. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৮।

১৯৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১০-২৪ এবং ২৫৪-৫৫; ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, একাদশ, পৃষ্ঠা, ৪১৬।

২০০. আল ইয়াহসাবি, আল-শিফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৯।

২০১. এটি হলো এ সত্যের উল্লেখ যে, রাসূল সা: যে ওহী পেতেন তাতে তিনি বিশ্বাস করতেন।

২০২. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ২০।

২০৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২২।

২০৪. একই গ্রন্থ।

২০৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২৩।

২০৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ২৪।

২০৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪০।

২০৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪২।

২০৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪৪।

২১০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৪৩-৪৫।

২১১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৫০-৫১।

২১২. তুলনীয়, Ernst, 'Blasphemy, the Islamic Concept, The Encyclopedia of Religion, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৩।

২১৩. ইবনে তাইমিইয়া, আল সারিম, পৃষ্ঠা, ৭৯।

২১৪. আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ, পৃষ্ঠা, ১৯৯।

২১৫. ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ, জা'দ আল মা'দ ফি হুদা খায়ের আল-'ইবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪১৯।

২১৬. মুতাওয়াল্লি, মাবাদি, পৃষ্ঠা, ৩০২।

২১৭. আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ, পৃষ্ঠা, ১৯৯।

২১৮. নিম্নের পরিশিষ্ট ৩ এর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে ধর্মাবমাননা সম্পর্কিত আইন তুলে ধরা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও সুদানের কয়েকটি ধর্মাবমাননা ও ধর্মত্যাগের ঘটনার মামলার বিবরণীও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াতের যেসব তথ্য প্রমাণ পর্যালোচনা ও উপস্থাপন করেছি, তাতে ব্যক্তির মর্যাদা ও তার বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের মূলে রয়েছে স্বাধীনতা বনাম দায়িত্বশীলতার মতো মৌলিক নৈতিক বিষয়। কোন ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমাজের জন্য কোন্‌টি কল্যাণকর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন, সে অনুযায়ী কাজ করার ও কথা বলার স্বাধীনতা মঞ্জুর করা ছাড়া এ বিষয়টি সুষ্ঠু নৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে সমাধান করা কঠিন হবে। কোন সুষ্ঠু বিচার বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি অবমাননাকর আচরণের সম্মুখীন হলে তার প্রতিশ্রুতিবোধ, বিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠতা তাকে বিচলিত করে তোলে এবং তিনি বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এর নিন্দা জানান এবং এ ব্যাপারে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। আমি যে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি, তাতে ইসলামের মহান নৈতিক ও আইনগত শিক্ষার অন্যতম এ মৌলিক বার্তা দেখতে পেয়েছি। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি শরীয়া অন্যান্য ধর্ম ও আইনগত ঐতিহ্যের ব্যাপারেও একটি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম সমাজের অমুসলমান অধিবাসীদের ন্যায় বিচার, শিষ্টাচার ও সত্যের পথে কথা বলার এবং এ সবের পরিপন্থী কোনকিছুর নিন্দা জানানোর অধিকার প্রদান করেছে।

ইসলাম ইতিবাচক নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখেছে, যাতে ব্যক্তির কথা ও আচরণে তার আদর্শের একনিষ্ঠতার অকপট প্রকাশ হয়ে থাকে। সহমর্মিতা, আত্মসংযম, অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অপরের কোন ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কথা বা কাজ পরিহার করা, তার অগোচরে নিন্দা না করা বা কটুকথা না বলা অথবা অপরের দুর্বলতা প্রকাশ কওে না দেয়া, যে কোন আকারেই হোক না কেন-এগুলো হচ্ছে ইসলামের নৈতিক সৌধের প্রধান বিষয়নৈতিক অখণ্ডতা ও ধর্মনিষ্ঠতার (তাকওয়া) বুনিয়াদ। অন্যদিকে মিথ্যা অপবাদ, কুৎসা রটনা ও অবমাননার হাত থেকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শরীয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ধর্মাবমাননার বিষয়েও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেছে যাতে ধর্মদ্রোহ এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি মারাত্মক হুমকি রোধ করা সম্ভব হয়। আমরা শরীয়াতের বিভিন্ন সূত্রে এসব ব্যাপারে যে তথ্যপ্রমাণ দেখতে পেয়েছি তার লক্ষ্য হচ্ছে: আইন প্রয়োগের উচ্চতম মান বজায় রাখা যাতে সঠিক নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটলে এবং ঔচিত্য ও সহনশীলতার সীমা লংঘন করলেই কেবল কারোর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

মিথ্যা অপবাদ, অবমাননা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করা হয়। শাস্তি মূলক ব্যবস্থাকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কেবল একান্তভাবে বাধ্য হয়েই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন-সুন্নাহতে নৈতিক উদ্বুদ্ধকরণ, সদুপদেশদান, ব্যক্তির শুভবুদ্ধির উদ্রেকের আবেদন, অনুশোচনা ও ক্ষমার ওপর উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইসলাম যার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপর স্পষ্টত: অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই নৈতিক উপদেশ দিতে এবং যে ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নিয়ম নীতি লংঘন করেছে বলে মনে করা হয়; তাকে শুধরানোর জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। নৈতিক উপদেশ (নসিহা), কাফফারা ও অনুশোচনার (তাওবা) মাধ্যমে শুধরানোর এ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এগুলো হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষা ও আইনগত নির্দেশনার নির্যাস ও চেতনা, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে যে কোন আইনগত পদ্ধতিতে যার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ থাকা উচিত।

সমসাময়িক অনেক মুসলিম দেশের সংবিধানে এমন বিধিবিধান গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে বাকস্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও: বস্তুত পশ্চিমা মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে এসব সাংবিধানিক ঘোষণার অধিকাংশ প্রদান করা হলেও; এতে কুরআন-সুন্নাহর স্বাভাবিক দিক নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে; যা একদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে জোরযবরদস্তি নিষিদ্ধ করেছে; অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নৈতিক শুদ্ধতা ও সত্যের সন্ধানে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দাবি জানিয়েছে। যারা এসব ইসলামি রীতিনীতি অনুসরণ করবেন, তারা মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীণতা ভোগ করবেন তবে এ স্বাধীনতার দায়িত্বশীল প্রয়োগ এবং এর অপব্যবহার রোধ নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সংযম পালন জরুরি। আধুনিক সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে বেশ চমৎকার মনে হলেও, এর সন্তোষজনক বাস্তব প্রয়োগের অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক মুসলিম দেশের নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক ঘোষণা এখনো বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে দেশের ব্যবহারিক আইনে পরিণত হয়নি। এছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগ ও গুণগত মানোন্নয়নে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ স্বাধীনতার ব্যাপারে যেসব আইনকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি; সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে সম্ভবত এটি করা সম্ভব হতে পারে। মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিধিতে ইসলামি বিষয়সমূহ ও কুরআনের কতিপয় নীতি ও ধারণা,

যেমন হিসবাহ, নসিহা, শূরা, ভাল কাজে সহযোগিতা করার (তাওয়াউন) মতো বিষয়ের সম্ভবত আরো দৃশ্যমান ভূমিকা সংযোজন করা হলে মুসলিম দেশসমূহের সংবিধিবদ্ধ আইন আরো সমৃদ্ধ হবে। নাগরিক ও রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে কিভাবে একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে এগুলোকে সমন্বিত করা যায় সে ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও আইন প্রণেতাগণ, বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে তথ্য সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী; তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত শরী'আতের এসব দিক ও অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রের বিপরীতে ব্যক্তির অবস্থান জোরদারে সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে: এসব বিধান কার্যকর করা এবং তার আওতাধীন সকল বৈধ পন্থার মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তাতে রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়াতের বিধিবিধানের মধ্যে আমরা বড় ধরনের কোন পার্থক্য দেখতে পাইনি। এটি সম্ভবত নীতি ও স্টাইলের প্রশ্ন, কোন বিতর্ক বা সংস্কারের বিষয় নয়। মুসলিম দেশগুলোর আধুনিক সাংবিধানিক আইনে স্বাধীনতার অনুকূল ও পরামর্শমূলক দিকগুলোকে শরী'আতের মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে যেহেতু শরী'আতের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বত:সিদ্ধতা রয়েছে; সেহেতু শরীয়া সংক্রান্ত নীতিকে তার নিজস্ব পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রকাশ করার সুযোগ দিলেই কেবল, তা সবচেয়ে কার্যকরভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে পারবে। বিশেষ করে কেউ জাতিরাষ্ট্রের পশ্চিমা ঘেঁষা শিক্ষা ও মুসলিম দেশসমূহে ঔপানিবেশিক-উত্তর সাংবিধানিক আইনের বিষয় মাথায় রাখলে; তিনি স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের সুপারিশ করবেন। অপরদিকে অনেক মুসলিম দেশ তাদের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে ও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। এ প্রক্রিয়া ব্যাপক গুরুত্ব পাবার উপযোগী ও সমর্থনযোগ্য এবং আলাপ আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটি হওয়া উচিত।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে যে: কোন সংবিধানের গণতান্ত্রিক উপাদানের মূল বিষয় এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতিকে একটি সরকারের প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবে বিভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মানবমর্যাদা, জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তা এবং কর্তব্য ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত ইসলামি আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য নি:সন্দেহে স্থায়ী ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা প্রয়োজন; যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের আইন, বিচার ও নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে-মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১ : হক্ব, হুকম, শারি' ও 'আদল

১. হক্ব এর অর্থ ও সংজ্ঞা

আরবি ভাষায় হক এর প্রাথমিক অর্থ হল 'প্রতিষ্ঠিত সত্য ঘটনা,' 'বাস্তবতা' বা 'সত্য'। আইনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো 'সত্য' অথবা 'প্রকৃত ঘটনার অনুরূপ', বস্তুত এটাই হলো শব্দটির প্রধান অর্থ।[১] হকের অন্যান্য প্রধান অর্থ হলো, 'সঠিক' 'ক্ষমতা' ও 'দাবি', এমনকি কিছু কিছু লোক 'কল্যাণসাধন ও জনকল্যাণকে'ও (খায়ের ওয়াল মাসলাহা) হক এর অর্থ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[২]

পবিত্র কুরআনে ঘনঘন 'হক' শব্দটি উচ্চারিত হতে দেখা যায় এবং প্রায়ই 'কতিপয় মূল্যবোধ', পুরস্কার, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির নিশ্চয়তা বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল-সাবুনি পবিত্র কুরআনে হক শব্দটির অন্তত ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের একটি তালিকা দিয়েছেন, তবে তিনি উপসংহার বলেছেন যে নিশ্চয়তা ও প্রমাণ বুঝাতে সাধারণভাবে কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] কুরআনের ভাষায় হক ওয়াজিব-এর সঙ্গে আন্ত:পরিবর্তনীয়। অবশ্য 'দায়িত্বের' বিপরীত হিসেবে অধিকার বুঝাতেও 'হক' এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সম্পদে 'ভিক্ষুক ও গরিবের' নির্দিষ্ট অধিকার (হক) থাকার কথা বলা হয়েছে (৫১:১৯)। পবিত্র কুরআনে এদু'টো অর্থের কোনটিকেই হক এর প্রধান অর্থ হিসেবে বিশেষভাবে বুঝানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। কখনো কখনো কোন কাজের সুনির্দিষ্ট ফল হিসেবে মুমিনদের বিজয় ও মুক্তি বুঝাতে হক এর ব্যবহার করা হয়েছে (১০:১০৩; ৩০:৪৭)। ন্যায়বিচারের স্বার্থে হত্যা করা নিষিদ্ধ, বৈধ কাজ করা (বিলহক); এবং জেনেশুনে সত্য (আল হক) গোপন করো না (২:৪২), এগুলো হলো হক এর অনুরূপ ব্যবহারের দু'টি দৃষ্টান্ত, একারণে আলবাহি এ মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনে হক শব্দটি অবিচ্ছেদ্যভাবে ন্যায়বিচার ও কল্যাণসাধনের (আদল ওয়া ইহসান) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সর্বশেষে বলা যায় যে, অনেক সময় হক জোরালো বাধ্যবাধকতা না বুঝিয়ে বরং বিশেষ ধরনের আচরণকে উৎসাহিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণিত মুসলিম শরিফের একটি হাদিস। এতে বলা হয়েছে, কোন মুসলমানের 'ছ'টি বিষয়ে অপর মুসলমানদের ওপর অধিকার (হক) রয়েছে ...' তা হলো, সালামের জবাব দান, দাওয়াত কবুল করা, সদুপদেশ (নসিহা) গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এগুলো অবশ্যই নৈতিক অধিকার; তবে প্রতিপালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার কারণে এগুলো 'হক' এর পর্যায়ে উন্নীত

হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এ বিষয়টি ইসলামে অধিকারের ক্ষেত্রে আইনগত দিকের বিপরীতে নৈতিক ধারণার উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে। প্রাচীন মুসলিম আইন বিশারদগণ, হক এর আইনগত কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি তবে তারা এর পরিবর্তে শব্দের ভাষাগত অর্থের ওপর নির্ভর করেন।[৫] আলী আল-খফিফ এর মতে, আইন বিশারদগণ সম্ভবত এটি করা প্রয়োজন মনে করেননি: কারণ শব্দটির অর্থ পরিস্কার ও বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে এর আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৬]

ইবনে নূজাইম এর বাহর আল রাইক গ্রন্থে দৃশ্যত হকের এক ধরনের ভাসাভাসা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এখানে কোন বস্তুর ওপর ব্যক্তির অধিকারকে (আল হক মা ইয়াস্তাহিক্কুহুল রাজুল) হক এর সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংজ্ঞা পরোক্ষ ধাচের; কারণ এতে হক থেকে উৎপন্ন শব্দকেই সংজ্ঞা হিসেবে নেয়া হয়েছে। একই লেখক মালিকানার অধিকারের বিষয়ে সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তিনি একে 'একান্তভাবে স্বত্বনিয়োগ' (ইখতিসাস হাযিজ) বলে উল্লেখ করেন।[৭] মালিকানার পক্ষে একান্তভাবে দাবি বা স্বত্বনিয়োগ হচ্ছে হক এর সাধারণ ধারণার মৌলিক উপদান এবং এক্ষেত্রে হককে 'অনুমতিযোগ্য আস্থা' (ইবাহা) থেকে পৃথক করা যায়। মালিকানার অধিকার হচ্ছে একান্ত স্বত্বনিয়োগ হিসেবে হক এর বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। অপরদিকে আন্দোলন করার স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা হচ্ছে ইবাহা'র দৃষ্টিতে হক এর উদাহরণ। এসব সুবিধার কারণে জনগণ সাধারণভাবে অধিকার লাভ করে এবং এভাবে বিশেষ কারোর পক্ষে একান্তভাবে কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৮]

আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ হক এর কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। গুরুত্বের দিকের পার্থক্যের আলোকে এতে তারা হক এর ভিন্ন ভিন্ন উপাদান তুলে ধরেন। এর কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে হক এর হুকম, শারি এর প্রেক্ষাপট বিবেচনায়। অপরগুলোতে হক এর জনস্বার্থের (মাসলাহা) ধারণার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রায়োগিক কৌশলের বিষয় পরিহার করার লক্ষ্যে আমি এর মাত্র একটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করবো; এ সংজ্ঞায় হককে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'সন্দেহাতীত অধিকার বা কোন কিছুর ওপর ক্ষমতা প্রদান অথবা অপরপক্ষের কাছে দাবি জানানো, যাকে সুনির্দিষ্ট কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে শরী'আত বৈধতা প্রদান করেছে।[৯]

এ সংজ্ঞায় সন্দেহাতীত অধিকারের (ইখতিসাস) মধ্যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা নিছক অনুমোদনযোগ্য, হকের দৃষ্টিতে তা হলো মুবাহাত। শরীয়াতের আওতায় এ ধরনের অধিকারের অবশ্যই বৈধতা থাকতে হবে এবং এ শর্তের কারণে আত্মসাত করা অর্থ বৈধতা পায়নি, যেমন চোরের কাছে থাকা চোরাই

www.pathagar.com

মাল। অধিকার একান্তভাবে আল্লাহতা'আলার, একজন মানুষের, এককব্যক্তি অথবা দলবদ্ধভাবে একাধিক ব্যক্তির হতে পারে। এ সংজ্ঞায় সর্বশেষ যে কথাটি বলা হয়েছে: তাহলো অধিকারের অর্থ কল্যাণ লাভ; তবে তা হুবহু কল্যাণের মতো নয়। উদাহরণ হলো, অধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির পণ্য বিক্রয় চুক্তি করার দায়িত্ব দেয়া হলো; তিনি কিন্তু সুদ (রিবা) ধার্যের কাজে এ চুক্তিকে ব্যবহার করবেন না, না এ অধিকারকে কোন ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজে ব্যবহার করবেন, যেমন মজুতদারি (ইহতিকার)। কেননা আল্লাহতা'আলা এসব কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, হক যে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করে তা থেকে খোদ হক এর পার্থক্য রয়েছে এবং তা পৃথকভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বুঝালেই কেবল হক কল্যাণ (মাসলাহা) বুঝাবে; কিন্তু যদি নির্দিষ্টভাবে কেবল ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে উদ্দেশ্যের দিক থেকে সে মাসলাহা হক বুঝাবে না। তৎসত্ত্বেও ইসলামি আইনে দৃশ্যত হক ও মাসলাহা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। যদিও এ দুটি শব্দের রূপ অভিন্ন নয়, হক হলো একান্তভাবে লক্ষ্য নির্ভর (গাইয়া) এবং এর ভিত্তিতে এর বৈধ চর্চার বিষয় নির্ধারিত হয়। যখন কোন অধিকার এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে মাসলাহা লংঘিত হয় বলে মনে করা হয়; তাহলে সেক্ষেত্রে এ অধিকার চর্চা অধিকার লংঘন করার শামিল বলে গণ্য হবে। আল শাতিবি'র মতে, যে সব কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো এর লক্ষ্য নয় বরং তা হলো নির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষ্যার্জনের উপায় এবং এগুলোই হচ্ছে কল্যাণ (মাসলাহা)। এটি অর্জনের জন্যই প্রধানত: এসব কাজকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।[১০] এভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, বস্তুত:পক্ষে ইসলামে হক হচ্ছে একান্তভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা এবং ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থের বিষয়টি আরো উচ্চতর মূল্যবোধ, যেমন ন্যায় বিচার ও কল্যাণের (মাসলাহা) আওতাধীন।

হক এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা (সুলতাহ) কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতে পারে, যেমন কোন শিশুর হেফাযতের (হাদানা) অধিকার অথবা কোন জিনিসের ওপর অধিকার হতে পারে, যেমন কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর তার বৈধ উত্তরাধিকারীর অধিকার। হকের ক্ষেত্রে মাসলাহা ব্যাপক প্রভাবের কারণে অবশ্য অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার চর্চায় সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি। যেমন, জীবন বা বেঁচে থাকার 'অধিকার' কেবল অন্যদের আক্রমণ থেকেই পবিত্র বা সংরক্ষিত নয় বরং তার নিজের আক্রমণ থেকেও পবিত্র। অনুরূপভাবে কোন সম্পদের মালিক কল্যাণকর উদ্দেশ্য ছাড়া তা ধ্বংস করার অধিকার রাখেন না। এধরনের কাজ করা হবে আল্লাহতা'আলার মৌলিক অধিকার এবং যার ওপর এ টি প্রতিষ্ঠিত সেই মাসলাহার লংঘন।

২. হক্ব ও হুকম

ইসলামি আইনের মূল উৎস (উসূল আল ফিকহ) সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ শরী'আতের আইন ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয় হুকম শার'ইর আওতায় হক ও এর শাখা প্রশাখা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১১] হুকম শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, এর মধ্যে রয়েছে আদেশ, নিষেধ, অনুমোদনযোগ্যতা, ইত্যাদি। শরী'আতের সকল আহকাম (বহুবচন, হুকম) কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে; যা মানবজাতির জন্য আল্লাহতা'আলার প্রেরিত বিধি বিধানের সারসংক্ষেপ। কুরআন অবশ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে (উলুল আমর) আহকাম নির্ধারণ করার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে।

হুকম হচ্ছে হকের উদ্দেশ্য (সাবাব), এক্ষেত্রে হুকম থেকে হকের উৎপত্তি হয়েছে; তবে হক ও হুকম অভিন্ন নয়। অন্য কথায় হক হচ্ছে: হুকম এর ফল বা পরিণতি। উসূল আল ফিকহ'তে হুকম এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, হুকমদাতার পক্ষ থেকে কোন বৈধ সুযোগ্য ব্যক্তির (মুকাল্লাফ) কাছে দাবি বা চাহিদা, ঐচ্ছিক বিষয় অথবা সংবিধিবদ্ধ আইন সম্পর্কিত (আল ওয়াদ) নির্দেশনা।[১২] এ সংজ্ঞা বেশ ব্যাপক, যাতে সব ধরনের হক অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সাধারণত: আদেশ বা নিষেধের আকারে কোন চাহিদা বা দাবির কথা জানানো হয়ে থাকে। যখন কোন দাবির কথা চূড়ান্ত আকারে জানানো হয়; তখন তা হয় আবশ্যকীয় বিষয় (ওয়াজিব) অথবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয় (হারাম) হিসেবে তা পরিগণিত হবে। তবে কোন দাবি যদি চূড়ান্ত হিসেবে জানানো না হয়; তা হলে তা সুপারিশযোগ্য (মানদুব) অথবা তিরস্কারযোগ্য (মাকরুহ) বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে ইচ্ছামূলক (তাখাইয়িব) বিষয় করা বা না করার এখতিয়ার ব্যক্তির মর্যির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং বিষয়টি মুবাহ বলে পরিচিত। কোন সংবিধিবদ্ধ আইন (আল ওয়াদ) দাবিও নয়, আবার ঐচ্ছিক বিষয়ও নয় বরং তা হলো হুকুম এর উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ; যা এমন কিছুর নির্দেশ করে যাতে অন্য কোন কিছুর ফল, শর্ত, অথবা বাধাদান বুঝিয়ে থাকে। এ বিষয়টি একথা নিশ্চিত করছে যে, শরী'আতের হুকম কেবল তখনই যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে; যখন এর উদ্দেশ্য (ইল্লাহ) বর্তমান সকল প্রয়োজনীয় শর্ত (শুরুত্ব) পূরণ করবে এবং এর যথাযথ প্রয়োগের পথে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।[১৩] বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকারসমূহ সাধারণভাবে হুকম শার'ইর আওতাধীন থাকে। এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এতে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে যে, ইসলামি আইনে অধিকারসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরী'আতের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে নির্নীত হয়েছে।[১৪]

www.pathagar.com

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হক এর চেয়ে হুকম এর সংজ্ঞা বেশ ব্যাপক অর্থবোধক। এতে কেবল সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত হয়না; যা হক এর প্রধান প্রতিপাদ্য, উপরন্তু এতে মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কও নিয়ন্ত্রিত হয়। শেষোক্ত অর্থটি প্রায় ফিকহ'র, হক আল্লাহর ধারণার আওতাধীন। কিন্তু বাস্তবে হক-আল্লাহ হচ্ছে অধিকারের চেয়েও বড় একটি হুকম। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি আইনে প্রতিটি অধিকারই হুকম; কিন্তু প্রতিটি হুকমই অধিকার বুঝাবে, তা নয়। হুকম ওয়াদি'র ক্ষেত্রে সম্ভবত বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যাকে হুকম তাকলিফি'র কতিপয় দিক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৫] তবে তা আদৌ কোন অধিকার বা দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করতে পারে না।[১৬] আল শাতিবি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি হুকম শার'ইর একটি পরহেযগারির (তা'য়াবুদ্দি) দিক রয়েছে; যার অর্থ হলো শরী'আতের কোন হুকমই আল্লাহর অধিকার থেকে পুরোপুরি পৃথকযোগ্য হবে না। আল কারাফিও মৌলিকভাবে একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, ইসলামে আল্লাহর অধিকার থেকে পুরোপুরি আলাদা কোন অধিকার মানুষের নেই।[১৭]

সদর আল শারীয়ার মতো উসূল বিষয়ে পারদর্শী অনেক আলেম জনগণের অধিকার ও অনুমোদনযোগ্য বিষয়সমূহ যেমন স্বাধীনতা, মর্যাদা, ও মালিকানাস্বত্বকে (আল হুররিয়া ওয়াল ইসমাহ ওয়াল মালিকিয়া) প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে অপর আলেমগণ মালিকানা স্বত্বকে একটি মৌলিক অধিকার এবং মালিকের একান্ত নিজস্ব সম্পদ (ইখতিসাস হাজিয) বলে উল্লেখ করেছেন। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামি আইনে অনেক অধিকার তথাকথিত কর্তব্যমূলক অধিকারের শ্রেণীতে পড়ে। মুসলিম ফকিহ বা জুরিগণ এ ধরনের শ্রেণীকরণে কোন আগ্রহ দেখাননি। ইসলামি আইনের প্রবণতা হচ্ছে একক ধারণা হুকম এর আওতায় অধিকার ও কর্তব্যের সমরূপ দান করা এবং এরপর ন্যায়বিচার (আদল) এর সাধারণ ধারণার অধীনে উভয় বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের চেষ্টা করা, এতে সমন্বয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের আভাস ফুটে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে ইসলামে অনেক অধিকারই কর্তব্যমুখী যেমন, ছেলেমেয়েদের আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হলো পিতার অধিকার, বাস্তবে এটি হলো একটি কর্তব্য। অনুরূপভাবে অভিভাবকের অধিকার রয়েছে তার অধীনে থাকা ছেলে বা মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের (কাফ'আহ) হবার বিষয়টি দেখা যাতে সম্ভাব্য দম্পতির মানানসই হবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।[১৯]

www.pathagar.com

৩. অধিকার ও ন্যায়বিচার *(হক ও আদল)*

আমি শরীয়ায় অধিকার ও দায়দায়িত্বকে হক ও হুকম এর ব্যাপক ধারণার মধ্যে সমন্বিত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছি এবং কুরআনের ন্যায়বিচারের মানদণ্ডের আলোকে অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবায়নের দিকটিও প্রত্যক্ষ করেছি।৮ কুরআনে হক এর ব্যবহারের সাথে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যা বস্তত কুরআনে হক এর অভিব্যক্ত অর্থের অন্যতম। আমরা এটাও জানি যে যেকোন আইনি ব্যবস্থা অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক বাস্ত বায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, বিচার ব্যবস্থার অধীনে এর পারস্পরিক সমন্বয়। এটি কুরআনের এক অনন্য দিক এবং এতে অন্যান্য আইন ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির একত্ববাদী অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীয়া অধিকার ও দায়দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য তুলে দেয়ার চেষ্টা করছেনা; আবার অন্যদিকে আধুনিক সংবিধানের পার্থক্যের এ পরিচিত রীতির ওপর কোন তাগিদও দিচ্ছেনা। বস্তুত পক্ষে কুরআনে অধিকার ও কর্তব্য আদল এর ধারণার আকারে প্রকাশ পেয়েছে এবং নীতিগতভাবে এরা আরও অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সংযোজিত অংশে পরিণত হয়েছে। আমি উল্লেখ করেছি যে, অধিকার ও দায়দায়িত্বের বিষয়টি হুকমের আওতাধীন এবং হুকম ও আদলের মধ্যকার সম্পর্কের দিকটিও হলো এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। হুকুম যেমন আদলের একটি মাধ্যম তেমনি হক হলো তার পূর্ণতাদায়ক ও বাস্তব রূপায়ন এবং উভয়ের অধিকার ও দায়দায়িত্বের দ্বৈত ক্ষমতার ফল হচ্ছে 'আদল। এভাবে ইসলাম হুকম শা'ইর এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, একই সাথে এটিও আশা করা হয় যে তা অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক বাস্ত বায়নের উপায় হিসেবেও কাজ করবে। পবিত্র কুরআনে আদলের প্রতি রূপক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা একে স্পষ্টত ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেছে এবং খোদ কুরআন মাজিদে এর ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ গুরুত্বের বিষয়টি বুঝাতে আমি একটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই যাতে ন্যায় বিচারকে কেবল ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলেই ঘোষণা করা হয়নি; উপরন্ত তা নবুওত ও কুরআনের বাণীরও সারমর্ম। অন্য কথায় এটি হলো খোদ ইসলামেরও মূলমন্ত্র ও সার কথা :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

'আমরা আমাদের নবীগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে পাঠিয়েছি, আমরা

www.pathagar.com

তাঁদের ওপর কিতাব ও বিধান অবতীর্ণ করেছি; যাতে লোকেরা ইনসাফের চর্চা করতে পারে।' (৫৭:২৫)

'আমাদের নবীগণকে' শব্দগুচ্ছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মানব ইতিহাসে আল্লাহর প্রেরিত সকল ধর্মীয় বিধানেই ন্যায়বিচার বা ইনসাফ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়বিচারের গুরুত্ব প্রদানে এর সহজাত ও সার্বজনিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নের আয়াতে : তা লক্ষ্যযোগ্য

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ. اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا.

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহর সাক্ষ্য হিসেবে ন্যায়ের পথে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাক; যদি তা তোমাদের নিজেদের, তোমার পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের বিপক্ষেও যায়; এবং তা ধনী বা গরিবের যার বিষয়েই হোকনা কেন। (৪:১৩৫)

وَلاَيَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَأنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا.

কোন বিশেষ দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এতোটা উত্তেজিত করে তুলতে না পারে (যার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করবে। (৫:৮)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ .

আর লোকদের মাঝে যখন (কোনবিষয়ে) ফায়সালা করবে, তখন তা ইনসাফের সাথে করবে। (৪:৫৮)

অমুসলমানদের প্রতিও ন্যায়বিচার করার জন্য কুরআন মুসলমানদের প্রতি তাকিদ প্রদান করেছে, বিশেষ করে যারা যুলুম নির্যাতন চালায়নি এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়নি।

لاَيَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ.

আল্লাহ তোমাদেরকে একাজ করা হতে নিষেধ করেন না যে, তোমরা সেই লোকদের সঙ্গে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে; যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেনি। (৬০:৮)।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ আফযাল যুল্লাহ ইসলামের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাঠামোর কতিপয় অগ্রাধিকার ক্রম নিরূপণের চেষ্টা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এ ধরনের নিরংকুশ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তিনটি মূল্যবোধ থাকলে তা হলো, তাওহীদ- আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত–রাসূলের (সা:) এর নবুওতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং ন্যায় বিচার। এরপর বিচারপতি আফযাল বলেন, মানদণ্ডের এ অগ্রাধিকার ক্রম তার ও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অপর এক বিচারপতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং উভয় বিচারপতি একমত হন যে, কুরআনে আদলের ওপর অত্যুচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে; যার ফলে একে রিসালাতের পূর্বে স্থান দেয়া উচিত, আর সে কারণেই এর স্থান তাওহীদের পরেই।[২০] এসব কারণে এ উপসংহারে পৌছানো যথার্থ হবে যে, আদল হচ্ছে প্রত্যেকের একটি মৌলিক অধিকার যে ব্যাপারে কোন ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। আমরা যেহেতু আদল, হুকম, হক ও ওয়াজিবের উদ্দেশ্যের মৌলিক ঐক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছি সেহেতু বিভিন্ন ধরনের অধিকারের মধ্যে ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রকৃতি, বিশেষ করে অধিকার এবং এর সমর্থনে প্রাপ্ত ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে এগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার বিষয়ে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা।

কুরআনের বিচারের মানদণ্ডে কোন ধরনের বৈষম্যের স্থান না থাকায় অধিকার ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে দ্বিপ্রান্তিক পরিস্থিতি বিরাজ করলে সেক্ষেত্রে কুরআনের ন্যায় বিচারের অত্যুচ্চ নিরপেক্ষতার নীতি পুরোপুরি কায়েম রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। একটার বিনিময়ে অপরটির ওপর অসঙ্গতিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করলে ন্যায়বিচারের বস্তু নিষ্ঠতার সাথে আপোষ করতে হতে পারে। অন্যকথায় আদলের গ্রহণযোগ্য উদ্যোগে অধিকার ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বর্তমানে অনেক আধুনিক সংবিধানে অধিকার ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির বিষয়ে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং একারণে এর একটি বা অন্যটি অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিশ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। অন্য দিকে কুরআনের ন্যায়বিচারের ধারণা একক ও অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ। ইসলামে অধিকার ও বাধ্যবাধকতা স্বাভাবিকভাবে আদলের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং খোদ ন্যায় বিচারের সহায়কও। এভাবে ন্যায়বিচার ও অধিকার অভিন্ন বিষয় নয় যদি তাই হয় তাহলে এর দাবিদার যে কেউ তা সহজেই পরিত্যাগ করতে পারবে। একটি ধারণা হিসেবে ন্যায়বিচার অধিকারের চেয়ে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ এবং তা পক্ষপাতিত্বহীন থেকে কোন্ ব্যক্তির কোন্ কোন্ 'অধিকার' অগ্রাধিকার পাবে তা নিরূপণ করতে পারে।

www.pathagar.com

'আল্লাহর অধিকার' ও 'মানুষের অধিকার' এর যুগল বিভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় ইসলাম এ দু' অধিকারের মধ্যে একটি বস্তুনিষ্ঠ ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে এবং আদলের ধারণার আওতায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যসবাদ, উদারবাদ ও সমাজবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে শরিয়তে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা করা হয়নি। আদল হচ্ছে ইসলামের একটি দর্শন এবং এতে অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সমন্বিত ও একক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।[২১]

সরকারের নীতি ও মাসলাহ'র মতো অন্যান্য স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে আদল এর সাধারণ কাঠামোর আওতায় অধিকার ও বাধ্যবাধকতার একটি বা অপরটির সুনির্দিষ্ট সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে; তবে যতক্ষণ কুরআনের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা করা যাবে। অতএব সুনির্দিষ্ট অধিকার বা বাধ্যবাধকতার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে; যদি তা কল্যাণকর প্রমাণিত হয় এবং এতে চূড়ান্তভাবে ন্যায়বিচারের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি, ইজতিহাদের সংশোধনী এবং সমাজের বৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ের বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার

ব্যাপকভিত্তিক সুস্পষ্ট সংজ্ঞার অনুপস্থিতির কারণে দৃশ্যত: ইসলামি আইনে হক এর অনেক দিকের বিকাশ ঘটেছে। অপরদিকে আমরা অবশ্য হুকুম শার'ঈর বিস্তারিত সংজ্ঞা দেখতে পেয়েছি। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ফকিহগণ হুকুম শার'ঈর ও এর বিভিন্ন দিকের প্রতিটির ব্যাপারে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[২৩] হুকম-এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকায় হয়ত হক এর সংজ্ঞা দানের বিষয়ে অগ্রগতি থেমে গেছে এবং একটির অধীনে আরেকটিকে ন্যস্ত করার প্রবণতা উৎসাহিত হয়েছে। উপরন্তু হক এর চেয়ে হুকুম-এর সাথে বাধ্যবাধকতার (ওয়াজিব) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের আয়নার প্রতিবিম্ব না হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যদিও; সব সময়ই এ বিষয় দু'টি সম্পূরক নয় এবং একে অপরের সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকতে পারে, তৎসত্ত্বেও অসম্পূরক অধিকার ও কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের তাৎপর্য কেন্দ্রীয় নয় বরং প্রান্তিক।[২৪]

আমি এখানে ও প্রথম অধ্যায়ে যে বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি, তা ইসলামি আইনে হক এর চেয়ে হুকম ও ওয়াজিবের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানকে সমর্থন করছে। তবে এর কোনটিই হক এর তাৎপর্য লঘু করা বুঝাবে না, না আলেমদেরকে তা

www.pathagar.com

হকের বিভিন্ন দিকের যেমন, এর উদ্দেশ্য (আসবাব); প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিভাগ, এর ব্যবহার (ইস্তিমাল আল হক) ও অপব্যবহার (তা'সাউফ ফি ইস্তিমাল আল হক); অধিকার পূরণ (ইস্তিফা আল হক) ও অধিকার চ্যুতির (ইনকিদা আল হক) বিষয় বিকাশে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা থেকে নিবৃত্ত করেনি। [২৫] এছাড়া আমি তাওহীদের একক প্রভাবের আওতায় হক ও আদলের সম্পর্কের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের বিকাশ করেছি এবং আমি একই আলোকে ইসলামি আইনের একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দানের বিষয়ে আলোচনা করেছি।

পশ্চিমা আইন বিশারদগণ "অধিকার" ও "কর্তব্যের" আপেক্ষিক তাৎপর্যের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, Wesley Hohfeld-ই সর্বপ্রথম অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাষায় "অধিকারের" বিষয় স্বীকৃতি দেন। তিনি তার Fundamental Legal Conceptions গ্রন্থে তাঁর পূর্বসুরীদের চেয়ে অনেক বিস্ত তভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অধিকার হচ্ছে যেমন একটি সুবিধাজনক বিষয় এবং সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের তুলনায় সাধারণ ধারণাও ঠিক তেমনি। কর্তব্য পালনাধীন একজন ব্যক্তিকে সাধারণ শর্তে নয়, অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে, সে কি করতে পারবে বা পারবে না। জানমালের অধিকারের হচ্ছে: একটি স্থিতিশীল সাধারণ অধিকার এবং তা কেবল একটি মাত্র কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কর্তব্যের দীর্ঘ তালিকার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। অতএব কোন সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের সঙ্গে অধিকারের সম্পর্কের বিষয় সব সময় সুস্পষ্ট বোধগম্য হয় তা নয়, কোন কোনটি হয় সুস্পষ্ট ও তাৎক্ষণিক অথবা লঘু ও দূরবর্তী। এ প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা চিন্তাবিদরা দুটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন, তার একটিতে কর্তব্যের উৎপত্তি হিসেবে অধিকারকে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর বিপরীত তত্ত্বটিকে প্রায়ই অধিকার ত্যাগ করা বলে উল্লেখ করা হয় : 'আমরা অধিকার বা কর্তব্য যাই বলিনা কেন দিন শেষে তা নিছক একটি প্রেক্ষাপট বা ধরনে পরিণত হয়; কেননা কর্তব্যের পরিবর্তে অধিকার শব্দের ব্যবহারে অতিরিক্ত কিছুই অভিব্যক্ত হয় না।'[২৬] যে কোন বস্তুগত দৃষ্টিতে বিষয়বস্তু অথবা দুটি বিষয়ের সম্পর্কের কোন একটি থেকে বিচ্যুত না হয়ে অথবা অস্বীকৃতি না জানিয়ে "অধিকারের পরিপন্থী"-এর বিকল্প হিসেবে "কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া" বলা যেতে পারে। সম্ভবত অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে একথা বলা হয়েছে। কেননা একের স্বীকৃতির জন্য অপরের স্বীকৃতি প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি।

www.pathagar.com

টীকা

১. তুলনীয়, হক, আল-মাওসু'য়া আল ফিকিয়াহ, টীকা ৭ এর ১০; 'Hakk' The Encyclopedia of Islam, New Edition; Wehr, Dictionary of Modern Arabic, পৃষ্ঠা, ১৯২।

২. হাম্মাদ, হুররিয়াত আল রা'ই, পৃষ্ঠ, ৪৩৩।

৩. আল সাবুনি, মুহাদারাত ফি'ল শরীয়া আল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৪২।

৪. আল বাহি, আল ইসলাম ফি হাল মাশাকিল, পৃষ্ঠা, ৬৮।

৫. তুলনীয়, জারকা, আল মাদখাল আল ফিকহি আল'আম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০। কুয়েতের আল মাওসুয়াহ আল ফিকিয়াহ হতেও (The Encyclopedia of Fiqh) কুরআনের আক্ষরিক অর্থগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, এ গ্রন্থের হক নিবন্ধে (অষ্টাদশ খণ্ড) হক-এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি।

৬. আল খাফিফ, আল হক ওয়াল জিম্মাহ, পৃষ্ঠা, ৩৬।

৭. ইবনে নুজাইম, আল বাহার আল রা'ইক শারহ কানজ আল দাকাইক, পৃষ্ঠা, ১৪৮, আল মাওসু'য়াহ আল ফিকিয়াহ'তেও এ সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হয়েছে, অষ্টদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০।

৮. তুলনীয়, আল দারিনি, আল হক ওয়া মাদা সুলতান আল দৌলাহ ফি তাকিদিহ, পৃষ্ঠা, ১৮২।

৯. আল দারিনি, একই গ্রন্থ, টিকা, ১১, পৃষ্ঠা, ১৯৩।

১০. আল শাতিবি, আল মুয়াফাকাত ফি উসূল আল আহকাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৮৫।

১১. তুলনীয়, আল দারিনি, আল হক, টিকা ১১, পৃষ্ঠা, ২১১।

১২. তুলনীয়, আল মাওসুয়াহ, টিকা ১০, পৃষ্ঠা, ৮। অন্যদিকে ফুকুহাতে হুকম-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, মুকাল্লাফের আচরণ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও শরীয়াতের সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে একজন মুজতাহিদের দেয়া সিদ্ধান্ত বা রায় হলো হুকম। তুলনীয় আহমদ জাকি হাম্মদ, 'Ghzali's Juristic Treatment of the Shariah Rules in Al-Mustafa. The American Journal of Islamic Social Sciences, সংখ্যা, ৪ (১৯৮৭), পৃষ্ঠা, ১৫৮

১৩. এ সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত আলাচনা করা হয়েছে, এম এইচ কামালী, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ৩২১।

www.pathagar.com

১৪. আল মাওসুয়াহ, টীকা ১০, পৃষ্ঠা, ১১।

১৫. হুকম তাকলিফ বা 'নিরূপনীয় আইন' এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের আচরণ নিরূপণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে অবশ্যকরণীয় (ওয়াজিব), সুপারিশযোগ্য (মানদুব) ও নিষিদ্ধ (হারাম) এর মতো বিষয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা। অপর দিকে হুকম ওয়াদি বা 'ঘোষণামূলক আইন'এ হুকুম কিভাবে ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা যায় তার প্রয়োজনীয় পরিবেশ, কার্যকারণ ও প্রতিবন্ধকতার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

১৬. আল খাফিফ, আল হক ওয়াল যিম্মাহ, টীকা, ৯, পৃষ্ঠা, ৪৯; আল দারিনি, আল হক, টিকা, ১১, পৃষ্ঠা, ২১০।

১৭. আল শাতিবি, আল মুওয়াফাকাত, টীকা ১৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১৭; আল কারাফি, কিতাব আল ফুরূক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৪০-৪১।

১৮. 'উবাইদ আল্লাহ ইবনে মাসুদ আলবুখারি, যিনি সদর আল শরীয়া বলে পরিচিত, আল তাওদীহ ফি হাল গাওয়ামিদ আল তানকিহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬১।

১৯. তুলনীয়, আল দারিনি, আল হাক, টিকা, ১১, পৃষ্ঠা, ১৭৬।

২০. ১৯৯১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ আফযাল যুল্লাহ' 'The Application of Islamic Law in Pakistan'. শীর্ষক ভাষণ দেন। এতে সুবিজ্ঞ বক্তা বিষয়টি উল্লেখ না করলেও তার বক্তব্যে মু'তাযিলা ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ঈমানের পাঁচ মূলনীতি (আল উসূল আল খামসা) হিসাবে তাওহীদের পরই দ্বিতীয় স্থানে এসেছে আদল। এসব মূলনীতি হল (১) তাওহীদ (২) আদল (৩) পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকি (আল ওয়াদ ওয়া'ল ওয়াইদ) (৪) ঈমানের মধ্যবর্তী অবস্থা (আল মান জিলাহ বাইনাল মানজিলা তাঈন) যাহলো ইসলাম ও কুফরির মাঝামাঝি অবস্থান এবং বেহেশত ও দোযখের মাঝামাঝি অবস্থানের মত (৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। তুলনীয়, আবু যাহরাহ্, তারিখ আল মাযাহিব, পৃষ্ঠা, ১১৯

২১. তুলনীয়, ইমারা, আল ইসলাম ওয়া হুকুক আল ইনসান, পৃষ্ঠা, ৫৭।

২২. তুলনীয়, আল দারিনি, আল হাক, টিকা, ১১, পৃষ্ঠা, ১৪৮-৪৯।

২৩. এগুলো হলো আইন দাতা (হাকিম) ও হুকমের বিষয় বস্তু (মাহকুম ফিহি); ঘটনার পক্ষ (মাহকুম আলাইহি) এবং খোদ হুকম।

www.pathagar.com

২৪. অধিকার ও কর্তব্যের আন্ত:সম্পর্কের দিকটি আইন শাস্ত্রের একটি অতি বিতর্কিত বিষয়। তবে অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে কর্তব্যের বিষয় বজায় থাকতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। ইসলামি আইনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য যে ইবাদত–বন্দেগির ক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় যেসব কাজ রয়েছে সেগুলোকে বিশেষ অধিকার বলে মনে করা যায় না। অনুরূপভাবে ইসলামি বা পশ্চিমা উভয় ফৌজদারি আইনে কর্তব্যগুলো সমাজের সদস্যদের ওপর আরোপ করা হয়েছে যার কোনটিই অধিকারের অনুসঙ্গ নয় (তুলনীয়, Dias, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ৩৭)। অপরদিকে কোন অধিকার 'কর্তব্যের' ওপর অধিকতর নির্ভরশীল বলে মনে হয় 'এবং এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে কর্তব্য দৃশ্যত অধিকতর শক্তিশালী অথবা স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়।

২৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল সানহুরি, মাসাদির আল হাক ফি'ল ফিকহ আল ইসলামি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৫; আবু সিন্নাহ, নাযারিয়াত আল হাক, এ মাটি ওবাইদা সম্পাদিত, ফিকহ আল ইসলামী পৃষ্ঠা, ১৭৫; ইউসুফ মুসা, আল ফিকহ আল ইসলামি, পৃষ্ঠা, ২১১ এবং আল জারকা, আল মাদখাল আল ফিকহি আল আম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫।

২৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Stoljar, An Analysis of Rights, পৃষ্ঠা, ৪৭।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২ : বিদ'আহ

মালয়েশিয়ায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় আইনের মাধ্যমে নয় বরং রাজ্যগুলোর আইন দ্বারা। সাধারণত 'মুসলিম আইন বিধিবদ্ধকরণ প্রশাসন বা 'Admmistration of Muslim Law Enactment' শিরোনামে এসব আইনগত ফরমানে সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত একটি অধ্যায় রয়েছে; যাতে মিথ্যা মতবাদ ও শিক্ষা প্রচারের মতো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের আইনে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা এখানে যে আইন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তাতে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। অতএব একে আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালয়েশীয় আইনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শরী'আতের মৌলিক নৈতিক আদর্শগুলোতে কিভাবে আইনের বিষয় পালিত হয়েছে এসব বিধিবিধান তার একটি উদাহরণ হিসেবেও কাজ করছে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, মিথ্যা মতবাদ সম্পর্কিত শিক্ষা সম্ভবত নিষিদ্ধকাজের (মাকরুহ) শ্রেণীতে পড়ে; তবে শরী'আতের বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রধানের এসব বিষয় নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং কল্যাণকর ও সুশাসনের জন্য সহায়ক মনে হলে তিনি মাকরুহ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। উদাহরণ হলো : সেলাঙ্গর মুসলিম আইন বিধি প্রশাসন, ১৯৫২, একে মুসলিম আইন প্রশাসন (সংশোধনী) সংবিধিবদ্ধ ৯নং আইন, ১৯৮৩ হিসেবে সংশোধন করা হয়; এ আইন কেন্দ্রীয় অঞ্চল কুয়ালালামপুরেও প্রযোজ্য। 'মিথ্যা মতবাদ' শিরোনামে এ আইনে নিম্নোক্ত কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে: কোন ব্যক্তি মুসলিম আইনের পরিপন্থি মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান বা প্রকাশ্যে কোন মতবাদ প্রচার অথবা এমন অনুষ্ঠান পালন বা কাজ করে তাহলে তা হবে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর এ অপরাধের জন্য তাকে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড দান অথবা সর্বোচ্চ এক হাজার ডলার জরিমানা করা হবে (ধারা-১৮)।

১৯৬৫ সালে পেরাক রাজ্যে মুসলিম আইন প্রশাসনে হুবহু এ আইনটি গ্রহণ করা হয়। তবে পেরাকের আইনে এর সঙ্গে উপধারা-২ নামে একটি সংশোধনী রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, মিথ্যা ফতোয়া বা শিক্ষা প্রচারের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড সম্পর্কিত বিষয় ছাপানো বা প্রচার করা বইপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাজেয়াফত ও ধ্বংস করা হবে।

১৯৮৬ সালে তেরেঙ্গানু রাজ্যে মুসলিম আইন বিধিবদ্ধকরণ প্রশাসনের ধারায় (ধারা-২০৪) পেরাক রাজ্যে কার্যকর উপরোক্ত আইনটি হুবহু গ্রহণ করা হয়। এতে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, 'সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি

www.pathagar.com

> অনধিক পাঁচ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা বা অনধিক তিন বছরের জেল হবে অথবা উভয় দণ্ড' হবে। একই ধারার পরবর্তী অনুচ্ছেদটি দণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বাজেয়াফত ও ধ্বংস করার পেরাক রাজ্যের বিধানের অনুরূপ।

ইসলামে ধর্মের ব্যাপার নব উদ্ভাবনী (বিদ'আহ) অথবা ইসলামী মূলনীতি লংঘনের (হাওয়া) অনুরূপ ভূয়া মতবাদ ও শিক্ষা প্রচারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ রাখা হয়েছে। এমন কিছু বিদ'আহ চালু রয়েছে, যা 'মুসলিম আইনের পরিপন্থী' নয়, এছাড়া বিদ'আহর আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত থাকতে পাওে; যাকে মুসলিম আইনের এমন কিছু দিকের সত্যিকারের ব্যাখ্যা বলে দাবি করা হয় যেসব বিষয়ে শরী'আতের প্রতিষ্ঠিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অবশ্য নীতিগতভাবে একথা সঠিক বলে মনে হয় যে, নি:সংশয়তার ভিত্তিতেই আইন কার্যকর করা উচিত এবং ইসলামের মূলনীতি ও ধর্মতত্ত্বের সুস্পষ্ট লংঘনের ঘটনার ক্ষেত্রে কেবল দণ্ডনীয় শাস্তি দেয়া যেতে পারে। পেরাক রাজ্যে মুসলিম আইন বিধিবদ্ধকরণ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও এটি একটি পরীক্ষা। এ আইনে 'ইসলামের প্রকৃত আদর্শ' অথবা 'বৈধভাবে জারি করা কোন ফতোয়ার পরিপন্থী ও অপছন্দনীয়' বিষয় রয়েছে এমন বই বা নথিপত্র, প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল ও পাঁচশ' ডলার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে (ধারা-১৬৮)। এ ধারায় 'ইসলামের প্রকৃত আদর্শ' বাক্যাংশের ব্যবহারে মনে হয়েছে যে, 'অপছন্দনীয়র' সুস্পষ্ট পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং এতে দৃশ্যত সত্যনিষ্ঠতার বিষয়টি তদন্ত করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় সত্যের ব্যাপারে সন্দেহজনক দাবি থেকে যেতে পারে। বিষয়টি হয়ত এমন হতে পারে, আইন এখানে দৃশ্যত যথাযথ পাণ্ডিত্য অথবা সন্দেহজনক কিনা-তা দেখতে চায় না বরং দেখতে চায় তাতে মূলনীতির আন্তরিক প্রকাশ পেয়েছে কিনা। আমি এখানে আরো বলতে চাই যে, লংঘনের দৃষ্টান্তসমূহ সবসময়ই জটিল অথবা সনাক্ত করা কঠিন হবে এমন নয়।

পেরাক আইনের ১৬৯(১) ধারার বিধিতে একটি মামলার ঘটনা মালয়েশীয় মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা পায়। এক রিপোর্টে বলা হয় যে, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা হাজি মোহাম্মদকে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত শিক্ষা প্রচারের দায়ে জেল দেয়া হয়। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী হাজি মোহাম্মদ পেরাকের এক এগংলো-চীনা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং তিনি ছিলেন তার ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা। তিনি তার অনুসারীদের শিক্ষা দিতেন যে 'কুরআনে ও চন্দ্র মাসের পঞ্জিকায় শুক্রবারের কোন কথা বলা হয়নি... তাই কোন সুনির্দিষ্ট দিনে

জুমার নামায আদায় করার বিষয়টি ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি।' এছাড়া 'শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী' সময়ে খুতবা প্রদান ও জুমার নামায পড়ার জন্যও তাকে অভিযুক্ত করা হয়।[১] বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলেও; ইসলামের সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠিত নীতিকে অস্বীকার করার দায়ে তাকে তিন মাসের জেল দেয়া হয়। সারা বিশ্বে সাধারণ মুসলমানরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে শুক্রবার জুমার নামায আদায় করে আসছেন। উপরন্তু পবিত্র কুরআনে 'আল জুমু'আহ' নামে একটি সূরা রয়েছে, এর অর্থ 'সমাবেশ'। এ সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'শুক্রবার আযান হলে (মিন ইয়াওমুল জুমু'আহ) নামাযের জন্য আল্লাহর স্মরণে ছুটে যাও এবং বেচা কেনা বন্ধ রাখ... (৬২:৯)। এ ধরণের সুস্পষ্ট আয়াত থাকায় মুসলমানরা অব্যাহতভাবে জুমা'র নামায আদায় করে আসছেন এবং এ ব্যাপারে হাজি মোহাম্মদের মতো বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারের কোন অবকাশ নেই।

প্রায় একই সময়ে ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে মালয়েশিয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইসলামিক এফেয়ার্স সকল সরকারি অধিদফতরের কাছে পাঠানো এক সার্কুলারে দারুল আরকাম নেতা উস্তাজ আশারি মোহাম্মাদের লেখা একটি বই প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বইটির নাম আওরাদ মোহাম্মাদিয়া পেগানগান দারুল আরকাম। বইটিতে যদিও নামায সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও এতে ঈমানের কতিপয় বিষয়ে বিতর্কিত মত প্রচার করা হয়। বইটি নিষিদ্ধ করার যেসব কারণ সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক. বইটিতে দাবি করা হয় যে, আওরাদ মোহাম্মাদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ সুহাইমি (কয়েক দশক আগে যিনি মারা যান) রাসূল সা: এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পবিত্র কা'বা শরীফে তার কাছে থেকে আওরাদ মতবাদ গ্রহণ করেন।

খ. এতে আরো দাবি করা হয় যে, শায়েখ সুহাইমি মারা যাননি, তিনি ইমাম মাহাদি হিসেবে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করার জন্যই অন্তর্ধান করেছেন।

গ. বইটিতে 'ঈমানের ঘোষণা দান' (শাহাদাত) এর বিকৃত প্রচার করা হয়েছে এভাবে যে, শায়েখ সুহাইমি হচ্ছেন রাসূল (সা:) এর খলিফা (উত্তরাধিকারী) আর এভাবে তাকে খোলাফায়ে রাশেদার সমকক্ষ হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা চালানো হয় ।

www.pathagar.com

সার্কুলারে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আল আরকামের অনুসারীরা তাদের নেতাদের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলে এবং দাবি করে যে, আওরাদ মোহাম্মাদিয়ার দোয়ার বরকতেই দারুল আরকাম আন্দোলনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর ফলে মালয়েশিয়া সরকার কেবল বইটি নিষিদ্ধ করেনি উপরন্তু সরকারের দফতরসমূহে দারুল আরকামের সব ধরনের প্রচার-প্রচারণার কাজ নিষিদ্ধ করে।

আমরা আবারও বলতে চাই যে, রাসূল সা: এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ দাবি অথবা শায়েখ সুহাইমির অতি প্রাকৃতিক দাবির বিষয়টি মোটেই নতুন কিছু নয়। এ ধরনের কিছু দাবি বিশেষ করে শায়েখ সুহাইমির গুপ্ত রহস্য (গায়েব) ও পুনরাবির্ভাবের বিষয়টির সাথে শিয়া ইমামিয়া মতবাদ অনুযায়ী শিয়া উপদলীয় অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম আল মাহদী অন্তর্ধানের পর এখনো জীবিত আছেন এবং তিনি পুনরাবির্ভূত হবেন। দ্বাদশ ইমামের গায়েব জানা এবং তার মাহদি হবার বিষয়ে বিশ্বাস করার প্রশ্নটি সুন্নি ও শিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ এবং মালয়েশিয়া সরকার এ বিষয় সুন্নি/শাফেঈ মতকে সমুন্নত করার ব্যাপারে কোন দ্বিধা করেনি। তুলনামূলকভাবে পেরাকের হাজি মোহাম্মাদের বিষয় থেকে এটি অধিকতর জটিল হলেও, তা যে প্রচলিত ইসলামি আইনের পরিপন্থি সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। মালয়েশিয়ার সুন্নিদের মতে, এসব অভিযোগ ইসলামের সত্যিকার সৌন্দর্য ও শিক্ষার পরিপন্থি এবং অগ্রহণযোগ্য নবোদ্ভাবনী (বিদ'আহ) বই কিছু নয়।

টীকা

১. The Star, মঙ্গলবার, ১লা অক্টোবর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা, ১৩

২. সার্কুলার, ৭ আগস্ট, ১৯৯১ প্রচার করে ইসলামিক এফেয়ার্স ডিভিশন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কুয়ালালামপুর।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৩ : ফিতনা প্রসঙ্গ

একনজরে আধুনিক আইন

ক. বিদ্রোহ

বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদ্রোহিতা সম্পর্কে সংবিধিবদ্ধ আইন সার্বিকভাবে ব্যাপক এবং তা ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। প্রায়ই এ আইন বাক স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হলো, মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় সংবিধান, ১৯৫৭। এ সংবিধানে সকল মালয়েশীয় নাগরিকের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হয়েছে; কিন্তু একই সাথে তাতে পার্লামেন্টকে এ স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য আইন পাসের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। নীতিগতভাবে এটি একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতে কেবল পার্লামেন্টকে এ ধরনের ক্ষমতা মঞ্জুর করা হয়েছে। পার্লামেন্টের এ ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের তালিকা বেশ দীর্ঘ। এভাবে আইন অনুযায়ী পার্লামেন্ট ফেডারেশনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অথবা উপযোগী বলে মনে করলে বাক স্বাধীনতার উপর যে কোন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। বিধিনিষেধ আরোপের মতো বিষয়ের মধ্যে রয়েছে : অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতা; পার্লামেন্টের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের বিধিনিষেধ অথবা আদালত অবমাননা; কুৎসা রটনা; অথবা যেকোন ধরনের অপরাধে ইন্ধনদান রোধ করা (ধারা ১০)। একই ধারার (৪) অনুচ্ছেদে আরও কিছু বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে। তা হলো, পার্লামেন্ট জাতিগত বিষয় অথবা মালয়ী শাসকদের বিশেষ অধিকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করতে পারবে।

কুয়ালালামপুরে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যারা নিবন্ধ উপস্থাপন করেন, তাদের কয়েকজন মালয়েশীয় আইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আরোপিত বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাগণ সংবিধানের দিক নির্দেশনাকে অনুমোদন করলেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন (সেডিশন এ্যাক্ট ১৯৪৮) এর কতিপয় বিধির সমালোচনা করেন। তাদের একজন হলেন সাদ ফারুকী। 'ল'জ রিলেটিং টু প্রেস ফ্রিডম ইন মালয়েশিয়া' (মালয়েশিয়ায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইন) শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। সাদ ফারুকীর মতে, মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারণা যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক উদার। অতএব মালয়েশিয়ার একজন আইনজীবী কোন্‌টিকে বাক স্বাধীনতা এবং

www.pathagar.com

কোন্‌টিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বুঝায়, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দানে সক্ষম নন; আর 'এ আইনগত অনিশ্চয়তার দিকটি সবসময় কৌসুলীর অনুকূলেই যায়।'[১] মালয়েশীয় আইনে নিম্নের যেকোন একটি পন্থায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংঘটিত হতে পারে: যেকোন মালয়ী শাসক বা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টিতে ইন্ধনদান; যেকোন বৈধ বিষয়কে অবৈধভাবে পরিবর্তনে ইন্ধনদান; বিচার প্রশাসনের অবমাননার কাজে উস্কানি দান; জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করা; জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো; অথবা নাগরিকত্ব, জাতীয় ভাষা, মালয় এবং সাবাহ ও সারাওয়াকে আদিবাসীদের বিশেষ সুযোগ–সুবিধা এবং মালয় শাসকদের মর্যাদার মতো 'স্পর্শকাতর বিষয়ে' প্রশ্ন উত্থাপন করা। মালয়েশীয় এ আইনের অনুচ্ছেদ (ক)তে "বিদ্রোহাত্মক মনোভাব" প্রকাশ পায়; এমন যেকোন কাজ, বক্তব্য, কথা ও প্রকাশনাও দণ্ডনীয় অপরাধ। এ শব্দগুচ্ছে ব্যাপকার্থে উদ্দেশ্যের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক। তবে বক্তব্যের বিষয় 'সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা অথবা অবজ্ঞা সৃষ্টি, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট সৃষ্টিতে উস্কানি দান, অথবা দেশের জনগণের মধ্যে জাতিগত ও গোষ্ঠীগত ঘৃণাবিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে কিনা' আবারও তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।[২] রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনের প্রেক্ষাপটে "অসন্তোষের" অর্থ রাজনৈতিক সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি, এর অর্থ হলো ভালবাসার অনুপস্থিতি এবং আনুগত্যহীনতা, বৈরিতা ও দুশমনির উপস্থিতি। 'সরকার সম্পর্কিত অসন্তোষে ইন্ধন দান' বলতে বুঝায় সরকারকে নিরাপত্তাহীন করে তোলার লক্ষ্যে জনগণের হৃদয়ে বিরোধিতা, বৈরিতা ও আনুগত্যহীনতার মনোভাব সঞ্চার, জাগ্রত ও উত্তেজিত করা।[৩] এ আইন সরকারের সৎ ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে এ ধরনের সমালোচনাকে কল্যাণকর বলে বিবেচনা করা হয় : 'একথা (অবশ্যি) সত্য যে এক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর অবশ্যই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ বিবৃতি হিসেবে একথাও সত্য বলে মনে হয় যে, নজরদারি বা গোয়েন্দাগিরি ও চাপ প্রয়োগের পরিবেশে সরকারের নীতির বিষয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও অকপট আলোচনা ও সমালোচনার ধারা বিকশিত হতে পারে না।'[৪] বাস্তবতা হচ্ছে, বাক স্বাধীনতা খর্ব করার বিস্তারিত আইন রয়েছে। মালয়েশিয়ার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে (ধারা-২৯৮ক) দেশদ্রোহিতা আইনের কতিপয় ধারাও পুনর্ব্যক্ত হয়েছে, তাতে অনৈক্য, বিভেদ, বৈরিতা ও ঘৃণাবিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে এমন বেআইনী কথা উচ্চারণ ও প্রকাশনার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সম্মেলনে উপস্থাপিত আরেকটি নিবন্ধে মিন চুন মন্তব্য করেন যে দেশদ্রোহিতা আইনে আরোপিত কতিপয় বিধিনিষেধকে 'অযৌক্তিক বলে মনে করা যেতে পারে।' নিবন্ধকার

www.pathagar.com

আরো উল্লেখ করেন যে, বিচারকগণের বিচারিক ব্যাখ্যাদানে বিষয়টি সুরাহায় সহায়ক হয়নি। (উপরে উদ্ধৃত) 'অসন্তোষের' অর্থ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিচারিক মন্তব্য এভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে লেখকের মূল্যায়ন হলো, 'এ বিধিনিষেধে' রাজনৈতিক বিরোধিতার বৈধ কার্যক্রম ও লক্ষ্যকে শ্বাসরুদ্ধ করার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।'[৫]

মালয়েশিয়ার ফৌজদারি আইনের 'ধর্মসংক্রান্ত অপরাধ' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে যুলুম-নির্যাতন ও সহিংসতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এজন্যে জেল ও জরিমানা উভয় হতে পারে: 'কোন ব্যক্তি কোন শ্রেণীর ধর্মকে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপাসনালয় অথবা পবিত্র বলে বিবেচিত কোন বস্তু ধ্বংস, ক্ষতিসাধন অথবা কলুষিত করলে তার সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে' (ধারা-২৯৫)। এ দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি নিম্নে তুলে ধরা হল :

> *কোন ব্যক্তি ধর্মীয় কারণে একই ধর্ম বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বক্তব্য, মৌখিক বা লিখিতভাবে অথবা প্রতীকের মাধ্যমে বা দর্শনযোগ্য প্রতীকের মাধ্যমে অনৈক্য সৃষ্টি ...... বা তার চেষ্টা করলে অথবা বৈরিতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ বা অশুভ মনোভাব... প্রকাশ করলে তাকে তিন বছর মেয়াদ পর্যন্ত জেল প্রদান, অথবা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড প্রদান করা হতে পারে (২৯৮ ক)।*

প্রিন্টিং প্রেসেস পাবলিকেশন্স এক্ট, ১৯৮৪, এর আওতায় অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন একটি অপরাধ এবং এজন্য দোষী সাব্যস্ত হলে মুদ্রণকারী, প্রকাশক, সম্পাদক ও প্রতিবেদককে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান অথবা জরিমানা করা হবে, যা ২৫ হাজার রিঙ্গিতের বেশি হবে না, অথবা তারা উভয় দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।' (ধারা-৮ক)। একই ধারার পরবর্তী অনুচ্ছেদে অসৎ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'ক্রটিপূর্ণ বলে অনুমিত তথ্য থেকে বুঝা যায় যে বিষয়টি প্রকাশের আগেই অভিযুক্তরা সংবাদটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।'

ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ১৯৭৩-এ 'প্রত্যেক নাগরিকের' বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মঞ্জুর এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে; কিন্তু অত:পর এতে বলা হয়েছে যে, 'ইসলামের গৌরব, অথবা পাকিস্তানের ঐক্য, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, শিষ্টাচার--- জনশৃঙ্খলা, সামাজিক শিষ্টাচার ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের মাধ্যমে এ স্বাধীনতার ওপর যে কোন ধরনের

www.pathagar.com

যৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে... (এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে) কুৎসা রটনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ' (ধারা-১৯)

এ ধারা সম্পর্কে এক মন্তব্যে মুহাম্মদ মুনির উল্লেখ করেন যে, এ সাংবিধানিক ধারা বলে দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল আইন, যেমন বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সংক্রান্ত আইন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত আইন, বাকস্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেও, তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। শর্ত হলো, আদালতকে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, আরোপিত বিধিনিষেধের সাথে নিরাপত্তা বজায় রাখার একটা যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে 'যৌক্তিক সম্পর্ক' বলতে, আইন ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে দূরবর্তী বা অবাস্তব সম্পর্ক বুঝাবে না বরং ঘনিষ্ঠ ও বাস্তব সম্পর্ক বুঝাবে।[৬] জনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত একই ধারার ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে জনাব মুনির আরো বলেন, যেসব কথা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে, সেসব কথার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে। পাকিস্তান ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এ ধরনের কথার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে (ধারা-১৫৩ক) এবং জননিরাপত্তা আইন ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২তে একই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ বা ১০৭ ধারায় জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন বক্তব্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। একই লেখক বলেন যে জরুরি পণ্য বা সেবা সরবরাহ বিঘ্নিত করার মাধ্যমে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে, এমন বিষয়েও এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে।[৭] এবং সর্বশেষে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত সাংবিধানিক রেফারেন্স সাধারণত: অশ্লীলতা ও যৌন বিকৃতি বিষয়ক প্রকাশনার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ বুঝায়।

শরী'আর ফিৎনার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি আধুনিক ফৌজদারি আইন হলো: আদালত অবমাননা ও সংসদ (পার্লামেন্ট) অবমাননা, উভয় অবমাননার ঘটনা বহু মুসলিম ও অমুসলিম দেশের আইনে ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে একটি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। সাধারণ আইন অনুযায়ী আইন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের সুনাম ক্ষুণ্ন করা বা আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার জন্য আদালত কক্ষে বা তার বাইরে যেকোন বক্তব্য বা আচরণ আদালত অবমাননা বুঝায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন আইনজীবী বা সাক্ষী আদালতকে এমনভাবে সম্বোধন করলেন, যাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় তা হলে: মামলা পরিচালনাকারী বিচারক আদালত অবমাননার জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।

ইংল্যাণ্ডে ফৌজদারি অবমাননা সংক্রান্ত আইনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: জুরিরা বিচারের রায় ঘোষণার আগেই যাতে বিচার সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ করতে না

www.pathagar.com

পারেন, তা নিশ্চিত করা। তাই গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে জুরি ট্রায়ালের খবর প্রকাশ পেলে তাতে জুরিদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং এ ধরনের প্রকাশনা আদালত অবমাননার আওতায় পড়তে পারে। অধিকাংশ বিচার ব্যবস্থায় আদালত অবমাননার বিষয় একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিষয়টি প্রায় পুরোপুরিভাবে বিচারকদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্রসমূহ ও অন্যরা আদালত অবমাননার দায়ে দোষী কিনা সে ব্যাপারে তারাই সিদ্ধান্ত নেন।[৮]

মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় সংবিধান সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টকে আদালত অবমাননার ঘটনার শাস্তি প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। (ধারা, ১২৬)। হাইকোর্ট বিধিমালা, ১৯৮০ এবং সুপ্রীম কোর্টের কার্যপ্রণালী পরিচালনা সংক্রান্ত অনুরূপ বিধিমালার দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া আদালত মামলা চলার সময় সংঘটিত কোন অশালীন কাজের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন মনে করলে, আদালত নিজ উদ্যোগে অবমাননার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এমনকি আদালতের বাইরে অবমাননার ঘটনা ঘটলেও, আদালতের মর্যাদা রক্ষা করার বিষয়টি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে এটর্নি জেনারেল অথবা যে কোন বেসরকারি পক্ষ অবমাননা মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নিতে পারবেন।

মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত আদালত অবমাননার (ও আইন অবমাননা) ঘটনায় শাস্তিদানে আদালতের ক্ষমতার বিষয় শরীয়া আদালতের সাথে সম্পর্কিত। এভাবে আমরা কেদাহর শরীয়া ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন, ১৯৮৮ (এবং কেলানতান এর অনুরূপ আইন, ১৯৮৫,) বিধিতে আদালত অবমাননার জন্য সর্বোচ্চ মেয়াদে কারাদণ্ডের বা অনুরূপ জরিমানার বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারি। ৩১ অনুচ্ছেদের ২টি আইনের প্রত্যেকটিতে নিম্নোক্ত শাস্তির কথা বলা হয়েছে :

> কোন ব্যক্তি আদালতের নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হলে, লংঘন করলে, আপত্তি জানালে, অবজ্ঞা প্রদর্শন অথবা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে, সে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ অপরাধের জন্য তার সর্বোচ্চ এক হাজার রিঙ্গিত জরিমানা বা সর্বোচ্চ এক বছরের জেল অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

কেদাহ ও কেলানতান রাজ্যের আইনেও নিজ নিজ রাজ্যে বলবৎ কোন আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা উপহাস করলে-সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। (যথাক্রমে ধারা-১৮ ও ধারা-২৮)।

www.pathagar.com

উপরন্তু মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম আইন প্রশাসন সংক্রান্ত সংবিধিবদ্ধ আইনে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অবমাননা সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এ কারণে কেউ রাজ্যের ধর্মীয় বিষয়ক প্রধান হিসেবে সুলতানের বৈধ কর্তৃত্ব অথবা ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তার অবমাননা করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে; তার এক বছর পর্যন্ত জেল বা সর্বোচ্চ তিন হাজার রিঙ্গিত জরিমানা হতে পারে। (দণ্ডের সঠিক মাত্রা রাজ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যথাক্রমে মুসলিম সংবিধিবদ্ধ আইন প্রশাসন সেলানগর, ১৯৮৩, তেরেঙ্গানু, ১৯৮৬, এবং কেদাহ ১৯৮৮)।

মালয়েশিয়ার আইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানকালে অধ্যাপক আহমদ ইবরাহীম লিখেছেন যে, অনুমোদনযোগ্য সমালোচনার সীমা লংঘনের বিষয় মোকাবিলা করার জন্য মালয়েশিয়ার নির্বাহী ও বিচার বিভাগের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। আদালত অযৌক্তিক, অসৌজন্যমূলক ও সরল বিশ্বাসহীন বলে বিবেচিত অবমাননাকর-যে কোন সমালোচনার জন্য দণ্ড প্রদান করতে পারবে। নির্বাহী বিভাগ দেশদ্রোহিতা আইন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের আওতায়, এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বাক স্বাধীনতার অধিকার সীমিত। দেশদ্রোহিতা আইন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের সংজ্ঞায় ক্ষতিকর শ্রেণীর মধ্যে পড়লে অথবা আদালত অবমাননা বলে বিবেচিত হলে এ অধিকার রহিত হয়ে যায়।[৯]

খ. অশ্লীলতা

অশ্লীলতা সম্পর্কে প্রাচীন কিন্তু মৌলিক ইংরেজ আইনগত সিদ্ধান্তে যে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয় তা হলো, অশ্লীলতা বা অশ্লীল প্রকাশনা বলে বিবেচিত বিষয় বিকৃতি ও অসততার মতো অনৈতিক প্রভাবের শিকার হবার জন্য যাদের মন উন্মুখ হয়ে আছে এবং যাদের হাতে এ প্রকাশনা গিয়ে পড়তে পারে, তাদেরকে বিকৃত ও অসততার পথে পরিচালিত করার কোন প্রবণতা এক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে কিনা।[১০] পরের ঘটনায় প্রকাশনার নিছক প্রবণতা নয়, প্রভাবের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোন প্রকাশনা যদি তরুণদের মনে যৌনতার সুড়সুড়ি প্রদান করে অথবা আরো বয়স্কদের কামুক চরিত্রের মানুষ হিসেবে তুলে ধরে, তাহলে সে প্রকাশনাকে বিকৃত ও অসৎ প্রকাশনা বলা যেতে পারে।[১১] তবে বিবাহিত জীবনের যৌনতা বিষয়ক গ্রন্থ কি এ বর্ণনার আওতায় পড়বে?

আমরা জানি যে, কোন নির্দিষ্ট বই কখন, কিভাবে ও কত বেশি পড়লে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং কোন প্রকাশনাকে সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত মূল্যবোধের বিপরীতে কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করা যাবে?

www.pathagar.com

হ্যারী স্ট্রীট (Harry Street) নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত ইংরেজ আইন সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে বলেন 'এ পর্যন্ত অশ্লীলতা আইনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা হলো অশ্লীলতার দুর্বোধ্যতার বিষয় অকপটে মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছে আইনটি।'[১২]

মালয়েশিয়া সার্বিকভাবে অশ্লীলতা ও অশ্লীল প্রকাশনার মৌলিক ধারণা ও সংজ্ঞার ব্যাপারে বৃটিশ সাধারণ আইন অনুসরণ করেছে। এ বিষয়ে মালয়েশীয় আইনসমূহ অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং দণ্ডবিধি, প্রকাশনা আইন, ও চলচ্চিত্র আইনসহ বিভিন্ন আইনে তা দেখতে পাওয়া যায়। দণ্ডবিধিতে 'যে কোন অশ্লীল বইপত্র, প্যাম্পফ্লেট, পত্রিকা, আঁকা ছবি, চিত্র কর্ম, প্রতীক বা মূর্তি অথবা যেকোন ধরনের অশ্লীল বস্তু' -প্রকাশ্যে প্রদর্শন, বিক্রি, বিলিবন্টন, অথবা যেকোন ভাবে প্রচার করা, আমদানি অথবা রফতানি করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং কেউ এ ধরনের কাজ করলে, তার তিন বছর পর্যন্ত জেল অথবা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে। (ধারা-২৯২)। অবশ্য "অন্যদের জন্য বিরক্তিকর" অশ্লীল কাজ জনসমাগম স্থলে করা এবং জনসমাগম স্থলের কাছে অশ্লীল গান, কবিতা আবৃত্তি বা কথাবার্তা বলাও দণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং এজন্য সর্বোচ্চ তিন মাসের জেল বা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে। (ধারা-২৯৪)

সংবাদপত্র মুদ্রণ প্রকাশনা আইন, ১৯৮৪, মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নির্দেশদানের মাধ্যমে 'অবাঞ্ছিত প্রকাশনা' নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা প্রদান করেছে। এ নির্দেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে। এভাবে মন্ত্রী 'নোট, ছবি, মিউজিক সাউন্ড রেকর্ডিং এর মতো অশ্লীল কোনকিছু মুদ্রণ, আমদানি, বিক্রি' -পরিবেশন বা সংরক্ষণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে পারবেন' (ধারা-৭)। পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'নিষিদ্ধ কোন প্রকাশনা কাছে রাখা 'দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ পঁচিশ রিঙ্গিত জরিমানা হতে পারে' (ধারা-৮)

মালয়েশীয় উপদ্বীপের কেলানাতান ও কেদাহ রাজ্যের আইনে অশ্লীলতা হচ্ছে দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ জন্য ছয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। শরীয়া ফৌজদারি দণ্ডবিধি কেলানতান, ১৯৮৫ এবং কেদাহ, ১৯৮৮ এর আওতায় নিজ নিজ অনুচ্ছেদে অশোভন কথা উচ্চারণ শিরোনামে নিম্নোক্ত কথা বলা হয়েছে :

> কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কোন স্থানে হুকুম সাইয়ারাকের (হুকম শার'ঈ-এর রূপভেদ) পরিপন্থী কোন কথা উচ্চারণ বা প্রচার করলে এবং তাতে শান্তি ভঙ্গের কারণ হবার সম্ভাবনা থাকলে; সে অপরাধ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ অপরাধের জন্য তার সর্বোচ্চ এক হাজার

www.pathagar.com

> রিঙ্গিত (৩৭৫ মার্কিন ডলার) জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

এ ছাড়া কেদাহ ও কেলানতান রাজ্যের আইনে জনসমাগম স্থলে হুকম সাইয়ারাক এর পরিপন্থী কোন অশ্লীল কাজ বা আচরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের কাজ কেউ করলে, তার সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল বা সর্বোচ্চ এক হাজার রিঙ্গিত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে (ধারা-৫.১)।

পাকিস্তান দণ্ডবিধিতে 'যেকোন অশ্লীল বই, প্যাম্পফ্লেট... পত্রিকা সংরক্ষণ, তৈরি, বিক্রি ও পরিবেশন... অথবা কোন জনসমাগম স্থলে কোন ধরনের অশ্লীল কাজ করা নিষিদ্ধ...' এধরনের কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং 'এজন্য তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে।'[১৩] তবে 'অশ্লীলতার' সুনির্দিষ্ট আইনগত সংজ্ঞাদানের বিষয়টি এখনো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। 're D. Pandurangan and Anolther V. State Prosecutor ১৯৫৩ (Criminal Law Journal, পৃষ্ঠা, ৭৬৩-৬৪)। কৌসুলীদের যুক্তি বিবেচনা করে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট কতিপয় পর্ণোগ্রাফিক বইপুস্তক অশ্লীল এবং তা ভারতীয় (পাকিস্তানেও) দণ্ডবিধির আওতায় ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে পড়বে বলে রায় দেন। আদালত নিম্নোক্ত ভাষায় এ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাগুলো সনাক্ত করেন :

> দণ্ডবিধিতে 'অশ্লীলতা' শব্দের কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। অভিধানে শব্দটির প্রকৃতি ও যে স্বাভাবিক অর্থ করা হয়েছে, সে অর্থই বোঝাবে : Webster's New International Dictionary তে অশ্লীলতা অর্থ হলো সুরুচি বা শালীনতার ওপর আক্রমণ, শিষ্টাচার শুদ্ধতা ও শোভনতা প্রকাশে বাধা হতে পাওে; এমন মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ বা উপস্থাপন করা, অশ্লীল কথাবার্তা, অশোভন ছবি বা ছবিসমূহ কামোদ্রেককারী ধারণা, অশোভন কাজ, কামুকতা...। অশ্লীলতা

"অশ্লীলতা সম্পর্কে অভিধানে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, তার আলোকে আদালত আরো জানান যে, 'সুনির্দিষ্ট আইনগত সংজ্ঞার অভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন বই এই অর্থের আওতায় পড়বে কি-না-সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তবে এই বইটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে, যে কেউ বুঝতে পারবেন যে; এটি উপরের সংজ্ঞার আওতায় পড়বে।'

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আলোকে মুহাম্মদ মুনির অশ্লীলতার বিবরণ প্রদান করেন। দৃশ্যত তিনি এ ব্যাপারে কোন উপসংহার টানতে চাননি, শুধু এটুকু বলেছেন যে, পাকিস্তানের দণ্ডবিধিতে 'সুরুচি/শোভনতা' ও 'নৈতিকতা' শব্দগুলো 'অশ্লীলতা' অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত 'অশোভনতা ও 'অমানবিকতা'র মতো শব্দের চেয়ে অনেক বেশি

www.pathagar.com

তাৎপর্যপূর্ণ। জনাব মুনির বলতে চেয়েছেন যে, এ ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। তাই আলোচ্য ধারণাগুলোর সংজ্ঞা না দেয়া হলে; একটির চেয়ে অপরটির পরিধি যে 'অধিকতর ব্যাপক' তা বিবেচনা করা কঠিন হবে।

টিকা

১. শাদ ফারুকি, 'Law Relating to Press Freedom in Malaysia,' ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত Freedom of Expression শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত অপ্রকাশিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা, ৩।

২. Lee Hun Hoe, বর্ণিও'র প্রধান বিচারপতি, Public Prosecutor v. Ooi Kee Saik, (১৯৭১) মালয়েশিয়ান ল' জার্নাল, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা, ১০৪।

৩. একই সূত্র, সুলতান আজলান শাহ'র বিবৃতি, (যেহেতু তিনি তখন রাজা ছিলেন)।

৪. একই সূত্র।

৫. Choon, 'Should there be any Restrictions to the Freedom of Expression?' ১৯৮৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কুয়ালালামপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে Freedom of Expression শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত অপ্রকাশিত নিবন্ধ।

৬. মুনির, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan : Being a Commentary of the Constitution of Pakistan, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা, ১৫৯।

৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৬১।

৮. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Street, Freedom of the Individual and the Law, পৃষ্ঠা, ১৫২।

৯. আহমদ ইব্রাহীম, 'Freedom of Speech and Expression under the Federal Constitution : Sedition and Contempt of Court', Law, Info, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা, ১৯।

১০. Street, Freedom, পৃষ্ঠা, ১২২।

১১. তুলনীয়, মুনির, The Constituion of Pakistan, পৃষ্ঠা, ১৬২।

১২. Street, Freedom, পৃষ্ঠা, ১২৭।

১৩. পাকিস্তান দণ্ডবিধি, ধারা ২৯২ ও ২৯৪।

১৪. মুনির, The Constitution of Pakistan, পৃষ্ঠা, ১৬২।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৪ : ধর্মাবমাননা

একনজরে আধুনিক আইন বিশেষ করে মালয়েশিয়া প্রসঙ্গ

মালয়েশিয়া যদিও একটি ইসলামি রাষ্ট্র নয়; তথাপি দেশটির সংবিধান ও সামাজিক বাস্তবতা-উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থিতি পরিদৃষ্ট হয়। ইসলাম ও মালয়ী ঐতিহ্যকে (আদাত) একত্রে দেশটির সবচেয়ে বড় সামাজিক শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। মালয়েশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু থাকার কারণে, অংশত এমনটি করা হয়েছে। দেশটিতে চীনা (প্রায় ৩০ শতাংশ), ভারতীয় (প্রায় ১০ শতাংশ) এবং অন্যান্য সম্প্রদায় (প্রায় ১০ শতাংশ) রয়েছে, এ কারণে মালয়েশিয়ার নেতারা তাঁদের দেশকে বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির সমাজ বলে বর্ণনা করে থাকেন। সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কারণও এটি। মুসলমানরা জনসংখ্যার অর্ধেক। মালয়ী শাসক বা সুলতানকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং তাঁকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে হবে। অবশ্য সংবিধানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের মুসলমান হতে হবে, এমন কোন কথা বলা হয়নি।[১] কেন্দ্রীয় সংবিধানে "ইসলামকে ফেডারেশনের ধর্ম" বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে আরো বলা হয়েছে যে 'কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোন স্থানে শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে অন্যান্য ধর্মও পালন করা যাবে।' [ধারা ৩(১)]। কেন্দ্রীয় সংবিধানের ১১ ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ধর্মের কথা ঘোষণা ও পালন এবং তা প্রচার করার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪) প্রদান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ (৪) এ বলা হয়েছে, 'রাজ্য আইন এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল কুয়ালালামপুর ও লুবানের কেন্দ্রীয় আইন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন ধর্মীয় মতবাদ বা ধর্মবিশ্বাস প্রচার নিয়ন্ত্রণ বা এ ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।' অনুরূপভাবে, রাজ্য আইনও বিকৃতি রোধ ও মিথ্যা প্রচারণা থেকে ইসলামকে হেফাযতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

মালয়েশিয়ার সংবিধানে ইসলাম সম্পর্কে এক মন্তব্যে অধ্যাপক আহমদ ইব্রাহীম বলেন যে, 'সংবিধানে ইসলামের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি ইয়াং ডি-পার্টুয়ান অ্যাগোং (যেমন সুলতান)এর ক্ষমতা গ্রহণের শপথ আকারেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।[২] ভাবগম্ভীর ইসলামি রীতিতে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় এবং এর অংশ হিসেবে যেসব বাক্য উচ্চারণ করা হয় তা হলো, যে: "আমরা সব সময়ই ইসলাম ধর্মকে হেফাযত করবো এবং এদেশের আইনের শাসন ও শান্তিশৃংখলা সমুন্নত রাখবো।' মালয়েশিয়ায় ইসলামি আইনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি; কারণ

www.pathagar.com

দেশটির সংবিধানের ১৬ ধারায় আইনের সংজ্ঞায় একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমন অভিমতের জবাবে একই লেখক এমত ব্যক্ত করেন যে, এখানে বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক আইনের সংজ্ঞায় 'অন্তর্ভুক্ত' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইসলামি আইন অন্ত র্ভুক্ত করার জন্য তা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।[৩] অধ্যাপক আহমদ ইব্রাহীমের মূল্যায়নে এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সংবিধানের শর্তের আওতায় ৩(১) ধারা অনুযায়ী 'মালয়েশিয়ার মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন পদ্ধতি পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তারা ইংরেজদের সাধারণ আইনের পরিবর্তে ইসলামি আইন অনুসরণ করতে চাইলে তাদেরকে তা করার অনুমতি দেয়া হবে।'[৪]

আগেই বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের সংবিধিবদ্ধ আইনে (কেন্দ্রীয় অঞ্চল বাদে) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় পরিচালিত হবে। শরীয়া আদালতের বিষয়েও এটা প্রযোজ্য হবে, কেন্দ্রীয় আইন নয় বরং রাজ্যের সংবিধিবদ্ধ আইনে তা পরিচালিত হবে। ধর্মাবমাননার প্রসঙ্গে সেলানগর মুসলিম সংবিধিবদ্ধ আইন প্রশাসন, ১৯৫২ (১৯৮৩ সালে সংশোধন করা হয়) হচ্ছে 'ধর্ম অবমাননা' সংক্রান্ত একমাত্র আইনঃ যা কেন্দ্রীয় অঞ্চল কুয়ালালামপুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংবিধিবদ্ধ আইনের নবম অংশের এ আইনটি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ-সংশ্লিষ্ট। নিম্নে এটি উদ্ধৃত হলো :

> যে কেউ বক্তব্য প্রদান বা লেখনীর মাধ্যমে, অথবা বোধগম্য কোন উপায়ে মুসলমাদের ধর্ম, বা যে কোন গোষ্ঠীর মতবাদ কিংবা বৈধভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন ধর্মীয় শিক্ষকের শিক্ষা অথবা কোন সভাপতি (রাজ্য ধর্মীয় পরিষদ) বা সংবিধিবদ্ধ আইনের আওতায় প্রদত্ত ফতোয়ার অসম্মান করার চেষ্টা করে অথবা অবমাননা করে তাহলে বিধিবদ্ধ এ আইনের আওতায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এজন্য সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ একহাজার ডলার জরিমানা দেয়া যেতে পারে। (ধারা-১৭২)

এই আইনের শর্তসমূহ এতোটাই ব্যাপক যে, ইসলাম অবমাননার সব বিষয়কে এর আওতাভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট, যে কারণে একে বিশেষ করেঃ কেবল ধর্মাবমাননার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। তথাপি আইনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছেঃ ধর্মাবমাননার বিষয়। আইনটির ব্যাপকভিত্তিক শর্তের আওতায় ইসলামের মূলনীতি ও আইনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা বা অবমাননার বিষয় পড়বে।

তেরেঙ্গানু মুসলিম সংবিধিবদ্ধ আইন প্রশাসন, ১৯৮৬ তেও ধর্মাবমাননার বিষয়ে

www.pathagar.com

অনুরূপ বিধিবিধান রাখা হয়েছে। তবে এখানে যারা অপরাধ করবে, তাদের জন্য আরো কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (২০৯) ধারায় বলা হয়েছে :

> কোন ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিকভাবে বা লেখার মাধ্যমে অথবা কোন কাজ কিংবা কোন ধরনের ভাবভঙ্গিমা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের চার মাযহাবের যেকোন একটি পদ্ধতি, বা ধর্মীয় কর্মকর্তা, শিক্ষক বা বৈধ ইমাম কিংবা বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় বৈধভাবে দেয়া কোন ফতোয়ার অবমাননা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এজন্য তাকে সর্বোচ্চ তিন হাজার রিঙ্গিত জরিমানা প্রদান অথবা সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড ভোগ করতে হতে পারে।

সেলানগরের সংবিধিবদ্ধ আইনের মতো, এ আইনের আওতাও বেশ প্রসারিত এবং কেবল ধর্মাবমাননার মধ্যে তা সীমিত নয়, উপরন্ত কোন বৈধ ধর্মীয় কর্মকর্তার দেয়া ধর্মীয় নির্দেশ (ফতোয়া) অবমাননা করাসহ অবমাননার অন্যান্য ঘটনাও এর আওতায় পড়বে। ধর্মের ক্ষেত্রে সব ধরনের অবমাননার মধ্যে ধর্মাবমাননা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের জন্য এ আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে বলে আশা করা হয়।

কেদাহ আইনের শরীয়া ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে (ধারা ৮, ১৯৮৮) 'অশোভন কথা উচ্চারণ' বিষয়ে একটি সাধারণ বিধি রয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

> কোন ব্যক্তি যেকোন স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কথা উচ্চারণ বা প্রচার করলো, যা হুকম সাইয়ারাকের পরিপন্থী এবং তা শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হতে পারে, তাহলে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং এজন্য তাকে সর্বোচ্চ এক হাজার রিঙ্গিত জরিমানা ও সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল বা উভয় দণ্ড দেয়া যেতে পারে। (ধারা-৬)।

আবারও দেখা গেল যে, এ অনুচ্ছেদের শব্দ এমন ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যে: কেবল ধর্মাবমাননার বিষয় নয়; বিদ'আহসহ শরী'আহ প্রতিষ্ঠিত যেকোন মূলনীতির বিকৃতির ঘটনাও এর আওতায় পড়বে। মালয়েশিয়ার সব রাজ্যে সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বশীল এ আইন হুবহু অথবা সামান্য পরিবর্তন করে কার্যকর রয়েছে। উদাহরণ হলো, কেলানাতান এর শরীয়া ফৌজদারি দণ্ড বিধি, ১৯৮৫ এর (৬) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনটি কেদাহ'র আইনেও হুবহু প্রচলিত রয়েছে। তেরেঙ্গানু রাজ্যে এক বছর কারাদণ্ড এবং অন্য রাজ্যগুলোতে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং সমপরিমাণ জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। তাই একে ধর্মাবমাননাসহ ধর্মের বিরুদ্ধে যেকোন অবমাননাকর কাজের জন্য শাস্তির মানদণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। তেরেঙ্গানু রাজ্যের ইসলাম ধর্ম বিষয়ক সংবিধিবদ্ধ আইন প্রশাসন, ১৯৮৩

www.pathagar.com

এর একটি বিধিতে আরো সুস্পষ্ট শিরোনাম হল: 'কুরআনের আয়াত অবমাননা' এবং এ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে (২০৯) যে কথা বলা হয়েছে, তা নিম্নে বর্ণনা হলো :

> কোন ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিতভাবে অথবা কোন কাজ বা যেকোন ধরণের আচরণের দ্বারা কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদিস অথবা মুসলমানদের কাছে পবিত্র বলে পরিচিত কোন কথা বা বাক্য অমান্য করলে বা অবমাননার কারণ হলে সে অপরাধ করবে এবং এজন্য তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ তিনহজার রিঙ্গিত জরিমানা অথবা এক বছরের জেল অথবা উভয় দণ্ড।

সেলেনগর আইন, ১৯৫২ এর অনুরূপ ধারার শিরোনাম হল, 'কুরআনের অপব্যবহার।' এ আইনে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন সত্ত্বেও বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও সেলানগরে একই ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তি হবে 'সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ একশ' ডলার জরিমানা [সেলেনগরের সংশোধিত আইন নং ৯ (১৯৮৩) এর ধারা-১৭০ ও ধারা-২১]। তৎসত্ত্বেও কেদাহ আইনে 'কুরআনের আয়াতের অবমাননা' করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও, 'মুসলমানদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত যেকোন কথা বা বাক্য' অবমাননার বিষয়ও এ আইনের আওতায় পড়বে।

প্রশ্ন হচ্ছে: উল্লিখিত অপরাধীকে এরপরও মুসলমান অথবা ধর্মত্যাগী বলে বিবেচনা করা হবে কি-না। তেরেঙ্গানুর আইন অনুযায়ী মজলিশ (তেরেঙ্গানুর ইসলামী ধর্মীয় পরিষদ) বা মুফতি ছাড়া কেউই ইসলাম ধর্ম বা হুকম সাইয়ারাক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া জারি অথবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাউকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), সাইরিক (মুশরিক) বা কাফের বলে ঘোষণা করতে পারবে না' (ধারা-২০৫)। একই ধারার পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'হাকিম শার'ঈ ছাড়া অন্য কেউ কোন মুসলমান মুরতাদ বা কাফের হয়ে গেছে কিনা-সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এখানে হাকিম শার'ঈর অর্থ হচ্ছে: কোন সুযোগ্য কাযি যিনি শরীয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।

মালয়েশীয় সমাজে মুসলমানদের পাশাপাশি স্বদেশী অমুসলিম চীনা, খৃষ্টান ও হিন্দুরা বসবাস করে এবং সেখানে একজনের কাছে অন্যের ভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। এ সমাজে ধর্মাবমাননা ও কুফরির মতো ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রশ্নে দৃঢ় নীতি গ্রহণের বিষয়টি মোটেই বিস্ময়ের কিছু নয়। তেরেঙ্গানুর আইনে আরো বলা হয়েছে যে, কেউ আইনের বিধান (অনুচ্ছেদ :২০৫) লংঘন করলে এবং অপর কাউকে কাফের, মুরতাদ অথবা

www.pathagar.com

ধর্মাবমাননাকারী ঘোষণা করলে, সে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করবে। এজন্য তার 'সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।" (ধারা-২০৫.৩)।

সেলানগর সংবিধিবদ্ধ আইন, ১৯৫২-তেও অনুরূপ একটি ধারা রয়েছে। এতে আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় নেতাসহ যে কোন অবৈধ ব্যক্তির ধর্মীয় নির্দেশনা (ফতোয়া) জারিকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটিতে এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে কোন অপরাধের ব্যাপারে ফতোয়া দেয়ার অধিকার একমাত্র রাজ্যের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষেরই, যেমন সুলতান ও ধর্মীয় পরিষদের। কোন অনুমোদিত ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এজন্য দোষী ব্যক্তির সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল বা সর্বোচ্চ এক হাজার ডলার জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে। (ধারা-১৬৮ সংশোধিত ১৯৮৩)। এসব বিধি সিয়াসা শরীয়া বা শরীয়াভিত্তিক নীতির বৃহত্তর আওতার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন অথবা কল্যাণকর বলে মনে করলে, এধরনের আইন-কানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করেছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় এবং মালয়েশীয় সমাজের বহুমাত্রিকতার কথা বিবেচনা কওে, প্রায় সকল মালয়েশীয় রাজ্যের সুলতান ও শাসকরা দৃশ্যত ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে অপরাধের ক্ষেত্রে অননুমোদিত ব্যক্তির ধর্মীয় সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) প্রদান নিষিদ্ধ করার নীতিগ্রহণ করাকে উৎসাহিত করেছেন।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনকালে সংশোধিত পাকিস্তান দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে বলা হয়েছে, রাসূল সাঃ সদস্য যেমন, (আহল আল বায়িত) বা তাঁর সাহাবীদের প্রতি অসম্মান বুঝায়-এমন কথা উচ্চারণ এবং ইসলামের ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগি ও আচার অনুষ্ঠান-এর (শা'ইর-ই-ইসলাম) অবমাননাকর কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দণ্ডবিধির সংশোধিত সংস্করণে এধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে:

> কোন ব্যক্তি কথা বা লেখার মাধ্যমে অথবা স্পষ্ট বোধগম্য কোন উপায়ে রাসূল সাঃ এর পবিত্র নামের অবমাননার উদ্দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোষারোপ, কটাক্ষ বা কটুক্তি করলে, তার মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে, এছাড়া তাকে জরিমানাও করা হবে।[৫]

এখানে যে অপরাধের কথা বলা হয়েছে, তাকে অবশ্যই তা'জির অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; এজন্য সবচেয়ে কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত মৃত্যুদণ্ড। এ অপরাধের অন্যান্য দণ্ডের মধ্যে রয়েছে: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা। এ দণ্ড বিধিতে

www.pathagar.com

ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআন বা এর কোন উদ্ধৃতির ... অবমাননা বা ক্ষতি করলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। (ধারা-২৯৫-খ) উপরন্তু এ দণ্ডবিধিতে আরো বলা হয়েছে, কেউ রাসূল সাঃ এর পত্নীগণের (উম্মুল মু'মিনীন) বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের (আহল আল-বায়িত) পবিত্র নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নাম রটনা করলে; তার তিন বছরের জেল বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। (ধারা-৯৮ক)। এবং এতে সর্বশেষে বলা হয়েছে, কেউ যদি পাকিস্তানের কোন শ্রেণীর নাগরিকের 'ধর্মীয় অনুভূতিকে সচেতনভাবে অবমাননা করে বা অবমাননার চেষ্টা করে' তাহলে তার 'দুবছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে।' (ধারা-২৯৫-ক)

ধর্মাবমাননার জন্য মামলার ঘটনা বেশ বিরল, এ ধরনের মামলা হতে তেমন একটা দেখা যায়না।

১৯৯১ সালে এধরনের মাত্র দুটি মামলার ঘটনা সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি: এর একটি হয় ইন্দোনেশিয়ায় এবং অপরটি মিশরে। উভয় মামলার ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। প্রথম মামলাটি হয় ইন্দোনেশিয়ায় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিন মনিটর এর সম্পাদকের বিরুদ্ধে। এ মামলায় ইসলাম ধর্ম অবমাননার দায়ে তার পাঁচ বছরের জেল হয়। ৪২ বছর বয়স্ক সম্পাদক রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী Arswendo Atmowiloto ১৯৯০ সালে তার সাময়িকীতে একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। এরপর জাকার্তার জেলা আদালত তাকে এ দণ্ডপ্রদান করেন। জরিপে বলা হয়ে যে, 'পপ গায়ক ও রাজনীতিবিদরা, এমনকি সে নিজেও রাসূল সাঃ এর চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। ফলাফলে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ও সাবেক ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনের মতো নেতৃবৃন্দের নামের নীচে একাদশ স্থানে রাসূল সাঃ কে স্থান দেয়া হয়।' ইন্দোনেশিয়ার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে ধর্মবমাননার সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে পাঁচ বছরের জেল। মামলার বিচারক Sarwon-র রায় ঘোষণাকালে বলেন, 'আসামি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ্যে ইন্দোনেশিয়ার একটি ধর্ম অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।' বিচারক তাকে এ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে পাঁচ বছরের জেল প্রদান করেন। বিচারক আরো বলেন, Arswendo ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে কৌসুলীর এককোটি রুপিয়াহ জরিমানার আবেদনের স্থলে মাত্র আড়াইহাজার রুপিয়াহ জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'জনমত জরিপের এ ফল প্রকাশের পর সারাদেশে মুসলমানরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ১৯৯০ সালের অক্টোবরে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।' মামলা পরিচালনাকারী বিচারক বলেন, আসামির আচরণে

মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন এবং 'তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা বিনষ্ট করতে পারে।'[৬]

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে মিশরেও ধর্মাবমাননার একটি মামলা হয়। এ মামলার বিচার কর্তৃপক্ষ ধর্মাবমাননার দায়ে ঔপন্যাসিক 'আলা হামিদ ও প্রকাশক-পরিবেশককে একই সাথে আট বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করেন। 'আলা হামিদের এ উপন্যাসটিতে ইসলামের নবী রাসূল সা ঃকে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কল্পকাহিনী তুলে ধরা হয়। কায়রোর একটি বিশেষ নিরাপত্তা আদালতে মামলাটির বিচার অনুষ্ঠিত হয়। নাশকতামূলক কাজ বিরোধী আইনের আওতায় প্রদত্ত রায়ে প্রকাশক ও মুদ্রণকারীকেও এ অপরাধের সহযোগী হিসেবে দণ্ডিত করা হয়। মামলাটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি; তবে দৃশ্যত এ ঘটনা অনেকটা বৃটিশ লেখক সালমান রুশদির অনুরূপ। রুশদি ইসলামের অবমাননা করে 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামক উপন্যাস রচনা করেন। 'আলা হামিদের উপন্যাসটির নাম মাসাফাহ ফী 'আকল রাজুল (মানব মনের দূরত্ব)। এ গ্রন্থটিতেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর অবমাননামূলক কল্পকাহিনী তুলে ধরা হয়েছে; যা অনেকটা সালমান রুশদির উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমির অনুরূপ। সংবাদপত্রের মন্তব্যে এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয় যে নিরাপত্তা আদালতে মামলাটির বিচার করা একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। অতীতে মিশরের নিরাপত্তা আদালতসমূহে কেবল রাষ্ট্রের জন্য হুমকি বলে বিবেচিত রাজনৈতিক অপরাধের বিচার করা হয় এবং নিরাপত্তা আদালতের দণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপিল করা যায়। মিশরে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশনার মামলা সাধারণত দণ্ডবিধি আইন ১৯৮২ এর ২৯ ধারায় বিচার করা হয়ে থাকে এবং অপরাধীকে '৬ মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল দেয়া হয় এবং ৫০০ থেকে এক হাজার মিশরীয় পাউন্ড জরিমানা করা হয়।' (ধারা-৯২৮)।

১৯৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের এক সম্প্রচারে ঘোষণা করা হয় যে, 'আলা হামিদের ধর্মাবমাননা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোন সুযোগ দেয়া হবে না বলে আশা করা হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও দু'সপ্তাহ পর এক খবরে বলা হয়, বেসরকারি লবিং গ্রুপ হিসাবে কর্মতৎপর একটি মিশরীয় মানবাধিকার সংস্থা আলা হামিদের পক্ষে মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপিল করেছে।[৮] ১৯৮৮ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী নাগিব মাহফুজ আলা হামিদের শাস্তির রায়ের ঠিক পরপরই পত্রিকায় লিখলেন যে, তিনি ও অন্যান্য মিশরীয় লেখক শাস্তির কঠোরতা এবং তাকে যেভাবে বিচার করা ও দণ্ড প্রদান করা হয়, তাতে বিস্মিত হয়েছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে নাগিব মাহফুজ লিখেন: 'বইটির যুক্তিপূর্ণ

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার পর এটি নিষিদ্ধ করতে চাইলে, তা করাই কি উত্তম হতো না? মধ্যযুগ থেকেই তো ইসলামকে আক্রমণ করে লেখা বইগুলোর ব্যাপারে এমনটি করা হয়ে আসছে।' সে যাই হোকনা কেন, এটা নিশ্চিত যে- ধর্মাবমাননার ঘটনা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত এবং ব্যাপক ক্রোধ, বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও সহিংসতায় ইন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশিত হবার পর পরই-বিশ্বে যে ধরনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ-সহিংসতা দেখা দেয় বিশেষ করে তার পুনরাবৃত্তি যাতে ঘটতে না পারে সেব্যাপারে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ সজাগ ছিল বলে মনে হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে মিশর তার প্রাণোচ্ছ্বল সংবাদপত্র ও বাক স্বাধীনতার জন্য গর্ব করে থাকে। এটি নিশ্চিত যে, 'আলা হামিদ ও তার সহযোগীরা রাসূল সাঃ এর ওপর অবমাননাকর হামলার ব্যাপারে তার স্বদেশী মিশরীর জনগণের স্পর্শকাতরতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেয়নি।

আমি সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নুমেরির শাসনকালে ধর্মত্যাগের একটি মামলায় একজনের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা তুলে ধরার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই। মনে হচ্ছে যে গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক সংকটের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে আদালতের পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিম রিপাবলিকান ব্রাদার্সের ৭৬ বছর বয়স্ক নেতা মাহমুদ মুহাম্মদ তাহা'কে ১৯৮৫ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইসলামের বিষয়ে বিকৃত মত প্রচারণার দায়ে তাকে এ দণ্ড প্রদান করা হয়। তিনি প্রায় দু'দশক ধরে তার এমত প্রচার করে আসছিলেন। ১৯৭৬ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা করে এবং অনেক মুসলিম সংগঠন তাহা'র মতকে প্রত্যাখ্যান করে। এঘটনা এতোটা বিতর্কিত ছিল যে তা নিমেরির শাসনের পতনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাহা'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নুমেরি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে নুমেরি ইসলামিকরণ কর্মসূচি শুরু করেন, যার প্রতি কারোর তেমন একটা আস্থা ছিল না এবং কোন জনসমর্থনও পাওয়া যায়নি। নুমেরি তার সরকারের করুণ অবস্থা ও আসন্ন পতনের বিষয় আঁচ করে ইসলামের পথে পা বাড়ান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেন যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও কূটকৌশলপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। তিনি বহু রিপাবলিকান নেতাকে জেলে নিক্ষেপ করেন। স্পষ্টভাষী ও সুবক্তা তাহা-ইসলাম সম্পর্কে তার বিতর্কিত মতে অটল থাকেন। এসব মতের মধ্যে ছিল, ফরয নামায (সালাত) নিছক যন্ত্রবৎ কাজে পরিণত হতে পারে : তা হলো একজন মুসলমান আল্লাহপরস্তি ও ধার্মিকতার এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌছুতে পারে, যেখানে তার জন্য

নামায নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়। তাহা'র আরেকটি বিভ্রান্ত মত হলো: মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা: এর সর্বশেষ নবী হওয়া সংক্রান্ত। তাহা রাসূল সাঃ শেষ নবী; এবং তারপর আর কোন নবী আসবেন না সম্পর্কে মুসলমানদের ঈমানের মৌলিক বিষয়টি অস্বীকার করেন। তার মতে, মুহাম্মদ সাঃ একজন যথার্থ নবী তবে তিনি শেষ নবী নন। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম কাবা ঘরে গিয়ে হাজ্জ পালন করা সম্পর্কে তাহা'র মত হলো, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির জন্য কোন ঈমানদার ব্যক্তির মক্কা শরীফে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যেকোন স্থান এবং যেকোন সময়ে সে এ ইবাদত করতে পারবে। নুমেরি তাহা ও তার বহু অনুসারীকে গ্রেফতার করেন এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে দৃশ্যত ধর্মত্যাগ ছাড়াও অন্যান্য অপরাধে তাদের বিচার করেন। তাহা সুদানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৮৩ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন, ১৯৭৩ এর আওতায় তার অপরাধের বিচারকে অবৈধ বলে অভিহিত করে বিচার বর্জন করেন। বিচারিক আদালতে রায় পর্যালোচনা দেখা যায় যে, আদালতটিতে ধর্মত্যাগের মামলা পরিচালনা করা হয় না বিধায় উচ্চতর আদালতের একটি রায় তদস্থলে প্রদান করা হয়; যাতে তাহা'কে ধর্মত্যাগী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তাহা'কে ধর্মত্যাগী হিসেবে রায় দানের ক্ষেত্রে আপিল আদালতও একতরফা দেওয়ানি মামলার বিবরণীর ওপর নির্ভর করে। ইসলাম সম্পর্কে তাহা'র অভিমতকে ধর্ম অবমাননাকর বিবেচনা করে, কতিপয় ব্যক্তি ১৯৬৮ সালে এ মামলা দায়ের করেন। এছাড়া আপিল আদালত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিম বিশ্ব লীগের (রাবেতা-ই আলমে আল ইসলামী) ঘোষণার ওপর নির্ভর করে। নুমেরি তাহা'র মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন এবং ১৯৮৫ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রকাশ্যে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এ মামলায় অন্যতম অমীমাংসিত বিষয় ছিল: সংবিধানের ৪৭ ও ৪৮ ধারায় উল্লিখিত মত ও ধর্মাবিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতায় প্রশ্নটি। বস্তুত: আদালত এ বিষয়টি বিবেচনায় না এনে সংবিধান উপেক্ষা করেছিলেন।[১]

www.pathagar.com

টীকা

১. আহমদ ইবরাহীম 'The Position of Islam in the Constitution of Malaysia, আহমদ ইবরাহীম ও অন্যান্য, Readings on Islam in Southeast Asia, পৃষ্ঠা, ২১৫।

২. একই লেখক 'The Principles of an Islamic Constitution and the Constitution of Malaysia, (১৯৮৯), International Islamic University Law Journal ১ (নং-২) পৃষ্ঠা, ৭।

৩. একই সূত্র, পৃষ্ঠা, ৮।

৪. একই সূত্র : পৃষ্ঠা, ৭।

৫. পাকিস্তান দণ্ডবিধি, ১৯৬০, (১৯৯১ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), ১৯৫-খ।

৬. New Straits Times, কুয়ালালামপুর, এপ্রিল ১৯৯১, পৃষ্ঠা, ২১।

৭. বর্তমান লেখক শ্রুত বিবিসির রেডিও সম্প্রচার ...।

৮. New Straits Times, জানুয়ারি ৬, ১৯৯২, পৃষ্ঠা, ৮। আরো দেখুন, আল বিলাদ (বৈরুত) এ প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার, নং-৭২, এপ্রিল ২৫, ১৯৯২, পৃষ্ঠা, ৫০।

৯. মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আমার সুদানী সহকর্মী অধ্যাপক মুহাম্মদ আতা আল-সিদ এর সাথে আলাপ করে মাহমুদ তাহা'র মামলার ব্যাপারে তথ্য ও তার মন্তব্য জানতে পেরেছি। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ১৯৯২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলাপ হয়। নুমেরি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, এস, সাফওয়াত, 'Islamic Laws in the Sudan', আল-আজমেহ সম্পাদিত, Islamic Law, পৃষ্ঠা, ২৪২।

তাহা'র মামলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, Mayer, Islam and Human Rights, পৃষ্ঠা, ১৮২।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৫ : সালমান রুশদি প্রসঙ্গ

সালমান রুশদির উপন্যাস 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশের পরপরই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সারা বিশ্বে মুসলমানরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। ১৯৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের ভাইকিং পেঙ্গুইন উপন্যাসটি প্রকাশ করে। বইটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ও আক্রমণাত্মক অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করে বৃটেনের মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমানরা বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। স্যাটানিক ভার্সেস এর বিরুদ্ধে অতি দ্রুতগতিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় উঠে। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে পাঁচ ব্যক্তি এবং কাশ্মীরে একজন নিহত হন। বেলজিয়ামের ইসলামি কমিউনিটির ইমাম ও তার সহকারী গুলিতে নিহত হন। ১৯৯১ সালের জুন মাসে টোকিওতে 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর জাপানি অনুবাদককে হত্যা করা হয়। রুশদির চরম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এ উপন্যাস প্রকাশের পর বিষয়টি ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে ও ফলাও প্রচার পায়। এ কারণে আমি এ ব্যাপারে প্রচারিত কয়েকটি ঘটনার সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি।[১]

এ প্রসঙ্গে, আমি কতিপয় প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করবো, এর মধ্যে রয়েছে ইরানের মরহুম নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর 'ফতোয়া' এবং আলেমদের অভিমত, যার মধ্যে রয়েছে, মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাবেতায়ে আলমে আল ইসলামির ল' একাডেমী। এছাড়া আমি তিনজন লেখক, শাব্বির আখতার, রাফাত আহমদ ও আলাউদ্দিন খারুফার অভিমত নিয়ে আলোচনা করবো। এ তিন লেখক বিষয়টি নিয়ে বই লিখেছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, যা গুরুত্বের দাবি রাখে।

দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-এ ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সা:, তাঁর পত্নীগণ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণকে গালিগালাজ ও অবমাননা করা হয়েছে। বইটিতে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং ইসলাম ধর্মের কয়েকটি প্রধান মূল্যবোধ ও নীতি সম্পর্কে অবমাননাকর কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথমে আমি রাসূল সা:, তাঁর পত্নীগণ ও সাহাবীগণের ব্যাপারে রুশদির উপন্যাসের অবমাননাকর বিষয় হুবহু উদ্ধৃত করেছিলাম; তবে সংশোধন কালে আমি ঐ সমস্ত অবমাননাকর বক্তব্যকে শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহতা'আলা ও কুরআন সম্পর্কে রুশদির উপন্যাসের ৩৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় অবমাননাকর বক্তব্য কেবল অবমাননাকরই নয়, উপরন্তু তা অত্যন্ত

www.pathagar.com

ধৃষ্ঠতাপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এতে কুরআনকে 'তুচ্ছ চিন্তাধারার জগাখিচুড়ির অনুশাসন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৬৩), এতে কুরআন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে এর বিপুল অবদান সম্পর্কে রুশদির চরম অজ্ঞতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ৬৬৬ পৃষ্ঠায় রুশদি রাসূল সাঃ সম্পর্কে জঘন্য কুৎসা রটনা করেছেন, এবং ৩৮১-৮২ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বাসীদের মাতা' (উম্মুল মুমিনুন) বলে সুপরিচিত তাঁর পত্নীগণের প্রসঙ্গে ভিত্তিহীন কদর্য শব্দ প্রয়োগ করেছেন; যা সহজ ভাষায় অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত এবং সভ্য আলোচনার মানদণ্ড থেকে অনেক অনেক হীনতর। আল্লাহর নবী ইবরাহীম আঃ এবং রাসূল সাঃ এর সাহাবিগণকে সবচেয়ে কদর্য ও জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় স্যাটানিক ভার্সেস-এ (পৃষ্ঠা ১০১, ১১৭, ৩৭৪)। পেঙ্গুইন বুকস লিঃ-এর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে দেয়া এক বিবৃতিতে বৃটেনের মুসলিম সমাজ বলেছিল, 'এ ধরনের গ্রন্থ কতটা প্রশংসিত অথবা পুরস্কৃত হলো সেটা কোন বড় বিষয় নয়।'[২] গ্রন্থটিতে এধরনের শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে লেখকের সংবেদনহীনতার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যা বৃটেন ও তার বাইরের কোটি কোটি মুসলমানকে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

রুশদি প্রায় দাবি করে থাকেন যে, 'স্যাটানিক ভার্সেস' হচ্ছে একটি কল্পকাহিনী- তাই এটি সত্য অথবা মিথ্যা-সে প্রশ্নই উঠে না। এ দাবি ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল এর সম্পাদক এম এইচ ফারুকীর মতো সমালোচকদেরকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন : 'এটি একটি উপন্যাস, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অথবা কল্পকাহিনী হলে কোন কথা বলার ছিল না, মূল বিষয় হচ্ছেঃ এর ভাষা শোভনীয় হওয়া উচিত ছিল।'[৩] শাব্বির আখতার তার মন্তব্যে বলেছেন, স্যাটানিক ভার্সেস 'প্রকৃত ইসলামী ইতিহাসের সঙ্গে এতোটাই ঘনিষ্ঠ যে, তা খোদ রুশদির বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে'। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে এক সাক্ষাৎকারে রুশদি বলেন, 'বইটির ঐসব অনুচ্ছেদের প্রায় সবকিছু কল্পনার অনুক্রম, ঐতিহাসিক ঘটনা বা দৃশ্যত ইতিহাসকে ভিত্তি করেই ..... শুরু হয়েছে।'

আরেকজন বিশ্লেষক Galeyn Remington বলেন যে, (মুসলমানদের মনে) 'আঘাত হানার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে রুশদি তার বইয়ের বক্তব্যগুলো সাজিয়েছেন। তিনি জ্ঞাতসারেই মুসলমানদের সংবেদনশীলতা নিয়ে খেলা করেছেন ... ।' John Esposito ও তার সুস্পষ্ট মন্তব্যে বলেন, 'পশ্চিমা জগতে এমন কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞকে তিনি চেনেন না; যিনি এ ধরনের (রুশদির) বক্তব্যের পরিণতিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে বলে অনুমান করতে সক্ষম নন।' স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশিত হবার পরপরই দাঙ্গা এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ-সমাবেশ

www.pathagar.com

শুরু হয়; যার পরিণতিতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটার আগেই ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল :

> ধর্মের বিরুদ্ধে এ নযিরবিহীন মহাপরাধের ঘটনায় বৃটেনের মুসলিম সমাজ যে কতটা শোকাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সময়ের আবর্তনে অন্যান্য দেশে যখন, এ খবর পৌঁছুবে; তখন সেখানকার মুসলমানরাও অনুরূপ মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হবেন। প্রকৃত ঘটনা হলো: এখন পর্যন্ত প্রখ্যাত প্রকাশক পেঙ্গুইন তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে এমন জঘন্য ধর্মাবমাননার ঘটনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে।[৬]

এখানে এ মজার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভ্যাটিক্যানের সরকারি দৈনিক দ্য স্যাটানিক ভার্সেসকে ধর্মাবমাননাকর রচনা হিসেবে এর নিন্দা করেছে। উপরন্তু ইংল্যান্ডের চীফ রাব্বি রুশদির এ উপন্যাসের বিরোধিতা করেন। ইসরাইলের বিশিষ্ট রাব্বি আব্রাহাম শাপিরা উপন্যাসটিকে মুসলমানদের ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রতি অবমাননাকর বিবেচনা করে ইসরাইলে বইটির প্রকাশনা বন্ধ করার চেষ্টা করেন।[৭]

১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী এক ফতোয়ায় 'ইসলাম, রাসূল সা: ও কুরআনের জন্য অবমাননাকর স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাসটির লেখক এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত থেকে বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণা দেন।' এ ব্যাপারে আয়াতুল্লাহ খোমেনী আরো বলেন, 'আমি বিশ্বের সকল মুসলমানের প্রতি যেখানেই পাওয়া যাক না কেন দ্রুত লেখক ও প্রকাশকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন ইসলামের অবমাননা করার আর সাহস না পায়।'[৮]

তেহরান রেডিওতে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর এ আহ্বান প্রচারিত হবার পর মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী অবশ্য বলেন, 'বদ লোকটি যদি অনুশোচনা প্রকাশ করে বলে "আমি মারাত্মক ভুল করেছি" এবং মুসলমানদের ও ইমামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে এখনো তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।'[৯] ১৮ ফেব্রুয়ারি রুশদি সতর্কভাবে নির্বাচিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিবৃতিতে দু:খ প্রকাশ করেন তবে পরবর্তী সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি অবশ্য কোন অনুশোচনা প্রকাশ করেননি । রুশদির বিবৃতিটি নিম্নে বর্ণিত হলো :

> দ্য স্যাটানিক ভার্সেস এর লেখক হিসেবে আমি স্বীকার করছি যে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা আমার উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার

www.pathagar.com

> কারণে সত্যিকারার্থে ব্যথিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হওয়ায় ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা মর্মাহত হওয়ায় আমি গভীরভাবে দু:খিত। আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি, যেখানে রয়েছে বহু ধর্মবিশ্বাস, এ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের সকলকে অবশ্যই অপরের সংবেদনশীলতার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।[১০]

আয়াতুল্লাহ খোমেনি ১৯ ফেব্রুয়ারি আরেকটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি যে সব কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

> 'এমনকি রুশদি অনুশোচনা করে সর্বযুগের সেরা পরহেজগার ব্যক্তিতে পরিণত হলেও প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকরণীয় কাজ হবে, জানমালসহ তার হাতে থাকা সকল শক্তির মাধ্যমে তাকে (রুশদিকে) জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া।[১১]

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ফতোয়ার ব্যাপারে আলেম সমাজ ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিচার সংক্রান্ত কোন প্রক্রিয়ার উল্লেখ ছাড়া রুশদিকে হত্যার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি আহবান জানানোর তার এ রায় ঘোষণার প্রশ্নে তার বিচক্ষণতার ব্যাপারে তারা আপত্তি জানান। সম্ভবত এটি ছিল; আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ফতোয়ার একমাত্র ত্রুটি যা নিয়ে প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। তবে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত পুরো ঘটনা সম্পর্কে যারা অবহিত, তারা একথা ভাল করেই জানেন যে, কোন বিচক্ষণ মুসলিম বিশ্লেষকের পক্ষে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ফতোয়ার মৌলিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়। রুশদি যদি অনুশোচনা প্রকাশ করতে চাইত, তাহলেই কেবল সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার প্রক্রিয়ায় রায় ঘোষণা করা প্রয়োজন হতো, এটি হলো আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া কমিটির চেয়ারম্যান শায়েখ ড. আব্দুল্লাহ আল মাশহাদের অভিমত। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ইসলামে বিচারের ক্ষেত্রে বাদীকে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ অথবা আনুষ্ঠানিক শপথ ব্যক্ত করার মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করা প্রয়োজন। যেভাবে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, (ফতোয়া দান) তাতে এ ধরনের সুযোগ প্রদানের বিষয়ে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে ...।'[১২]

মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শায়েখ জাদ আল হক গণবিক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে শান্তভাবে আলোচনা ও বিচার প্রক্রিয়ার পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, এতে বইটির চাহিদা ও বিলি-বন্টন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। জাদ আল হক বলেন, ফতোয়ার

www.pathagar.com

কারণে বইটির বিক্রি হঠাৎ আকাশচুম্বি হয়ে যাবে, যা এর হঠকারী লেখক স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।[১৩]

মিশরের মুসলিম বিষয়ক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মুফতি ড: হানতাবিও আনুষ্ঠানিকভাবে জানান যে,রুশদীর পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু বিচার করা প্রয়োজন। আদালত অবশ্যই লেখককে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেবে, যাতে বিভ্রান্তিকর পাঠ ও ভুল বুঝার কারণে রায় প্রভাবিত হতে না পারে। এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবার পরও; করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবে।[১৪]

১৯৮৯ সালের ১০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিম বিশ্ব লীগের (রাবিতা-ই-আলমে আল ইসলামী) ইসলামী ল' একাডেমীর একাদশ অধিবেশনে সালমান রুশদির ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়। সৌদি আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়েখ আব্দুল আজিজ ইবনে বায এর সভাপতিত্বে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফার এ বিবৃতিতে রুশদিকে একজন ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা করে, রুশদি ও তার প্রকাশককে বৃটিশ আদালতে ফৌজদারি অপরাধে বিচার করা উচিত বলে সুপারিশ করা হয় এবং ইসলামি সম্মেলন সংস্থার উচিত তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা বলে এতে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে একাডেমীর বিবৃতিতে শরীয়ার : আইন অনুযায়ী কোন মুসলিম দেশে অনুপস্থিতিতে রুশদির বিচার করারও সুপারিশ করা হয়, যা কার্যকরযোগ্য না হলেও মুসলমানদের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশের উপায় হিসেবে কাজ করবে। উপরন্তু একাডেমী মুসলমানদের মর্মাহত করার জন্য রুশদি যে দু:খ প্রকাশ (১৯৮৯ সালের ১৮ ফেব্রয়ারি) করেন তাকে 'নিরর্থক ও অন্ত সারশূন্য' বলে প্রত্যাখ্যান করে বলে যে; রুশদি তার অবমাননাকর প্রকাশনার বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বশেষে একাডেমী স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থটি নিজ নিজ দেশে আমদানি ও বিক্রি নিষিদ্ধ করতে মুসলিম দেশ ও সরকারসমূহের প্রতি আহবান জানায়।[১৫]

১৯৮৯ সালের ১৩-১৬ মার্চ রিয়াদে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বাদশ সম্মেলনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে রুশদির বইকে বস্তুতপক্ষে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নির্লজ্জ লংঘন হিসেবে নিন্দা করা হয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ও বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়, অন্যদের অধিকারের বিনিময়ে কোন অধিকার চর্চা করা যাবে না অথবা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলামকে অবমাননার টার্গেটে পরিণত করা যাবে না। সদস্য রাষ্ট্রগুলো 'স্যাটানিক ভার্সেস-এর তীব্র নিন্দা জানায় এবং এ গ্রন্থের লেখককে একজন ধর্মত্যাগী বলে বিবেচনা

www.pathagar.com

করে।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বইটিতে নৈতিকতার নীতিমালা, সুসভ্য আচরণ এবং শতাধিক কোটি মুসলমানের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। অতপর বিবৃতিতে নিজ নিজ দেশে বইটি নিষিদ্ধ এবং এর বিলি-বন্টন রোধ করার জন্য-সকল সদস্য দেশের প্রতি আহবান জানানো হয়।[১৬]

রুশদির উপন্যাসের সাহিত্যিক ও শিল্পগুণ প্রসঙ্গে শাব্বির আখতার মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে একটি কার্যকর দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সহায়ক এমন কিছু স্যাটানিক ভার্সেস-এ পাওয়া যায়নি, না তাতে সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষতা ও আদর্শিক বহুত্ববাদের সাথে ইসলামের চিন্তামূলক যোগাযোগের কোন উপাদান স্থান পেয়েছে।' আখতার আরো বলেন, 'বইটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, 'সুপরিকল্পিতভাবে হযরত মুহাম্মদ সাঃ কে গালিগালাজ ও অবমাননা করা।'[১৭]

আরেকজন বিশ্লেষকের মন্তব্যেও এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, লোকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে, শেষাবধি নতুন চিন্তাধারার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি উন্মিলিত করে এমন রচনা এবং জনগণকে অবমাননা ও তাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয়ার মতো ক্ষতিকর গ্রন্থের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। রুশদির বইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'বইটিতে যে অজ্ঞতা, ঠাট্টাবিদ্রুপ, অবমাননা ও আপত্তিকর বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা না মানবিক অবস্থার বিকাশ সাধন করবে, না ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে বিরাট বিভাজনে বিভক্ত মানুষের হৃদয়-মন উন্মুক্ত করবে।'[১৮]

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির শিল্প সাহিত্যের নামে মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার অধিকার কি আছে? খালিদ সাঈদ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন লিখেছেন : 'আমি যদি আপনাদের বলতাম যে, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম হিটলার আমার কাছে এসে বললেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলংক রটনা করা হয়েছে, আদতে তিনি ইহুদিদের হত্যা করেননি। এরপর আমি এ কাহিনী অবলম্বনে একটি গীতিকবিতা লিখে ফেললাম। তাহলে আপনারা কি আমাকে একথা বলবেন যে, এটি হলো একটি শিল্পকর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মানদণ্ডে একে বিচার করা উচিত।'[১৯]

হুকম আল ইসলাম ফি জারাইম সালমান রুশদি (সালমান রুশদির অপরাধের ব্যাপারে ইসলামের রায়) শীর্ষক গ্রন্থে আলাউদ্দিন খারুফা প্রধান প্রধান মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরে, তার আলোকে সালমান রুশদির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিন খারুফা মদিনার মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় আলেম (বর্তমানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়াতে কর্মরত)। নিম্নে তাঁর এ মূল্যায়ন তুলে ধরা হল :

www.pathagar.com

> আমরা যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার আলোকে সকল মাযহাবের দৃষ্টিতে রুশদির অপরাধ ধর্মত্যাগের (রিদ্দাহ্) শামিল। রুশদি নি:সন্দেহে একজন ধর্মত্যাগী, আমি এ মতকে সমর্থন করছি এবং তাকে একজন ইসলামের অবমাননাকারী বলে বিবেচনা করছি, যে ইসলাম ত্যাগ করে ধর্মত্যাগীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য কোন ধর্মত্যাগীকে অনুতাপ করতে বলা আবশ্যক কিনা সে ব্যাপারে ফকিহ্দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং তার অনুতাপ প্রকাশ গ্রহণ করা হবে কিনা-সে ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[২০]

খারুফা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কোন সুযোগ্য বিচারক কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের পরে তিন দিন অনুশোচনা বা তওবা করার জন্য তাকে অনুরোধ জানানো এবং অনুশোচনার অনুরোধ জানানোর পূর্বে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করা সংক্রান্ত হানাফি মাযহাবের অভিমত তার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। তিনি আরও বলেন যে, 'এর মতো (যেমন রুশদি) ধর্মত্যাগীর অনুশোচনা প্রকাশ ইমাম আবু হানিফার কাছে গ্রহণযোগ্য।'

শাফেঈ মাযহাবের মতে বারবার ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রেও অনুশোচনা গ্রহণযোগ্য। 'সালমান রুশদির মতো এমন ধরনের ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে দুই দুই বার ধর্মবিশ্বাসের (আল শাহাদাতাঈন) কথা উচ্চারণ এবং ইসলামের অবমাননার জন্য তাঁর গভীর অনুতাপ ও অনুশোচনার কথা ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন হবে।'[২১]

রুশদির ঘটনার ব্যাপারে হাম্বলি মাযহাবের সিদ্ধান্তকে অধিকতর পছন্দনীয় বিবেচনা করে খারুফা বলেন, এতে তার তাওবা বা অনুশোচনা গ্রহণ করা যাবে এই শর্তে যে; সে স্পষ্টভাষায় তার অনুশোচনার কথা ঘোষণা করবে, দুইবার এ সাক্ষ্য উচ্চারণ করবে এবং সে যা করেছে তা পরিত্যাগের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করবে। এরই মধ্যে ধর্মত্যাগীর জন্য কঠোর নিরোধমূলক শাস্তি প্রদান প্রয়োজন। হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ্ ইবনে তাইমিইয়ার মতে, সালমান রুশদির মতো ধর্মত্যাগীকে কাফের বলে বিবেচনা করতে হবে বিধায় তার তাওবা করার কোন প্রয়োজন নেই, তা গ্রহণযোগ্যও নয়। দণ্ড কার্যকরের আগে তাকে কোন অবকাশ দেয়া যাবে না।

এ কথা উল্লেখ করার পর খারুফা আরো বলেন যে, ইসলামের কল্যাণ হবে (লি মাসলাহাত আল ইসলাম)... এবং ইসলামের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল হবে (দা'ইয়াহ তাইয়েবা লিল-ইসলাম), এ শর্তে এ ধরনের যেকোন রায় কার্যকর করা যেতে পারে। ইসলাম হচ্ছে সহনশীলতা, মহানুভবতা ও ঔদার্যের ধর্ম, একথা স্মরণ রেখে সমসাময়িক মুসলমানদেরকে বিশেষ করে বর্তমানকালের মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার প্রমাণ তুলে ধরা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এ পরিপ্রেক্ষিতে হানাফি, শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবের অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী রুশদির অনুশোচনা কেবল নিম্নোক্ত শর্তে গ্রহণযোগ্য : কৃত আচরণের জন্য তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দু:খ প্রকাশ করতে হবে; তিনি পুনরায় বইটি প্রকাশের চেষ্টা করবেন না এবং বর্তমানে বাজারে থাকা বইগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন। তিনি যখন এসব কাজ করবেন, তখন বাহ্যত তার বিবৃতি মেনে নেয়া আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে; কারণ ইসলাম কারোর অন্তরে কি আছে তা অনুসন্ধান করার অনুমতি দেয়নি।

তবে খারুফা বলেন, 'রুশদি উপরের শর্ত মেনে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করলে, তাকে তার বাকি জীবন ভয়ভীতির মধ্যেই কাটাতে হবে এবং তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য অবশ্যকরণীয় কাজ হয়ে থাকবে (আল ইউলাহিয়াকুহ মাদা হায়াতি) এবং কখনো এ কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না।'[২২]

১৯৯০ সালের ২৮ ডিসেম্বর দ্য টাইমস অব লন্ডনে 'Why I have Embraced Islam' শীর্ষক রুশদির একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে রুশদি লিখেন, 'আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, আমি কখনো একজন ধর্মবিশ্বাসী হিসেবে বড় হইনি এবং আমি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছি ... তা ব্যাপকার্থে ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত ছিল' অত:পর তিনি বলেন, বড়দিনের প্রাক্কালে তিনি ছয়জন মুসলিম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বৈঠকটি ছিল সহৃদয়তা, সমঝোতা ও সহনশীলতার বিজয়।' রুশদি আরো বলেন, 'এটি আমার লেখা গ্রন্থের অস্বীকৃতি ছিল না; বরং তা ছিল সহজ সত্য এবং এভাবে বিষয়টি গ্রহণ করায় আমি খুশি হয়েছি।'

এরপর তিনি বলেন, 'এতো কিছুর পরও স্যাটানিক ভার্সেস একটি উপন্যাস এবং এর পাঠকদের অনেকে এতে মূল্যবান কিছু দেখতে পেয়েছেন। আমি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমার বিশ্বাস বইটি অবশ্য সহজে হাতে পাবার সুযোগ থাকবে, যাতে ক্রমান্বয়ে বইটি যেমন ঠিক তেমনিভাবে মূল্যায়িত হতে পারে।[১]

১৯৯১ সালের ৭ জানুয়ারি আমেরিকান ম্যাগাজিন Newsweek লিখেছিল যে, ১৯৮৯ সালে সালমান রুশদি ঘোষণা করেন, "আমি মুসলমান নই।" পরে গত সপ্তাহে বড়দিনের প্রাক্কালে ইংল্যান্ডে ইসলামি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে রুশদি প্রকাশ্যে জোরালো ভাষায় বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সা: তাঁর রাসূল।

www.pathagar.com

আমরা দেখতে পেয়েছি যে, রুশদির বিবৃতিতে তার উপন্যাসের ধর্মাবমাননার বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়নি। রুশদির বিবৃতিতে অব্যাহত অস্পষ্টতা এবং তার কথা ও আচরণের মধ্যে অসঙ্গতির বিষয়-তার এ ঘটনার যে কোন মূল্যায়নে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য দানের ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি; তবে রুশদি সুস্পষ্ট-ভাষায় অনুশোচনা প্রকাশ এবং ধর্মাবমাননাকর গ্রন্থের পক্ষ সমর্থন ও যুক্তিদান বন্ধ এবং অনুরূপ মনোভাব পোষণের আভাস প্রদান করলেই; কেবল প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যেতে পারতো। বইটির প্রতি রুশদির অব্যাহত সমর্থন ব্যক্ত করা, তার অর্থনৈতিক লাভ বা সঠিক বলে নৈতিক দাবি পেশের প্রেক্ষাপটে নিছক মৌখিক ঘোষণায় তার বিরুদ্ধে আনীত ধর্মাবমাননার অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে কিনা, তা যদি কেবল পদ্ধতিগত অগ্রাধিকারের প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে; সুযোগ্য বিচারক আদালতের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হবে। যে আদালতে এ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে, তার অবশ্যই পূর্ণ বিচারিক ক্ষমতা থাকতে হবে এবং একটি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে সক্ষম হবে সে আদালত। এখানে কোন বাধ্যতামূলক নির্দেশ মানতে হবে না- জেনে বুঝেই রুশদি বিবৃতিগুলো প্রদান করেছেন এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাকে তার কৃতকর্মের জন্য পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে; তখনই তিনি আরেকটি বিবৃতি প্রদান করেন।

www.pathagar.com

টীকা

১. এ ঘটনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে Lisa Appignanesi ও Sara Maitland এর রুশদি সম্পর্কিত সংবাদপত্রের পর্যালোচনা, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহের সংকলন The Rushdie File; রাফাত এম আহমদের আয়াত শায়তানিয়া : নাকদ কিতাব সালমান রুশদি, পৃষ্ঠা, ৮২; খারুফা'র হুকম আল ইসলাম ফি জারাইম সালমান রুশদি, পৃষ্ঠা, ১৩; শাব্বির আখতার, Be Careful with Muhammad : The Salman Rushdie Affair. শেষ তিনটি গ্রন্থ ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে জীবনপঞ্জি দেখুন।

২. Appegnanesi এর উদ্ধৃতি The Rushdie File, পৃষ্ঠা, ৬৫।

৩. একই গ্রন্থের উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা, ২৭।

৪. আখতার, Be Careful with Muhammad পৃষ্ঠা, ১২৯; Appignanesi, The Rushdie File পৃষ্ঠা ২২।

৫. উভয়টি Appignanesi' র উদ্ধৃতি, The Rushdie File, পৃষ্ঠা, ২৫০।

৬. এম এএইচ ফারুকি, 'Sacrilege, Literary but Filthy : The Satanic Verses', Impact International, ২৮ অক্টোবর-১৩ নভেম্বর, ১৯৮৮।

৭. Appignanesi, The Rushdie File, পৃষ্ঠা, ২৩৫-৩৬।

৮. প্রথম পৃষ্ঠার নিবন্ধ, 'Battle of the Book', Newsweek, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, আহমদ, আয়াত শায়তানিয়া, পৃষ্ঠা, ৮৪।

৯. একই গ্রন্থ।

১০. Appignanesi'র উদ্ধৃতি, The Rushdie File পৃষ্ঠা, ৯১।

১৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১১২ ও ১১৯।

১৪. Appignansi'র উদ্ধৃত, The Rushdie File's পৃষ্ঠা, ১৩৯।

১৫. খারুফার বিবৃতির বিবরণ, হুকম আল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১১১-১৩, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দেখতে পড়ুন, আহমদ, আয়াত শায়তানিয়া, পৃষ্ঠা, ১১২।

১৬. খারুফার উদ্ধৃতি, হুকম আল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১১৪-১৫।

১৭. আখতার, Be Careful with Muhammad, পৃষ্ঠা, ৬।

১৮. Appignanesi and Maitland এর উদ্ধৃতি, The Rushdie File, পৃষ্ঠা, ১৪০।

১৯. Globe and Mail, টরেন্টো, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯।

২০. খারুফা, হুকম আল ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১০৫।

২১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১০৭।

২২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১০৬-১০৯।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

'আব্দুল্লাহ আব্দুল গনি বাসিউনি (Basyuni), নাজারাইয়াত আল-দৌলাহ ফিল-ইসলাম, বৈরুত : আল দার আল-জামিয়াহ, ১৯৮৬।

'আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ ফু'য়াদ, মু'জাম আল-মুফাহরাস লি-আলফাজ, আল কুরআনুল করিম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল ফিকর লিল তিবা'হ ওয়াল নশর, ১৪০১/১৯৮১।

'আব্দুল হালিম, রজব মুহাম্মদ, আল-রিদ্দাহ ফি দাও, মাফহুম জাদিদ, কায়রো : দার আল নাহদা আল-'আরাবিয়া, ১৯৮৫।

'আব্দুর রহমান, আ'য়শা, আল কুরআন ওয়াল কাদাইয়াল ইনসান, বৈরুত : দার আল 'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮২।

'আবদুহ, মুহাম্মদ, রিসালাত আল তাওহীদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, কায়রো: দার-আল মানার, ১৯৭৩।

আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, ইংরেজি অনুবাদ আহমদ হাসান, তিন খণ্ড, লাহোর, আশরাফ প্রেস, ১৯৮৪।

আবু হাবিব, সা'দি, দিরাসাহ ফি মিনহাজ আল-ইসলাম আল সিয়াসি, বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাত আল রিসালা, ১৪০৬/১৯৮৫।

আবু সিন্নাহ, আহমদ ফাহমি, 'নাযারিয়াত আল হক', মুহাম্মদ তাওফিক উবাইদা (সম্পাদিত), আল ফিকহ আল ইসলামি কায়রো: মাতাবি আল আহরাম আল তিজারিয়াহ, ১৩৯১/১৯৭১, পৃষ্ঠা, ১৭৫-২৩৫।

আবু সুলায়মান, আব্দুল ওয়াহহাব, 'আল নাযারিয়াত ওয়া'ল কাওয়ায়িদ ফি'ল ফিকহ আল ইসলামি' মাজাল্লাত জামিয়াত আল মালিক আব্দুল আজিজ, ২রা জামাদিউসসানি, ১৩৯৮/ মে, ১৯৭৮।

আবু সুলায়মান, আব্দুল হামিদ : The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Methodology and Thought, Herndon, Va : International Institute of Islamic Thought, ১৯৮৭।

আবু ইউসুফ, ই'য়াকুব ইব্রাহীম, কিতাব আল খারাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো: আল মাতবা'আহ আল-সালাফিয়া, ১৩৫২ / ১৯৩৩।

আবু যাহরা, মুহাম্মাদ, আল জারিমাহ ওয়াল 'উকুবাহ ফি'ল ফিকহ আল ইসলামি, কায়রো : দার আল ফিকর, আল আরাবী, তারিখবিহীন।

তানযিম আল-ইসলাম লিল মুজতামা, কায়রো: মুতবা'আত মুখাইমার, তারিখবিহীন।

উসূল আল ফিকহ, কায়রো : দার আল ফিকর আল আরাবী, ১৩৭৭/১৯৫৮।

আবু হানিফা : হায়াতুহু ওয়া 'আসরুহু আরা'উহু ওয়া ফিকহুহু, কায়রোঃ দার আল ফিকর আল 'আরাবি, ১৩৮৫/১৯৪৭।

তারিখ আল মাযাহিব আল ইসলামিয়া, কায়রো; দার আল ফিকর আল আরাবি, ১৯৭৭।

সেলাংগর সংবিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রশাসন, ১৯৮৯।

তেরেংগানু ইসলাম ধর্ম বিষয়ক সংবিধিবদ্ধ আইন প্রশাসন, ১৯৮৬।

পেরাক সংবিধিবদ্ধ মুসলিম আইন, ১৯৬৫।

মালয়েশিয়ার সেলাংগর সংবিধিবদ্ধ মুসলিম আইন প্রশাসন, ১৯৫২ (এবং যথাক্রমে ১৯৮৩ ও ১৯৯১ সালে এর সংশোধনী)।

আফিফি, মুহাম্মাদ আল সাদিক, আল মুজতামা আল ইসলামি ওয়া উসূল আল হুকম, কায়রো : দার আল-ই'তিসাম, ১৪০০/১৯৮০।

আহমদ, রিফাত সাঈদ, আয়াত শায়তানিয়া : নাকদ কিতাব সালমান রুশদি, কায়রো : আল দার আল শারকিয়া, ১৪০৯/১৯৮৯।

আখতার, শাব্বির, Be Careful with Muhammad; The Salman Rushdie Affair, London: Bellew Publishing ১৯৮৯।

আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, The Holy Quran: Text, Translation and Commentary, জেদ্দা, ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার, তারিখ বিহীন।

আলী, মাওলানা মুহাম্মদ, A Manual of Hadith, লন্ডন : কারজন প্রেস, ১৯৭৭।

আল আলুসি, মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ, রূহ আল মা'নি ফি তাফসির আল কুরআন আল আজিম, দেওবন্দ (ভারত), ইজারাত আল তিবা'হ আল মুস্তাফাইয়াহ, ১৯৭০।

আল আমিদি, সাইফুদ্দিন, আল ইহকাম ফি উসূল আল আহকাম, আব্দুল রাজ্জাক আফিফি সম্পাদিত, বৈরুত : আল মাকতাব আল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২।

আমিন, আহমদ, ফজর আল ইসলাম, চতুর্দশ সংস্করণ, কায়রো : মাকতাবাত আল নাহদাহ আল মিসরিয়া, ১৯৮৬।

আল আনসারি, আব্দুল হামিদ ইসমাইল, আল শূরা ওয়া আশারুহা ফিল দিমুক্রাতিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : আল মাকতাবা আল-'আসরিয়া, ১৪০০/১৯৮০।

Appignanesi and Maitland, The Rushdie File, নিউইয়র্ক : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০।

www.pathagar.com

আল আরাবি, আব্দুল্লাহ, নিজাম আল হুকম ফি'ল ইসলাম, কায়রো; দার আল ফিকর তারিখ বিহীন।

Arnold, Thomas Walker, The Preaching of Islam, লাহোর : শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ প্রেস, ১৯৬১।

আসাদ, মুহাম্মদ, Principles of State and Government in Islam, বার্কলে : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৬।

আল-আস্কালানি, আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার, ফাতহ্ আল-বারী শারহ্ সহিহ আল বুখারি, ফুয়াদ আব্দুল বাকি ও মুহায়উদ্দিন আল খতিব সম্পাদিত, বৈরুত : দার আল মারিফা।

El-Awe মুহাম্মদ সেলিম, On the Political System of the Islamic State, ইন্ডিয়ানাপোলিস, : আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৮০।

ফিল নিজাম আল সিয়াসি লিল,দাওলাহ্ আল ইসলামিয়া, কায়রো : আল মাকতাব আল মিসরি আল হাদিস, পুনঃমুদ্রণ, ১৯৮৩।

'Pluralism in Islam The American Journal of Islamic Social Sciences, ৮(১৯৯১)।

Punishment in Islamic Law, ইন্ডিয়ানাপোলিস : আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৮২।

আওদা, আব্দুল কাদির, আল তাশরি আল জিনাল আল ইসলামি মুকাররানান বিল কানিন আল-ওয়াদি, কায়রো : মাকতাবাত ওয়াহবাহ, ১৪০১/১৯৮১।

আজ্জাম, সালে সম্পাদিত, Universal Islamic Declaration of Human Rights, লন্ডন : ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ, ১৯৮১।

আল বাদাবি, ইসমাঈল, দা'আইম আল হুমক ফিল শরীয়া আল ইসলামিয় ওয়াল নিজুমুল দুস্তুরিয়াহ আল মু'য়াসারাহ, কায়রো : দার আল-ফিকর আল আরবি, ১৪০০/১৯৮০।

আল বাহি, মুহাম্মদ, আলদ্বীন ওয়াল দাওলাহ্ মিন তাবজিহাত আল কুরআন আল করিম, বৈরুত : দার আর ফিকর, ১৩৯১/১৯৭১।

আল ইসলাম ফি মাশাকিল আল মুজতামা'আত আল ইসলামিয়া, কায়রোঃ মাকতাবাদ ওয়াহবাহ, ১৪০১/১৯৮১।

আল বাহনাসাবি, সেলিম, আল হুকম ওয়া কাদিয়াত তাকফির আল-মুসলিম, তৃতীয় সংস্করণ, কুয়েত : দার আল বুহুস আল 'ইলমিইয়া, ১৪০৫/১৯৮৫।

বাহনাসি, আহমদ ফাতহি, আল-জারা'ইম ফি'ল ফিকহ্ আল-ইসলামি; দিরাসা

www.pathagar.com

ফিকহিয়া মুকারানা, পঞ্চম সংস্করণ, বৈরুত : দার আল শুরুক, ১৪০৩/১৯৬৪।

Bailey, David H, Public Liberties in the New States, Chicago : Rand McNally & Co. ১৯৬৪।

আল বানা'লি, আহমদ ইবনে হাজর আল বুতামি, তাহযির আল মুসলিমিন 'আন আল ইবতিদা ওয়াল বিদা ফি'ল দীন, দোহা, কাতার : মাতাবি, 'আলী ইবনে 'আলী, ১৪০২/১৯৮৩।

Barendt, Eric, Freedom of Speech, Oxford : Oxford University press, ১৯৮৫

আল-বায়হাকি, আবু বকর আহমদ ইবনে আল হুসাইন, আল সুনান আল কুবরা, বৈরুত : দার আল ফিকর, তারিখবিহীন।

Bridge, J. W, et al, Fundamental Rights, লন্ডন : সুইট এন্ড ম্যাক্সওয়েল, ১৯৭৩

আল বুহুতি, মানসুর ইবনে ইউনুস ইবনে ইদ্রিস, কাশশাফ আল কিন্না, 'আন মাতন আল ইকনা, রিয়াদঃ মাকতাবাত আল নসর আল হাদিসা, ১৯৬৮।

আল বুখারি, উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (সদর আল-শরী'য়া) আল তাওহিদ ফি হাল গাওয়ামিদ আল তানকিহ, কায়রো : মাকতাবাত দার আল কুতুব, ১৩২৭।

আল বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, জাওয়াহির সহিহ আল বুখারি 'ইজ আল দীন সিরওয়ান সম্পাদিত, বৈরুত : দার আল এহইয়া, ১৪০৭/১৯৮৭।

Chejne, আনোয়ার, G, Succession to the Rule in Islam, লাহোর : শাহ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৬০।

Choon, Lee Min, 'Should there be any Restrictions to the Freedom on Expression?' বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে ১৯৮৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর কুয়ালালমপুরে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক সেমিনারে উপস্থাপিত অপ্রকাশিত নিবন্ধ।

Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, ১৯৭৩।

Cranston, Maurice, What are Human Rights? লন্ডন এণ্ড সিডনি : দ্য বডলি হেড, ১৯৭৩।

আল-দারিনি, ফাতহি আল হক ওয়া-মাদা সুলতান আল দৌলাহ ফি তাকিদিহি, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত : মু'য়াসসাসাত আল রিসালা, ১৪০৪/১৯৮৪।

Dias, R.W. Jurisprudence, চতুর্থ সংস্করণ, লন্ডন Butterworths ১৯৭৬।

Dicey, A. V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, দশম সংস্করণ, লন্ডন : ম্যাকমিলান, ১৯৬৪।

আল দুসুকি, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ 'আরাফাহ, হাশিয়াত আল দাসুকি আলাল শার

www.pathagar.com

আল কাবির লি আবিল বারাকাত সিদি আহমদ আল যারযির, কায়রো: ঈসা আল বাবি আল হালাবি, তারিখবিহীন।

এনায়েত, হামিদ, Modern Islamic Political Thought, লন্ডন : ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮২।

Encyclopedia Americana, International Edition, ড্যান বারি, কানেক্টিকাট, গ্রোলিয়ের ইনকর্পোরেশন, ১৯৯১।

The Encyclopedia of Islam, New edn. লেইডেন : ই,জে, ব্রিল, ১৯৬৫।

The Encyclopedia of Religion, নিউইয়র্ক : ম্যাকমিলান পাবলিশিং কোং, ১৯৮৭

The Encyclopedia of Religion and Ethics, জেমস হেস্টিংস সম্পাদিত, নিউইয়র্ক : টিএন্ডটি ক্লার্ক, ১৯০৮।

ফারুকি, শাদ এস, Law Relating to Press Freedom in Malyasia, ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত অপ্রকাশিত নিবন্ধ।

Federal Constitution of Malysia, ১৯৫৭, (১৯৯০ সালের ২৫ জুন পর্যন্ত) কুয়ালালামপুর : ইন্টারন্যাশনাল বুক সার্ভিসেস, ১৯৯০।

ফিকরি, আলী, আল মু'য়ামালাত আল মাদ্দিয়া ওয়াল আদাবিয়াহ, কায়রো : মুস্ত ফা আল বাবি আল হালাবি, ১৩৬৬/১৯৪৭।

Gardet, Louis, 'God in Islam, The Encyclopedia of Religion, New York, Machillan Publishing Co. 1987.

গাযাবী, মুহাম্মদ সেলিম, আল হুররিয়া আল আম্মাহ ফিল ইসলাম, আলেকজান্দ্রিয়া : মু'য়াস্‌সাসাত শাবাব আল জামিয়া, তারিখবিহীন।

Gibb, H.A.R এম খাদুরি সম্পাদিত 'Constitutinal Organization', Law in the Middle East ওয়াশিংটন ডিসি : মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট, ১৯৫৫।

Goldziher, Ignaz, Introduction to Islamic Theology and Law, Princeton : Princeton University Press, ১৯৮১।

হাম্মাদ, আহমদ জালাল, হুররিয়াত আল রা'ই ফিল মায়েদান আল সিয়াসি, কায়রো : দার আল ওয়াফা লিল তিবা'হ ওয়াল নাশর, ১৪০৮/১৯৮৭।

হাম্মাদ, আহমদ জাকি Al Ghazali's Juristic Treatment of the Shari'ah Rules in Mustafaz' The American journal of Islamic social sciences. চতুর্থ খণ্ড (১৯৮৭)।

www.pathagar.com

হাসান আহমদ, The Doctrine of Ijma in Islam, ইসলামাবাদ : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৪।

Hohfeld, Wesley, Fundamental Legal Conceptions Ceptions, New Haven, ১৯৬৪

Hughes, Thomas P. Dictionary of Islam, পুনমুদ্রিত, লাহোর: বুক হাউজ, তারিখ বিহীন।

হুসাইন, মুহাম্মদ খিযির, আল হুররিয়া ফিল ইসলাম, কায়রো : দার আল ইতিসাম, ১৩২৪/১৯০৬।

রাসাঈল আল ইসলাহ, দুই খণ্ড, কায়রো: দার আল ইসলাহ লিল নাশর ওয়াল তাওউজি, তারিখ বিহীন।

নাকদ কিতাব আল ইসলাম ওয়া উসূল আল হুকম, তিউনিস : মাকতাবাহ আল যায়াতুনিয়াহ, ১৯২৫।

ইবনে আবিদিন, মুহাম্মদ আমিন, হাশিয়াত আল রাদ আল মুখতার আলাল দুর আল মুখতার (হাশিয়াত ইবনে আবিদিন নামে পরিচিত), কায়রো : দার আল ফিকর ১৩৯৯/১৯৭৯ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ কায়রো : মুকতাবাত আল বাবি আল হালাবি, ১৩৮৬/১৯৬৬।

ইবনে হাম্বল, আহমদ, ফিহরিস আহাদিস মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু হাজির যগলুল সংকলিত, বৈরুত : দার আল কুতুব, ১৪০৫/১৯৮৫।

ইবনে হাযম, মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ আল যাহিরি, আল ফিসাল ফি'ল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়াল নিহাল, কায়রো : মাকতাবাত আল সালাম আল আলামিয়া, তারিখবিহীন।

আল মুহাল্লা, কায়রো : ইদারাত আল তিবা'আহ আল মুনিরিয়া, ১৩৫১/১৯৩২।

ইবনে নূজাইম, জায়নুল আবিদিন, আল বাহার আল রা'য়িক শারহ কানজ আল দাকাইক, কায়রো : আল মাকতাবাহ আল'ইলমিয়া, ১৩১১ হি।

ইবনে কাইয়িম, নিম্নে দেখুন, আল জাওযিয়া।

ইবনে হিশাম, আব্দুল মলিক, আল সিরাহ আল নববী, কায়রো : মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবী ১৯৩৬, মিন ইলম আল রাসুল, দ্বিতীয় খণ্ড, কায়রো : আল মাকতুবাহ আল তিজারিয়া, ১৩৫৬/১৯৩৭।

আল বাবি আল হালাবি, ১৯৩৬; কায়রো : দার আল তাহরির, ১৩১৮/১৯২৯।

ইবনে তাইমিয়া, তাকিউদ্দিন, আল সারিম আল মসলুল আলা সাতিম আল রাসূ'ল, মুহাম্মদ মুহায়িউদ্দিন আব্দুল হামিদ সম্পাদিত, বৈরুত : দার আল কিতাব, ১৩৯৮/১৯৭৮

www.pathagar.com

ইকতিদা আল সিরাত আল মুস্তাকিম লি মুখালাফাত আসাব আল জাহিম, নাসির ইবনে আব্দুল করিম আল'আকাল,এর টিকাসহ প্রকাশক বিহীন, ১৪০৪/১৯৮৪। মাজমুয়াত ফতোয়া শায়খ আল ইসলাম ইবনে তাইমিইয়া, আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম সংকলিত, বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাত আল রিসালা, ১৩৯৮ হিঃ মাজমু'য়াত আল রাসাইল ওয়াল মাসাইল, দ্বিতীয় খণ্ড, রিয়াদ : প্রকাশক ও তারিখ বিহীন।

আল সিয়াসাহ আল শরীয়াহ্ ফি ইসলাহ্ আল রা'ই ওয়াল রাইয়াহ্, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল কিতাব আল আরাবি, ১৯৫১।

Public Duties in Islam : The Institution of Hisbah, মুখতার হলান্ড অনূদিত, Leicester : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২।

ইব্রাহীম আহমদ, 'Freedom of Speech and Expression Under the Federal Constitution : Sedition and Contempt of Court' মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট সোসাইটি প্রকাশিত Law Info, ১৯৮৭।

'Principles of an Islamic Constituion and the Constitution of Malaysia, International Islamic University Law Journal, প্রথম খণ্ড, নং ২ (১৯৮৯)।

The Position of Islam in the Constitution of Malaysia', আহমদ ইব্রাহীম et al Readings on Islam in Southeast Asia, সিঙ্গাপুর : ইনস্টিটিউট অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ, ১৯৮৬।

আল ইলি, আব্দুল হাকিম হাসান, আল হুররিয়া আল আম্মাহ, কায়রো : দার আল ফিকর, ১৪০৩/১৯৮৩।

ইমারাহ্, মুহাম্মদ, আল ইসলাম ওয়া হুকুক আল ইনসান : যারুরাত লা হুকুক, কায়রো : দার আল শুরুক, ১৪০৯/১৯৮৯।

Impact International, লন্ডন।

International Institute of Islamic Thought (কায়রো) Conference Report on Pluralism in Islam, American Journal of Islamic Social Sciences, ৮(১৯৯১), পৃষ্ঠা '৩৫৩।

ইসলামিয়াত আল মা'রিফা, আল মা'হাদ আল আলামি লি'ল ফিকর আল ইসলামি, হার্নডন, ভিএ, ১৯৮১।

ইসমাঈল, ইয়াহিয়া, মানহাজ আল সুন্নাহ ফি'ল ইলাকাহ বায়ান আল হাকিম ওয়াল মাহকুম, কায়রো : দার আল ওয়াফা, ১৪০৬/১৯৮৬।

আল জাওযিয়াহ, ইবনে কাইয়িম, ইলাম আল মুওয়াক্কি'ঈন আনরব আল

www.pathagar.com

আলামিন, মুহাম্মদ মনির আল দিমাস্কী সম্পাদিত, কায়রো : ইজারাত আল তিবা'হ আল মুনিরিয়া, তারিখবিহীন।

আল তুরুক আল হুকমিয়াহ ফি'ল সিয়াসাহ আল শরীয়া, মুহাম্মদ জামিল গাজী সম্পাদিত, জেদ্দা : মাতবা'ত আল মাদানি, তারিখ বিহীন, আরো ব্যবহৃত হয়, আল মু'য়াচ্ছাসাহ আল আরাবিয়া প্রকাশিত এর লি'ল তিবাহ ওয়াল নাশর কায়রো সংস্করণ, ১৩৮০/১৯৪৯, এবং দার আল মা'রিফা'র বৈরুত সংস্করণ।

জাদ আল মা'য়াদ ফি হুদা খায়ির আল 'ইবাদ, মক্কা : আল মাতবাহ আল মাক্কিয়াহ, তারিখ বিহীন।

ইগাসাত আল লাহফান মিন মাকায়িদ আল শায়তান, মুহাম্মদ আনোয়ার আল বালতাজি সম্পাদিত, কায়রো : দার আল তুরাদ আল আরাবি, ১৪০৩/১৯৮৩।

আল জাযিরি, আব্দুর রহমান, কিতাব আল ফিকহ আলাল মাযাহিব আল আরবা, বৈরুত : দার আল ফিকর লিল তিবা'হ ওয়াল নাশর, ১৩৯২ হি :

Jennings, Ivor, The Law and the Constitution, পঞ্চম সংস্করণ, লন্ডন : ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন প্রেস, ১৯৫৯।

Joynboll, Th W. Blasphemy; Encyclopedia of Religion and Ethics, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৭২।

আল জুন্দি, মুহাম্মদ, মা'য়ালিম আল নিজাম আল সিয়াসি ফি'ল ইসলাম, কায়রো : দার আল ফিকর, ১৪০৬/১৯৮৬।

কামালি, মুহাম্মদ হাশিম, Principles of Islamic Jurisprudence, সংশোধিত সংস্করণ, Cambridge : The Islamic Text Society, ১৯৯১।

'Have We Neglected the Shariah Law Doctrine of Maslahah?' ইসলামিক স্ট্যাডিজ, ২৭ (১৯৮৮), পৃষ্ঠা, ২৮৭-৩০৪।

'Siyasah Shariyyah or the Policies of Islamic Government,' American Journan of social sciences, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৮৯), পৃষ্ঠা, ৩৯-৮১।

Law in Afghanistan : A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary, Leiden : E. J. Brill, ১৯৮৯।

'The Limits of Power in an Islamic State' ইসলামি স্টাডিজ, ২৮ (১৯৮৯), পৃষ্ঠা, ৩২৩-৩৫৩।

'The Approved and Disapproved Varieties of Ra'y (Personal Opinion) in Islam', American Journae of social sciences, ৭ম খণ্ড (১৯৯০) পৃষ্ঠা, ৩৯-৬৪।

'Freedom of Expression in Islam : An Analysis of Fitnah' American Journae of social scieneas, ১০ম খণ্ড (১৯৯৩), পৃষ্ঠা, ১৭৮-২০১।

'An Analysis of Rights in Islamic Law', American Journae of social scieneas দশম খণ্ড (১৯৯৩), পৃষ্ঠা, ৩৪০-৩৬৭।

আল কাসানি, বাদায়ি আল সানায়ি, কায়রো : মাতবা'য়াত আল ইসতিকামা ১৯৫৬।

খাদুরি, মাজিদ, The Islamic Law of Nations: al Shaybani's Siyar বাল্টিমোর : জন হপকিন্স প্রেস, ১৯৬৬।

আল খাফিফ, শাইখ 'আলী, আল হক ওয়াল যিম্মাহ, কায়রো : মাকতাবাত ওয়াহবাহ, ১৯৪৫।

আল খালিদি, মাহমুদ আব্দুল মযিদ, কাওয়াইদ নিজাম আল হুকম ফিল ইসলাম, কুয়েত : দার আল বুহুস আল 'ইলমিয়া, ১৯৮০।

আল শু'রা, বৈরুত : দার আল জিল, ১৪০৪/১৯৮৪।

খলিল, ইমাদ আল দীন ফি'ল নাকদ আল ইসলামি আল মু'য়াসির, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত : মু'য়াস্‌সাসাত আল রিসালা, ১৪০৪/১৯৮৪।

খাল্লাফ, 'আব্দুল ওয়াহাব, আল সিয়াসাহ আল শরীয়া, কায়রো : আল মাতবা'আহ আল সালাফিয়া ১৩৫০/১৯৭১।

খান, মুহাম্মদ মুহসিন, The Translation of the Meanings of Sahih al Bukhari, লাহোর : কাজী পাবলিকেন্স, ১৯৭৯।

খান, মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ, Human Rights in Islam, লন্ডন; হিগিনসন, ১৯৬৭।

খারুফা, আলা'উদ্দিন, হুকম আল ইসলাম ফি জারাইম সালমান রুশদি, জেদ্দা : দার আল ইসফাহানি লি'ল তিবা'হ, ১৪১০/১৯৮৯।

আল খুদারি, মুহাম্মদ, মুহাদারাত ফি তারিখ আল উমাম আল ইসলামিয়া, কায়রো : আল মাকতাবাহ আল তিজারিইয়া, ১৩৭০/১৯৬৯।

আল কিন্দি, N, The Governors and Judges of Egypt, R. Guest সম্পাদিত, লেইডেন : E. J Brill, ১৯১২।

Lambton, A.K.S, State and Government in Medieval Islam, অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৮১।

লায়লাহ, মুহাম্মদ কামিল, আল নুযুম আল সিয়াসাহ, কায়রো : দার আল ফিকর আল আরাবি, ১৯৬৩।

www.pathagar.com

Little, Lester K. 'Cursing', The Encyclopedia of Religion, নিউইর্য়ক : ম্যাকমিলান পাবলিশিং কোং, ১৯৮৭।

Luca, C, 'Discrimination in the Arab Middle East', Willem A. Veenhoven সম্পাদিত, Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms, প্রথম খণ্ড, দ্য হেগ, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা, ২১১-৪০।

MacDonald, D. B, "Hakk, The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden : E.J Brill.

মাযকুর, মুহাম্মদ, আল কাদা ফি'ল ইসলাম, কায়রো: দার আল নাহ্দাহ্ আল আরাবিয়া, ১৯৬৪।

মাহমাসানি সুবহি, আরকান হুকুক আল ইনসান ফিল ইসলাম, বৈরুত : দার আল ইলম লিল মালাইন, ১৯৭৯।

ইবনে মাজাহ্, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল কাযবিনি, সুনান ইবনে মাজাহ্, ইস্তাম্বুল : কাগরি ইয়বিনলারি, ১৪০১/১৯৮১।

মাজমা, আল লুগাহ্ আল আরাবিয়া, আল মু'জাম আল ওয়াসিত, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো : শরিকাত আল ইলানাত আল শারাকিয়া, ১৪০৫/১৯৮৪।

মাকদিসি, George, 'Magestrium and Academic Freeom in Classical Islam and `Medieval Christanity, Nicolas Heer সম্পাদিত, Islamic Law and Jurisprudence, সিয়াটল : ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৯০।

Malayan Law Journal, Kuala Lumpur, Malaysia, আল মাকদিসি, মুয়াফাক আল দীন ইবনে কুদামাহ্, আল মুগনি, রিয়াদ: মাকতাবাত আল-রিয়াদ আল হাদিসা, ১৪০১/১৯৮১।

আল মাকদিসি, শামসুদ্দীন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাফলাহ্ আল হাম্বলি, আল আদাব আল শরীয়া ওয়াল মিনাহ্ আল মারিফা, কায়রো : মাকতাবাত আল মানার, ১৩৪৮ হিঃ।

মওদুদি, এস, আবুল আলা, Islamic Law and Constitution, লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি :, পুনমুদ্রিত, ১৯৭৯।

আল হুকুমা আল ইসলামিয়া, আহমেদ ইদ্রিস অনূদিত, প্রকাশকবিহীন, আল মুখতার আল ইসলামী, ১৯৭৭।

আল মাওয়ারদি, আবুল হাসান, কিতাব আল আহকাম আল সুলতানিয়া, কায়রো: মাতবা'আত আল সা'দাহ, ১৩২৭/১৯০৯।

আল মাওসুয়াহ আল ফিকিয়াহ্, কুয়েত : উইজারাত আল আওকাফ ওয়াল শু'উন আল ইসলামিয়া, ১৪০৫/১৯২৪।

www.pathagar.com

Mayer, Ann Elizabeth, 'Law and Religion in Muslim Middle East', The American Journal of Comparative Law, ৩৫(১৯৮৭), পৃষ্ঠা, ১৩৫-৮৪।

Islam and Human Rights, Boulder, কলোরাডো : ওয়েস্টার্নভিউ প্রেস, ১৯৯১।

আল মিসরি, আদনান দারবিশ, আল কুল্লিয়াতঃ মু'জাম ফি'ল মুস্তালাহাত ওয়াল ফুরুক আল লুগাবিয়া, দামেস্ক : উজারত আল ইরশাদ, ১৯৭৪।

Montgomery-Watt, W, Islamic Political Thought : the Basic Concepts, Edinburgh : Edinburgh University Press, ১৯৬৮।

আল মুবারকপুরি, সাই আল রহমান, আল আহযাব, আল সিয়াসিয়াহ্ ফি'ল ইসলাম আল জামিয়া আল সালাফিয়াহ্, ভারত, ১৪০৭/১৯৮৭।

মুনাইমিনাহ, জামিল, মুশকিলাত আল হুররিয়া ফি'ল ইসলাম, বৈরুত : দার আল কি'তাব আল লুবনানি ,১৯৭৪।

মুনির, মুহাম্মদ, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan : Being a Commentary of the Constitution of Pakislan, 1973, লাহোর : ল পাবলিশিং কোং, ১৯৭৫।

Murphy, Jeffrie G. An Introduction to Jurisprudence, Totowa, New Jersey : Rownan & Allenheld, ১৯৮৪।

মুসা, মুহাম্মদ ইউসুফ, আল ফিকহ্ আল ইসলামি, কায়রো : দার আল কুতুব আল হাদিসা, ১৩৭৪/১৯৫৪।

মুসলিম, ইবনে আল হাজ্জাজ আল নিশাপুরি, মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল আশকানি সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল মক্তব আল ইসলামি, ১৪০৪/১৯৮৪।

মুতাহারি, মুর্তাজা, 'Islam and the Freedom of Thought and Belief', আলী হোসাইন আল তাওহীদ অনুদিত, আল তাওহীদ, একাদশ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা, ১৪৩-৬৩, ১৪১২ হি :।

মুতাওয়াল্লি, আব্দুল হামিদ, মাবাদি নিযাম আল হুকুম ফি'ল ইসলাম, আলেকজান্দ্রিয়া, মানশা'য়াত আল মা'রিফ, ১৯৭৪।

আল নাবাহান, মুহাম্মাদ ফারুক, নিজাম আল হুকম ফি'ল ইসলাম, কুয়েত : জামিয়াত আল কুয়েত, ১৯৭৪, এছাড়া মুয়াস্‌সাসাত আল রিসালাহ্য প্রকাশিত বইটির বৈরুত সংস্করণ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আল-নাবহানী শায়েখ তাকিউদ্দীন, মুকাদ্দিমাত আল দাস্তুর, কুয়েত, প্রকাশকবিহীন, ১৯৬৪।

www.pathagar.com

নাদওয়াত আল রিয়াদঃ নাদওয়াহ ইলমিইয়া হাওল আল শারীয়া আল ইসলামিয়া ওয়া হুকুক আল ইনসান ফি'ল ইসলাম, বৈরুত : দার আল কিতাব আল লুবনানি, ১৯৭৩।

নাহবী, আদনান আলীরিদা, মালামিহ আল শূরা ফি'ল দাওয়া আল ইসলামিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, রিয়াদ, ১৯৮৪।

আল নববী, মুহাইলুদ্দীন, রিয়াদুসসালেহীন, মুহাম্মাদ নাসির আল্লীন আলবানি কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল মাকতাব আল ইসলামী, ১৪০৪/১৯৮৪।

New Straits Times, কুয়ালালামপুর, Newsweek, C.A.O. The Lifestyles of Islam, Leiden : E. J. Brill, ১৯৮৫।

The Pakistan Penal Code, ১৮৬০ (১৯৯১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত ,লাহোরঃ পিএলডি পাবলিশার্স, ১৯৯১।

Penal Code of Malaysia (Straits Settlement Ordinance No iv of 1871).

Printing Presses and Publications Act of Malaysia (Act 301), ১৯৮৪ ।

কানুন আল 'উকবাত আল মিসরি (মিসরীয় দণ্ডবিধি)।

আল কারাফি, শিহাবুদ্দীন, কিতাব আল ফুরুক, কায়রো : মাতবা'আত দার ইহইয়া, আল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৩৪৬ হিঃ।

আল ইহকাম ফি তামাইয আল ফতোয়া 'আন আল আহকাম ওয়া তাসাররুফাত আল কাজী ওয়াল ইমাম, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গাদ্দাহ সম্পাদিত, আলেপ্পো : মাকতাব আল মাতবু'আত আল ইসলামিয়া, ১৩৮৭/১৯৬৭।

আল কাসিমি, জাফির, নিজাম আল হুকম ফিল শরীয়া ওয়াল তারিখ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল নাফাইস, ১৯৭৭।

আল কুরতুবি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, আল জামি লিআহকাম আল কুর'আন (তাফসিরে কুরতুবি বলে পরিচিত) কায়রো : মাতবা'আত দার আল কুতুব, ১৩৮৭/১৯৬৭।

আল কুরতুবি, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ, বিদ'আত আল মুজতাহিদ ওয়া নিহাইয়াত আল মুকতাসিদ, পঞ্চম সংস্করণ, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, ১৪০১/১৯৮১।

রহমান, ফজলুর, ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিকাগো ও লন্ডন : ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৭৯।

রহমান, এস,এ, The Punishment of Apostasy in Islam, দ্বিতীয় সংস্করণ,

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট অভ্ ইসলামিক কালচার, লাহোর ১৯৭৮।

রহমান, তানজিলুর, Essays on Islam, লাহোর : ইসলামিক পাবিলিকেশন্স, ১৯৮৮।

ইসলামি কানুন-ই-ইরতিদাদ, লাহোর : কানুনী কুতুবখানা, তারিখবিহীন।

রমাযান, সাঈদ, Islamic Law : its Scope and Equity, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বিহীন, ১৯৭১।

রিদা, মুহাম্মদ রশিদ, তাফসির আল কুরআনুল হাকীম, (তাফসিরে মানার বলে পরিচিত), বৈরুত : দার আল মা'রিফা, ১৩২৮।

তারিখ আল উস্তাদ আল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহ, কায়রো : মাতবা'আত আল মানার, ১৩২৪/১৯০৪।

আল সাবিক, সাঈদ, 'আনাসুর আল কু'ওয়াহ ফি'ল ইসলাম, কায়রো: মাকতাবাত ওয়াহবাহ, ১৩৮/১৯৮৩।

আল সাবুনি, আব্দুর রহমান, মাহদারাত ফিল শরীয়া আল ইসলামিয়া, প্রকাশকবিহীন, ১৩৯২/১৯৭২।

সাফওয়াত, সাফিয়া, 'Islamic Laws in the Sudan' আজিজ আল আজমেহ সম্পাদিত, Islamic Law: Social and Histrical Contexts, লন্ডন ও নিউইর্য়ক : Routledge, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা, ২৩১-৪৯।

আল সামারা'ই, আব্দুর রাজ্জাক নূমান, আহকাম আল মুরতাদ ফিল শরীয়া আল ইসলামিয়া, বৈরুত : দার আল আরাবিয়া লিল তিবা'আহ ওয়াল-নাশর, তারিখবিহীন।

সাঈদ আব্দুল আজিজ, Precepts and practice of Human Rights, in Islam, Universal Human Rights, vol-1, নং-১ (জানুয়ারি : ১৯৭৯)।

আল সানহুরি, আব্দুল রাজ্জাক, মাসাদির আল হক ফি'ল ফিকহ্ আল ইসলামি, কায়রো : মাহাদ আল দিরাসাত আল আরাবিয়া আল আলিয়া, ১৯৫৬।

আল সারাখসি, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, আল মাবসুত, কায়রো : মাতবা'আত আল সা'দাহ, ১৩২৪ হি; এবং বৈরুত : দার আল মারিফা, ১৪০৬/১৯৮৬।

সরদার, জিয়াউদ্দিন, The Future of Muslim Civilisation, লন্ডন : Croom Helm ১৯৭৯।

Schacht, Joseph, 'Law and Justice', P.M. Holt সম্পাদিত The Cambridge History of Islam, কেম্ব্রিজ : কেম্ব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৭১।

আল শাহরিস্তানি, আবুল ফাতহ মুহাম্মদ, আল মিলাল ওয়াল নিহাল, আব্দুল

www.pathagar.com

আজিজ মুহাম্মদ আল ওয়াকিল সম্পাদিত, কায়রো : মু'য়াস্‌সাসাত আল হালাবি, ১৩৭৮/১৯৬৮।

কিতাব আল মুসারা'আত আল ফালাসিফাহ, এস এম মুখতার সম্পাদিত, কায়রো: ১৯৭৬।

শাকির, আল শায়েখ আহমদ (সম্পাদিত) ফাহারিস সুনান আল তিরমিযি, বৈরুত : দার আল কুতুব আল 'ইলমিইয়া, ১৪০৭/১৯৮৭।

শালতুত, মাহমুদ, মিন তাওজিহাত আল কুরআনুল করিম, কুয়েত : মাতাবি দার আল কালাম, তারিখবিহীন।

আল ইসলাম আকিদা ওয়া শারীয়া, কুয়েত : মাতাবি দার আল কালাম, তারিখ বিহীন।

আল শারাবাসি, আহমদ, মিন আল আদাব আল নববিইয়াহ, কায়রো: মাতাবি আল আহরাম, ১৯৭১।

আল শারানি, আব্দুল ওয়াহাব, কিতাব আল মিযান, কায়রো : আল মাতবা'আহ আল হুসাইনিয়া, ১৩২৯ হিঃ এবং বৈরুত : দার আল ফিকর, ১৪০১/১৯৮১।

আল শারবিনি, মুহাম্মদ আল খতিব, মুগনি আল মুহতাজ ইলা মারিফাত মা'য়ানি আলফাজ আল মিনহাজ, কায়রো : দার আল ফিকর, তারিখবিহীন।

Shari'ah Crimincal Code Enactment of Kelantan, মালয়েশিয়া, ১৯
Shari'ah Criminal Code Enactnent of Kedah. মালয়েশিয়া, ১৯৮৮।

আল শাতিবি, আবু ইসহাক ইব্রাহীম, আল মুওয়াফাকা ফি উসূল আল আহকাম, মুহাম্মদ খিযর আল হুসাইনের মন্তব্যসহ, কায়রো : আল মাতবা'আহ আল সালাফিইয়া, ১৩৪১ হি।

আল ই'তিসাম, কায়রো : মাতবা'আত আল মানার, ১৩৩২/১৯১৪, এবং বৈরুত: দার আল মারিফা, ১৪০২/১৯৮২।

আল শাওকানি, ইয়াহিয়া ইবনে আলী, ইরশাদ আল ফুহুল মিন তাহকিক আল হক ইলা'ইলম আল-উসূল, কায়রো : দার আল ফিকর, তারিখবিহীন, এবং কায়রো : দার আল হাদিস, ১৪১৩/১৯৯৩।

নায়েল আল আওতার, শারহ মুন্তাকা'ল আখবার, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, তারিখবিহীন।

আল সিবা'ই, মুস্তাফা, ইশতিরাকিয়াত আল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেস্ক : দার আল কাওমিইয়া তিবা'হ ওয়াল নশর, ১৩৭৯/১৯৬০।

Siegman, Henry, 'The State and the Individual in Sunni Islam', The Muslim

www.pathagar.com

world, ৫৪(১৯৬৪), পৃষ্ঠা, ২৩০।

আল সিরওয়ান, 'ইয্য আল-দীন আব্দুল আজিজ সম্পাদিত, জাওয়াহির সহিহ আল বুখারী, বৈরুত : দার ইহইয়া আল উলুম, ১৪০৭/১৯৮৭।

The Star, মালয়েশিয়া।

Stoljar, Samuel. J, An Analysis of Rights, Wiltshire : দ্যা ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮৪।

Street, Harry, Freedom of Individual and the law, Bristol: Migibbon & kee, ১৯৬৭।

আল সুবকি, তাজুদ্দীন, আব্দুল ওয়াহাব, আল আশবাহ ও'য়াল নাজাইর, আদিল 'আব্দ আল মাওজুদ সম্পাদিত, বৈরুত : দার আল কুতুব আল ইলমিইয়া, ১৪১১/১৯৯১।

আল সুয়্যুতি, জালালুদ্দীন, আল জামি আল সগির, চতুর্থ সংস্করণ, কায়রোঃ মুস্ত াফা আল বাবি আল হালাবি, ১৯৫৪।

আল তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জারির, তাফসির আল তাবারি, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, ১৯৬৮।

আল তাবরিজি, আব্দুল্লাহ আল খতিব, মিশকাত আল মাসাবিহ, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানি সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : মক্তব আল ইসলামি, ১৩৯৯/১৯৭৯।

The Times, London.

আল তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মদ, সুনান আল তিরমিযি, ইস্তাম্বুল : কাগরি ইয়াইনলারি, ১৯৮১, এবং বৈরুত : দার আল ফিকর, ১৪০০/১৯৮০।

তুফ্ফাহা, আহমদ যাকি, মাসাদির আল তাশরি আল ইসলামি ওয়া কাওয়ায়িদ আল সুলুক আল আম্মাহ, বৈরুত : দার আল কিতাব আল লুবনানি, ১৪০৫/১৯৮৫।

Tyser, C.R, The Mejelle : Being an English Translation of Majallah' el-Ahkam el-Adliya, লাহোর : ল পাবলিশিং কোং, ১৯৬৭।

Universal Islamic Declaration of Haman Rights, New York : U.N.G.A. তারিখ বিহীন, এবং ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ।

উসমান, 'ফাতহি, আল ফারয ফি'ল মুজতামা আল ইসলামি, কায়রো : শিরকাত মাতাবি আল ইলানাত আল শারকিয়া, ১৩৮২-১৯৬২।

আল হুকুক আল ইনসান বাইন আল শারীয়া আল ইসলামিয়া ওয়াল ফিকর আল কানুনি আল গারবি, বৈরুত : দার আল শুরুক, ১৪০১/১৯৮২।

www.pathagar.com

ওয়াফি, আব্দুল ওয়াহিদ, হুকুক আল ইনসান ফিল ইসলাম, কায়রো : মাতবা'আত আল রিসালা, তারিখবিহীন।

ওয়াজদি, মুহাম্মদ ফরিদ, দাইরাত আল মারিফ কাম আল-'ইশরিন, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল মারিফা, ১৯৭১।

ওয়াসফি, মুস্তাফা কামাল, আল নিজাম আল-দুস্তুরি ফি'ল ইসলাম মুকাররিনান বিল নূজূম আল 'আসরিইয়া, কায়রো : মাকতাবাত ওয়াহবা, ১৯৭৪।

Wehr, Hans, Arabic-English Dictionary, J. M. Cowan সম্পাদিত, নিউইয়র্ক : Spoken Language Services Inc, ১৯৭৬।

আল-ইয়াহসাবি, আল কাযি আবুল ফযল 'আইয়াদ, আল শিফা বিতা'রিফ হুকূক আল মুস্তাফা, আহমদ আল শামানির মন্তব্যসহ, কায়রো : দার আল ফিকর লিল তিরা'আহ ওয়াল নাশর, তারিখবিহীন।

আল-জামাখশারি, জারুল্লাহ্ মাহমুদ, আল কাশশাফ আল হাকাইক আল তানজিল, বৈরুত : দার আল মারিফা, তারিখ বিহীন।

আল জারকা, মুস্তাফা আহমদ, আল মাদখাল আল ফিকহি আল 'আম, তিনখণ্ড দামেস্ক : দার আল ফিকর; ১৯৬৭-৬৮।

আল জাবি, আল তাহির আহমদ (সম্পাদিত) তারতিব আল কামুস আল মুহিত, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল ফিকর, তারিখবিহীন।

যায়েদান, আব্দুল করিম, মাজমু'আত বুহুস ফিকহিইয়া, বাগদাদ : মাকতাবাত আল কুদস, ১৩৯৫/১৯৭৫।

আল ফারদ ওয়াল দাওলা ফিল শারী'আ আল ইসলামিয়া, আল ইত্তিহাদ আল আলামি লিল মুনায্যামাত আল তুল্লাবিইয়াহ, গ্যারি, ইণ্ডিয়ানা, ১৩৯০/১৯৭০।

আল মাদখাল লি দিরাসাত আল শরীয়া আল ইসলামিয়া, বাগদাদ : মুয়াস্সসাত আল রিসালা, ১৪০৫/১৯৮৫।

আল যুহাইলি, ওয়াহবাহ, আল ফিকহ আল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ৮ খণ্ড তৃতীয় সংস্কারণ, দামেস্ক : দার আল ফিকর, ১৪০৯/১৯৮৯।

Gardet, Louis, 'God in Islam', The Encyclopeclia of Religion, নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান পাবলিশিং কোং, ১৯৮৭।

আল গাযালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ, আল মুনকিয মিন আল দালাল, ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, R, J, Mac Carthy, Boston Twayne pubtishers-১৯৮০।

ইহইয়া উলুমুদ্দীন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল ফিকর, ১৪০০/১৯৮০।

কিতাব আদাব আল সুহবাহ ওয়াল মু'য়াশারাহ মা'আহ আসনাফ আল খালক,মুহাম্মদ সাউদ আল মু'ইনি সম্পাদিত, বাগদাদ : মাতব'আত আল 'আনি, ১৯৮৪।

www.pathagar.com

শব্দার্থ

আদালা : উত্তম চরিত্র।

আদাত (মালয়ী) : প্রথা, রসম-রেওয়াজ।

আযাব : শাস্তি।

আযাহল : সবচেয়ে ঘৃণিত, সবচেয়ে অপমানিত- (নিম্নের) যালিল শব্দের উচ্চতম অর্থ।

আদহা বা আদহান : বিরক্তি, অবমাননা, ক্ষতি, অনিষ্ট করা।

আদিল : একজন সৎ ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

আদল : ন্যায়বিচার।

আফাত আল লিসান : বক্তব্যের অনিষ্টতা।

আহাদ : একক বর্ণনাক্রম থেকে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন হাদিস।

আহদ আল যিম্মাহ : নিরাপত্তার চুক্তি, 'যিম্মি'র প্রতি অঙ্গীকার।

আহকাম (একবচন, হুকম) : নীতিমালা, প্রস্তাব, অধ্যাদেশ, ইসলামের স্তম্ভসমূহ, নিম্নে আরো দেখুন, হুকম।

'আহদ আল আদল : ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ সম্প্রদায়, যেমন-সুন্নী, ন্যায়পরায়ণ লোকেরা।

আহল আল বাগি : বিদ্রোহীরা।

আহল আল বায়িত : রাসূল সাঃ-এর পরিবারের একজন সদস্য, পবিত্র কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে রাসূলের (সঃ) পত্নীগণকে বুঝিয়েছে।

আহল আল বিদ'আহ ওয়াল শুবুহাত : নবো উদ্ভাবনী, সন্দেহজনক, মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা।

আহল আল ফাসাদ : দুর্নীতিপরায়ণ।

আহল আল হাদিস : হাদিস এর অনুসারিগণ।

আহল আল হাওয়া : দুষ্ট প্রকৃতির বা অস্থির চিত্তের লোকেরা।

আহল আল কিতাব : শাব্দিকভাবে কিতাবের অনুসারী লোকেরা, যেমন ইহুদি ও খৃস্টান।[১]

আহল আল রা'ই : ব্যক্তিগত সুচিন্তিত অভিমতদাতাগণ।

আহল আল-শূরা পরামর্শ করার যোগ্য ব্যক্তিবর্গ, যাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়।

www.pathagar.com

আহমক	:	নির্বোধ-লোক।
আজম	:	অনারব।
আখ (বহুবচন)		ভাই।
'আলিম	:	বিশেষজ্ঞ, বিদ্বান ব্যক্তি।
আমারাত (একবচন, আমারা)	:	আভাস, লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য।
'আমল	:	কাজ করা, কর্ম।
'আম	:	সাধারণ, বিশেষব্যক্তির বিপরীত।
আনসার	:	সাহায্যকারীরা, মদিনার প্রথম যুগের মুসলমানরা যাঁরা; রাসূল সাঃ ও মক্কা থেকে আসা মুসলমানদের (মুহাজির) সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।
'আকল	:	বুদ্ধি, কারণ।
আসবাব আন-নুযূল	:	কুরআনের একটি আয়াত বা আয়াতসমূহ নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি বা কারণ।
আসবাব আল জাল্লিইয়া	:	স্বতঃসিদ্ধ কারণ।
'আশুরা	:	মহরম মাসের দশমদিন। রাসূল সাঃ-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন রাঃ.এর শাহাদত দিবস হিসেবে দিনটিতে নফল রোযা পালন করা হয়।
আসল আল সিহহা	:	বিনা প্রমাণে বৈধ বলে মেনে নেয়ার মূলনীতি।
আসল আল তাশরি	:	শরীয়ার একটি বিধান।
আল আসমা আল হুসনা	:	আল্লাহতা'আলার অতীব সুন্দর পবিত্র নামসমূহ।
আইয়া (বহুবচন, আয়াত)	:	কুরআনের আয়াত
'আইব	:	অপূর্ণতা, ভুলত্রুটি, লজ্জা।
বাহাতা	:	দুর্নাম করা।
বাগি	:	আইন লংঘন; বিদ্রোহ।
বাই'আ	:	আনুগত্যের অঙ্গীকার।
বিদা'আহ	:	নবোদ্ভাবনী, সাধারণত বৈধ দৃষ্টান্তের বিপরীতে ক্ষতিকর নবোদ্ভাবনী। প্রায় সুন্নাহর বিপরীত হিসেবে বিদ'আহ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
বিদা'আহ দালালা	:	বিভ্রান্তিকর বিদ'আহ।
বিদ'আহ হাকিকিয়া		প্রকৃত, পরিপূর্ণ, সহজাত উদ্ভাবনী।

www.pathagar.com

বিদ'আহ্ হাসানা	:	ভালো উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ ইযাফিয়া	:	আংশিক, অতিরিক্ত, আপেক্ষিক উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ মুস্তাহাসানা	:	কল্যাণকর উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ্ কাবিহা	:	খারাপ (কদাকার) উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ্ শারীইয়া	:	শরীয়া সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ্ তারকিইয়া	:	শরীয়ায় বৈধ কোন বিষয় বর্জন বা পরিত্যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী।
বিদ'আহ্ গায়ের তারকিয়া	:	এমন উদ্ভাবনী যাতে শরীয়ার কোন অংশ বর্জন করা হয়না তবে তা শরীয়ায় কোন অংশ পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটাতে পারে অথবা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির পরিপন্থী কোন নতুন প্রেক্ষপটের অবতারণা করতে পারে।
বির	:	দয়া, সঠিক, আল্লাহভীরু কাজ।
বাগগাত	:	বিদ্রোহীরা।
বাগগাত মুহারিবুন	:	বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী।
বুহতান	:	মিথ্যা অভিযোগ
বারনুস	:	ঢিলা-ঢালা পরিচ্ছদ, ঢাকনাওয়ালা কাপড়-চোপড়।
যালাল	:	ত্রুটি, বিভ্রান্তি, সত্যপথ থেকে বিচ্যুতি।
যারার	:	অনিষ্ট, আহত,ক্ষতি।
যারুরা	:	প্রয়োজনীয়।
যারুরিইয়াত	:	'অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবোধ,' প্রায় জীবনের পাঁচটি মূল্যবোধের বিষয় উল্লেখ করা হয়, তা হলে : ধর্ম বিশ্বাস, মাল সম্পত্তি, বুদ্ধি- বিবেক ও বংশধারা।

'হাজিইয়াত' ও 'তাহসিনিইয়াত' এর বিপরীত বুঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়।

যাওয়াম আল যাহর	:	এ জগতের স্থায়িত্ব।
জাহিল	:	ঘৃণিত বা জঘন্য ব্যক্তি।
যানব (বহুবচন : যুনুব)	:	পাপ, গুনাহ।
যিকর	:	স্মরণ, উচ্চারণ, জপ (আল্লাহর নাম), স্মরণঃ কুরআন ও তার নির্দেশনা উল্লেখ করতে ব্যবহার করা হয়।
যিম্মি	:	মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে স্বাধীন অমুসলিম

www.pathagar.com

		নাগরিক, তারা কর-দানের বিনিময়ে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ভোগ করে থাকেন।
দীন	:	ধর্ম।
দু'আ	:	ভক্তিভরে আবেদন করা, প্রার্থনা, ডাকা, আহবান জানানো।
দু'আ আল খায়ের	:	কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা।
ফাহম ফাসিদ	:	ভুল ধারণা।
ফালাহ	:	সাফল্য/কল্যাণ।
ফকিহ	:	(বহুবচন, ফুকুহা) : আইন বিশেষজ্ঞ।
ফরয 'আইন	:	সুতীব্র ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা। প্রায় ধর্মীয় কর্তব্য বুঝায় যা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ফরয কেফা'য়া	:	সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্মিলিত কর্তব্য বা সমাজের সকল সদস্য নয়, কিছুসংখ্যক পালন করলেই আদায় হয়ে যায়।
ফাসাদ	:	অসারত্ব।
ফাসাদ আল কাসাদ	:	অশুভ ইচ্ছা; খারাপ নিয়ত।
ফাসিক	:	পাপী ব্যক্তি, দুর্নীতিবাজ লোক, ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লংঘনকারী ব্যক্তি, সৎ বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বিপরীত বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
ফতোয়া	:	আইনগত বা ধর্মীয় বিষয়ে কোন সুযোগ্য ব্যক্তি, মুফতি (আইন বিশেষজ্ঞ) বা মুজতাহিদ (ইজতিহাদ করতে সক্ষম ব্যক্তি) কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত, ধর্মীয় অনুশাসন।
ফতোয়া আল সাহাবি	:	রাসূল সাঃ-এর কোন সাহাবীর (শিষ্য) দেয়া সুচিন্তি ত অভিমত।
ফাই'	:	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, গণিমতের মাল।
ফিকহ	:	মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ইসলামী আইন। প্রায়ই শরীয়ার সমার্থক বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শরিয়ত থেকে এর প্রধান পার্থক্য হলো শরীয়ার সঙ্গে কুরআন হাদিসের গভীর

www.pathagar.com

		সম্পর্ক রয়েছে অন্যদিকে ফিকহ প্রধানত ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও আইন বিশারদগণের রচনার সমন্বয়ে গঠিত।
ফিরইয়া	:	অপবাদ দান, কলঙ্ক লেপন, প্রতারণা, মিথ্যা বলা, ইফতিরা'র সমার্থক।
ফিস্ক	:	অমান্য করা, প্রায়ই কুফর বা অস্বীকারের বিপরীত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
ফিস্ক আল-'আমল	:	পাপ কাজ।
ফিতনা, (বহুবচনঃ ফিতান)	:	বিদ্রোহ।
ফিতনা আল শাহাওয়াত	:	নফসের খায়েস পূরণ সংক্রান্ত ফিতনা
ফিতনা আল শুবুহাত	:	সন্দেহজনক ফিতনা।
ফুকাহা	:	দেখুন, ফকিহ
ফুরু	:	আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার বিস্তারিত বিবরণ।
ফুসুক	:	তদন্ত, জঘন্য অপরাধ।
গাযাব	:	রাগ/ক্রোধ।
গাইয়্যা	:	লক্ষ্য অভিমুখী।
গাইবা	:	অদৃশ্য।
গিবা	:	অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা, অপবাদ দেয়া।
গুসল	:	সমস্ত শরীর ধোয়া। যৌন মিলনের পর, মাসিক ঋতুস্রাব শেষে অথবা ধর্মীয় দৃষ্টিতে অবৈধ যৌন সংসর্গের পর এ ধরনের গোসল অত্যাবশ্যক, ফরয।
হাদানা	:	হেফাজতের অধিকার।
হাদ	:	সুনির্দিষ্ট শাস্তি, দেখন, হুদুদ।
হাদিস, (বহুবচনঃ আহাদিস)	:	রাসূল সাঃ-এর বক্তব্য কথা ও শিক্ষা, সুন্নাহর স্থলেও এর পারস্পরিক ব্যবহার দেখা যায়।
হাজ্জ	:	মক্কায় পবিত্র কাবা শরিফে হাজ্জ পালন করা, সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের জন্য জীবনে অন্তত একবার হাজ্জ পালন করা ফরয, অবশ্য করণীয় কাজ।
হাজিয়াত	:	সম্পূরক কল্যাণ, অগ্রাধিকারের দিক থেকে

www.pathagar.com

		যরুরিয়াতের পরেই এর স্থান।
হাজর		কারোর প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা, এক ধরনের সামাজিক বয়কট, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সালামের জবাব না দেয়া, তাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করা এবং তাদের অভিমত অনুমোদন না করার মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে।
আল হাকিম	:	আইনদাতা (আল্লাহ)।
হাকিম	:	শাসক, গভর্ণর, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
হাকিম শার'ই	:	সুযোগ্য বিচারক/কাযী, শরীয়া সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি।
হালাল	:	বৈধ, শরীয়া কর্তৃক অনুমোদিত।
হালাল আল-দাম	:	আইনতঃ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর রক্তপাত বৈধ।
হক	:	সত্য, (বহুবচন, হুকুক) : অধিকারসমূহ।
হক আল্লাহ	:	আল্লাহর অধিকার - সাধারণভাবে জনগণ বা সমাজের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা হয়; ব্যক্তিগত অধিকারের বিপরীত।
হক আল আবদ	:	বান্দার/মানুষের অধিকার
আল হক আল আদামি	:	ব্যক্তিগত অধিকার।
হক আল মু'য়ারাদা	:	সমালোচনার অধিকার।
হারাম	:	সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়।
হারবি	:	যুদ্ধরত দুশমন।
হাসর আসবাব আল তা'জির	:	যথাযথ ক্ষেত্রে তা'জিরের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা।
হাওয়া (বহুবচন, আহওয়া)	:	খেয়ালখুশী, মর্জিমাফিক, অথবা বিভ্রান্তিকর বাতিক যা কাউকে দীনের সঠিক পথ এবং ইসলামের মূলনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।
হিদায়া	:	সঠিক নির্দেশনা।
হিলম	:	ভদ্রতা, ধৈর্য্য।
হিরাবা	:	চরম বিশ্বাসঘাতকতা।
হিসবাহ	:	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমর বিল মারুফ ওয়াল নাহি আন আল মুনকার)। এটি মুসলিম সমাজের একটি সম্মিলিত অপরিহার্য কর্তব্য

www.pathagar.com

(ফরযে কেফায়া), হিসবাহ'র ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে ইতিবাচক অবস্থান-গ্রহণ করতে হবে এবং যখনই প্রয়োজন হবে তা কার্যকর করতে হবে।

হিযব : (বহুবচন, আহযাব); গ্রুপ, শ্রেণী, দল।

হুদা : পথনির্দেশনা, বিশেষতঃ খোদায়ী নির্দেশনা।

হুদুদ : (একবচন, হাদ), সুনির্দিষ্ট শাস্তি যা ব্যাভিচার ও অমার্জনীয় চুরিসহ মুষ্টিমেয় কয়েকটি অপরাধের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হুকুম, (বহুবচন, আহকাম): আইন, আদালতের নির্দেশ অথবা শরীয়ার মূল্যবোধ যার মাধ্যমে বৈধ দায়দায়িত্ব পালনে সক্ষম যোগ্য ব্যক্তিবর্গের আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

হুকুম শার'ই : আইনগত রায়, শরীয়ার নির্দেশ।

হুকুম তাকলিক : নির্দিষ্টকরণ আইন।

হুকুম ওয়াদি : ঘোষণামূলক আইন।

হুকুম সাইয়ারাক/হুকুম সাইয়ারা (মালয়ী) : হুকম শার'ই।

হুররিয়া : স্বাধীনতা।

হুররিয়া দীনিয়া : ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা।

হুররিয়া ইজতিমাইয়া : সামাজিক স্বাধীনতা।

হুররিয়াত আল মুয়া'রাদা : সমালোচনার স্বাধীনতা।

হুররিয়াত নাকদ আল হাকিম : গভর্নর অথবা সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনার স্বাধীনতা।

হুররিয়াত আল কাউল : বাক স্বাধীনতা।

হুররিয়াত আল রা'ই : মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

হুররিয়াত আলরা'ই আল সিয়াসি : রাজনৈতিক ব্যাপারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

হুসনাল-খুলক : উত্তম চরিত্র।

ইবাদা : ইবাদত বন্দেগী, ধর্মীয় কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন।

ইবাদত : ইবাদত বন্দেগীর বিষয়, আনুষ্ঠানিক ইবাদত, প্রায়ই আবশ্যকীয় ধর্মীয় কর্তব্য যেমন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত দান ও রমযানে রোযা পালন। প্রায় মু'য়ামালাত-এর বিপরীত অর্থ বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

ইবাহা	:	অনুমোদনযোগ্যতা, মুবাহ'র (অনুমোদনযোগ্য) ক্রিয়া বিশেষ্য যা ওয়াজিব ও মানদুব এর পরবর্তী পাঁচটি ইসলামি মূল্যবোধের মাত্রা বুঝায়।
ইফতিরা	:	কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, কলঙ্ক রটনা।
ইফতিতান আল নিসা	:	সৎগুণ, চমৎকারিত্ব, বদান্যতা।
ইহ্তিকার	:	মজুদ রাখা।
ই'জাব	:	স্বীয় বাসনা পূরণ, আত্মতুষ্টি, আত্ম অহঙ্কার
ইজমা'	:	আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ফকিহ ও আইন বিশারদগণের মধ্যে সাধারণ মতৈক্য। একে প্রায় ইখতিলাফ এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়।
ইজতিহাদ বি'ল রা'ই	:	সুচিন্তিত ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে গঠিত ইজতিহাদ।
ইখলাস	:	আন্তরিকতা, নিষ্ঠা।
ইখতিলাফ	:	মতপার্থক্য, ভিন্ন মত, প্রায়ই ইজমা'র বিপরীত বুঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, বাদানুবাদ।
ইখতিলাফ আল তাদাদ	:	ব্যাপক মতপার্থক্য, যা পরস্পর বিরোধী বুঝিয়ে থাকে।
ইখতিলাফ আল তানাববু	:	খুটিনাটি বা সামান্য মতপার্থক্য।
ইখতিলাফ ফি'ল রা'ই	:	মতপার্থক্য, ভিন্নমত।
ইখতিসাস	:	একান্তভাবে গচ্ছিত অর্থ।
ইখতিসাস হাজিয	:	বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ।
ইল্লাহ	:	কারণ
ইলম	:	জ্ঞান, বিজ্ঞান।
ইলম আল ইখতিলাফ	:	মতপার্থক্যের বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা।
ইমাম	:	নেতা। সাধারণত: মাযহাবের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ, কোন নেতৃস্থানীয় আলেম, মসজিদে নামাযের ইমামতি করা ও রাষ্ট্রপ্রধানকে বুঝানো হয়।
ঈমান		ধর্ম বিশ্বাস, কথার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের বিষয় জানানো, যার মাধ্যমে ইসলামকে অন্তরে বিশ্বাস করাও বুঝায়।

www.pathagar.com

ইম্মা'আহ	:	দুর্বল চরিত্রের লোক, যে সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
ইনকিদা' আল হক	:	অধিকার হরণ।
ইকামাহ	:	জামায়াতে নামাযের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আহবাণ।
'ইরাদ	:	পরিত্যাগ, বর্জন করা, আরো দেখুন, হাজর।
'ইরদ	:	মর্যাদা
'ইশা	:	বাদমাগরিব, রাত।
'ইসমা	:	সম্মান, অব্যাহতিদান, নিরাপত্তা।
ইসনাদ	:	হাদিস বর্ণনার ধারাক্রম।
ইস্তিবদাদ বি'ল রা'ই	:	অন্যদের ওপর ব্যক্তিগত অভিমত চাপিয়ে দেয়া।
ইস্তিফা আল-হাক	:	অধিকার পূরণ।
ইস্তিহসান	:	ভালকিছু ধারণা করা, আইন সংক্রান্ত অগ্রাধিকার, শরীয়ার সাধারণ লক্ষ্যের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সম্ভাব্য দুই বা ততোধিক সমাধানের একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
ইস্তিহছার	:	তাচ্ছিল্য করা, ঘৃণা করা।
ইস্তি'মাল আল-হাক	:	কোন অধিকারের প্রয়োগ।
ইস্তিশাব	:	ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে বলে মনে করা।
ইস্তিস্লা	:	জনস্বার্থ বিবেচনা। দেখুন, মাসলাহা, কারণ এ দুটি পরিভাষা সমার্থক।
ইস্তিতাবা	:	কোন ব্যক্তিকে তাওবা বা অনুশোচনা করার জন্য আহবাণ জানানো।
আল ই'তিবার আল মুনাসিব	:	পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে কোনটি সঠিক তা বিবেচনা করা।
ই'তিদা	:	অন্যের অধিকার লঙ্ঘন, আল তা'য়াদ্দির সমার্থক।
ইযালাত আল মুনকার	:	পাপের অপনোদন।
আল-জাবর ওয়া'ল ইখতিয়ার	:	পূর্বনির্ধারিত বিষয় ও স্বাধীন ইচ্ছা।
জাদাল	:	তর্কবিতর্ক, যুক্তি, আলোচনা।
জাহল	:	অজ্ঞতা।
জাহিল	:	অজ্ঞ ব্যক্তি।

জামা'আহ	:	বহুসংখ্যক, গ্রুপ, সমাজ।
জান্নাহ	:	বাগান, বেহেশত।
জারহ আল-শুহূদ	:	বাতিল সাক্ষ্য, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অকার্যকর ঘোষণা করা।
জাহর বি'ল সু'	:	প্রকাশ্যে খারাপ কথা উচ্চারণ করা, ক্ষতিকর বা বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য।
জিদাল	:	দেখুন, জাদাল।
জিহাদ	:	সংগ্রাম করা, নৈতিক দৃষ্টিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা এবং বাহ্য দৃষ্টিতে মহৎ উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম করাও জিহাদ।
জিযইয়া	:	অমুসলিমদের ওপর আরোপিত ইসলামি কর।
জুহদ	:	সামান্য মতপার্থক্যের কারণে অন্যদের মতামত ও আচরণের সত্যতা অস্বীকার করা।
আল কাবা'ইর	:	বড় ধরনের পাপ কাজ/গুনাহ।
কাফা'হ	:	পর্যাপ্ততা, সমতা, উদাহরণ হল- বিবাহের ক্ষেত্রে বর-কনে।
কাফফারা	:	জরিমানা।
কাফির	:	অবিশ্বাসী, নাস্তিক।
কাহিন	:	গণক।
কালাম	:	বক্তব্য, আশ'আরী ও মু'তাযিলার মতো ধর্মীয় গোষ্ঠী উদ্ভাবিত ইসলামের দার্শনিক তত্ত্ব।
কালিমা খাবিসা	:	কুকথা, খারাপ বক্তব্য।
কালিমা তাইয়েবা	:	ভাল কথা, উত্তম বক্তব্য।
কালিমাত আল শাহাদাহ	:	ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য দানঃ যেমন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাঃ তাঁর রাসূল।'
কাসরা আল সু'য়াল	:	অতিরিক্ত প্রশ্ন করা।
কাতিব	:	নকল নবিশ।
খলিফা	:	খলিফা, প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী।
খালওয়াহ	:	অবৈধ মেলামেশা, নারী পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা,

www.pathagar.com

একান্তে দেখা সাক্ষাৎ।

খায়ের : যা ভাল বা উত্তম, ভাল কাজ, কল্যাণ।

আল খুলাফা আল রাশিদূন : খলিফাবৃন্দ, রাসূল সাঃ-এর ওফাতের পর প্রথম চারজন খলিফা বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তারা হলেন-আবু বকর সিদ্দিক (মৃত্যু : ১২ হিঃ/৬৩৪ খৃ.) 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (মৃত্যু : ২৬ হি./৬৪৩ খৃ.), উসমান ইবনে আফফান (মৃত্যু " ৩৫/৬৫৬) এবং আলী ইবনে আবি তালিব, মৃত্যু : ৪০/৬৬১)। তারা মোট ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

খুসুমাহ : যুক্তি, বিরোধ, বিতর্ক।

কিযব : মিথ্যা কথা, মিথ্যা বলা।

কুফর : শব্দগত অর্থে গোপন করা বা ঢেকে রাখা, কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামকে অস্বীকার করা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, ঈমান ও ইসলামের বিপরীত বুঝাতে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আল-কুফর আল-আকবর : বড় ধরনের কুফরি, যা ঈমান পরিত্যাগ করার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়া বুঝায়।

আল-কুফর দুন আল-কুফরঃ পারিভাষিক অর্থে অবিশ্বাসের চেয়ে অন্যকিছু অবিশ্বাস করা। হালকা কুফরি, যা বড় কুফরির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার। এ ধরনের কুফরি পুরোপুরি বা সরাসরি অস্বীকার বুঝায় না। আচরণের মাত্রা বুঝাতে ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার করা হয় যা মূলত সীমা লঙ্ঘন (ফিস্ক) বুঝায়ে থাকে।

লাগউ : বুদ্ধিহীন কথা, নির্বোধ।

লা'ন বা লা'নাহ : অভিশাপ

মা'য়ানি খফিইয়া : অন্তর্নিহিত অর্থ।

মায : তোষামুদ, মোসাহেবি, প্রশংসা।

মাযহাব (বহুবচনঃ মাযাহিব) : ধর্মীয় বা আইন ঘরানা। চারটি প্রধান সুন্নি মাযহাব (আইনশাস্ত্রগত) : ১। হানাফিইয়া, প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফা আল নূ'মান ইবনে সাবিত (মৃত্যু : ১৫০/৭৬৭), ২। মালিকিইয়া, প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (মৃত্যু : ১৭৯/৭৯৫), ৩।

www.pathagar.com

শাফিইয়া, প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেঈ (মৃত্যু : ২৪১/৮৫৫)।

মাযমুম : তিরস্কারযোগ্য, আপত্তিজনক, দোষণীয়।

মাফহুম আল মুখালাফা : বিভিন্নমুখী সংশ্লিষ্টতা

মাগরিব সূর্যাস্ত, গোধুলীলগ্ন।

মাহর : যৌতুক।

মাহযূর : নিষিদ্ধ, সীমার বাইরে।

মজলিস আল-শূরা : পরামর্শ পরিষদ।

মাজনুন : পাগল।

মাকরুহ : তিরস্কারযোগ্য, আইনত দণ্ডযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও করা দোষণীয়। এটি ইসলামের সুপরিচিত মূল্যমান যাচাইয়ের আলোকে পাঁচটি বিষয়ের অন্যতম যার স্থান মোবাহ'র পরই।

মাল ইয়াসির ক্ষুদ্র পরিমাণ, নগণ্য সাফল্য বা মুনাফা।

মালিকিয়া মালিকানাস্বত্ব, মালিকানার অধিকার।

মানযূব : সৎগুণ, প্রশংসারযোগ্য আচরণবিধি যা অনুসৃত হলে নৈতিক পুরস্কার পাওয়া যায়, তবে কোন ব্যক্তি এ ধরনের পথ অনুসরণ না করলে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে না। এটি মুস্তাহাবের সমার্থকও।

মানসুখ : বাতিল।

আল মানযিলাহ বাইনা'ল মানযিলাতাইন : ইসলাম ও কুফরির মধ্যবর্তী অবস্থান (মু'তাযিলা তত্ত্ব)।

মাকাসিদ আল শরীয়া শরীয়ার উদ্দেশ্য।

মাকবুল : গ্রহণযোগ্য।

মাকযূফ : মিথ্যা অপবাদের শিকার ব্যক্তি।

মাকসিদ (বহুবচন : মাকাসিদ) : লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নিয়ত।

মা'রুফ : শরীয়া ও সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী ভাল। মুনকার বা খারাপের বিপরীত বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

মাসালিহ মুরসালাহ অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থ।

মাসালিহ মু'তাবারা অনুমোদিত স্বার্থ, বিশেষ করে শরীয়ার সুস্পষ্টভাবে

www.pathagar.com

		স্বীকৃত হয়েছে এমন স্বার্থসমূহ।
মাসিইয়া	:	অবাধ্যতা, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, পাপ।
মাসলাহা (বহুবচন, মাসালিহ্)	:	জনগণের কল্যাণ, হিতসাধন বা স্বার্থ সংরক্ষণ, সাধারণত : মাফসাদা খারাপ বা অন্যায়ের বিপরীত বুঝাতে এর ব্যবহার করা হয়। শরীয়ার সকল বিধিবিধানের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সাধারণ কল্যাণ সাধন।
মাসলাহা 'আলিয়া	:	বৃহত্তর উদ্দেশ্য বা স্বার্থ
মাসলাহা মুরসালা	:	জনস্বার্থ বিবেচনা।
মা'সূম	:	অলঙ্ঘনীয়, নিষ্পাপ।
মাওযূ'য়াত	:	জাল বা ভুয়া হাদিস।
মিহনাহ	:	গভীর অনুসন্ধান।
মিরা	:	তিক্ততা, তিক্ত বিতর্কের বিষয়, নেতিবাচক তর্কবিতর্ক।
মুয়াযযিন	:	মুয়ায্যিন, যিনি আযান দেন, নামাযে সামিল হতে মসজিদে আসার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান।
মু'য়ামালাত (একবচন, মু'য়ামালা)	:	নাগরিকদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মেলামেশা বা বাণিজ্যিক লেনদেন। প্রায় 'ইবাদত' বা ধর্মীয় বিষয়ের বিপরীত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
মু'আওয়াল	:	রূপক
মুবাহ (বহুবচন, মুবাহাত)	:	অনুমোদনযোগ্য, নিরপেক্ষ। যে কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে না আবার শাস্তিও হবে না।
মুবতাদি	:	(বহুবচন, মুবতাদিউন) : ধর্মীয় বিষয়ে নবউদ্ভাবক।
আল-মুবতাদি আল 'আমি	:	প্রভাবশালী নয় এমন সাধারণ মানুষ' যে বিদ'আতী কাজের সাথে জড়িত।
মুফারিক লি'ল জামা'আ'হ	:	সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ব্যক্তি।
মুফাসসির (বহুবচন, মুফাসসিরুন)	:	ভাষ্যকার, সাধারণত কোন তাফসির রচয়িতা বা কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি।
মুফসিদ		দুর্নীতির ইন্ধনদাতা।
মুফতি	:	আইন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, মুফতি।
মুহাদ্দাদা	:	শত্রুতাপূর্ণ বিরোধিতা।

www.pathagar.com

মুহাজিরুন : অভিবাসী, বিশেষ করে মক্কা থেকে মদিনায় গমনকারী (হিজরতকারী) প্রথম যুগের মুসলমানরা।

মুহারাবা : প্রকাশ্য দুশমনি, যুদ্ধ।

মুহকামাত (একবচন, মুহকাম) : কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত।

মুহসান : সচ্চরিত্রের অধিকারী বিবাহিত মুসলিম যে যিনা বা রিদ্দাহ'র জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়নি, সৎ মানুষ, খ্যাতিমান ব্যক্তি।

মুহসিনিন (এক বচন, মুহসিন) : সদয় আচরণ ও সৎ কর্মের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

মু'জাহির বি'ল মা'য়াসি : যে ব্যক্তি তার খারাপ আচরণ বা পাপাচারের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়।

মুজতাহিদ (বহুবচন, মুজতাহিদুন) : আইনগত ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রচলিত সূত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন মতামত প্রদান করতে সক্ষম এমন যোগ্য আইন বিশারদ।

মুকাল্লাফ : আইনগতভাবে দায়ী ব্যক্তি।

মুখাসামা : বৈরী তর্ক-বিতর্ক বা কথা কাটাকাটি।

মুমারাত : তিক্ত কথাবার্তা বা আচরণ।

মুনাফিকুন (একবচন, মুনাফিক) : প্রতারক, মুনাফিক।

মুনকার : অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ, গরহিত কাজ।

মুরতাদ (বহুবচন, মুরতাদুন): ধর্মত্যাগী, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর সুস্পষ্ট কথা আচরণের মাধ্যমে তা পরিত্যাগ করে।

মুশাক্‌কাকা : বিচ্ছিন্নতা, ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ, কলহ এবং বিরোধিতা, বৈরী আচরণ।

মুশরিকুন (একবচন, মুশরিক) : বহু ঈশ্বরবাদী, মূর্তিপূজকবৃন্দ, যারা এক আল্লাহর সঙ্গে একাধিক খোদায় বিশ্বাস করে।

মুসতাহাব : দেখুন, মানদুব।

মুস্তাআ'মান : কোন ব্যক্তির সুরক্ষিত মর্যাদা।

মুস্তামাওবিফা : সুফি : অধ্যাত্মবাদী।

মুতাশাবিহাত : (একবচন, মুতাশাবি) : অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, বুঝা কঠিন, এর উদাহরণ হলোঃ কুরআনের কয়েকটি সূরার কয়েকটি সূচনা, বর্ণ, কুরআনের দ্ব্যর্থবোধক

www.pathagar.com

বা দুর্বোধ্য আয়াতসমূহ।

মুতলাক : নিরঙ্কুশ, সীমাহীন, অবাধ।

মুতরাক আল যাহির আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ।

আল নবী : দেখনু, আল রাসূল সাঃ

নফস : রূহ, আত্মা।

না' আইয়াহ : ভাড়াটে বিলাপকারী।

নাকল কাযিব মিথ্যা বিবরণ।

নাসিহ আন্তরিক উপদেশদাতা।

নাসিহাহ : আন্তরিক উপদেশ, প্রায় উপদেশদাতাই এ উপদেশ প্রদানের উদ্যোগী হন।

নাসিখ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা, রদ করা।

নাসখ : বাতিল ঘোষণা।

নুসূস : (এক বচন, নাস) : কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা, যাতে অভিব্যক্ত অর্থ সুস্পষ্ট এবং কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না।

কাদা : পবিত্র আদেশ।

কাদার : পূর্বনির্ধারিত, ভাগ্য, পরিণাম, ক্ষমতা।

কাযফ : মিথ্যা অপবাদ দেয়া, এ অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি (হাদ) হলো ৮০ ঘা দোররা।

কাযিফ : যে মিথ্যা অপবাদ দেয়, অপবাদ রটনাকারী।

কাযী : বিচারক।

কারা'ইন : পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ।

কার'ই : চূড়ান্ত, সুনির্দিষ্ট, সন্দেহজনক নয় এমন, জাননি'র বিপারিত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কাউলান মারুফান : শোভন ও সঠিক বক্তব্য।

কাউওয়ায়িদ কুল্লিয়া : বহুমাত্রিক প্রয়োগযোগ্য বিধি।

কিবলা : মুসলমানরা যেদিকে মুখ করে নামায পড়েন, কা'বা শরীফ।

কিসাস : বদলা নেয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ।

কিয়াস : যে মাস'আলার হুকুমের ব্যাপারে নস বা ইজমা নেই

www.pathagar.com

এমন নতুন মাস'আলার হুকুমের জন্য নস বা ইজমা আছে এমন কোন মাস'আলার সাথে উভয় মাস'আলার ইলৎ বা কারণ এক হবার কারণে সম্পৃক্ত করা।

কিয়াস আল-আওলা : অগ্রাধিকার যুক্তি।

রাফ 'আল হারা : দুর্দশা লাঘব করা।

রাহমান : দয়া/করুণা।

রা'ই : মেষপালক/রাখাল।

রাজম : পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

আল রাসূল : বার্তাবাহক, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ

রা'ই : সুচিন্তিত ব্যক্তিগত অভিমত, প্রায় নাস (দেখুন, নুসূস) এর বিপরীত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

রা'ই বাতিল : বাতিল অভিমত।

রা'ই ফি মাওদি আল ইস্তিবা : সন্দেহজনক অভিমত।

রা'ই মাজমুম : নিন্দনীয় বা আপত্তিকর অভিমত।

রা'ই সহিহ : বৈধ বা প্রশংসনীয় অভিমত।

রা'ই তাফসিরি : কুরআন সুন্নাহর কোন নির্দেশনার (নুসূস) ব্যাখ্যাদান ও স্পষ্ট করার জন্য প্রদত্ত অভিমত।

রা'ই ইজতিহাদি : সুচিন্তিত ব্যক্তিগত অভিমত যাতে কোন সুযোগ্য ব্যক্তির স্বাধীন মতামত অভিব্যক্ত হয়।

রিবা' : সুদ।

রিদ্দা : ধর্মত্যাগ।

রিফক : ভদ্রতা।

রিয়া : কপটতা, মুনাফেকি, লোকদেখান কাজ।

রুকু : রুকু করা, নামাযের সময় হাঁটুতে হাত রেখে শরীরের উর্ধ্বাংশ আনুভূমিক করা।

সাব : অবমাননা, দুর্নাম রটনা।

সাব আল্লাহ : ধর্মাবমাননা।

সাব আল-নাবী : দেখুন সাব আল-রাসূল।

সাব আল রাসূল : রাসূল সাঃ-এর খারাপ বলা বা অবমাননা করা।

www.pathagar.com

সাব আলসাহাবি রাসূল সাঃ কোন সাহাবীর অবমাননা করা।

সাব্বাব : ধর্মাবমাননাকারী।

সবর : ধৈর্য, সহনশীলতা, সংযম।

সাদ আল জারাই' : স্বার্থ সিদ্ধি বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

আল সগির : ছোটখাট গোনাহ।

সাহির : যাদুকর, গণক।

সা'ইগ : অনুমোদনযোগ্য।

সালাহ (বহুবচন : সালাওয়াত) : ফরয নামাজ। মুসলমানদের দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যরুরি।

সালাম : শান্তি, ইসলামে অভিবাদন রীতি, আসসালামু আলাইকুম (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। মুসলমানদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় এ সালাম বিনিময় করা হয়ে থাকে।

সালাতুত তারাবি : রমাযান মাসে এশার নামাযের পর যে নামায পড়া হয়।

সালাতুল খাউফ : ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার নামায। দৈনন্দিন ফরয নামাযের সংক্ষিপ্ত রূপ, কেউ জীবন নাশের আশঙ্কার মধ্যে থাকলে তার জন্য এমন নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

সালিহিন/সালিহুন : সৎ ও খোদাভীরু লোকেরা, যারা সাচ্চাভাবে কাজ করেন।

সাওম : রোযা, রমাযান মাসে রোযা পালন ফরয।

সাত্‌র আল-ফাওয়াহিশ : অন্যায় কাজ গোপন করা।

শা'আ'ইর-ই-ইসলাম (উর্দু) : ইসলামের পর্ব ও আচার-অনুষ্ঠান।

শাহাদাহ : ইসলামে ঈমান আনার ঘোষণা দানঃ 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাঃ তার নবী ও রাসূল।' একে আল শাহাদাতাইন বা ঈমানের দুটি সাক্ষ্য দানও বলা হয়। প্রথম হলো আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদান আর দ্বিতীয়টি হলো মুহাম্মদ সাঃ এর নবুওতির সাক্ষ্যদান।

শাহাওয়াত (একবচন : শাহওয়া) : যৌনস্পৃহা, কাম-লালসা, আকাঙ্ক্ষা।

www.pathagar.com

শা'ইর	:	কবি।
শান-ই-নুযূল (উর্দু)	:	কুরআনের আয়াত বা আয়াতসমূহের নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।
আল শার'	:	আইন, শরীয়া।
শার'ঈ	:	বিচারসংক্রান্ত আইনগত বিষয়ক।
শরী'য়াহ	:	কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত ইসলামী আইন। ইংরেজী ভাষায় শরীয়ার কাছাকাছি অনুবাদ হলো Islamic law তথাপি শরীয়া সুনির্দিষ্টভাবে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কেবল সীমাবদ্ধ নয় উপরন্তু তা নৈতিক ও ধর্মীয় নির্দেশনার আরো বৃহত্তর এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত।
শাতম	:	দেখুন সাব।
শয়তান	:	শয়তান।
শুবা (বহুবচন, শুবহাত)	:	সন্দেহ।
শুফ	:	অগ্রক্রমাধিকার।
শূরা	:	পরামর্শ
শুরুত (একবচন, শার্ত)	:	শর্তাবলী, পূর্বশর্ত।
সিফাত (একবচন, সিফা)	:	গুণ, প্রায়শ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
সিহহা	:	বৈধতা।
সিয়াসা শারী'য়া	:	শারী'য়া ভিত্তিক নীতি, প্রায় জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে জনকল্যাণের লক্ষ্যে অথবা প্রতিষ্ঠিত আইনের কঠোর প্রয়োগে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামের আশঙ্কার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা কাযী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
সু'য়াল-তা'বিল	:	হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা।
সু' ইস্তিমাল আল-হক	:	অধিকারের অপব্যবহার।
সুলতাহ	:	কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতা।
সুন্নাহ		মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ এর শিক্ষা ও অনুসৃত জীবনাচরণঃ যা কুরআনের পরই ইসলামের প্রধানতম নির্ভরযোগ্য উৎস। রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ তাঁর কথার নির্ভুল বিবরণ হাদিস হিসেবেও

		সুপরিচিত।
সূরা	:	(বহুবচন, সুওয়ার) : কুরআনের একটি অধ্যায়, সূরা।
সাইরিক (মালয়ী)	:	বহু ঈশ্বরবাদী, মুশরিক।
তা'আববুদি	:	আন্তরিক নিষ্ঠাবান।
তা'আদি	:	দেখুন, ই'তিদা।
তা'আসসুফ ফি ইস্তি'মাল আল-হক	:	কোন অধিকারের অপব্যবহার।
তা'ওয়াবুন	:	পারস্পরিক সহায়তা, ভাল কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।
তাদাখুল	:	অংশত পুন:আবৃত, ছেদ, সংমিশ্রণ।
তাগরিব	:	নির্বাসন দান, দেশ ছাড়া করা।
তাহাত্তুক	:	ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা।
তাহসিনিয়াত	:	অলঙ্করণ অথবা এমন-জিনিস যা তেমন একটা প্রত্যাশা করা হয় না, অত্যাবশ্যকীয় বা যরুরিয়াতের বিপরীত।
তাকযিব সারিহ	:	সরাসরি অস্বীকার করা।
তাকফির	:	কাউকে অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা।
তাখসিস	:	সুনির্দিষ্টকরণ।
তাখাইর	:	বিকল্প।
তালাক	:	বিবাহ বিচ্ছেদ।
তা'লিম	:	শিক্ষা, নির্দেশনা, পড়ানো, প্রশিক্ষণ।
তাকদীর	:	ভাগ্য, পরিমাপকরণ।
তাকিইয়া	:	ভান করা, সুবিধামতো গোপন করা, শিয়া ধর্মতত্ত্বের একটি মূলনীতি যাতে কোন ধর্মবিশ্বাসীকে বিপদের সময় সত্য গোপন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
তাকলীদ	:	অনুকরণ, প্রায় অতীতের আলেমদের সিদ্ধান্ত ও অভিমতের অন্ধ অনুকরণ করা বুঝায় যা প্রধানত: ইজতিহাদের বিপরীত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
তাকাইদ	:	গুণ, যোগ্যতা, অবস্থা, সীমাবদ্ধতা।
তাকওয়া		পরহেযগারি, আল্লাহভীতি ও সচেতনতা।
তারাবি		দেখুন, সালাত আল-তারাবি।

www.pathagar.com

তা'রিয বি'ল-আযা		ক্ষতিসাধন, বিরক্ত বা আঘাত করার চেষ্টা।
তা'রিয বিল কাযফ	:	অপবাদ দেয়ার চেষ্টা।
তা'রিফ	:	অবহিতকরণ, জানানো, জ্ঞাপন।
তারজিহ	:	(অন্যান্য আইনগত অভিমতের ওপর একটিকে) ওপরটি উপর অগ্রাধিকার প্রদান।
তাসালসুল	:	ঘটনার পরম্পরা।
তাসদিক বি'ল কাল্ব	:	অন্তরের গভীরে বিশ্বাস করার ঘোষণা দান, কেবল কথার মাধ্যমে সত্যতা প্রতিপাদনের বিপরীত।
তাশবিব		নারীর সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করা।
তাওবিখ	:	ভর্ৎসনা, তিরস্কার।
তাওহীদ	:	একত্ববাদ, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এ কথা বিশ্বাস করা।
তা'বিল		রূপক ব্যাখ্যা।
তায়াম্মুম		নামাযের আগে পবিত্রতা অর্জন, পানি পাওয়া না গেলেই কেবল পরিষ্কার মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করা হয়।
তা'যির	:	প্রতিরোধ বা প্রতিযোগিতামূলক শাস্তি, প্রায় পরিস্থিতির আলোকে বিচক্ষণতার সাথে কাযী এ দণ্ড দিয়ে থাকেন। এটি সাধারণত হাদ এর বিপরীত।
তা'যির বি'ল মাল	:	ফরিয়াদির ক্ষয়ক্ষতি, ফরিয়াদির আর্থিক ক্ষতিপূরণ দান।
সুবুত	:	প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চিত, নিশ্চয়তা।
তুহমাহ	:	দোষারোপ, অভিযোগ, কটাক্ষ, সন্দেহ।
তুহর	:	পবিত্রতা অর্জন।
উখুওয়া	:	ভ্রাতৃত্ব।
উলামা (একবচন, আলিম)	:	ধর্ম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ধর্মতাত্ত্বিক।
উলু'ল-আমর	:	'যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, সরকার ও সমাজের নেতা এবং আলেমগণ, যারা সামাজিক বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। কুরআনে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উম্মাহ : ব্যাপকার্থে বর্ণ, জাতি, দেশকাল, ভাষা ও জাতীয়তা নির্বিশেষে মুসলমান জনসমষ্টি। উম্মাহর একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হচ্ছে ঈমানী ঐক্য।

উম্মাহাত আল মু'মিনিন : 'মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) মাতা': রাসূল সাঃ-এর স্ত্রীগণকে বুঝাতে এ পরিভাষার ব্যবহার হয়।

উসূল আল ফিকহ : ইসলামি আইন ও বিচার ব্যবস্থায় মূল বা উৎস শরীয়ার প্রধান উৎস হিসেবে প্রধানত কুরআন-সুন্নাহ বুঝায়। তবে এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি সূত্র ও পদ্ধতিও রয়েছে যা ইজতিহাদের যথাযথ চর্চার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।

আল-উসূল আল-খামসা : ঈমানের পাঁচটি মূলনীতি (পঞ্চস্তম্ভ)

আল-ওয়া'দ ওয়া'ল ওয়া'ইদ: আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির হুমকি।

ওয়া'দ : সংবিধিবদ্ধ আইন।

আল-ওয়াহিদ : কেবল এক আল্লাহ।

ওয়াহিদ : এক।

ওয়াজিব : অত্যাবশ্যকীয় কুরআন-সুন্নাহর চূড়ান্ত নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য।

ওয়ালি আল-হিসবাহ : বাজার নিয়ন্ত্রণকারী।

ওয়া'য : নম্রভাষায় উপদেশদান।

ওযূ : নামাযের আগে পানির সাহায্যে পবিত্রতা অর্জন।

উজুব : জরুরি, অত্যাবশ্যকীয়।

ইয়াকিন : দৃঢ়বিশ্বাস।

যাকাত : বিশুদ্ধতা অর্জন। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ একবছর নিজের কাছে থাকার পর গরিব ও অভাবীদের সহায়তার জন্য মুসলমানের জন্য সে অর্থের শতকরা আড়াইভাগ দান করা বাধ্যতামূলক।

যালিম : স্বৈরাচার, নির্যাতনকারী, অন্যায়কারী ব্যক্তি।

যানাদিকা (একবচন, যিনদিক) : নাস্তিক, মুনাফিক।

যানদাকা : মুনাফিক।

যান্ন : সন্দেহজনক, গুজব।

যান্ন গালিব : সমূহ সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

যান্ন আল মুবাহ	:	সমূহ সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট গুজব, যা সন্দেহের (শাক) ভিত্তিতে সৃষ্ট গুজবের বিপরীত, যাতে বিষয়টি সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আধাআধি। প্রায়ই যাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ভিত্তি বলে বিবেচনা করা হয়।
যাননি	:	সন্দেহজনক।
যিহার	:	প্রাক ইসলামি এক ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক রীতি, 'আমার কাছে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো'- এ কথা ঘোষণার মাধ্যমে এ ধরনের তালাক দেয়া হতো।
যিনা	:	ব্যভিচার, অবৈধ যৌন মিলন, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মোহাম্মদ হাশিম কামালি ১৯৪৪ সালে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ওপর লেখাপড়া করেন এবং পরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন। অত:পর তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামি আইন ও মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজ-এর ওপর এল.এল.এম. ও ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ-এর ফ্যাকাল্টি, কানাডার সোশ্যাল সায়েন্সেস এন্ড হিউম্যানিটিজ রিসার্চ কাউন্সিল-এর গবেষণা সহযোগী এবং ওহিয়োর ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির ল' স্কুলের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে আইনের অধ্যাপক হিসেবে ইসলামি আইন ও ফিকাহ'র বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে তিনি International Institute of Advanced Islamic Studies, Malaysia এর Chief হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: 'ল ইন আফগানিস্তান : এ স্টাডি অব কনস্টিটিউশন্স', 'ম্যাট্রিমনিয়াল ল এন্ড জুডিশিয়ারি' (লেইডেন : ই. জে.ব্রিল ১৯৮৫); 'প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স' (কুয়ালালামপুর : প্যালেন্ডক পাবলিকেশন্স, ১৯৮১ এবং ক্যামব্রিজ দ্য ইসলামি টেক্সট সোসাইটি, ১৯৯১) 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন ইন ইসলাম' (কুয়ালালামপুর : বেরিটা পাবলিশিং, ১৯৯৪ এবং ক্যামব্রিজ 'দ্য ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি, ১৯৯৭); 'পানিশমেন্ট ইন ইসলামিক ল: এন ইনকয়ারি ইনটু দ্য হুদুদ বিল অব কেলান্টান' (কুয়ালালামপুর : ইনস্টিটিউট অব পলিসি রিসার্চ, ১৯৯৫); 'ইসলামিক কমার্শিয়াল ল : এন এনালাইসিস অব ফিউচার্স এন্ড অফশন্স'।

এছাড়া আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে তাঁর অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি দু'বার মালয়েশিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ইসমাঈল আল ফারুকী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া যৌথভাবে যখন এ পুরস্কার চালু করেন তখন তিনিই প্রথম এ পুরস্কার লাভ করেন। পরে ১৯৯৭ সালে তিনি তাঁর গ্রন্থ 'ইস্তিহ্‌শান (জুরিস্টিক প্রিফারেন্স) এন্ড ইটস এপ্লিকেশন টু কনটেম্পরারি ইস্যুজ' (জেদ্দা : ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭) রচনার জন্য দ্বিতীয়বার এ পুরস্কারে ভূষিত হবার গৌরব অর্জন করেন।

অনুবাদক পরিচিতি

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম। ১৯৫৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। স্কুল শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরে ১৯৮৫ সালে দৈনিক সংগ্রামে সহ-সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তের বার্তা বিভাগের সিনিয়র সহ-সম্পাদক ও শিফট ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত।

ইতোপূর্বে বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ 'রাসূলের (সাঃ) যুগে মদীনার সমাজ' ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় প্রায়শ:ই তার লেখা প্রকাশিত হয়।

ISBN

www.pathagar.com